GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য

(Iranian Influence in the Perception of Nazrul Islam: Perspective-Language and Literature)

466269

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

DIGITIZED

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সহ-তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে.এম. সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পিএইচডি গবেষক
মোঃ নূরে আলম
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য

(Iranian Influence in the Perception of Nazrul Islam: Perspective-Language and Literature)

466269

Dhaka University Library
466269

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সহ-তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে.এম. সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

DIGITIZED

পিএইচডি গবেষক
মোঃ নূরে আলম
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : ৫১/২০১২-২০১৩ (পুন.)

জুন ২০১৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

دانشگاه داکا

پایان‌نامه برای اخذ درجه دکتری

عنوان

تأثیر ایران بر اندیشه‌های نذرالاسلام از زاویه زبان و ادبیات

466269

استاد رهنما

دکتر کلثوم ابو البشر مجومدار

استاد بخش زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه داکا

استاد مشاور

دکتر ک.ام.سیف الاسلام خان

استاد بخش زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه داکا

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

نگارنده

محمد نور عالم

بخش زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه داکا

DIGITIZED

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পিএইচডি গবেষক জনাব মোঃ নূরে আলম কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত *নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য* (Iranian Influence in the Perception of Nazrul Islam: Perspective-Language and Literature) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমাদের জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোনো ভাষাতেই এই শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমরা এই অভিসন্দর্ভটি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

Kulsoom A. Bashar
24.06.2013

(ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার)
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সহ-তত্ত্বাবধায়ক

২৪.০৬.২০১৩

(ড. কে.এম. সাইফুল ইসলাম খান)
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য*** (Iranian Influence in the Perception of Nazrul Islam: Perspective-Language and Literature) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেন নি। আমি আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করি নি।

মোঃ নূরে আলম 28.06.2016

(মোঃ নূরে আলম)

পিএইচডি গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : ৫১/২০১২-২০১৩ (পুন.)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমার অত্যন্ত পছন্দনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় *নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য* (Iranian Influence in the Perception of Nazrul Islam: Perspective-Language and Literature)-এ গবেষণা করার সুযোগ দান করেছেন। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণের প্রতি।

এ গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ ও সুসম্পন্ন করার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়কগণের পরামর্শে আমি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। বানান-রীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান-রীতি অনুসরণ করেছি। তবে এতে ফারসি-আরবি ভাষার যে শব্দাবলি বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে তার কিছুটা পরিবর্তন করেছি। এতে ফারসি-আরবি শব্দাবলির প্রতিবর্ণায়নের (Transliteration) ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান* এর উচ্চারণবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা একাডেমী যেসব শব্দ দ্বিতীয় পর্যায়ে শুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছে ক্ষেত্র বিশেষে তা এবং ইরানি কবি-সাহিত্যিকগণে নাম ও 'গজল' শব্দটির বানানের ক্ষেত্রে নজরুলের ব্যবহৃত বানান অনুসৃত হয়েছে।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার এবং প্রফেসর ড. কে.এম. সাইফুল ইসলাম খান; যাঁদের আন্তরিক সদিচ্ছা, যথাযথ নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা এ অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে অধ্যায় ও উপাধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত-উপকরণ, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত, দিকনির্দেশনা এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এ অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্মত করেছেন। গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ করার জন্য বহু সময় তাঁদের কাছে যাতায়াত করেছি। যখনই আমি তাঁদের কাছে গবেষণার বিষয়ে সাক্ষাত লাভের জন্য যোগাযোগ করেছি, তাঁরা আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী ও তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

একটি বিষয় না বললেই নয়, আমি পিএইচডি গবেষণায় যোগদানের সময় নজরুল সম্পর্কিত বেশ কিছু বই আমার প্রিয় স্যার এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কে.এম সাইফুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেছিলাম। দুই বছর পর কিছু বই ফিরিয়ে দিয়েছি। এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বইগুলো আমি হাতছাড়া করি নি এবং তিনিও আমাকে কখনও বইগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য বলেন নি। অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার পরই বইগুলো স্যারকে ফেরত দেব। এ কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশে আমি অপারগ।

আমার গবেষণার মূল ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাই নজরুলকৃত রুবাইয়াতে ওমর খাইয়াম এর ভূমিকার শেষাংশের ভাষা অনুসরণ করেই বলছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. তারেক জিয়াউর রহমান সিরাজী আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহিত না করলে, ঘন ঘন খোঁজ-খবর না নিলে, তথ্যপ্রদান এবং সার্বিক সহযোগিতা না করলে, তাঁর বহু ব্যস্ততার মধ্যেও আমার লেখাগুলো সংশোধন না করলে হয়ত আমি কোনোদিনই প্রথম সেমিনার এবং দ্বিতীয় সেমিনারের প্রবন্ধ প্রস্তুত ও শেষ করতে পারতাম না। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমার পিএইচডি-এর দ্বিতীয় সেমিনার সম্পন্ন হয়। ইরান কালচারাল সেন্টারে তিনি আসলেই আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর নিতেন। আমি অফিসেই বিভিন্ন সময়ে গবেষণা কর্মের নিয়ম-পদ্ধতি, বানানসংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা নিয়েছি। তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান আমার অভিসন্দর্ভের কাজ ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর কাছে আমি এজন্য চির-ঋণী।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আবদুস সবুর খান এর প্রতি; তিনি আমাকে এ গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি তাঁর বাসায় আমাকে সময় দিয়েছেন, গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমার গবেষণা সম্পর্কিত লেখা অত্যন্ত যত্নের সাথে পড়ে, সংশোধন করে আমাকে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন।

আমার প্রিয় স্যার ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. মোহসিন উদ্দিন মিয়ার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; তিনিও আমার গবেষণাকর্ম ত্বরান্বিত করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ-এর প্রথম সেমিনার সম্পন্ন হয়।

আমার অভিসন্দর্ভের ওপর অনুষ্ঠিত দু'টি সেমিনারের মুখ্য আলোচকবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁদের সেসব সুচিন্তিত পরামর্শকে কাজে লাগিয়েছি ; যা এর সমৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁদের প্রতিও রইল আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

বিশিষ্ট গবেষক জনাব মো. আশিফুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক, ত্রৈমাসিক প্রত্যাশা বিভিন্ন সময় আমার গবেষণাকর্মে বানানরীতির ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষকরে পিএইচডি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং গবেষণাকর্মের শিরোনামের ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছেন; তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি ও কথা সাহিত্যিক এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন অধ্যাপক সিরাজুল হক। তাঁর প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রফেসর ড. মো. নূরুল হুদা এবং প্রফেসর ড. মো. শামীম খানের প্রতি; তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার কাজের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন এবং সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শুভাকাঙ্খি, প্রিয় বন্ধু এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. কামাল উদ্দিন এর কাছে। তিনি আমার গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়ে ও পরামর্শ প্রদান করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের প্রাক্তন কালচারাল কাউন্সেলর ড. এম. আর. হাশেমী, মোহাম্মদ ওরাই কারিমী এবং বর্তমান কালচারাল কাউন্সেলর ড. রেযা দিয়ানাত আমাকে গবেষণার কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যাঁদেরকে আমি আমার এ অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছি তাঁদের সবারই নাম আছে সাহিত্যে, বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্ম এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজেই কেবল আমার এ অভিসন্দর্ভে তাঁদের নাম থাকার জন্য তাঁরা পরিচিত হবেন না। আমার গবেষণাকর্মের মূল ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলছি, 'আমার সাহায্য করার মতি এ'দের অটল থাক্, এই-ই প্রার্থনা করছি।' মহান আল্লাহর কাছে সার্বিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। পরিশেষে আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
	প্রত্যয়নপত্র	II
	ঘোষণাপত্র	III
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV
	ভূমিকা	১-২৭
প্রথম অধ্যায় :	**পরিচিতি প্রসঙ্গ**	**২৮-৭৮**
	কাজী নজরুল ইসলাম পরিচিতি	২৮-৬২
	ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিচিতি	৬৩-৭৮
দ্বিতীয় অধ্যায় :	**নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ**	**৭৯-১৫২**
	কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ	৭৯-১০৭
	নজরুল-রবীন্দ্রনাথ ও পারস্যপ্রেম	১০৮-১৫২
তৃতীয় অধ্যায় :	**নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব**	**১৫৩-২৮৮**
	নজরুল কাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব	১৫৩-১৮৫
	বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ	১৮৬-২০৪
	ফারসির অনুপ্রেরণায় নজরুলের অনুবাদকর্ম	২০৫-২২৩
	হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য	২২৪-২৫৬
	খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য	২৫৭- ২৮৮
চতুর্থ অধ্যায় :	**পরিশিষ্ট**	**২৮৯-৩৯৩**
	হাফিজের মূল গজল ও নজরুলের অনুবাদ অংশ	২৮৯-৩০৪
	নজরুল অনূদিত *দিওয়ান-ই-হাফিজ* এর ৮টি গজল	৩০৫-৩২৩
	নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মুখবন্ধ	৩২৪-৩২৭
	নজরুল রচিত হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৩২৮-৩৩২
	দিওয়ান-ই-হাফিজ অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা	৩৩৩-৩৩৯
	নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াত-ই-হাফিজ*	৩৪০-৩৬০
	নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* এর ভূমিকা	৩৬১-৩৬৪
	ওমর খৈয়াম অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা	৩৬৫-৩৬৮
	নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*	৩৬৯-৩৯৩
উপসংহার :		**৩৯৪-৩৯৫**

Dhaka University Institutional Repository

صفحه‌بندی

تأییدیه اساتید ---------------------------------- II

تعهد نگارنده به اصالت کار ------------------------- III

قدردانی -- IV

مقدمه -- ۱-۲۷

فصل اول: معرفی ----------------------------- ۲۸-۷۸

معرفی قاضی نذرالاسلام ----------------------------- ۲۸-۶۲

معرفی زبان و ادبیات فارسی -------------------------- ۶۳-۷۸

فصل دوم: نذر الاسلام و رابیندرانات ---------------- ۷۹-۱۵۲

اندیشه‌های دینی قاضی نذرالاسلام ---------------------- ۷۹-۱۰۷

نذرالاسلام- رابیندرانات و ایران دوستی -------------------- ۱۰۸-۱۵۲

فصل سوم: تأثیر ایران بر قاضی نذر الاسلام ------------- ۱۵۳-۲۸۸

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر ادبیات نذرالاسلام --------------- ۱۵۳-۱۸۵

تأثیر فارسی بر غزل‌های بنگالی: مورد نذرالاسلام --------------- ۱۸۶-۲۰۴

روح فارسی در ترجمه‌های نذرالاسلام ------------------------ ۲۰۵-۲۲۳

تأثیر حافظ بر ادبیات نذرالاسلام --------------------------- ۲۲۴-۲۵۶

تأثیر خیام بر ادبیات نذر الاسلام --------------------------- ۲۵۷-۲۸۸

فصل چهارم: آثار نذرالاسلام ---------------------------- ۲۸۹-۳۹۳

غزل اصلی حافظ ترجمه بخشی از آن ------------------------ ۲۸۹-۳۰۴

ترجمه هشت غزل حافظ ---------------------------------- ۳۰۵-۳۲۳

مقدمه رباعیات حافظ ------------------------------------ ۳۲۴-۳۲۷

زندگی حافظ --- ۳۲۸-۳۳۲

تأثیر دیوان حافظ بر آهنگ‌های نذرالاسلام --------------------- ۳۳۳-۳۳۹

ترجمه رباعیات حافظ ------------------------------------ ۳۴۰-۳۶۰

مقدمه رباعیات عمر خیام --------------------------------- ۳۶۱-۳۶۴

تأثیر خیام بر آهنگ‌های نذرالاسلام -------------------------- ۳۶۵-۳۶۸

ترجمه رباعیات خیام ------------------------------------- ۳۶۹-۳۹۳

نتیجه‌گیری: -- ۳۹۴-۳۹۵

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

কোনো কবি ও কবির প্রতি অন্য কোনো ভাষা বা সাহিত্যের প্রভাব বুঝতে হলে তাঁর যুগকে বুঝতে হয়, কবি-জীবনকে বুঝতে হয়। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সে যুগের পরিচয়, বিশেষকরে সে যুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বুঝতে হয়। কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে যখনই কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে তখনই আমরা দেখতে পাই সে যুগের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছে এবং সে যুগও তাঁর দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে; এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্তি তাহা ত, আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝি। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। (উদ্ধৃত, বন্দোপাধ্যায়[১৬], ১৯৯০: ৬)

নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা কবি ও বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও নির্মাতা– যিনি চুরুলিয়ার কাজী বাড়ির মাটির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের সৃজনধর্মী প্রতিভা ও শিল্প-সচেতনতার স্পর্শে এবং ভাষা-জ্ঞানের দরুন শুধু বাংলা সাহিত্য এমনকি বিশেষভাবে বলতে হলে বাংলা কাব্য সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিতই হয় নি, বরং বাংলা ভাষাও বিভিন্ন শব্দ-সম্ভারে এবং বাকবন্ধে ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। তাঁর বিভিন্নধর্মী ও নানা বিষয়ক রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ভাষা-বৈচিত্র্য ও রচনার উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য এবং আকর্ষণের কারণ হয়েছে। নজরুল ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ও সৃজনধর্মী কবি এবং ভাষাশিল্পী। তিনি কবিতা-গানে ও অন্যান্য রচনায় বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকেই শুধু নিজস্ব শিল্প-সচেতনতায় এবং সৃজনী-কৌশলে নবরূপে ব্যবহার করেন নি, বরং বাংলা ভাষার অন্তর্গত ফারসি, আরবি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃত ইত্যাদি শব্দাবলি এবং জনজীবনে প্রচলিত গ্রামীন ও লোকজ শব্দসমূহকেও বিষয়ানুসারে অত্যন্ত দক্ষভাবে ও নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করে বাংলা ভাষার শক্তি, প্রকাশক্ষমতা এবং সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর রচনাকে করেছেন উৎকর্ষমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী 'যে আছে মাটির কাছাকাছি/সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি'-কে তিনি স্বার্থক করেছিলেন। চিরদিন মানুষের গান গেয়েছেন– 'গাহি মানুষের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। 'নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৩৪)

১

নজরুল ছিলেন সকল প্রতিহিংসার উর্ধ্বে। তিনি নিজেই বলেন, 'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সবগণ্ডী কাঁটাইয়া, সবসংকীর্ণতা, সবমিথ্যা সবস্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।' (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৯১১) তিনি হলেন মানুষের কবি, মানবতার কবি। পারস্যের মানবতার কবি শেখ সা'দীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল বলেছেন, 'মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো কাব্য নাই।' তিনি আল্লাহকে পাওয়ার উপায় সম্পর্কে বলেছেন, 'শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে', আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সকলের মাঝে প্রকাশ তাহার সকলের মাঝে তিনি'। এ বিষয়ে নজরুল আরও বলেছেন,

নাই-দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি-ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধুলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করবে, চির রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।' (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯২)

১৯২২ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমবেশি ২২ বছরের সাহিত্য সাধনায় নজরুল নিজেকে গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অগ্রসৈনিক ও ফারসি সাহিত্যের এক অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর বাণী 'বল বীর চির উন্নতমম শির, শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখড় হিমাদ্রির' যা আমাদেরকে আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে।

কিভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে নজরুলের সম্পর্ক হলো ? নজরুল কিভাবে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তা সত্যিই আমাদেরকে অবাক করে। যারা হাফিজ ও রুমীকে চিনতে পারেন নি, তাদের কাছে নজরুল অস্পষ্ট। এ বিষয়ে নজরুল বলেন, 'আমার বিদ্রোহী পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তারা যে হাফিজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে।' (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৪০০)

নজরুল ইরানি কবি হাফিজ, রুমী, খৈয়াম ও সা'দীর ন্যায় লেখনির মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার দুর করতে চেষ্টা করেছেন। এক সময় এদেশের মুসলমান সমাজ হাফিজকে কাফের আখ্যা দিয়েছিল। তারাই কাফের বলেছিল, মহাকবি ইকবাল, রুমী, খৈয়াম ও মনসুরকেও। নজরুল এ বিষয়ে বলেন,

> আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোন দিন অভিযোগ করেছি বলেত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভুষিত হবার মত বড় ত আমি হন নি। অথচ হাফিজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম! (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯৪)

নজরুল চেতনায় রয়েছে সা'দীর মানবতাবাদীগ্রন্থ *গুলিস্তান*, রুমীর আধ্যাত্মিকগ্রন্থ *মাসনাবী*-এর মূলবিষয়, হাফিজের প্রেমের সুর *দীওয়ান*, খৈয়ামের উদারতারবাণী *রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম*, আত্তারের মর্মীবাদ, সানাঈ ও আনোয়ারীর কাসিদার সামাজিক দিকসহ পবিত্র *কোরআন*, *বাইবেল*, *বেদ*, *ত্রিপিটক* ইত্যাদি। এগুলোর সারবস্তু আত্মস্থ করে তিনি তাঁর রচনা এত সুন্দর ও সাবলীলভাবে সন্নিবেশিত করে সাজিয়েছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যকর্ম উঠেছে প্রতি-হিংসার উর্ধ্বে, সক্ষম হয়েছেন প্রেমকে জয় করতে, নিজ ধর্মের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাশীল তেমনি অন্য ধর্মকেও তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এভাবে :

> জীবনে যে তাঁরে ডাকেনি ক, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
> কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার ?
> তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
> তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
> তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্মভেদ,
> সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আসে না ত বিচ্ছেদ !
> তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীয় মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
> তাঁহার অগ্নি জলবায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
> তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,

Dhaka University Institutional Repository

কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?
কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্মে দেয় নি ক গালি,-কে রাখে তার খবর ?'
(নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ২৬১-২৬২)

নজরুলের 'করুণ কেন অরুণ আঁখি/ দাও গো সাকি দাও শারাব' (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৩৯৬), 'আর সহে না দিল নিয়ে এই দিল দরদীর দিল্লগী/ তাই ত চালাই নীল পেয়ালায়/ লাল সিরাজি বে-হিসাব' (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৩৯৭) লক্ষ করলে মনে হয় তিনি যেন ফারসি কবিদের হুবহু অনুকরণেই গানগুলো রচনা করেছেন; যা শ্রতাকে অপূর্ব অনুভূতিতে বিহবল করে তোলে। কবির উপরিউক্ত গানের ছন্দ, আবেগ, ফারসি শব্দের অনুপ্রাস, বাংলা-ফারসি শব্দ ব্যবহারে পাঠককে আকৃষ্ট করে তোলে।

নজরুল তাঁর উপরিউক্ত কবিতায় 'নীল পেয়ালা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবির ব্যবহৃত নীল বর্ণ এবং নীল পেয়ালায় লাল সিরাজী ফারসি সাহিত্যে কতই না সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক। এ সম্পর্কে ড. রাজীব হুমায়ুন বলেছেন, 'হাফিজ তথা পারসীক কবিদের সুফি মনোভাব নজরুলের এই রকম কয়েকটি গানে যে রকম প্রতিভাত হয়েছে এমনটি আর বুঝি বাংলার সংগীত সাহিত্যে কোথাও নেই।' (হুমায়ুন[৩০], ২০০১ : ১১৯)

নজরুল অগ্নিবীনা, বিষেরবাঁশি, দোলনচাঁপা, চক্রবাক, সিন্ধুহিল্লোল, মরুভাস্কর, জিঞ্জির, শেষ সওগাত কাব্যগ্রন্থ; বুলবুল, চোখের চাতকসহ ইত্যাদিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান রচনা করেছেন। এতে রয়েছে স্বাধীনতার গান, বিদ্রোহের গান, ভাঙ্গার গান, প্রেমের গান, ইসলামি গান, শ্যামাসংগীত, কীর্তন ঝুমুর ইত্যাদি। অন্য দিকে তিনি আড়াই থেকে তিন হাজার সুর সৃষ্টি করেছেন।

ফারসি উচ্চ-শিক্ষা অর্জন না করে এ সাহিত্যের দখল কিভাবে তাঁর সম্ভব হলো ? চুরুলিয়া গ্রামের কাজী বাড়ির মাটির ঘরের এ 'দুখুমিয়া' কিভাবে লেটো দলের সর্দার হয়েছিলেন ? ২২/২৩ বছর বয়সে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে কিভাবে সাড়া জাগিয়েছিলেন ? ২৩/২৪ বছরের তরুণ কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন? ৩০ বছরের তরুণ কিভাবে বাঙালি জাতির সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন ? কিভাবে সুরের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি জাতিকে ? কিভাবে পেলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি ? কিভাবে এসব সম্ভব হলো তাঁর পক্ষে ?

অনেকেই বিস্মিত হন মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করে নজরুল কিভাবে এ সকল জানলেন ও লিখলেন ? এর উত্তর আছে নজরুল-এর কৈশোরের পরিবেশে, জয়দেব-গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস-চণ্ডিদাসের পরিবেশে এবং তৎকালে ফারসি সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের প্রভাবে।

নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নের জবাব রয়েছে তাঁর অধ্যবসায়ে, পারিবারিক পরিবেশের কিছু ভূমিকায়, চুরুলিয়ার নদী, বৃক্ষরাজি বা লোক সাহিত্যে। হাফিজ, রুমী, সা'দী, ফেরদৌসি ও খৈয়ামের মতো বড় বড় ইরানি মনিষীগণের কাব্যের প্রভাব রয়েছে তাঁর উপর। আসানসোল, রানীগঞ্জ, ত্রিশাল, দরিরামপুর, কুমিল্লার দৌলতপুর, ঢাকা, কলকাতা, রবীন্দ্র রচনাবলি, ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মিকগ্রন্থ, হাফিজের কাব্যে ব্যবহৃত প্রতীকী ও রূপক শব্দসম্ভার, ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, উপমহাদেশের পরাধীনতা নজরুলকে সহায়তা করেছে নজরুল হতে। আরও পিছনে তাকালে দেখা যায়, এ নয়-দশ বছরের ছেলেটিকে মসজিদে ইমামতি, গ্রামে মোল্লাগিরি, মক্তবে শিক্ষকতা, যাত্রার দল ও পালাগানের বা কবিগানের দলের সর্দার, বেকারির দোকানে চাকরি করতে হয়েছে। কারণ হাফিজের ন্যায় দারিদ্র ও অভাব। কবির নয় বছর বয়সে মারা গেলেন তাঁর পিতা কাজী ফকির আহম্মদ। হয়ত নজরুলকে নজরুল হতে দারিদ্রতাও সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল লিখেছেন :

হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৩৫৭)

এ দারিদ্র কি শুধু নজরুলকেই মহান করেছে ? শুধু নজরুল কেন- ইরানের মহাকবি হাফিজকে কি মহান করে নি ? হাফিজ জীবনের সূচনালগ্নে নজরুলের ন্যায় পিতৃহারা হয়ে দারিদ্রে নিপতিত হন। তাই এ দারিদ্র যেমন মহান করেছে হাফিজকে ঠিক তেমনি মহান করেছে নজরুলকেও। এ দারিদ্রের কারণেই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থসম্পদ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ আজীবন নিজের অধিকাংশ বই নিজেই ছাপিয়েছেন। এখন তিনি ও তাঁর সৃষ্টিসম্ভার ভারতের জাতীয় সম্পত্তি। অসামান্য জন-প্রিয়তার পরও প্রায় সব গ্রন্থস্বত্ব বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন নজরুল। তাঁর অতুলনীয় গান কত সামান্য মূল্যে কিনে নিয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানী' (মনিরুজ্জামান[১৯], ১৯৮৫ : ৩)

গুলিস্তাঁয় নজরুল সংখ্যা প্রকাশের কারণ স্বরূপ এস.ওয়াজেদ আলী বলেছেন :

> বাংলার জাতীয় কবি নজরুল গরীবের কণ্ঠে দিয়েছেন ভাষা, গরীবের দুঃখ তাঁর লেখায় এসেছে একান্ত সর্মস্পর্শী রূপে এবং গরীবের অভাব-অভিযোগ তাঁর অমর কবিতায় অগ্নিশিখার মতই জ্বলে উঠেছে। গরিব, পদদলিত এবং লাঞ্ছিত কৃষক এবং মজুর তাঁর কবিতা পড়ে তাদের আত্মসম্মানবোধ ফিরে পেয়েছে, তাদের অধিকারের বিষয়ে সজাগ হয়েছে। আর সংকল্প একেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার। (আলী[২], ১৯৯৪ : ৩০০)

নজরুলের এক চাচা ছিলেন কাজী বজলে করিম। তিনি ফারসি জানতেন। নজরুল তাঁর কাছে ফারসি শিখেছিলেন। চুরুলিয়া মক্তবের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন কাজী ফজলে আহাম্মদ সিদ্দিকী। নজরুলের ফারসি শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর কাছে। নজরুল কাজী বজলে করিম ও কাজী ফজলে আহাম্মদ সিদ্দিকীর কাছে শেখ সা'দী, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়ামের নাম শুনেছিলেন; পরিচিত হয়েছিলেন শেখ সা'দীর গুলিস্তানসহ সেকালে প্রচলিত ফারসি গ্রন্থের সঙ্গে। হয়তো নিজের অজান্তেই কিশোর নজরুল ভালোবেসেছিলেন- হাফিজ, ওমর খৈয়াম ও রুমীকে। আর এ ভালোবাসার ফসল *রুবাইয়াৎ -ই-ওমর খৈয়াম* ও *দিওয়ান-ই-হাফিজ*।

নজরুল গ্রাম্য মক্তবে মৌলভী সাহেবের কাছে 'দুখুমিয়া' উপাধিতে ভূষিত অবস্থায় ফারসি শিখে এ বিশাল সাহিত্য জগত কিভাবে নাড়া দিয়েছেন তা আজও গবেষকগণদের কাছে অস্পষ্ট। নজরুল তাঁর কাব্যগানে ও অন্যান্য রচনায় বহু ফারসি-আরবি-উর্দু শব্দ অত্যন্ত নৈপূণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ইরানের হাফিজ, খৈয়াম, রুমী ও অন্যান্যের ব্যবহৃত প্রতীকী ও রূপকশব্দ সুন্দর ও সাবলীলভাবে, যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে তিনি শুধু বাংলা কবি-সাহিত্যিক কেন; ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণকেও অবাক করেছেন।

নজরুল নিজ অভিজ্ঞতার মূল সম্পদের আলোকে মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রে যে মানুষ সম্পর্কে পবিত্র *কোরআনে* বলা হয়েছে 'আশরাফুল মাকলুকাত' সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, মহাগ্রন্থ *বেদে* বলা হয়েছে 'মনুষ্য জীব শ্রেষ্ঠ', সা'দীর *গুলিস্তানে* বলা হয়েছে, 'বিশ্বের সমগ্র মানুষ এক দেহ সরূপ', সেই মানুষের অন্তর্গত হয়ে নজরুল কিভাবে মানুষকে ঘৃণা করবেন ? কিভাবে অন্য ধর্মে গালি দিবেন ? এ বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ও রাসুলে করিম (সা.)-এর ব্যাখ্যায় পৃথিবীর আর কোনো কবি এমন তৎপর হন নি।

Dhaka University Institutional Repository

কবির বাণী :

আদম-দাউদ-ঈসা-ইব্রাহিম-মোহাম্মদ
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-নানক-কবীর বিশ্বের সম্পদ।
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৩৫)

১৯৪৭-এ পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার প্রায় পাঁচ বছর আগে ১৯৪২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম বাকরুদ্ধ হন। অবশ্য কবিকে নিয়ে লেখালেখির জোয়ার শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যমণ্ডলে তাঁর আবির্ভাবের ঠিক পরপরই। এ বিষয়ে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল এক পত্রে লিখেছিলেন, 'কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব ? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্রে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে বিরতিশয় পীড়িত হইয়া সে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।' (উদ্ধৃত, ইসলাম[৭], ১৯৮৩ : ৩)

২

আমাদের দেশের অনেক ইসলামিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান এখনও নজরুলকে অধার্মিক[১] হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। নজরুল বলেছেন :

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
(নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ৪৮০)

নজরুল আরো বলেছেন :

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত -লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু,বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৯৫)

কবিতাই তাঁর বুলেট ও বোমা যা তিনি বিপ্লবীদের নায় নিশ্চিত শাস্তির কথা জেনেও সমানভাবে লিখে যেতে পিছু হটেন নি। ফলস্বরূপ বিপ্লবীদের মতোই তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, জেলের মধ্যে অনশন করতে হয়েছে; অন্যদিকে তাঁর একটির পর একটি গ্রন্থ সরকারকর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

---

[১] দ্বিতীয় অধ্যায়ে *কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ* আলোচনায় বিস্তারিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যুগবাণী, *বিষেরবাঁশি*, *ভাঙারগান*, *প্রলয় শিখা*, *চন্দ্রবিন্দু* ইত্যাদি গ্রন্থগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। আর *অগ্নিবীণা*, *সঞ্চিতা*, *ফণিমণসা*, *সর্বহারা* ও *রুদ্রমঙ্গল*-এ গ্রন্থ নিষেধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যদিও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয় নি। নজরুল বলেন, 'যাঁরা মনে করেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি তাঁরা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে- তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান ? এ-ভুল যারা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে'। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৪০০) নজরুল পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তাঁর মতে :

> অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি- আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৮৮৪)

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (২ এপ্রিল, ১৯২৬ /২৯ চৈত্র ১৩৩২) উপলক্ষে নজরুল ইসলাম ২৬ আগস্ট, ১৯২৬ সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ 'গণবাণী'তে 'হিন্দু-মুসলমান' লেখেন। 'মন্দির ও মসজিদ প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

> হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম-তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, 'বাবা গো, মাগো!'-মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে! দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল। (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৮৭৯)

হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে নজরুল বলেন :

> হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৮৮৩)

নজরুলের বিভিন্ন লেখনির মধ্যে বাহ্যত ধর্ম বিরোধি এবং ইসলাম বিরোধি বক্তব্য দেখা যায়। যেমন তাঁর সমালোচনামূলক বাণীগুলোর মধ্যে একটি হলো :

> মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার
> রে অগ্রদূত ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
> (মনিরুজ্জামান[২০], ১৯৯৬ : ২২)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল নামায পড়াকে 'কাছা খুলিয়া পাঁচ ওক্ত ওঠ-বোস করা' (ইসলাম[৭], ১৯৮৩ : ১২০) বলে ঠাট্টা করেছেন। তিনি সমাজ জাগরণমূলক, রাজনীতিধর্মী, প্রতিবাদীধর্মী, প্রাথমিক সাহিত্য জীবনে একই মন্ত্রে উদ্বোধিত হয়ে শক্তির মাহাত্ম্যকীর্তন করার পর রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় প্রতারিত হয়ে মূল রাজনৈতিককর্ম থেকে বিদায় নেন। এসময়ে তাঁর চিন্তা থেকে মার্কসীয় দর্শন, তাঁর চিন্তার অনুকূল অন্যান্য পাশ্চাত্য দর্শনের অনুকূল বাতাসের দ্যোতনা ঝরে পড়ে। তিনি আবার ধর্মমুখী হন। তখন তিনি গীতিবাদ্য রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। যদিও এই সময় তিনি ইসলামি গান, শ্যামা-সংগীত বা বৈষ্ণব-গীতি লিখেছেন; তবু দেখা যায় তিনি তখনও শক্তিদর্শনে বিশ্বাসী। ১৯৪১-এ লিখিত তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, 'বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই- প্রেম জাগাইতে প্রহারের মতো অমোঘ ওষুধ নাই।' নজরুল নাস্তিকতাকেও গ্রহণ করেন নি, কমিউনিষ্ট হতে পারেন নি। বরং ১৯৪১-এর নবযুগের একটি সংখ্যায় 'আমার লীগ আমার কংগ্রেস' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন, 'আল্লাহ আমার প্রভু, রসূলের আমি উম্মত, আল কুরআন আমার পথপ্রদর্শক।' এ কথাগুলোতে বোঝা যায় ঈমানদার মুসলিম বলে তিনি নিজেকে যেমন পরিচিত করতে চেয়েছেন তেমনি তিনি যে, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোক নন সেটাও দেখাতে চেয়েছেন। বুদ্ধি দিয়ে জীবনসমস্যা উত্তীর্ণ হওয়া যায় এটাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সাম্যবাদী কবিতাতে তো বটেই, *জিঞ্জির* এর 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' (নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ৪৫৭) কবিতায় তিনি নীতিবাদ, শাস্ত্রকারদের ব্যঙ্গ করছেন এবং *নতুন চাঁদ* গ্রন্থে 'তাহার বুদ্ধিবদ্ধ নয়' বলে বুদ্ধিমানদের উপহাস করেছেন। কারণ সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমান মানুষ অসীমের রহস্য উদঘাটনে অক্ষম। তাঁর কিছু লেখা পড়ে বিশ্বাস করতেই হয় যে উমাইয়াপন্থী ত তিনি ছিলেনই না, মোতাযিলাপন্থীও ছিলেন না। যদিও তিনি লিখেছিলেন :

যে রূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ
দোযখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র সে দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী হোক না বে-নামাজী।
(উদ্ধৃত, শেলী[২৫], ২০০৫ : ৬৭)

যারা নজরুলের প্রতি বিদ্বেষী তাঁদের অনেকেই বলেছেন, নজরুল ইসলাম যাবতীয় নীতির মস্তকে পদাঘাত করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি চোর ডাকাত মিথ্যাবাদী বারাঙ্গনা প্রভৃতির যাবতীয় দুর্নীতিমূলক কার্যকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, স্নেহের হাত বুলিয়ে পঁচা সমাজের ভাল করা যায় না, পঁচা ফোঁড়া ও গলিত ঘায়ের চিকিৎসায় হাতুড়ে ডাক্তারের আশ্বাসে কাজ হয় না; সেখানে সার্জনের প্রয়োজন। রোগি গালি দেয়া সত্বেও সার্জন সেখানে ধারালো অস্ত্র চালায়। নজরুল বলেন, 'আমি কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা-ছুঁড়বেই গালিও দেবে, তা সইবার মত শক্তি চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবেনা। এ জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে।' (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯৫-৩৯৬)

নজরুল তেত্রিশ কোটি লোকের গ্রাস কিছু সংখ্যক মানুষকে কেড়ে খেতে দেখেছেন। তাই তিনি বলেন,

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৯৫)

নজরুল বুঝতে পেরেছেন, শোষিত-বঞ্চিত নির্যাতিতরাই সংখ্যায় বিপুল। নজরুলের চিন্তাধারা অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ। নজরুল এই নির্যাতিত বঞ্চিতদের সঙ্গে একাত্ম এবং তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁর লেটোর দলে ঘুরে

Dhaka University Institutional Repository

বেড়ানো, গান-বাঁধা, রুটির দোকানে চাকর হিসাবে কাজ করা, গার্ড সাহেবের বাবুর্চিগিরি করার অভিজ্ঞতা তিনি ভুলে যান নি। জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েছে। নির্যাতিত শোষিত মানুষের বক্ষজ্বালা তাঁর বুকে সত্যরূপে জ্বলেছে বলেই তিনি তাদের হয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন। একা সংগ্রাম করা যায় না বলে তিনি আগামী দিনের সৈনিকদের জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতাকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরে বলেন :

রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৯৫)

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে 'রবীন্দ্রনাথ, সতেন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রনাথ যেভাবে অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের কথা বলেছেন ; নজরুলের বলার তাগিদ তার থেকে আলাদা, এবং লক্ষও তাঁর ভিন্ন। তিনিও মানবপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর মানব কেবল যুগ-যুগান্তব্যাপী লাঞ্চিত অপমানিতেরাই। (রায়[২১], ১৯৯৮ : ২৬) নজরুলের সংগ্রাম ছিল দাম্ভিক, অহংকারী ধনী লোকদের বিরুদ্ধে; তাই তিনি বলেন :

চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?
বিচারক ! তব ধর্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনীকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
(নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ২৩৮-২৩৯)

৩

৩০ বছরের নজরুল যে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছেন—তা ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবিকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সংবর্ধনা সমিতির সদস্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মি. এস. ওয়াজেদ আলী। বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে এ সংবর্ধনায় সোনার দোয়াত-কলম এবং রূপার অভিনন্দন পত্রে ইরানের গুলবাগিচার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'তুমি বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ; মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। তুমি বাংলার মধুবনের শ্যাম-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলি দিয়াছ; ধুলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি'। নজরুল গ্রহণ করেছেন ইরানের মহামনীষিদের সৌন্দর্য। তাই তিনি ইরানের কবিদের সুন্দরের অনুভূতিতে উক্ত অভিনন্দনপত্রের জবাবে বলেছেন :

> আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তণু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।... বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি- এরি অভিযান

Dhaka University Institutional Repository

> সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি-এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। ... আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি; তাঁর চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৯১)

যাঁরা নজরুলের সমালোচক, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটান তাঁদের উদ্দেশ্যে নজরুল বলেন, 'যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে তাঁদেরকে অনুরোধ আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে গানের কবিকে তারা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।' (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৯১)

নজরুলের ছিল এক মহান সৎ উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য সফল করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রেম দিতে ও নিতে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মানুষের জন্য। তাই তিনি কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে মানুষকে নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু এ পৃথিবীর মানুষ তাঁকে ও তাঁর আবেদন বুঝতে পারে নি। ১৯৪১ সালে ৬ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী উৎসবে জীবনের শেষ সভাপতির ভাষণে নজরুল বললেন :

> যদি আর বাঁশি না বাজে..., আমায় ক্ষমা করবেন- আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুণ আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি- আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম। হিন্দু-মুসলমানে, দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ ও অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তুপের মত জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। ...আমায় ক্ষমা করবেন- মনে করবেন- পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত- আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ১২৭)

নজরুলের ভাষণ অবাক করল সকলকে। 'পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায়' অথবা 'পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে আসা তরুণের অপূর্ণতার বেদনা' মানে কি ? নজরুল কি সাহিত্য ছেড়ে দেবেন ? তিনি কি আত্মহত্যা করবেন ? কিন্তু সেদিন তারা বুঝতে পারেন নি যে বছর খানেক পর চিরদিনের মতো সত্যিই তিনি নীরব হয়ে যাবেন।

যে কবি বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিলেন, যে কবি একটি জাতিকে জাগ্রত করেছিলেন, সে কবিকে কখনো কোনো লোভ-অহংকার স্পর্শ করতে পারে নি। নজরুল ইব্রাহিম খাঁকে লিখেছেন, 'আমি একে পাড়া গেঁয়ে স্কুল পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরী নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না'। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯৪) অথচ বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে তার ধারণা 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ১৯) প্রবন্ধটিতে অনুমান করা যায়।

নজরুল জানেন কুম্ভকর্ণমার্কা সমাজকে আঘাত দেয়া ছাড়া জাগ্রত করা সম্ভব নয়, বিড়ালের গলায় কাউকে না কাউকে তো ঘন্টা বাঁধতেই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল বলেন :

বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আসহাবে কাহাফের' মত রোজ কিয়ামত তক্ ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, তেল-কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে-এ আশা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯৮)

নজরুল ইসলাম অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর একটি চিঠির উত্তরে বলেন:

আমরা কানাকড়ির খরিদদার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক করে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবেনা, মুদিওয়ালা ত নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তুল-দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তার পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদদার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মত সহায় সম্বল, তাহলে এ অভিযোগ করতাম না। (নজরুল ইসলাম[১৩], ১৯৯৩ : ৩৯৩)

৪

নজরুল ছিলেন রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথের[১] পর প্রথম মৌলিক কবি। তিনি মানুষের বিশ্ববিজয়ী প্রেমিক রূপ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মধ্যে দেখেছিলেন। 'মানুষের মাহাত্ম্য অর্থাৎ 'আশরাফুল মাখলুকাত' (সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) হওয়ার ধারণা নজরুল ইসলাম রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকেই পেয়েছিলেন' (ইউসুফ[৫], ২০০৩ : ৩২) বলে মানুষ ও তাঁর প্রেমের সৌন্দর্য তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্যটি সব দেশের সকল মুসলিম কবির মধ্যে বিদ্যমান। 'সা'দী, রুমী, হাফিজ এমনকি উমর খৈয়ামেও এ লক্ষণ পরিস্ফুট।' (ইউসুফ[৫], ২০০৩ : ৩২)

'১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের স্বল্পকাল পরেই নজরুলের কবিকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়'। (গুপ্ত[৯], ১৯৯৭ : ২৬) নজরুল ছিলেন একেশ্বরবাদী ও আত্মবিশ্বাসী। কবির ভাষায়: 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ'- (নজরুল ইসলাম[১১], ১৯৯৩ : ৮) ইহা বিদ্রোহের ভাষা নয় রবং আত্মবিশ্বাসের এক নিদর্শন। অথচ ১৯২১ সালে বাইশ বছর বয়সে বহুভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহকে সাথে নিয়ে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ষাট বছর বয়সের কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করতে ঘরে ঢুকেই কবি গুরুর পা ধরে সালাম করলেন নজরুল। ইহা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। 'নজরুল ইসলাম ভাষার দিক থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনাচারের প্রতিবাদ, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেও ভারতচন্দ্র-আলাওলের ধারার সঙ্গে নিজেকে যোগযুক্ত করেছেন।' (ইউসুফ[৫], ২০০৩ : ২৯)

নজরুল বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার মধ্যে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্নিগ্ধ শান্ত কাব্যধারার সঙ্গে এর সমন্বয় নেই বরং অসৌজন্য আছে বলা যেতে পারে।' (হাই[২২], ১৯৭৯ : ৩০৬) পশ্চিমা সাহিত্যের বাতাস আমাদের দেশে প্রবেশের ফলে কবিদের যাত্রা শুরু হয় ভিন্ন পথে-বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যের

[১] দ্বিতীয় অধ্যায়ে *নজরুল-রবীন্দ্রনাথ : পারস্যপ্রেম* পর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারাকে প্রায় অস্বীকার করে। 'বাহ্যত তার ভূমিকা হল, রবীন্দ্র কাব্য কলার বিরোধিতা। নজরুল ইসলামকে তিরিশের কালের সেই কবিদের গুরু বলে কেউ কেউ চিহিত করেছেন।' (ইউসুফ[৫], ২০০৩ : ৩০) রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি বাংলা সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও নজরুলের যোগাযোগ ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,- অতি বাক্‌পটুকে ঢোক গিয়ে কথা বলতে শুনেছি- কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর-বাড়িতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, সাহসই হবে না তোর এমনি ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে সে তা পারে। তাই একদিন সকালবেলা- 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল- কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। শুনেছি অনেক কথাবার্তার পর কবি নাকি বলেছিলেন- 'নজরুল, তুমি নাকি তলোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ি কামাচ্ছ-ক্ষুরই ওকার্যের জন্য প্রসস্ত- একথা পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন। (গুপ্ত[৯], ১৯৯৭ : ৩০)

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গজল[১]কাব্যে এক নতুন স্বাদ ও উত্তেজনাসৃষ্টি করেছেন। এজন্য নজরুলকে বাংলা গজলের জনক বলা হয়। একটি নতুন স্বভাবের নির্দেশে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে এলেন। এভাবেই আধুনিক বাংলা গজলকাব্যে তিনি এক নতুন স্বাদ ও আকাঙ্খা তৈরি করলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ছাড়া বাংলা গজলকাব্য বিকাশের যে নতুন পথ আছে, নজরুল ইসলামই তা প্রমাণ করেছিলেন। 'তিনটি কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন ইসলামের ঐতিহ্যের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যও তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না; দ্বিতীয়তঃ নজরুল ইসলাম এসেছিলেন অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্য থেকে এবং সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল; তৃতীয়তঃ দেশের রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।' (হাই[২২], ১৯৭৯ : ৩০৭)

তবে রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের সূক্ষ্ম দার্শনিকতা ও অরূপের লীলা-রহস্য নয়, এর মানবিক প্রেম, প্রকৃতিপ্রণয় এবং বিশেষ করে বঙ্গমন্ত্রের ঋষিরূপই নজরুল-প্রতিভাকে প্রভাবিত করেছে। (গুপ্ত[৯], ১৯৯৭ : ৩০)

অগ্নিবীণায় (১৯২২) যে কবি-কণ্ঠস্বর শোনা গেল রবীন্দ্রনাথের যুগে তা এক বিস্ময়কর কলধ্বনি। ধ্বনি-বিন্যাসের নতুন ধারা, শব্দ-ব্যবহারের এক হিল্লোলিত তরঙ্গাঘাত দ্বিধামুক্ত গতিসম্পন্ন *অগ্নিবীণা* বাংলাকাব্যে এক নতুন সংযোজন। ভক্তি ও নিবেদনের বিনয়াবর্তে যে বাংলা কবিতা এতদিন রবীন্দ্রকাব্যের ধ্যান-গম্ভীরতাসম্পন্ন ছিল, নজরুল ইসলাম সে কবিতায় একটি সাবলীল স্বাধীন স্ফূর্তি এবং অবাধ-আবেগ সঞ্চার করলেন। *অগ্নিবীণা* এর সূর আরও উচ্চস্বরে এগিয়ে গেল *বিষেরবাঁশি* তে (১৯৪২)। নজরুল *বিষেরবাশীর* কৈফিয়তে লিখেছিলেনঃ 'এ বিষেরবাঁশির বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীপিতা দেশ-মাতা, আর আমার অপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।' একই বছর প্রকাশত হয় *ভাঙার গান*। এ কাব্যে বৃটিশ বিরোধিতাকে কবিতায় প্রত্যক্ষ আবেগ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে। এভাবে ক্রমশ নজরুল ইসলাম শ্রমিক আন্দোলনের প্রবক্তা হলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাবেদ তিনি সাপ্তাহিক লাঙল প্রকাশ আরম্ভ করেন। দেশ ও জাতীর বিরুদ্ধে এভাবে রবীন্দ্রব্যতিক্রমী *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬) *ফণি-মনসা* (১৯২৭), *সিন্ধু-হিল্লোল* (১৯২৭), *বুলবুল* (১৯২৮), *চোখের চাতক* (১৯২৯) এবং

---

[১] তৃতীয় অধ্যায়ে *বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ* পর্বে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চক্রাবাক (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে নজরুল ইসলাম গণ-আন্দোলনের সংগ্রামী কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করলেন। তবে দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং কংগ্রেসের ভেদ-বুদ্ধি কবিকে দারুণভাবে আঘাত করেছিল।

নজরুল চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাই নজরুলের আবদারকে তিনি সর্বদাই প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁর অভিযাত্রাকে উৎসাহিত করেছেন। নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করায় যাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অনুমোদন করতে পারোনি, আমার বিশ্বাস; তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ, আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি; অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছমাত্র।' কিন্তু এর বাইরে নজরুলের কবিতা সমন্ধে সুস্পষ্ট কোনো মতামত রবীন্দ্রনাথ জানান নি।' (রায়[২১], ১৯৯৮ : ৩৪)

জেলে নজরুলের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা শুনতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জেলের ঠিকানায় তারবার্তা লিখে পাঠিয়েছেন : 'Give up hunger strike, our literature claims you' (হায়দার[২৩], ১৯৮৪ : ৩৮) কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সে তারবার্তা নজরুলকে না দিয়ে 'Address not found' লিখে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই তারবার্তা পেলে নজরুল কি করতেন আমাদের সে কৌতুহল রয়েই গেল।

৫

বৃটিশ পূর্বযুগে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর ধরে মুসলিম শাসনামলে ফারসিই ছিল এদেশের রাষ্ট্র, আদালত ও সংস্কৃতির ভাষা। ইংরেজ আমলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত এদেশের শাসন কার্যের ভাষা ছিল ফারসি। '১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে ভারতবর্ষের রাজভাষা হিসাবে প্রচলন করা হয়।' (স্মারক[২৯], ২০০৬ : ৩৬) সুতরাং বিগত একশত পচাঁত্তর বছরের (১৮৩৮-২০১৩ খ্রি.) ব্যবধানে তা অনেকটাই অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এ সময়ের ব্যবধানে ফারসি ভাষা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়েছে এবং এর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য সম্ভারও নতুন রং ও রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ফারসি ভাষার ইতিহাস[১] অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সাতশত বছর পূর্বেও ইরানি ভাষার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরই পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে আধুনিক ফারসি ভাষা। যার ফলে এ ভাষার প্রভাব নজরুল ইসলাম কেন শুধু এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। অনেক ইউরোপীয় মনীষীর উপরও এ ভাষা-সাহিত্য তথা ইরানি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মহাকবি গ্যাটে, এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, প্রফেসর ই.জি. ব্রাউন, এ.জে. আরবেরি, প্রফেসর নিকোলসন প্রমুখ ইরানি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসি সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। যাঁকে 'হাফিজে হাফিজ' বলা হতো। কারণ তিনি ইরানের কবি হাফিজের কাব্যসমগ্র মুখস্ত করেছিলেন বলে কথিত আছে। ইরানি চেতনায় আরও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মুনির উদ্দীন ইউসুফ, কবি আবদুস সাত্তার, আবদুল হাফিজ, কবি ফররুখ আহমদ, কবি গোলাম মোস্তফা, প্রফেসর কালিম সাহসারামী, অমিয় চক্রবর্তী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, আব্দুল হাই সিকদার, কবি আসাদ চৌধুরী,

[১] প্রথম অধ্যায়ে *ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিচিতি* পর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আল-মাহমুদ, প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার, ড. কে.এম. সাইফুল ইসলাম খান, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজি, ড. আবদুস সবুর খান, প্রফেসর ড. নুরুল হুদা ও প্রফেসর ড. শামীম খান প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণ। ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ ইরানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রায় ১৫০ জন বাংলাভাষী ফারসি কবি ও সাহিত্যিকের কথা তার *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* ও *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য* গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাষার শক্তিশালী কবি মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষায় কাব্য চর্চা করতে গিয়ে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে না পারলেও কবি ড. মোহাম্মদ ইকবাল উর্দুভাষী হয়েও ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করে সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে ইরানের কবি-সম্রাট (মালেকুশ্ শোআরা) বাহারের একটি চরণ প্রণিধানযোগ্য :

عصر حاضر خاصهٔ اقبال گشت　　　　واحدی کز صدهزاران بر گذشت

আচরে হা'জের খাচ্ছে ইকবা'ল গাশ্ত　　　　ভা'হেদী কেয্ সাদ হেজা'রা'ন বার গুজাশ্ত

[এই যুগ তো ইকবালেরই যুগ, তিনি একা
কিন্তু অতিক্রম করে গেছেন লাখো জনতা]
(উদ্ধৃত, স্মারক[২৮], ২০০২ : ভূমিকা)

নজরুল সাহিত্যের সবত্রই আমরা দেখতে পাই ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর আবেগমিশ্রিত দরদ ও ভালোবাসা রয়েছে যা সমভাষী হওয়ার চেয়ে কোনোক্রমেই কম নয়। মাওলানা রূমীর ভাষায় :

همدلی از همزبانی بهتر است
'হামদেলী আয হামযাবা'নী বেহতার আস্ত'
'সমহৃদয়ী সমভাষী চেয়ে উত্তম'

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা হয় ১২৫০ সালে, আর আধুনিক যুগ শুরু হয় ১৮০১ সালে। সুতরাং এ প্রায় পূর্ণ মধ্যযুগে ফারসি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্টীয় ভাষা। এ যুগের সাহিত্যের বিরাট অংশ ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত। সুতরাং এ যুগেই বাংলা সাহিত্যে ফারসি-আরবি শব্দের প্রবেশ ঘটে বহুল পরিমাণে। পরবর্তীকালে ফারসি-আরবি বাংলার আঞ্চলিক, উপভাষা এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণির ধর্ম সাংস্কৃতির ভাষায় রূপ নেয়। তুর্কী বিজয় এবং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজভাষা ফারসি হলেও মুসলিম শাসনকর্তারা বিশেষভাবে গৌড়ের সুলতানেরা বাংলা ভাষা চর্চায় উৎসাহ দান করেন। ঐতিহাসিকদের মতে বাংলা কাব্যে ফারসি কাহিনী-কাব্যের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হতে শুরু করে চতুর্দশ শতক থেকে। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে ফারসির চর্চা শুরু হয়। হুসেনশাহী বংশের আমলেই বাংলাভাষা সম্মানের আসন গ্রহণ করে। আলাউদ্দীন হুসেন শাহের দরবারের ভাষা ছিল ফারসি, যদিও তিনি অন্যান্য নবাব-বাদশার ন্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পালি প্রাকৃত, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি এবং আরও বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শব্দসম্ভার ও বাকবন্ধ গ্রহণ ও অধিগত করে অর্জন করেছে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি। নজরুলের ফারসি-আরবি ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আবদুস সাত্তার বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে এবং বিশেষত বঙ্কিম-উত্তর কালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কল্পে একযোগে নানামুখী ও পরস্পর বিপরীত-ধর্মী নানা প্রাবহিকতাযুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখা দেয়। এতে একটি বিশেষ ধারা ক্রমশ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বিংশ শতাব্দীতে উঠে এলেও, অপর ধারাটি অপেক্ষিত পরবর্তীকালে প্রকাশমান হতে থাকে। আরবী-ফারসী শব্দের নব্য-ব্যবহার প্রবণতা এই শেষোক্ত ধারাতেই আত্যন্তিকভাবে লক্ষযোগ্য হয়। আর তারই নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান আমাদের আজকের জাতীয় কবি, যাঁর সেদিন আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো হাবিলদার কবি, সৈনিক কবি, কিংবা বিদ্রোহী কবি রূপে। (সাত্তার[২৭], ১৯৯২ : ১)

ঐতিহ্যগত কারণে যেরূপ আরবি-ফারসি ভাষার সম্পর্ক ও সম্বন্ধ-সূত্র রয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষায়ও ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত কারণেই প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ এবং বাকবন্ধ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বিশেষত নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব প্রণিধানযোগ্য। শুধু নজরুল-কাব্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের বিশেষত কাব্যের আলোচনায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে সাধারণভাবেই আরবি-ফারসি এই যুগল শব্দ অনিবার্যভাবেই আসে। কেননা, ফারসি ভাষায় যেমন বহু আরবি শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি আরবি ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অনেক ফারসি শব্দ। নজরুল নিজস্ব ভাষা, আঙ্গিক এবং রূপরীতিতেও নতুন ভাবধারা আমদানি করেছেন। 'বক্তব্য-প্রকাশ ও উপজীব্য-বিষয় যথার্থরূপে ফুটিয়ে তোলার এবং কাব্য শিল্প নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি আরবী-ফারসী-উর্দু প্রভৃতি ভাষার ভান্ডারেও নির্দ্বিধায় হাত পেতেছেন।' (সাত্তার[২৭], ১৯৯২ : ১৩) এর পাশাপাশি এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, নজরুলের আগের বিশেষকরে মধ্যযুগ ও অষ্টাদশ শতকের কবিগণ তাঁদের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। শুধু মুসলমান কবিগণই নন, হিন্দু কবিগণের মধ্যেও অনেকে এই ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে কিন্তু সে ব্যবহার কৌশলগত ও অভিনবত্বপ্রয়াসী। 'নজরুল বাংলা ভাষার বহমান প্রবণতার সঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের মুসলমানি বাঙ্গালার অন্তর্সম্পদকে অম্বিত করলেন, সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি শ্রবণশোভন ও দ্যোতনাময় আরবি-ফারসি শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশ ব্যবহার করলেন।' (মাহ্ফুজউল্লাহ্[১৭], ১৯৯৩ : ২৭)

এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, পাল ও সেন রাজাদের শাসনামলে রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ভাষা ছিল পালি ও সংস্কৃত। সেন রাজাদের শাসনকালে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিতের মতে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট এবং জনজীবনের ভাষা হিসাবে পরিগণিত আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা অগণিত এবং কারো-কারো মতে হাজার চারেক। (শেলী[২৫], ২০০৫ : ১১)

এসব শব্দ বাংলা এবং লোকজীবনের ভাষায় এমনভাবে মিশে গেছে যে, কোনটি ফারসি আর কোনটি আরবি তা বুঝাই কঠিন।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে অনুবাদ সাহিত্য থেকে। সেটা সংস্কৃতি, হিন্দি, উর্দু, ফারসি অথবা ইংরেজি যাই বলিনা কেনো। দৌলতকাযী, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাফিজ, বাহরাম খান, সৈয়দ হামযা, পাঠান মোগল যুগের কবিরা ফারসি কাব্য থেকে সরাসরি অথবা সংস্কৃতি, হিন্দি, উর্দুর মাধ্যমে ঐ কাব্যের কাহিনীর ভাবালম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। লাইলি-মজনুর প্রেম কাহিনী নিয়ে দৌলত উযীর, বাহরাম খান *লাইলি মজনু* কাব্য রচনা করেন। মুল্লা জামীর *য়ুসুফ জুলায়খার* কাব্যের অনুসরণে শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর *য়ুসুফ জুলায়খা* কাব্য রচনা করেন এবং আবদুল রাজ্জাকের পুত্র আব্দুল হাফিজ রচনা করেন দ্বিতীয় *ইউসুফ জুলায়খা*। তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগও ছিল মুল্লা জামীর ফারসি কাব্যের। আলাওল আরব্য রজনীগ্রন্থের *সয়ফুল মুলুক বদি*

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জামান উপাখ্যান রচনা করেন কোনো ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে। আবদুল হাফিজ যে, *নূরনামা* রচনা করেন সেটিও ফারসি থেকে অনুবাদ করে। *নূর ফরাসিশ নামা* নামে আরও একটি কাব্য তিনি ফারসি থেকে অনুবাদ করেন। কবি নসরুল্লাহ খান ফারসি থেকে *মুসার সওয়াল*, আব্দুল করীম খন্দকার *দুল্লা মজলিস*, মুহাম্মদ নকী *তুতীনামা* এবং কবি আব্দুস সামাদ *গুলিস্তান ও বুস্তান* -এর অনুবাদ করেন। নিযামীর ফারসি কিতাব থেকে পরাগল খাঁ *শাহা পরীর কিস্‌সা* অনুবাদ করেন। এছাড়া ফারসি অনুবাদ থেকে ফারসি শায়খ মনসুর *শ্রীনামা* একটি দরবেশি পুঁথি রচনা করেন। হাজী আলী *মওতনামা*, মুহাম্মদ আলী *হযরাতুল ফিকাহ*, আলী রযা ওরফে কানু ফকীর *সিরাজ কুলুব* (যার অর্থ হৃদয়সমূহের প্রদীপ) ফারসি মূল পুস্তক *সিরাজ কুলুব* থেকে অনুবাদ করেন। কবি হায়াত মামুদ *চিত্ত উত্থান* বা *সর্বভেদ* নাম দিয়ে ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় রচিত তাজুল মুলুকের *মফরিহুল কুলুব*- এর বাংলা অনুবাদ করেন। সৈয়দ হামযা রচিত *হাতেমতাই*ও ফারসির অনুবাদ। ফারসি ভাষায় মূল পুস্তকটি রচনা করেন ফরহতুল্লাহ ফরহৎ। মুনশী কাদের উল্লাহও *হাতেমতাই*- এর একজন অনুবাদক। উল্লেখ্য পয়গম্বরদের জীবনকাহিনী, কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আমীর হামযার যুদ্ধ কাহিনী, হযরত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, সোনাভান, জৈগুন প্রমুখ বীর রমণীদের লাভের জন্য 'হানিফার জঙ্গ', দাতা হাতেম তাই- এর কেচ্ছা আরবের প্রেমিক যুগল-লায়লি মজনুর অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান, ইরানের প্রেমিক-প্রেমিকা শিরী-ফরহাদের করুণ প্রণয়কাহিনী, হযরত রাসূল (সা.)-এর জীবন বৃত্তান্ত এবং সোহরাব রুস্তমের কাহিনী যে ফারসি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা রামমোহনের বদৌলতে ফারসি সাহিত্যে কাব্যের ভাবও বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ফেরদৌসি, আলতাফ হোসেন আনওয়ারী, সা'দী, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী ও নিজামীর কবিতার অনুবাদ করেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্র দেব প্রমুখ অনুবাদ করেছেন *রুবাইয়াৎ-ই-খৈয়াম*। (শহীদুল্লাহ[২৪], ১৯৯৫ : অবলম্বনে)

মধ্যযুগে আরবি এবং ফারসি ভাষায় রচিত বিভিন্ন গালগল্পের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির ফলে মুসলিম কবিরা স্বভাবতই নিজেদের জাতীয় সাহিত্যে আমদানি রীতির দ্বারা আরবিয় গালগল্পের ঐন্দ্রজালিক অভিযোজনার প্রয়াস পান। সেই অভিযোজনার ফলে আমরা মুসলিম বাংলা সাহিত্যের শুরুতেই সাক্ষাৎ পাই শাহ মুহম্মদ সগীরের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের। (ইসলাম[৬], ১৯৯২ : ১৯) পুথিকাব্য রচয়িতারা অনেক সময় উর্দু ও হিন্দির অনুবাদের মাধ্যমে ফারসি অনুবাদ করেছেন। যেমন: আধুনিক কবি কান্তিচন্দ্র, নরেন্দ্রদেব, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা ইংরেজির মাধ্যমে খৈয়াম ও হাফিজ অনুবাদ করেছেন তবে নজরুলের বেলায় তেমনটি ঘটে নি।

ভাষা ও ভাবের দিক থেকে নজরুল ইসলামের অনেক কবিতাকে হাফিজ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা চলে। মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর *পারস্য প্রতিভা* নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট কয়েকজন ফারসি কবির জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ, এস.এ. মান্নান, এ. জলিল, সিকান্দর আবু জাফর, খালিকদাদ চৌধুরী, ডক্টর এ. কাদের, নিযামউদ্দিন আহমদ এবং মু. শহীদুল্লাহ যথাক্রমে হাফিজ শীরাযীর *দীওয়ানে হাফিজ*, ইকবালের *আসরারে খুদী*, সা'দীর *গুলিস্তান-বুস্তান*, খৈয়ামের *রুবাইয়াত*, মির্যা নাথানের *বাহারিস্তানে গায়বী*, সৈয়দ গুলাম হুসাইনের *সিয়ারুল মুতাআখখিরীন*, মিনহাজুদ্দীন আবু উমর উসমানের *তাবাকাতে নাসেরী* এবং মুহম্মদ কাসিম ফেরেশ্‌তা রচিত *তারীখে ফেরেশ্‌তার* বংগানুবাদ করেন। (আবদুল্লাহ[৩], ১৯৮৩ : ৫৭-৫৮)

বর্তমান বিশ্বের মানবজাতির মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অনাস্থা, অনৈতিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংঘাত ও মানবাধিকারলংঘনের অবস্থা বিরাজ করছে, বিশ্ববিবেকের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে কাজী নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম তাঁর সাহিত্যে ইরানি কবি শেখ সা'দী এবং হাফিজের নিম্নের অমীয় বাণী ঘোরঅন্ধকারে দীপ্ত আলোকশিখা স্বরূপ ব্যবহার করেছেন :

بنی آدم اعضای یکدیگرند　　　　که در آفرینش ز یک گوهرند

বনি অদাম আ'জায়ে একদিগারান্দ　　　　কে দার অপরিনেশ যে এক গাওগারান্দ

'বনি আদম একে অপরের দেহের অঙ্গসমতুল্য;
সৃষ্টিপ্রকৃতিতে তারা একই সূত্র থেকে উৎসারিত'

হাফিজ বলেছেন :

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد　　　　نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

দেরাখ্ত দুস্তি বেনেশান কে কামে দেল বিয়র অরাদ　　　　নেহালে দুশমানি বার কোন কে রান্জ বিশুমার অরাদ

বন্ধুত্বের বৃক্ষরোপণ করো যাতে হৃদয়-বাসনা ফলবান হয়
শত্রুতার চারাটিকে উৎপাটিত কর, কারণ তা সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের করণ।
(উদ্ধৃত, স্মারক[২৮], ২০০২ : ৩০)

৬

কাজী নজরুল ইসলাম আরবি-ফারসি শব্দসহ বাংলা ভাষায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত নানা ভাষার শব্দাবলি ও বাকবন্ধকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, তা বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্পদেই পরিণত হয়েছে। এ ভাষা তার হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন শব্দ-সমবায়ে এবং স্বদেশি-বিদেশি শব্দাবলিকে ধারণ করে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে নজরুল ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। যার ফলে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভাষায়, ভাবে ও অর্থের চেনতায় ইরানি কবিদের প্রভাবে প্রভাবিত হন।

নজরুল বাংলা কাব্যে ও সংগীতে ফারসি-আরবি ভাষার এবং ফারসি ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার হলেও তিনি ফারসি-আরবি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদি স্রষ্টা নন। কারণ মধ্যযুগের কবি বিশেষকরে মুসলমান কবিদের অনেকেই তাঁদের রচনায় ফারসি, আরবি, উর্দু-হিন্দি ব্যবহার করেছেন। আঠারো শতকের মুসলমানি পুঁথি রচয়িতাদের ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে ফারসি, আরবি শব্দ রয়েছে। মধ্যযুগের শেষের দিকের কবি ভারতচন্দ্রও তাঁর রচনায় প্রচুর পরিমাণে ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। নজরুলের কাব্যে ফারসি শব্দ ব্যবহার' আলোচনায় পুঁথি কাব্যের প্রসঙ্গ আনার কারণ হলো, নজরুল তার রচনায় পুঁথি কাব্যের ভান্ডারে হাত পেতেছিলেন। ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেনের ভাষায়, 'নজরুল ইসলাম যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর অধিকাংশই ১৮শ শতাব্দীর পুঁথি-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিলো' (শেলী[২৫], ২০০৫ : ১৫)

নজরুল ইসলামের পূর্বসূরী কবিদের অনেকেই ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার পরিহার করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'যুগ স্রষ্টা' আধুনিক এবং সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা কবি মধুসূদন দত্তের রচনায় ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার নাই বললেই চলে। মাইকেলের পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যেও ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার খুজে পাওয়া কঠিন। রবীন্দ্র-যুগের হিন্দু-মুসলমান কবিদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার পরিহার করেছিলেন। নজরুলের পূর্বসূরী রবীন্দ্রানুসারি কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার করলেও কাজী নজরুল ইসলামই তাঁর যুগ সৃষ্টিকারী প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ সৃজনক্ষমতা এবং শিল্প-সচেতনতার মাধ্যমে সমগ্র বাংলা কাব্যে ও ভাষার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে স্বীকরণ করে নিয়ে এবং বিষয়ানুসারে আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দাবলি ও বাকবন্ধ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্রধর্মী কাব্যভাষার জন্ম দেন। নজরুলের কবিতায় ফারসি-আরবি শব্দের সংখ্যা অগণিত এবং ব্যবহার সুষমামণ্ডিত এর সঠিক হিসাব নির্ণয় কঠিন। এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার বলেন, 'আমি কম্পিউটার পদ্ধতিতে নজরুল রচনা থেকে প্রায় তিন হাজার আরবী-ফারসী শব্দই উদ্ধার করেছি।' (সাত্তার[২৭], ১৯৯২ : ১১) এ তিন হাজার শব্দের মধ্যে 'শতকরা ৬০% ভাগ আরবি শব্দ, শতকরা ৩০% ভাগ ফারসি শব্দ এবং শতকরা ১০% ভাগ উর্দু বা অন্যান্য শব্দ। এ শব্দসমূহ আমাদের দেশে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে প্রচলিত ঠিক সেভাবেই নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগে নিপুণতা লক্ষ করে সৈয়দ এমদাদ আলী 'বাংলা ভাষা ও মুসলমান' প্রবন্ধে লেখেন :

> কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার কবিতা-নিচয়ে বহু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, বাংলা ভাষার শক্তি ও শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন। আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য নই যে, তাঁহার বাংলা শব্দের সঞ্চয় কম বলিয়াই তিনি মিলের সন্ধানে ছুটিয়া যান আরবী-ফারসীর দিকে। ... নজরুল ইসলামের মতের উপাসক না হইয়াও বাংলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের সুপ্রয়োগকে আমরা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া সমর্থন করি। নজরুল ইসলাম যে সকল আরবী-ফরাসী শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি সেই সকল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিতে কৃপণতা করেন না। তাহাতে এই সুফল ফলিয়াছে যে, নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত অনেক আরবী-ফারসী শব্দ তরুণ হিন্দু কবিগণ অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।' (আলী[২], ১৯৯৪ : ১৮১)

নজরুলের রচনায় ব্যবহৃত কিছু ফারসি শব্দ এবং আরবি সহযোগে গঠিত ফারসি[১] শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ আমদানি, আরাম, আহাযারি, ইরান, ঈদগাহ, উম্মেদ, একদম, কুঞ্চুশ, কবরস্থান, কম, কমজাত, কমজোর, কমবক্ত, কাবাব, কাঙ্গাল, কামান, খঞ্জর, খাক, খাজা, খিজির, খাপ, খামোশ, খাব, খাঞ্জা, খাস, খোশ-আমদেদ, খোশ-খবর, খেয়ালি, খোশনসিব, খুন, খোশরোজ, খোশবু, খোদ, গম্বুজ, গর্দান, গাযি, গুনাগার, গুলজার, গুলবাগ, গুলবাগিচা, গুলবাহার, গুলাব, গুলশান, গুলবদন, গুলিস্তান, গেরেফতার, গোর, গোরস্তান, চরকা, চাপরাশি, চেরাগ, চেহারা, জওহর, জখম, জঙ্গ, জমিন, জমিদার, জল্লাদ, জহর, জাহান, জানোয়ার, জিঞ্জির, জিন্দাবাদ, জিন্দান, জিন্দেগি, জুদা, জোশ, তখত, তখত-তাউশ, তলোয়ার, তাযি, তাম্বু, তেজ, তেগ, দম, দরগাহ, দরবার, দরবেশ, দরাজ দিল, দরিয়া, দরুদ, দস্ত, দাঙ্গা, দানাপানি, দামামা, দিল, দুশমন, দিশারি, দোযখ, দোয়া, দোস্ত, নওজোয়ান, নওরোজ, নওয়াব, নামায, নিশান, নিল, নেকি, নেকি-বদি, নেগাবান, নেস্ত-নাবুদ, পয়গম্বর, পয়গাম, পয়মাল, পরওয়ানা, পারওয়ার দেগার, পরদা, পানাহ, পিরহান, পিয়ালা, পীর, পেরেশান, ফরমান, ফরিয়াদ, বজ্জাত, বদ, বদনাম, বদমাশ, বন্দি, বন্দেগি, বরবাদ, বরাত, বাগিচা, বাদশাহ, বান্দা, বিমান, বুলন্দ, বুলবুল, বুসা, বিয়াবান, বেঈমান, বেয়াদব, ময়দান, মর্দ, মাতম, মাহতাব, মিনার, মিছিল, মুর্দা, মেহমান, মুসাফিরখানা, রওশন, রওশনি, রসিদ, রাহা, রোয, রোযা, লাজ, শমশের, শরম, শহীদী,

[১] এসব শব্দের যেগুলো আরবি সেগুলোও মূলত ফারসি শব্দ হিসেবে পরিচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শামাদান, শির, শিরীন, শিরনি, সিরাজি, শেরওয়ানি, সওদা, সওদাগর, সওয়াব, সফেদ, সিতারা, সিন্দাবাদ, সিপাহসালার, হরদম, হররোজ, হাজার, হাম্মাম, হারামি, হুঁশিয়ার, হুরপরি, হেরেম ইত্যাদি।[১]

নজরুল কাব্যে এবং তাঁর অন্যান্য রচনায় ব্যবহৃত বহুসংখ্যক আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের মধ্যে মাত্র কয়েকটি ফারসি শব্দ উপরে তুলে ধরা হলো। এ সকল শব্দের বহু শব্দই বহুবার বাংলাকাব্যে বিশেষতঃ পুঁথি সাহিত্যে, বৃটিশ পূর্বযুগে বাংলা গদ্যে-বিশেষত দলিল দস্তাবেজের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বৃটিশ পূর্ব-যুগে এবং মুসলিম শাসনামলে ফারসি ছিল রাজভাষা, কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনামলে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হয় রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম। এ পরিবর্তনের ফলে ফারসির চর্চা ক্রম বিলীন হতে থাকে। এমনকি ইংরেজ শাসনামলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর খ্রিস্টান পাদ্রী ও হিন্দু সংস্কৃত-পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের সূচনালগ্ন থেকেই শতশত বছর ধরে প্রচলিত ফারসি-আরবি শব্দাবলি বর্জিত হতে থাকে এবং সংস্কৃত শব্দাবলিই বাংলা ভাষায় বিশেষত সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে। দীর্ঘ সময়কাল ধরে মানুষের মুখে, কলমে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত ফারসি-আরবি শব্দের স্থান কিভাবে সংস্কৃত শব্দ দখল করে তার বিবরণ দিয়েছেন ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন *ময়মনসিংহ গীতিকা* গ্রন্থের ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতের অধীনেই আবদ্ধ ছিল। আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যে এবং গদ্য রচনায় জনজীবনে প্রচলিত ও শতশত বছরের ঐতিহ্যবাহী ফারসি-আরবি শব্দ খুবই কম ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের দুই যুগ-স্রষ্টা কবি এবং রবীন্দ্রনাথের অনুসারী কবিরাও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রধানত পরিহারই করেছেন অর্থাৎ তাঁরা সমগ্র বাংলা ভাষার সামগ্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের রচনাকর্ম পাঠ করলে আমরা লক্ষ করব যে :

> তাঁর নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারটি ছিল অসম্ভব রকমের শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ। এই শব্দ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দরাশিসহ আঞ্চলিক ও লৌকিক বাংলার শব্দ, সংস্কৃত অভিধানের অজস্র অপ্রচল ও দুর্ভেদ্য সংস্কৃত শব্দ, মুসলিম জনসমাজে প্রচলিত সহজ আরবি-ফারসি শব্দ থেকে শুরু করে অনেক অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ, হিন্দি-উর্দু ভাষার অজস্র শব্দ এবং ইংরেজিসহ আরও অনেক ভাষার শব্দরাশিসমূহ।' (আরিফ[১], ১৯৯৭ : চব্বিশ)

৭

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৩)-এর চিন্তা, চেতনা ও কাব্যে ইরানের বুলবুল ফারসি গজলের শ্রেষ্ঠ কবি, আল্লাহর আরেফ, বিশ্ব সাহিত্যের অত্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন, গায়েবি কণ্ঠস্বর খাজা হাফিজ শিরাজি[২] (১৩২০-১৩৯১) এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি ও সর্বমহলে স্বীকৃত। নজরুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় ফারসি সাহিত্যের যেসব বড় বড় কবিদের সাথে পরিচিত হন তাঁদের মধ্যে হাফিজ নুরন্নবী ছিলেন অন্যতম। নজরুল বলেন,

> আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকে তাঁরই কাছে ফারসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। 'নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৫)

---

[১] তৃতীয় অধ্যায়ে *নজরুল কাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব* শিরোনামে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।
[২] তৃতীয় অধ্যায়ে *হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য* শিরোনামে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল এবং হাফিজ উভয়ে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাঁরা শুধু ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য নিয়েই নয়, বরং মানব হৃদয়ের বৈচিত্রাবলি নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন। কবিদ্বয় যেখানে অন্যায়, অনৈতিক, ধর্মব্যবসায়ী ও সকল প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; তখন ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা ক্ষমতা লাভ করে ধর্মের নামে মানুষকে দাবিয়ে রাখে। তাঁদের কব্যে ধর্মীয় উগ্রপন্থী ও অত্যাচারী শাসকের হঠকারিতার সমালোচনা রয়েছে। নজরুল ও হাফিজের মানবীয় ভালোবাসা সমৃদ্ধ কবিতাগুলো 'শরাব' কেন্দ্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ; আধ্যাত্মিক প্রেম বিষয়ক কাব্যগুলো শরাব, গোলাপ, প্রেমিক ইত্যাদি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের কাব্যে সমাজের নির্যাতিত দুর্বল শ্রেণির লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

নজরুল ইসলাম হাফিজের ৭৩ টি রুবাই[১] সরাসরি ফারসি থেকে অনুবাদ করেছেন। তবে তিনি হাফিজের ৭৫টি রুবাইর কথা স্বীকার করেছেন। এর বাইরে 'মুখবন্ধে' কবি আরো দুটি রুবাইয়ের অনুবাদ দিয়ে বলেছেন, 'সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্তত এই দুটি রুবাইয়াতের কোনো মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে বলে আমি এ দুটির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।' (নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৬)

মূল ফারসির যে ছন্দ, অনুবাদে তিনি তা অক্ষুন্ন রেখেছেন। হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ কাজী নজরুল ইসলামের হাতে যেরূপ মোহন সুন্দর রূপে ফুটেছে তা অন্য কারো অনুবাদে প্রতীয়মান হয় না। কারণ ফারসি কবিদের অন্তরের সাথে নজরুলের অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নজরুল মুখবন্ধে হাফিজ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে, উপসংহারে হাফিজের জীবনী দিয়ে অনুবাদকে আরও মনোরম ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। নজরুল বলেন,

> আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সী 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' আছে, তার প্রায় সব কয়টাতেই পচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সী সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literature এ এবং মৌলানা শিবলি নোমানী তাঁর 'শেয় রুল আজম' এ মাত্র উনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন; এবং এই দুইজনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority- বিশেষজ্ঞ। আমার নিজেও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি-যদিও আরো তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। (নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৬)

একদিকে নজরুল ইরানের বুলবুল হাফিজ শিরাজীর রুবাইয়াতের অনুবাদ সমাপ্ত করলেন অন্যদিকে নজরুল- কাননের বুলবুলি উড়ে গেল। নজরুল-পুত্র বুলবুল চলে গেল। বুলবুলকে কবর দিয়ে ফিরে এলেন সবাই। বুলবুলের বিছানার পাশে হঠাৎ পাওয়া গেল হাফিজের অনুসরণে লেখা একটি কবিতার অংশ:

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিথানে তার।
(নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৩)

---

[১] রুবাই শব্দটি রুবা' (ربع) থেকে উদ্ভুত। রুবা অর্থ চার সংখ্যা বিশিষ্ট। কোনো জিনিস চারটি অংশযুক্ত হলে তাকে রুবা' বলা হয়। পরিভাষায় রোবাঈ বলা হয় সে কবিতাকে যার চারটি অংশ, পঙক্তি থাকে। কখনো কখনো প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনায় একে 'দোবেইতী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। (উদ্ধৃত,তামীমদারী[১০], ২০০৭ : ১৪০) রুবাই কবিতায় অন্ত্যমিলের পরিকল্পনাটি হচ্ছে প্রথম শ্লোকের অনুকৃতি এবং শেষ পঙক্তিতে প্রথম অন্ত্যমিলের পুনরাবৃত্তি। অন্ত্যমিলের এ পরিকল্পনাটির তৃতীয় পঙক্তিতে পুনরাবৃত্তি ইচ্ছাধীন। রুবাইতে যদি তৃতীয় পঙক্তি অন্ত্যমিলযুক্ত হয়, সে রুবাইকে 'মুসাররা' এবং তৃতীয় লাইন অন্ত্যমিলযুক্ত না হলে তাকে 'খাসী' বলা হয়। (উদ্ধৃত, তামীমদারী[১০], ২০০৭ : ১৪১) রুবাই কবিতার উৎস ইরানে। তুরস্ক এবং মধ্য এশিয়া হতে এই কাব্যরীতি ইরানে প্রবেশ করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোনো সনদেই এ সম্ভাবনা সম্পর্কিত কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু হিজরি পঞ্চম শতকের কবি মানুচেহরী দামগানীর কবিতায় অস্পষ্টভাবে এর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সম্ভবত এর উৎপত্তি এখান থেকেই যে, রোবাঈর সাথে সাদৃশ্যপূর্ন এক ধরনের কবিতা, পরিভাষায় যাকে 'হাইকু' বলা হয়, যা চীন ও তুর্কিস্তানে প্রচলিত ছিল। (উদ্ধৃত, তামীমদারী[১০], ২০০৭ : ১৪২)

Dhaka University Institutional Repository

বুলবুলের মৃত্যুতে দারুণ ভেঙে পড়েন নজরুল। দিশেহারা কবি একদিকে ঝুঁকে পড়েন যোগ-সাধনার দিকে, আধ্যাত্ম চিন্তার দিকে অন্যদিকে আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়েন সংগীতের দিকে, সাস্ত্রীয় সংগীতের দিকে, শ্যামা সংগীতের দিকে।

হাফিজের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। দুস্তর সময়ের পরিক্রমায় ফারসি ভাষা প্রচলনের সুবাদে হাফিজ তার সমকালেই বাংলায় ব্যাপক পরিচিত ছিলেন ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হিসেবে। হাফিজকে বাংলায় পরিণত ঐশ্বর্য সম্পদে রূপান্তর করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯১৭ সালে যখন নজরুল স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেলেন তখন এক পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেবের কাছে দেওয়ানে হাফিজের কিছু কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ফারসি শিখা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন,

> তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়-গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈয্য কুলোল না এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল। (নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৫)

হাফিজের সঙ্গে নজরুলের জীবনের এক গভীর যোগসূত্র হলো, ছোটবেলা নজরুল এবং হাফিজ উভয়ের পিতা মৃত্যুবরণ করেন, উভয়েই রুটির দোকানে কাজ করেছিলেন, পারস্যে হাফিজকে নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয় এবং এজন্য তিনি বহু দুর্ভোগ সহ্য করেন। বাংলায় নজরুলকেও এক সময় কাঠমোল্লার দল কাফের ফতোয়া দিয়েছিলো এবং এ জন্য কবিকে নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিলো। অথচ নজরুল নাস্তিক ছিলেন না, এদেশে আজ নজরুলের হামদ, নাত ও গজল ছাড়া কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। 'হাফিজ ও নজরুলের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ মনে হয় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সাধনার স্তর উত্তীর্ণের ফলেই জীবন দর্শনে বিশেষ অবস্থা তৈরি হওয়া। যা ঘটেছে হাফিজ ও নজরুলের ক্ষেত্রে এবং মূর্খরা না বুঝেই এই অমর কবিদ্বয়কে নাস্তিক ও কাফের আখ্যা দিয়েছে।' (ইত্তেফাক[৮], ২৯ আগস্ট, ২০০৮)

পারস্যের কবিগণের প্রতি বাংলার কবি নজরুল ইসলাম বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হন। এদের মনন-মেধা, সুর-চেতনা দ্বারা নজরুল এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর অনেক গজল-গানে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীতে এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। *নজরুল-গীতিকা*, *সুর-সাকি*, *জুলফিকার*, *বন-গীতি*, *গুল-বাগিচা*, *গীতি-শতদল* ও *গানের মালার* অনেক কবিতা-গানে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। *নজরুল গীতিকা* তে তো *ওমর খৈয়াম-গীতি* ও *দীওয়ান-ই-হাফিজ-গীতি* নামে আটটি করে কবিতা গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকেই প্রতীয়মাণ হয় যে, ফারসি সাহিত্য তথা পারস্যের মহাকবি হাফিজ দ্বারা নজরুল কতটা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

নজরুলের মতে, ইরানি কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস করতেন। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের ওপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্বদা নিজেদের 'রিনদান' বা স্বাধীন চিন্তাকারী, ব্যভিচারী বলে সম্বোধন করতেন। এজন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল। 'হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর-'কায় বেখবর, আজ ফস্‌লে গুল্‌ ও তরকে শারাব-ওরে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন-আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে বসে আছিস?' (নজরুল ইসলাম[১২], ১৯৯৩ : ১৭)

Dhaka University Institutional Repository

কালের পরিক্রমায় ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে সকল মহামণীষীদের সমুন্নত আধ্যাত্মিক শক্তি, সুগভীর চিন্তাধারা ও গবেষণাধর্মী অবদান রয়েছে এবং ফারসি ভাষী নন এরূপ চিন্তাশীল কবি, সাহিত্যিকগণকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছেন তাঁদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী, ফেরদৌসি, হাফিজ শিরাজি, শেখ সা'দী প্রমুখ মহাপুরুষগণের নাম প্রণিধানযোগ্য যাঁদের যাদুময় ভাষা ও সাহিত্য রস ভাণ্ডারের গভীরে পরিচিত ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ফারসি সাহিত্যের মহান মণীষীগণ বিশেষকরে মিষ্টভাষী কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক ও আরেফ ইরানের নিশাপুরের হাকীম ওমর খৈয়ামের[১] চিন্তার প্রখরতা, ভাষার লালিত্য, বাচনভঙ্গির শুদ্ধতা ও যাদুময় আকর্ষণ নজরুলের মাঝে প্রেমের মণিমাণিক্য ও জ্ঞান-মণীষার রত্নভাণ্ডার বিতরণ করেছে। খৈয়ামের ভাষায় মানুষের পরিচয়, মানুষের জ্ঞানের কথা, জীবনের গুঢ় রহস্য, জীবন ও জগতের নানা সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে মানব মনের কৌতুহল ইত্যাদির আগ্রহপ্রবণতা ও চিন্তা-চেতনার সত্যিকার প্রকাশ ঘটেছে। যার ফলে :

> ওয়েইকে, কার্সন, দোতাসী, নিকলাই, তনুফীল, গ্যাটে, ফিটজিরাল্ড, ইয়ান ফালীদ, অ্যালেন রায়স, ক্রিস্টেন সেন, এডওয়ার্ড ব্রাউন, আর্নেস্ট, রোনান, জর্জ সালিমুন, যুকোফেস্কী, গার্লো, বীর সালভা, মীনুরোস্কী প্রমুখ অসংখ্য ওরিয়েন্টালিস্ট ও পাশ্চাত্য জগতের নামীদামী সাহিত্য বিশারদ তাঁদের মূল্যবান জীবনের পুঁজি বিনিয়োগ করে বছরের পর বছর ওমর খৈয়ামের ভাষা, বর্ণনা এবং তাঁর সময়কার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও রুবাইগুলোকে বহুবার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। (নিউজ লেটার[১৫], ২০০২ : ৭)

ফন হ্যামার ১৮১৮ সালে ওমর খৈয়ামের কবিতা জার্মান পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু জার্মান ভাষা তেমন বহু-প্রচলিত ভাষা না হওয়ায় ইউরোপের সর্বত্র ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে তেমন কৌতুহল জাগে নি। খৈয়াম তাঁর কাব্যে আল্লাহর মহান অস্তিত্বের বিমলতা, মহানত্ব ও উচ্চতার মোকাবিলায় মানুষের প্রকৃত দুর্বলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর নজরুল ইসলাম এ অর্থেই খৈয়ামকে উপলব্ধি করেছেন। নজরুলের মতে -

> ওমরকে তাঁর কাব্য প'ড়ে যাঁরা Epicurean ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণত ছয়ভাগে বিভক্ত ১) 'শিকায়াত-ই-রোজগার' অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ। ২) 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ। ৩)'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া' বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা।... ৪) 'বাহরিয়া'-বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, 'পাখি' ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা। ৫) 'কুফরিয়া'-ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। ৬) 'মুনাজাত' বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মত প্রার্থনা নয়- সুফির প্রার্থনার মত এ হাস্য-জড়িত। (নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ২৮৮)

খৈয়াম গান রচনা করেন নি অথচ নজরুল একাধিক রুবাই অবলম্বনে সমধর্মী, প্রাসঙ্গিক পঙতি স্বীয় কাব্যাংশে সংযোজন করে সম্পুর্ণ অভিনব নিয়মে গান রচনা করেছেন। নজরুলের ওমর *খৈয়াম গীতি* এ গানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নজরুল রচনাবলির ২য় খণ্ডের *নজরুল-গীতিকার* প্রথমেই ১ থেকে ৮

---

[১] তৃতীয় অধ্যায়ে *খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য* শিরোনামে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নং গীতির নামকরণ করেছেন *ওমর খৈয়াম-গীতি*। এটা ওমর খৈয়ামের ভাবাবলম্বনে নজরুল রচনা করেন। এ ৮টি ওমর খৈয়াম গীতির ক্রমানুসারে নামকরণ করেন ১) সিন্ধু-কাফি-কাওয়ালী, ২) ভৈরোঁ-কাওয়ালী, ৩)ভীমপলশ্রী-দাদ্‌রা, ৪)ভূপালী মিশ্র-কাহারবা, ৫) ভৈরবী- কাওয়ালী, ৬) পিলু কাহার বা, ৭) কালাংড়া-আদ্ধাকাওয়ালী, ৮) বেহাগ- দাদ্‌রা। সুতরাং নজরুল বেশ সচেতনভাবেই খৈয়ামকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই নজরুল ও খৈয়াম স্বাধীন মেজাজের, আত্মসত্তার উদ্বোধনকারী, প্রতিবাদী ও সংস্কারবাদী ছিলেন। নজরুল বেছে বেছে খৈয়ামের মাত্র ১৯৭টি রুবাই অনুবাদ করেছেন। নজরুল বলেন :

> আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ বেছে নিয়েছি; এবং তা ফার্সী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গী বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আমার মতো-কবির কবিতার মতো তা একেবারে বাজে। বাকীগুলিতে ওমর খৈয়ামের ভাব নেই, ভাষা নেই, গতি ঋজুতা-এক কথায় স্টাইলের কোনো কিছু নেই। (নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ২৯১)

ওমর খৈয়াম আধুনিক ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরে একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মলাভ করেন। তখন ইরানে বহু সংখ্যক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইরানে মুসলিম বা ইসলামি দর্শনকে ইরানি বিদ্বানগণ চার ভাগে ভাগ করে থাকেন। তাহল–১) মাশ্‌শায়ি দর্শনের ধারা; ২) ইশ্‌রাকি দর্শনের ধারা; ৩) ইরফানি দর্শনের ধারা ও ৪) কোরানিক দর্শনের ধারা।

এই চারটি ধারার প্রথমটা অ্যারিস্টটলীয় ধারা। ইবনে সিনা প্রথম এ ধরার দর্শন-চর্চার সূচনা করেন ও এর বিস্তার ঘটান। ইশ্‌রাকি দর্শন ধারার সূচনা করেন ও এর বিকাশ ঘটান সোহরাওয়ার্দী। ইরফানি দর্শন চর্চার ধারার সূচনা ও বিকাশ লাভ করে হাসান বসরী, ইব্রাহিম আদহাম, বায়যীদ, বোস্তামী, যুননুন মেসরি, প্রমুখের মাধ্যমে। আর কোরানিক দর্শন-চর্চার ধারা প্রবর্তন ও বিকাশের ব্যবস্থা করেন– কুরআন হাদীসবেত্তাগণ বা কালামশাস্ত্রবিদগণ। কবি ওমর খৈয়াম ছিলেন– ইবনে সিনার ছাত্র। আর সেই কারণে মুসলিম মাশ্‌শায়ি দর্শন ধারার বা অ্যারিস্টটেলীয় ধারার দার্শনিক তিনি।

ওমর খৈয়াম ইরানি আবহাওয়া সঞ্চারক সাকি, সোরাহি, শারাব, মিলন, বিরহ, তন্বী তনু, রূপসী নারী, প্রেম-দিওয়ানা ইত্যাদি উল্লেখ করে রুবাই লিখেছেন যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের ইসলামি চেতনাকে আঘাত করে। যার ফলে ইসলামি ধর্মবিদগণের কেউ কেউ না বুঝে খৈয়ামকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। একই ধরনের ধর্মতত্ত্ববিদগণ নজরুলকেও কাফের ফতুয়ায় ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি, বিদ্রোহ করেছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। তাই ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি ওমরের মনোভাব আর নজরুলের মনোভাবে কোনো ব্যবধান নেই। এখানে উভয়ে একে অপরের দ্বিতীয় আত্মা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ সকল রূপক শব্দের গভীরতায় প্রবেশ করে নজরুল খৈয়ামের রুবাইর অনুবাদ করেছিলেন। ওমর খৈয়াম সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

> এ পর্যায়ে ফিটজিরাল্ড (Fitzgerald) ওমর খৈয়ামের রোবাঈসমূহ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। রুশ গবেষক ও লেখক যুকোভস্কী তাঁর রোবাঈসমূহ সংগ্রহ ও এ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। অর্থার আরবেরীও তাঁর সাহিত্যরীতি (স্টাইল) ও বিষয়বস্তু সমালোচনাধর্মী গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বিচার করে তাঁর কবিতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তবে খৈয়াম কেবল রোবাঈয়াতই রেখে যান নি, বরং 'নওরোযনামে' 'রেসালেয়ে ওয়াজুদিয়ে' বা 'রওযাতুল কুলুব', ইবনে সীনার

Dhaka University Institutional Repository

'খোৎবাতুল গরা'-এর অনুবাদ প্রভৃতি দার্শনিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীও রচনা করছেন। (তামীমদারী[১৩], ২০০৭ : ১৫০)

অবশ্য এরূপ শব্দ ব্যবহারের প্রাচীন ধারার বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস রয়েছে। কবিতা, গান ও গজলের দেহে রসাবেশের চুমকি সৃষ্টিকারী ঐসব শব্দ ইরফানি কবিতা ও গজলে প্রথম আনেন– মিশরের সুবিখ্যাত আরেফ জুননুন মিশরী। তারপর থেকেই এ-রচনা-শৈলী ইরানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

মরমী কবিতায় এ-রকম বিশেষ রীতির পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার শুধু ইসলামি ইরফানি কবিতা ও গজলে নয়; সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, বাউল -সাধকদের গানেও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা পাওয়া যায়– জুননুন মিশরীর বহু পূর্ব থেকেই। ভারতে, ভারতীয় বাঙালায় ও বাংলাদেশে এ-রকম প্রতীক-রূপে বিশেষ বিশেষ অর্থে বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার লক্ষনীয়। ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করার এই রীতি-ই বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে চালু হয়। অতএব, বিষয়টা বহু পুরোনো এবং আন্তর্জাতিক। কাজেই ইরানি– রুবাই ও গজলের ঐসব পারিভাষিক শব্দের প্রকাশ্য অর্থ ছাড়াও গোপনীয় বিশেষ বিশেষ অর্থ রয়েছে; যা ভারত-বাংলাদেশের তন্ত্রতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বাউলতত্ত্বের সাথেও সম্পৃক্ত।

বিষয়টি সম্পর্কে অসচেতনতার কারণেই গত নয়শত বছর যাবৎ ইরানি রুবাই-গজল ইত্যাদি ইরফানি কাব্য, কবিতা ও গজলগানের তত্ত্বব্যাখ্যায় কেউ সুরা, সাকি, সোরাহি জাতীয় অতিকদর্য ভোগ-সম্ভোগের কাব্যোপকরণগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা ছিল অনুমান ভিত্তিক। তারা এ সকল কবিদেরকে কৈফিয়ৎ গ্রহণের সুরে গুনাহগার স্বরূপ উল্লেখ করেছেন । তাদের প্রশ্ন নজরুল অনূদিত খৈয়ামের ভাষায় :

পৌঁছে দিও হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে, লয়ে আমার নাম–
'বাদশানবী! কাঁজি খেতে নাই ত' নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ ক'রল আঙুর পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?
(নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ৩৩২)

তাদের উত্তর নজরুল অনূদিত খৈয়ামের ভাষায় :

তত্ত্ব গুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হাদিস্ !
কোথায় আমি ব'লেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ !
(নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ৩৩২)

সুতরাং খৈয়ামের রুবাইর মধ্যে নিহিত শরীয়তের বিচারে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলো কবির ভোগ-সম্ভোগের, লালসার প্রতিফলন নয় বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত অতি উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। এর নজীর কেবল ফারসিতে নয়; বাংলা, হিন্দি, আরবি, উর্দু, সংস্কৃত এবং অপরাপর অনেক ভাষার সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

ওমর খৈয়ামের বাস্তবজীবন-যাপন প্রণালি আর তার রুবাইর প্রতিফলিত জীবন-চিত্রের মাঝে যে বৈপরীত্য আছে, তা কোনো কাল্পনিক নয়–বাস্তব সত্য। ওমর খৈয়াম 'বিশ্বজগতে বৈপরীত্যের অবস্থান ও মন্দের অস্তিত্ব'

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেছেন। তাই তিনি আল্লাহর ওপর ক্ষুব্ধ নন, ক্রুদ্ধ নন, সন্দেহবাদী নন; নন নৈরাশ্যবাদীও। অথচ এসব বিষয়-ই বিপরীত রূপে তাঁর রুবাইয়ের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সোলতান থেকে কুলি সবাই তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর ছাত্ররাও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কাজেই ওমরের ইউরোপীয় আলোচকরা তাঁর ইসলাম-বিরোধী চরিত্রের যে-ছবি এঁকেছেন তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। ওমর খৈয়াম চিন্তা ও কর্মে নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, শরীয়ৎ-বিরোধী ও ভোগী ছিলেন না। তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও ঐরকম মূল্যায়ন করেছেন। বলেছেন– 'শারাব-সাকীর স্বপ্নই দেখেছেন,- তাদের ভোগ করে যেতে পারেন নি। ভোগ-তৃপ্ত মনে এমন আগুন জ্বলে না।' (নজরুল ইসলাম[১৪], ১৯৮৪ : ২৮৯)

কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়ামকে 'মরুভূমির বুকেত খর্জুর-তরু' বলেও উল্লেখ করেছেন। মরুভূমি– বালুকাময়, রসহীন ও পানিহীন। তবু খেজুর গাছ তার শিকড় দিয়ে সেই মরুভূমির কত গভীর থেকে কিভাবে রস টেনে নেয়; তা যেমন বোঝা কঠিন; তেমনি ওমর খৈয়াম আকাশের অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্র আর নীরস গণিতের আঁকিবুকির মধ্যে চঞ্চল থেকেও কি ভাবে তাঁর রুবাইয়ের রসের আনন্দ ধারা বইয়ে দিতে পেরেছেন– তা ভাবাও সত্যি বিস্ময়কর।

নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য শিরোনামে অত্র অভিসন্দর্ভটিকে ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'নজরুল এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।' দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ এবং নজরুল-রবীন্দ্রনাথের পারস্যপ্রেম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।' তৃতীয় অধ্যায়ে 'বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ ; ফারসির অনুপ্রেরণায় নজরুলের অনুবাদকর্ম ; হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য; খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য এবং নজরুল কাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।' চতুর্থ অধ্যায়ে পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে 'হাফিজের মূল গজল ও নজরুলের অনুবাদ অংশ ; নজরুল অনূদিত দিওয়ান-ই-হাফিজ এর ৮টি গজল ; নজরুল রচিত রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ এর মুখবন্ধ ; নজরুল রচিত হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ; দিওয়ান-ই-হাফিজ অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা ; নজরুল অনূদিত রুবাইয়াত-ই-হাফিজ ; নজরুল রচিত রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম এর ভূমিকা ; ওমর খৈয়াম অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিত; নজরুল অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।' প্রতিটি উপাধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর শেষে রয়েছে একটি উপসংহার যেখানে গোটা অভিসন্দর্ভের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে। আশাকরি অত্র গবেষণার মাধ্যমে নজরুলের উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আরিফ, হাকিম : *নজরুল-শব্দপঞ্জি*, প্রকাশনায় : নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪০৪/জুন ১৯৯৭, প্রকাশক : রশিদুন্ নবী, ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, বাড়ী নং ৩৩০-বি, রোড নং ২৮ (পূরাতন), ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

২. আলী, মোবাশ্বের : *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

৩. আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ : *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ১৯৮৩, আশ্বি ১৩90, জিলহজ্জ ১৪০৩।

৪. আবু জাফর, সিকান্দার : অনুবাদক, *রুবাইয়াৎ*, ওমর খৈয়াম, বাঙলা একাডেমী বর্ধমান হাউস : ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : চৈত্র-১৩৭৭/ এপ্রিল-১৯৭১।

৫. ইউসুফ, মনিরউদ্দীন : *আত্মপরিচয়, ঐতিহ্যের আলোকে*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রকাশকালঃ এপ্রিল-২০০৩/ বৈশাখ-১৪১০।

৬. ইসলাম, আজহার : *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়-১৩৯৯/ জুন-১৯৯২, বাএ-২৬১৬।

৭. ইসলাম, মুস্তফা নূরউল : *সমকালে নজরুল ইসলাম*, ১৯২০-১৯৫০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ/ ১৩৯০, নভেম্বর, ১৯৮৩; প্রকাশনা নং বা.শি.এ. ২৪।

৮. ইত্তেফাক, দৈনিক, শুক্রবার ২৯ আগষ্ট, ২০০৮।

৯. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার : *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জপাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

১০. তামীমদারী, ড. আহমাদ : অনুবাদ, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, তত্ত্বাবধানে, ড. মোহাম্মদ রেযা হাশেমী, কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, প্রকাশকালঃ এসফান্দ-১৩৮৫/ ফেব্রুয়ারী-২০০৭।

১১. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, বাএ ২৭৫৭।

১২. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশঃ ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

১৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

১৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

১৫. *নিউজ লেটার*, মে-জুন : ২০02, ২৪তম বর্ষ : ৫-৬ সংখ্যা, কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা।

১৬. বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সম্পাদিত : *মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম ব্যাঁর্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, অষ্টাদশ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭/পূনর্মূদ্রণ– ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মাহ্ফুজউল্লাহ্, মোহাম্মদ, সম্পাদিত : *জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন*, স্মারক-গ্রন্থ ১৯৯৩, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ: ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১/১৮ মে, ১৯৯৪।

১৮. মাহ্ফুজউল্লাহ্, মোহাম্মদ, সম্পাদিত : *জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন*, স্মারক-গ্রন্থ ১৯৯৪, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২/২৫ মে, ১৯৯৫।

১৯. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ : *আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারী-১৯৮৫/ ৯ ফালগুন-১৩৯১।

২০. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ : *নজরুলচেতনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০৩/জুলাই ১৯৯৬, প্রকাশক : রশিদুন্ নবী, গবেষণা কর্মকর্তা, কবিভবন, বাড়ীনং-৩৩০-বি, সড়ক নং ২৮৯(পুরাতন), ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

২১. রায়, ড. কৃষ্ণগোপাল : *কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশিকা: শ্রীমতি শিখা সরকার, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৮।

২২. হাই, মুহম্মদ আবদুল ; সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ : চৈত্র-১৩৯৫/এপ্রিল ১৯৭৯।

২৩. হায়দার, সুফি জুলফিকার : *নজরুল-প্রতিভা-পরিচয়*, সুফি জুলফিকার হায়দার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ: ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৯১/ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

২৪. শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ : *শহীদুল্লাহ রচনাবলী* [বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রচীন যুগ)], বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

২৫. শেলী, রাশেদুল হাসান, মাহবুব বারী সম্পাদিত : *নজরুল সাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব*, নজরুল গবেষণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, প্রকাশকাল : জুন-২০০৫, জ্যৈষ্ঠ-১৪১২।

২৬. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা : *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী*, ইসলামি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রকাশকাল : বৈশাখ- ১৩৯৭/ মে- ১৯৯০।

২৭. সাত্তার, আবদুস : *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, প্রকাশনায়- নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল-১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

২৮. *স্মারক, দ্বিবার্ষিক সম্মেলন* -২০০২, আনজুমানে ফার্সী বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-১৯ অক্টোবর, ২০০২।

২৯. *স্মারক, সম্মেলন, আন্তর্জাতিক*, মে-২০০৬, বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান এবং উন্নয়নের কর্মপন্থা, কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, আনজুমানে ফার্সী বাংলাদেশ স্মারক, প্রকাশকাল : মে- ২০০৬/ খোরদাদ-১৩৮৫।

৩০. হুমায়ুন, রাজীব : *নজরুলের লেখার গল্প শেখার গল্প*, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন-১৪০৭, ফেব্রুয়ারী ২০০১, আগামী প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি প্রসঙ্গ

ক. কাজী নজরুল ইসলাম পরিচিতি

খ. ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি, অনন্যসাধারণ গীতিকার, সুরকার, সংগীত-স্রষ্টা, বিদ্রোহী কবি এবং আধুনিক বাংলা সংগীতের 'বুলবুল' নামে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুসরণ ও অনুকরণের কৃত্রিমতা থেকে আধুনিক বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ফলপ্রসূ–সেদিক থেকে তিনি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার পথিকৃৎ। কাজী নজরুল ইসলামের ব্যতিক্রমধর্মী নতুন কবিতার জন্যই ত্রিশের দশকে আধুনিক কবিতার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। নজরুল তাঁর কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে পরাধীন ভারতে বিশেষত অবিভক্ত বাংলাদেশে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং দেশি ও বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন। সে কারণে ইংরেজ সরকার একের পর এক তাঁর গ্রন্থ ও রচনা নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। রাজবন্দি নজরুল প্রায় চল্লিশ দিন একটানা অনশন করে বিদেশি সরকারের জেল জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

সংগীতজ্ঞ নজরুল বাংলা সংগীতের আনুমানিক সহস্র বৎসরের ইতিহাসে সবচেয়ে সৃজনশীল মৌলিক সংগীত প্রতিভার অধিকারী বাণী ও সুর-স্রষ্টা। সংখ্যাধিক্যের কারণেই নয় বরং বাংলা সংগীতের প্রায় সব কয়টি ধারার পরিচর্যা এবং বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে তিনি লোকসংগীত-ভিত্তিক বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। 'নজরুল-সংগীত' বাংলা সংগীতের 'অণুবিশ্ব', তদুপরি উত্তর ভারতীয় মার্গ-সংগীতের খাঁটি বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্রে নজরুল বাংলা গানকে মধ্যযুগীয় সংগীতের অনুসৃতি থেকে আধুনিক সংগীতে রূপান্তর ঘটান। আধুনিক বাংলা কবিতার মতো আধুনিক বাংলা গানেরও পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম।

১

বাংলা চৌদ্দ এবং ইংরেজি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংগীত তথা সংস্কৃতির প্রধান পুরুষ কাজী[১] নজরুল ইসলাম মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬/২৪ মে ১৮৯৯ এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান গ্রাম

---

[১] কবি নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাজী। পূর্বে সম্রাটগণ কাজী প্রার্থীদের স্বাস্থ্য ও সাধুতা, বংশ, আরবি-ফারসি ভাষায় জ্ঞান এবং শরিয়তের পাণ্ডিত্য ইত্যাদি গুনাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে কাজী নিয়োগ করতেন। এদেশে মোঘল আমলে কাজী প্রথা চালু ছিল। কাজী নিয়োগ আদেশ তখন জারি হতো সরাসরি দিল্লি থেকে। নিয়োগপত্রে দস্তখত করতেন স্বয়ং সম্রাট। পাটনার কাজী-উল-কোজাৎ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের পরদাদা, অর্থাৎ তাঁর দাদা ছিলেন কাজী আমিনুল্লার আব্বা। পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন তখন সৈয়দ হোসেন আলী। '১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করলে তৎপুত্র মোয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ তার দুই ভাই আজম ও কাম রক্সকে হত্যা করে প্রথম শাহ আলম উপাধি ধারণ করে মোগল সিংহাসনে আরোহন করেন। তার আমলে (১৭০৮-১৭১২) নজরুলের পরদাদা ফারসি ভাষার বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং শরা-শরীয়তে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে বিহার প্রদেশে কাজী-উল-কোজাৎ নিযুক্ত হন।' (আহমেদ[১], ১৯৯৮ : ৪৫) দেশের প্রত্যেক এলাকার বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য একজন কাজী থাকতেন। তার ওপর ছিলের কাজী-উল-কোজাৎ। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে 'মুহাম্মদ শরিফ' নামে একজন কাজী ছিলেন। তিনি বাদশা আওরঙ্গজেবের অনুমোদনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন কারণে কাজী মুহাম্মদ শরিফ ইস্তফা দেন। নবাব মর্শিদকুলির অনুরোধ তাকে টলাতে পারেনি। মুর্শিদকুলি নিজে কাজী নিয়োগের দায়িত্ব প্রাদেশিক শাসনকর্তার ওপর ন্যস্ত করেন। ফলে কাজীগণের ভাগ্য সব প্রাদেশিক শাসনকর্তাসহ পাটনার শাসনকর্তা সৈয়দ হুসেন আলীর ওপর ন্যস্ত হল। গবেষণার আলোচ্য 'কাজী-উল-কোজাৎ' পরিবারকে নিজ মর্যাদা রক্ষার্থে পাটনা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিহার এলাকার বাইরে কোথাও বসবাসের জন্য। কাজী পরিবার স্বচ্ছলভাবেই পুনর্বাসিত হলেও কাজী-উল-কোজাতের পুত্র ওরফে কাজী নজরুল ইসলামের দাদা কাজী আমিনুল্লাহর ছিল বড় সংসার। তিনি সৌখিন পুরুষ ছিলেন। তার পুত্র কাজী ফকির আহমদ তথা নজরুলের বাবা। 'বৃদ্ধকালে প্রথম পক্ষের সন্তান বিয়োগহেতু বিপত্নীক হলে গ্রামের খান্দানী পরিবারের কর্তা মুনশী তোফায়েল আলীর কন্যার সাথে কাজী ফকির আহমদের নিকাহ পড়িয়ে দেয়া হয়।' (আহমেদ[১], ১৯৯৮ : ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

চুরুলিয়া[১] থানা জামুরিয়া, মহকুমা আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। খড়ের ছাওয়া একটি মাটির ঘরে নজরুলের জন্ম। কাজী বাড়ির পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণে পীর পুকুর। হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক জবরদস্ত ফকির ঐ পুকুরটি খনন করেছিলেন। তাই এই পুকুরটির নাম হয় 'পীর পুকুর'। পীর পুকুরের পূর্বপাড়ে পাহলোয়ান শাহের মাযার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ[২] ছিলো। নজরুলের পিতামহ কাজী আমিনউল্লাহ্‌, পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতা জাবেদা খাতুন। নজরুলের সহোদর তিন ভাই এবং এক বোন; জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজান কনিষ্ঠ কাজী আলি হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম। মোহাম্মদ মোদাব্বের নজরুলের পরিবার সম্পর্কে বলেছেন :

> নজরুলের পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ ও মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। কাজী ফকির আহমদ দুই বিবাহ করেন। তাঁর দুই স্ত্রীর ঘরে ৭ পুত্র এবং ২ কন্যা ছিল। নজরুলের সহোদর ৩ ভাই এবং ১ বোন। তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠভ্রাতা কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম ছিলেন। "আলী হোসেন ১৯৫১ সালের ৭ জানুয়ারী নিহত হন। (মোদাব্বের[৬], ১৯৯৩ : ৫)

নজরুলের বাড়ীর পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণে পীর পুকুর। এই পুকুরের পূর্বপারে পীর পুকুরের প্রতিষ্ঠাতা সাধক হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাযার শরিফ এবং পশ্চিমপারে একটি ছোট মসজিদ ছিল। নজরুলের পিতা ও পিতামহ আজীবন এ মাযার শরিফ ও মসজিদের খেদমত করে পরিবারের ভরন-পোষণ করেন। মুসলমান ধর্মের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও নজরুলের পিতা অন্য কোনো ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। ধর্মের ক্ষেত্রে পিতার এই উদারতা নজরুল উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিলেন। তাছাড়া ফারসি ও বাংলা কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগও তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে।

অতি দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে নজরুল শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। বাল্যকালে দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে গ্রামবাসিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পাড়ার সবাই বলত 'ছেলে তো নয়, যেন ডাকাত।' (মোদাব্বের[৬], ১৯৯৩ : ৫)

নজরুলের ডাক নাম দুখু মিয়া।[৩] ৭ চৈত্র ১৩১৪ সালে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু হয়। নজরুলের বয়স তখন নয় বছর। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর মৃত্যুর পর এ নজরুল পরিবারে চরম দারিদ্র নেমে আসে। পরিবারের দারিদ্রের চাপে তাঁর পড়াশুনার সু-ব্যবস্থা হয় নি। তিনি গ্রাম্য মক্তবে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তিনি কোনো শাসন নিষেধের বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। গ্রামের পাঠশালায় নজরুলকে ভর্তি করা হলে তিনি সেখানে অত্যন্ত ভাল ছাত্র হিসাবে পরিচিত হলেন। প্রখর বুদ্ধি ও মেধা শক্তির অধিকারী নজরুলের জ্ঞানপিপাসা শুধু মক্তবের পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকত না। যেখানে কীর্তন,

---

[১] চুরুলিয়া যা অতীতকালে অস্ত্রনির্মাণের স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। নজরুলের পূর্বপুরুষগণ পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। 'সম্রাট শাহআলমের সময় তাঁরা বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। মোঘল রাজত্বকালে এখানে যে একটি বিচারালয় ছিল তার কাজীর আয়মা সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কাজী নজরুল এই কাজীদেরই বংশধর।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৩)

[২] কবির পিতা ও পিতামহ আজীবন ঐ মাযার শরিফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। কবির পিতা কাজী ফকির আহমদ অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন; সাধক-বৃত্তি তাঁর স্বাভাবগত ছিল। প্রত্যহ মাযার শরিফ সাঁঝ বাতি দেয়া এবং মসজিদে বসে এশার নামায পর্যন্ত তসবিহ্‌ তেলাওয়াত করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। (আহমেদ[১], ১৯৯৮ : ৪৮)

[৩] কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর নজরুলের জন্ম, তাই তাঁর ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিঞা'। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৩) কাজী ফকির আহমদের ৭ পুত্র ও ২ কন্যার মধ্যে কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন ষষ্ঠ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাজীর জন্মের পর ৪ পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। এরপর নজরুলের জন্ম হলে তাঁর ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'। নজরুলকে তাঁর পড়শী ও পরিজনেরা এই নামেই ডাকতেন। (উদ্ধৃত, আহমেদ[১], ১৯৯৮ : ৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাগান, কোরআন পাঠ ও তার্ফসির হত সেখানেই এ দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফি, দরবেশ সাধু-সন্ন্যাসীদের সাথে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। অর্থ না বুঝলেও কোরআন শরিফ ভালোভাবে পড়তে পারতেন। 'তাঁর আচার-ব্যাবহারে গভীর ঔদাসীন্য লক্ষ করে লোকে তাকে 'তারাখ্যাপা' বলে ডাকত। অনেকের কাছে তাঁর আদরের নাম ছিল 'নজর আলি'।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৩)

নজরুল ১০ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেই সংসারের দারিদ্রের চাপে সে মক্তবেই দুই বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। উপার্জনের জন্য নজরুলকে শিক্ষকতা ছাড়াও গ্রামে মোল্লাগিরি, মসজিদে ইমামতি এবং কাজী পাহলোয়ানের মাযার শরিফের খাদেম হতে হয়। পিতার অকালমৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নজরুলকে ঐসব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। আরবি, ফারসি ও বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত শিক্ষাবিদ কাজী বজলে করিম নজরুলের আপন চাচা ছিলেন। শিক্ষাদান করার মানসে তিনি চুরুলিয়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে আরবি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। কাজী বজলে করীম স্থানীয় লেটো দলের আদি উস্তাদ ছিলেন। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল এবং মিশ্রভাষায় তিনি কবিতা ও গান রচনা করতেন। খুব সম্ভবত কাজী বজলে করিমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে লেটো-দল নজরুলকে আকর্ষণ করে। ঐ অঞ্চলের অপর একজন জনপ্রিয় লেটো কবি শেখ চকোর (গোদা কবি) এবং করিয়াল বাসুদেবের দলের লেটো ও কবি গানের আসরেও বিভিন্ন সময়ে নজরুল অংশগ্রহণ করেছেন। লেটো দলে নজরুল একাধারে পালা, কবিতা ও গানের রচয়িতা এবং অংশগ্রহণকারী ছিলেন। নজরুলের কবি ও সংগীত জীবনের শুরু লেটো দল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগও সম্ভবত: লেটো দলের জন্য রচনা করতে গিয়েই হয়েছিল, এ ছাড়া তাৎক্ষণিক কবিতা ও গান রচনা করার কৌশলও তিনি কিশোর বয়সে লেটোর আসরেই রপ্ত করেছিলেন। সুতরাং লেটো জীবনকে তাঁর কবিতা ও সংগীত জীবনের শিক্ষানবিশকাল বলা যেতে পারে। লেটো দলের কিশোর কবি নজরুলের সৃষ্টি চাষারসঙ, শকুনিবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের সঙ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ প্রভৃতি।

এই স্বভাব কবির অসংখ্য মারফতি, মুর্শিদি ও লোকসংগীত আজও গ্রামবাসীদের মুখে মুখে রয়েছে। নজরুল ফারসি কাব্যসৃষ্টির চেষ্টা করতেন। পিতৃব্যের সাহচর্য, প্রেরণা ও উৎসাহে আরবি-ফারসি-উর্দু-মিশ্রিত মুসলমানি বাংলায় নজরুল কাব্য চর্চায় উৎসাহী হন। তাঁর একটি কবিতার উদাহরণ :

মেরা দিল্ বেতাব কিয়া
তেরী আব্রু-য়ে কামান্;
জ্বালা যাতা হ্যায়
ইশ্ক্-মে জান্ পেরেশান।
হেরে তোমায় ধনি,
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কী যে বদনের শোভা
মাতোয়ারা প্রাণ
বুলবুল করতে এসেছে
তাই মধু পান।
(গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের রচিত প্রথম কবিতা 'রাজারগড়'। চুরুলিয়া গ্রামে তাঁদের বাড়ির সামনে অনেক দিনের একটি প্রকান্ড টিপিকে ঘিরে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীকে উপলক্ষ করে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৪)

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ–পবিত্র কোরআন, নামায, রোযা প্রভৃতির সঙ্গে মক্তব ও মসজিদ-জীবনেই নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ঐতিহ্যের স্বার্থক ব্যবহারে নজরুলের বাল্যজীবনের ঐ অভিজ্ঞতা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

সাংসারিক অর্থ উপার্জনের জন্য ১২-১৩ বছর বয়সে নজরুলকে লেটো-র[১] দলে গান ও নাটক রচনা করতে হয়। সে সময় লেটোনাচে'র দলে যিনি শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বিবেচিত হতেন তাকে 'গোদাকবি' আখ্যা দেয়া হত। ঐ সময়ের 'গোদাকবি' নজরুলের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ব্যাঙাচি' বলে ডাকতেন। তিনি নজরুল সম্পর্কে বলতেন, 'আমার 'ব্যাঙাচি' বড় হয়ে সাপ হবে।'(গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৪)

তাঁর এ ভবিষ্যৎদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। নজরুল সে সময়ে 'শকুনি বধ', 'মেঘনাধ বধ', 'চাষার সঙ', 'রাজ-পুত্র', 'আকবর বাদশা' ইত্যাদি পালাগান রচনা করেন। 'শকুনি বধে'র একটি গানের অংশবিশেষ–

শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডাকাণ্ড
হয়েছিল উন্মাদ!
অজা হয়ে কোন সাহসেতে
বাধ সাধিস মহাবলী বাঘের সাথে।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৪-৩৫)

'চাষার সঙ'-এর উদাহরণ :

চাষ কর দেহ জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামলে'
কলেমায় জমিতে মই দিলে,
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।
লা-ইলাহা ইল্লালালাতে
বীজ ফেলা তুই বিধি-মতে
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।
নয়টা নালা আছে তাহার,
ওজুর পানি সিয়াত যাহার
ফল পাবি নানাপ্রকার

[১] পশ্চিম বঙ্গে লেটো'নাচ নামে যে এক ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল তাকে যাত্রাগান ও কবির লড়াইর একটি মিশ্রিত সংস্করণ বলা চলে। এতে গ্রাম্য কবির রচিত কাব্যে গ্রাম্য অভিনেতারা অংশগ্রহণ করতেন। এ ব্যবস্থায় দুই দলের মধ্যে যে জয়ী হয় তাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

ফসল জন্মিবে তাহাতে।
যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্ যাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৫২)

'রাজপুত্র' পালাগানে রয়েছে,-

চল ওহে মন্ত্রীসুত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখি নাই দেশ-দেশান্তরে।
অসংখ্য গ্রাম নগরাদি
দুর্গগুহা পর্বত আদি, কত নদনদী,
দেখিলাম কিন্তু নিরবধি স্বদেশ জাগিছে অন্তরে।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৫)

'আকবর বাদশা' পালাগানের উদ্ধৃতি,-

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারীতা'লা
তারপরে দরুদ পড়ি
মোহাম্মদ সাল্লেআলা।
সকল পীর আর দরবেশ-কুলে
সকল সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে,
হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো খোদাতা'লা।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৫)

সে সময়ে তিনি বাংলা-ইংরেজি মেশানো কমিক গান লেখাতেও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার নমুনা,-

রব না কৈলাসপুরে
আই এ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন
আহা মরি, কি লাইট্নিং।
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
কামন ডিয়ার গুড্মর্ণিং।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হ্যাণ্ড শেক করে,
বসায় তারে রেসপেক্ট করে,
হোল্ডিং আউট এ মিটিং।
তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতুহলে
খেয়েছে সর্ব জাতিকুলে
নজরুল ইস্‌লাম ইজ টেলিং।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৬)

নজরুল বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। লেটোর দলে পালাগান রচনায় ব্যস্ত থাকলেও তাঁর দূরন্তপনা একটুও কমল না। গ্রামবাসীরা ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। হঠাৎ নজরুল একদিন গ্রাম ত্যাগ করলেন এবং লেটো দলের পর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নজরুল পুনরায় ছাত্রজীবনে ফিরে আসেন। নজরুলের পাড়াপড়শিরা তাঁকে প্রথমে রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি করে দেন, কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই নজরুল ঐ স্কুল ছেড়ে মাধরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল বা নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন । তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন-মল্লিক, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ছাত্র সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন : 'ছোট সুন্দর ছনমনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম। সে বড় লাজুক ছিলো।' (উদ্ধৃত, Nazrul Islam[7], 2011 : 7)

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নজরুল ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন। কিন্তু আর্থিক কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পর নজরুলের ছাত্রজীবনে আবার বিঘ্ন ঘটে। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার আগে কি কিছু পরেই নজরুল মাথরুন স্কুল ত্যাগ করেন। স্কুলের ছক-বাঁধা জীবনের বদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে নজরুল অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাধীনতা-প্রয়াসী মন ধরাবাঁধা জীবনের গণ্ডীতে বন্দি থাকতে চাইল না। তাই তিনি একদিন কাউকে কিছু না বলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেন।

নজরুল শখের কবিগানের আসরে যোগ দিলেন। তিনি গান ও পালা লিখতেন এবং সেগুলোতে সুরারোপ করতেন। তিনি আসরে ঢোলক বাজিয়ে গানও গাইতেন। বর্ধমান জেলার অণ্ডালের ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন বাঙালি খ্রিস্টান গার্ড সাহেব তাঁকে এক শীতের রাতে একটি কবিগানের আসরে গান করতে শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রসাদপুরের বাংলাতে তাঁকে বাবুর্চির কাজ দেন। 'গার্ড সাহেব ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপ এবং সেই কারণে নজরুলের যে গান শোনার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে কাজ দিয়েছিলেন তা শোনার অবকাশ ও সুযোগ তাঁর প্রায় হতই না। কিছুদিনের মধ্যেই এক হাঙ্গামার সূত্রপাত হতেই নজরুল গার্ডসাহেবের চাকরি ছেড়ে দেন।' (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৭)

এরপর নজরুল আসানসোল চলে গেলেন এবং আবদুল ওয়াহেদের এক বেকারি ও চা এর দোকানে মাসে ৫ টাকা বেতনে চাকরি নিলেন। খুব ভোরে উঠে রুটির ময়দা মাখতে হয়, আর সমস্ত দিন ধরে রুটি তৈরি ও বিক্রি করতে হয়। রাত্রিবেলা স্বল্পক্ষণের জন্য শুধু অবসর মেলে। তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। যথাসাধ্য ভালভাবে কাজ করতে লাগলেন। রাত্রিতে যে সামান্য সময়ের জন্য ছুটি পেতেন তা তিনি বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন। এখানে কাজ করার সময় নজরুল তাঁর যন্ত্রসংগীতনৈপুণ্যের জন্য কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ নামে আসানসোলের এক দারোগার নজরে পড়েন। দারোগা সাহেবের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায় ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে। নজরুলের চোখেমুখে বুদ্ধি-প্রতিভার ছাপ দেখে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে গোড়ার দিকে তিনি তাঁকে নিজের গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলাতে নিয়ে গিয়ে দরিরামপুর হাই স্কুলে ফ্রি স্টুডেন্ট হিসাবে ক্লাস সেভেনে ভর্তি করে দেন। কিন্তু স্কুলের রুটিন-বাঁধা জীবন তাঁকে একেবারেই আকৃষ্ট করত না। তিনি স্কুলে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা দুপুর স্কুলের সন্নিকটে ঠুনিভাঙা বিলের ধারে নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে বসে থাকতেন অথবা বাঁশি বাজাতেন। কাজীর-সিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুলের দুরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। নজরুল রোজ হেঁটে স্কুলে যেতেন। গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা তাঁকে খুবই জ্বালাতন করত। তাদের দুরন্ত স্বভাবের বর্ণনা পাওয়া যায় নজরুলের *শিউলি-মালা* গল্পগ্রন্থের 'অগ্নিগিরি' গল্পে। নজরুল লিখেছেন :

> পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার রুস্তম। সে-ই নিত্য নূতন ফন্দি বের করে সবুরকে ক্ষ্যাপানোর। ছেলে মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিঞা। তার কারণ, সবুর স্বভাবতই ভীরু নিরীহ ছেলে; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারতপক্ষে তার এঁদো কুঁঠরি থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন করে কাক লাগে, তেমনি করে ছেলেরা লেগে যায়।
>
> সবুর রাগে না বলে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয় না। তাদের এই ক্ষ্যাপানোর নিত্য নূতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।
>
> পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার 'তালবিলিম" (তালেবে এলম্ বা ছাত্র) জায়গির থাকত না পাড়ার ছেলেগুলির ভয়ে। (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৭৪৭-৭৪৮)

দারিদ্রের কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ, গার্ডের বয়বেয়ারা, আসানসোলের বেকারি ও গ্র্যাণ্ড ট্রাক রোডের চায়ের দোকানের কিশোর শ্রমিক নজরুল কৈশোরেই জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন। আসানসোল চা-রুটির দোকানে চাকরির সুবাদেই তিনি পুলিশের দারোগা কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ এর সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁর অনুগ্রহে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষার ঠিক পরেই তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। স্কুলের পড়া নিয়মিত করার অভ্যাস না থাকলেও তিনি অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

দরিরামপুর স্কুলের পর নজরুল পুনরায় নিজের এলাকায় ফিরে যান এবং কিছুকাল ঘোরাঘুরি করে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রথমে নিউ স্কুল বা অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশনে এবং পরে পুনরায় রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সিয়ারসোল স্কুলে নজরুলের পড়ার সময় ফারসি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন কলকাতার খিদিরপুরের বাসিন্দা হাফিজ নুরুন্নবী। তিনি অত্যন্ত সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন ও কাব্যমণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং উর্দু গদ্য লিখতেন। 'নুরুন্নবী সাহেব নজরুলের মধ্যে সাহিত্যশক্তির স্বাক্ষর দেখে তাঁকে সংস্কৃত ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ভাষা ফারসি নেওয়ালেন। নুরুন্নবী সাহেবের সাহচর্য ও শিক্ষায় নজরুলের মনে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৮)

পল্টনের ফারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত একজন পাঞ্জাবি মৌলবি সাহেব ছিলেন। তাঁর কাছে নজরুল বিখ্যাত পারস্য কবিদের কাব্যপাঠের সুযোগ পান। নজরুল স্কুল জীবনেই শিক্ষকের কাছে ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। তবে বিখ্যাত ফারসি কাব্যগুলোর পাঠ ও অনুবাদ করার মত যথাযথভাবে ভাষাকে রপ্ত করেছিলেন এই মৌলবী সাহেবের সাহায্যে। এর কয়েক বছর পর তিনি হাফিজের গজলের বঙ্গানুবাদেও হাত দেন। পরে হাফিজের

Dhaka University Institutional Repository

রুবাইয়াতের অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলো ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নজরুল তাঁর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মুখবন্ধে লিখেছেন :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়।
>
> আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।
>
> তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়।
>
> (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

নজরুল রায়সাহেব এম. চ্যাটার্জীর পুষ্পোদ্যানের পাশে 'মোহামেডন-বোর্ডিং' নামে মাটির দেয়ালঘেরা একটি ছোট ঘরে অন্যান্য মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে থাকতেন। নজরুল ক্লাসের ভাল ছাত্র ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং এ আহারের খরচ লাগত না। তা ছাড়া তিনি রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। এই সাত টাকায় চা-জল-খাবার ও জামাকাপড় হত। কোনো কোনো মাসে এ থেকে কিছু সঞ্চয় করে তিনি তাঁর ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচ বাবদ দিতেন। এই স্কুলে নজরুল ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তঅষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব হয়। এ সম্পর্কে শৈলজানন্দ বলেছেন :

> পাশাপাশি দুই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি আমরা। আমি রাণীগঞ্জে, নজরুল সিয়ারসোল রাজার ইস্কুলে। মাইল দু'য়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দু'জনে, আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা-আশ্চর্য হচ্ছে- ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দুজনে। সেই টানে, মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্ণাবর্ণ নেই-সৃষ্টির টান-সাহিত্যের টান। দুইজনে রোজ একসঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনদিন বা ইস্কুল পালাই। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরি, ধরি ই-আই আরের লাইন, কোনদিন বা চলে যাই শিশুশালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম লড়াই লেগেছে। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৭)

২

নজরুলের ছাত্রজীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি সিয়ারসোল রাজ স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়– সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, নিবারণচন্দ্র ঘটক বিপ্লবী ভাবধারায়, ফারসি শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবী ফারসি ভাষায় এবং প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-চর্চায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন আনুমানিক ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের পর প্রি-টেষ্ট পরীক্ষার সময়ে। প্রথমে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম, পরে করাচি যান। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিন বছর সেনাবাহিনীতে সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যেও তাঁর সাহিত্য ও সংগীত চর্চা চলতে থাকে। প্রথমে নজরুল করাচির সিনানিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনের সৈনিক ছিলেন। 'তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনাময় রচনা পাঠ করে অনেকের মনে হয় যে, তিনি মধ্যপ্রাচ্যের

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু করাচি নজরুল একাডেমির মীজানুর রহমান খোঁজ নিয়ে জানিয়েছেন যে, নজরুল করাচির বাইরে গমন করেন নি।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৩৮-৩৯)

৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মৌলভীর কাছে তিনি ফারসি শেখেন, সংগীতানুরাগী সহসৈনিকদের সঙ্গে সৈনিকদের প্রমোদের জন্য সরবরাহকৃত বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংগীতচর্চা করেন আর গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন। করাচি সেনানিবাসে রচিত এবং কলকাতায় প্রেরিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত *নজরুল-রচনাবলির* মধ্যে ছিল বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা, (সওগাত, মে ১৯১৯)। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই (শ্রাবণ ১৩২৬) মাসের *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* নজরুলের *মুক্তি* শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। নজরুল কবিতাটির নাম দেন *ক্ষমা*। *মুক্তি* নামটি পত্রিকার সম্পাদকের দেওয়া। *মুক্তি* কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের *পলাতকা*-এর সমিল স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা। কবিতাটির নীচে লেখা ছিল, 'ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত-বাঁধা ফকিরের মজার শরিফ' বলিয়া কথিত হয়।' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩, পৃ. ৫০৮)

রিক্তের বেদন গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো করাচিতে থাকাকালীন 'আরবসাগরের বিজন বেলায়' বসে লেখা। এই গ্রন্থের ৮টি গল্পের নাম– *রিক্তের বেদন*, *বাউন্ডেলের আত্ম-কাহিনী*, *মেহের-নেগার*, *সাঁজের তারা*, *রাক্ষুসী*, *সালেক*, *স্বামীহারা* ও *দুরন্ত পথিক*। মেহের নেগার ও স্বামীহারা ইত্যাদি গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় যে, নজরুল ইতোমধ্যেই রবীন্দ্র-কাব্যসংগীত অন্তরঙ্গভাবে পাঠ করেছিলেন। সালেক গল্পটির মধ্যে হাফিজের নিম্নের গজলের ভাবই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে :

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
(হাফিজ সিরাজী[১১], ১৩৬২ : ১)
'বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন্ কুন্ গরৎ পীরে মাগন গোয়েদ!
কে সালেক বে খবর না বুদ্ যে রাহ ও রস্‌মে মঞ্জেল হা।'

জায়নামাজে শরাব-রঙীন কর, মুর্শেদ বলেন যদি।
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত আদি।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৭০৫)

করাচিতে রচিত অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে– গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'ঘুমের ঘোরে', কবিতা 'আশায়' এবং 'কবিতা-সমাধি' প্রভৃতি। করাচিতে থেকেও তিনি কলকাতার সমকালীন প্রধান প্রধান সাহিত্যপত্রিকা যেমন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতির গ্রাহক ছিলেন এ ছাড়াও তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং ফারসি কবি হাফিজের কিছু গ্রন্থও ছিল। ফলে এ কথা বলা যায় যে, নজরুলের আনুষ্ঠানিক সাহিত্য-চর্চার শুরু করাচি সেনানিবাসে। কৃষ্ণগোপালরায় বলেন,

> সিয়ারসোল হাইস্কুলের ছাত্র থাকা কালীন ১৯১৭ সালের আগষ্টে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন, ১৯২০ সালের প্রথমদিকে ৪৯ নং বাঙালি রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে তিনি করাচি থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পুরোপুরি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেনাবাহিনীতে তিনি মোটামুটি আড়াই বছর বা দু'বছর সাত মাস চাকুরী করেছিলেন। এরই মধ্যে তিনি রচনা করেন কতিপয় কবিতা, গল্প, বাঁধনহারা

Dhaka University Institutional Repository

পত্রোপন্যাসের কিছু অংশ, কয়েকটি কবিতা ও দুটি গল্প 'হেনা' এবং 'ব্যথার দান'। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন যে ঐতিহাসিক ঘটনা নজরুলকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে তা হ'ল ১৯১৭-র অক্টোবরের রুস বিপ্লব। (রায়[১০], ১৯৯৮ : ১)

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পল্টন ভেঙ্গে দেওয়ার কয়েকমাস আগে নজরুল সাত দিনের ছুটি পেয়ে কলকাতা হয়ে আসানসোল মহকুমার অধীন জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেসময়েই তিনি কলকাতায় থাকাকালে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির* অফিসে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে দেখা করেন। মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে নজরুলের এই প্রথম দেখা। মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুলকে পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর সোজা কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্য সমিতির অফিসে উঠতে পরামর্শ দেন। সেসময় নজরুলের বয়স ২২ বছরের কাছাকাছি। 'মুজফ্‌ফর আহমদের পরামর্শমতো, ১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অফিসে এসে ওঠেন। সমিতির অফিসে ওঠার আগে তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধায়ের অতিথি হয়ে রামকান্ত বোস স্ট্রীটে কাশিমবাজার মহারাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বোর্ডিং হাউসে কয়েকদিন কাটান। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৪৪)

৩

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ৪৯ বেঙ্গলি ব্যাটেলিয়ান ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় তাঁর সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নং কলেজ স্টিটে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র অফিসে ঐ সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করতে থাকেন। কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের শুরুতেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসরমান-সাহিত্য-পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সদ্য রচিত বাঁধন-হারা উপন্যাস এবং বোধন, শাত-ইল-আরব, 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়াপরের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াযদহম' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ঐসব ব্যতিক্রমধর্মী রচনা অচিরে সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'খেয়াপারের তরনী' এবং 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটির উচ্ছসিত প্রশংসা করে বাংলার স্বাস্বত সমাজে তাঁকে স্বাগত জানান। 'বঙ্গীয় মাসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র অফিসে তিনি মোজাম্মেল হক, আফজালুল হক, কাজি আবদুল ওদুদ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম মোস্ত ফা প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। অপরদিকে সমসাময়িককালে কলকাতার দুটি জমজমাট সাহিত্যিক আড্ডা 'গজেনদার আড্ডা' এবং 'ভারতী'র আড্ডায় তিনি অতুল প্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, মোহিতলাল মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও নাট্যজগতের দিকপালের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (পরে ডক্টর) সঙ্গে ১৯২১ সালের অক্টোবরে শান্তিনিকেতন গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন।

নজরুলের সাংবাদিক-জীবন শুরু হয় করাচি সেনানিবাস থেকে ফিরে কলকাতায় সাহিত্যিক-জীবন শুরু হবার তিন মাসের মধ্যেই। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের সম্পাদনায় মুজফ্‌ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে *নবযুগ* নামে একটি *সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ* প্রকাশিত হয় । ''নবযুগ' বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট ছিল, তেমনি সকলের সামনে কৃষকমজুরদের দাবি ঘোষণা করতেও পরাঙমুখ হয় নি। এর ফলস্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

'নবযুগে'র জামিনের এক হাজার টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। আবার দুহাজার টাকা জমা দিয়ে কাগজ বার করা হয়।' (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৪৬)

নজরুলের লেখা 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধের জন্য ঐ বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। নবযুগ পত্রিকার সাংবাদিকরূপে তিনি যেমন একদিকে স্বদেশি ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন, তেমনি মুজফফর আহমদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত থেকে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হচ্ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘরোয়া আসর ও আড্ডায় সংগীতও পরিবেশন করছিলেন। নজরুল তখন গান লিখে নিজে সুর করতে শুরু করেন নি, তবে তাঁর কিছু কবিতা সুর দিয়ে স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন মোহিনী সেনগুপ্তা। কলকাতায় নজরুলের সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের সূচনা-পর্বে সওগাত পত্রিকায় প্রথম গান প্রকাশিত হয় 'বাজাও প্রভু বাজাও ঘন' (বসন্ত-মোহিনী' দাদরা) ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। ১৩২৭ সালে নজরুলের আরো কয়েকটি গান প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, যার কয়েকটির সুর ও স্বরলিপিকার মোহিনী সেনগুপ্তা। গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'হয়তো তোমার পাব দেখা', 'ওরে এ কোন স্নেহ সুরধুনি ইত্যাদি।'

৪

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-জুন মাস নজরুলের জীবনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সময়, কারণ এসময়ের মধ্যে তিনি কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র অফিসে পরিচিত স্কুলপাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের সঙ্গে প্রথমে কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে যান, সেখানে প্রমীলার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে দৌলতপুর গিয়ে আলী আকবর খানের অতিথিরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এখানে নজরুল যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করেন। আলী আকবর খানের এক বিধবা দিদি সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তিনি নজরুলকে মায়ের মতো স্নেহে আদরযত্ন করতে থাকেন। আলী আকবর খানের আর এক বিধবা বোন সেই পাড়াতেই থাকতেন। তাঁর একটি পুত্র ও বিবাহযোগ্য একটি কন্যা ছিল। ছেলেটি জাহাজে চাকরি করত। নজরুলের থাকাকালীন আলী আকবরের বিধবা বোন এই বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁর বিবাহযোগ্য মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পরে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মলাভ করে। মেয়েটির নাম সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগম। মেয়েটি নজরুলের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়। অবশেষে উভয়ের বিবাহ স্থির হয়ে গেলে নজরুলের কলকাতার বন্ধুরা এই বিবাহের খবর জানতে পারেন। এ বিবাহে বন্ধুদের মোটেই মত ছিল না। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলের চিঠিতে তাঁর বিবাহের কথা জানতে পেরে তাঁকে সাবধান করার জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন তারিখে যে পত্র লেখেন তার কিছু অংশ :

> যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়েস আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ; feeling এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয় যে, হয়ত বা দুটো জীবনই ব্যর্থ হয়। এ-বিষয়ে তুই যদি conscious, তাহলে অবশ্য কোনো কথা নেই। যৌবনের চাঞ্চল্য আপাতমধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয়। তুই নিজে যদি সব দিক ভেবে চিন্তে বরণ করাই ঠিক করে থাকিস, তা হলে আমি সর্বান্তঃকরণে তোদের মিলন কামনা করছি। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় নজরুল আলী আকবর খানের আচরণে এবং মেয়েটির কোনো কোনো ব্যবহারে বিশেষ বিষয়ে বিতৃষ্ণ বোধ করেন। ইতোমধ্যে বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়ে নজরুলের বিশেষ অনুরোধে ১৩২৮ সালের ২ আষাঢ় তারিখে বিরজাসুন্দরী দেবী বাড়ির অন্যদের সঙ্গে নৌকা করে দৌলতপুরে গিয়ে বিবাহ বাড়িতে উপস্থিত হন। সেনগুপ্ত পরিবারের মোট দশজন এই বিবাহে যোগ দেন। এসময়ে দেশ বর্ষায় ডুবে গিয়েছিল। বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল তাঁর অপমানের কথা খুলে বললে তিনি তাঁকে এ বিবাহ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু অতিথিঅভ্যাগত এসে যাওয়ায় নজরুল বিবাহের মজলিসে বসতে বাধ্য হন এবং আক্‌দও (বিবাহচুক্তি) হয়ে যায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন (৩ আষাঢ় ১৩২৮ সাল)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের রাত্রেই নজরুল দৌলতপুর ত্যাগ করেন এবং নার্গিসের সঙ্গে তাঁর আর কখনো দেখা হয় নি। মুজফফর আহমদ সাহেবের মতে নার্গিস বেগমের সঙ্গে নজরুলের আক্‌দ একেবারেই হয় নি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'... আলী আকবর বুঝেছিলেন নজরুল ইসলাম বিয়ে সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ। এই অবস্থায় খান সাহেবও কোনো একটা অছিলা ধরে বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইলেন। তাই তিনি কাবিননামায় (স্ত্রী বরাবরে সম্পাদিত স্বামীর একটি দলীল) একটি শর্ত রাখতে চাইলেন যে বিয়ের পর নজরুল ইসলাম নার্গিস বেগমকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না, দৌলৎপুর গ্রামে এসেই সে তাঁর সঙ্গে বাস করবে। এই অপমানজনক শর্ত মেনে না নিয়ে নজরুল ইসলাম বিয়ের মজলিস হতে উঠে চলে গিয়েছিল। তার মানে এই যে, সৈয়দা খাতুন, ওর্ফে নার্গিস বেগমের সহিত নজরুল ইসলামের 'আক্‌দ' বা বিয়ে একেবারেই হয় নি। এই থেকে এখন বোঝা যাচ্ছে যে বিরজাসুন্দরী দেবী তাঁর লেখা নজরুলের দ্বারা সম্পদিত প্রবন্ধে কেন লিখেছিলেন, 'বিয়ে তো ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলতে লাগলো মধ্যপথেই, এখন আমাদের বিদায়ের পালা।' আর, ঘটনার পনের বছর পরে নার্গিস বেগমের নজরুল ইসলামকে লেখা পত্রোত্তরে সেই বা কেন, লিখেছিল,-

'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে'
এই গানটি।

(উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৪৯)

দৌলতপুর থেকে ফিরে নজরুল কুমিল্লায় প্রমীলাদের বাড়িতে একপক্ষ কালের ওপর অবস্থান করেন এবং কলকাতা ফিরে যান। নার্গিসের সঙ্গে নজরুল ঘর না বাঁধলেও কিংবা আর কখনো দেখা না হলেও নার্গিসকে যে তিনি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁদের এই বিচ্ছেদ যে নজরুলের হৃদয়ে গভীর ক্ষত ও স্থায়ী বেদনার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পরবর্তীকালে রচিত নজরুলের বহু গান ও কবিতায় পাওয়া যায়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে দৌলতপুরে নার্গিসের সঙ্গে বিবাহসংক্রান্ত দুঃখজনক ঘটনার পর কলকাতায় ফিরে যাবার পথে নজরুল ১৭ দিন কুমিল্লায় ছিলেন। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে কুমিল্লা উদ্বেলিত, নজরুল কুমিল্লায় ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সভা ও শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে গাইলেন, সদ্যরচিত ও নিজের সুর দেওয়া স্বদেশি গান, 'কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী-মা'র আঙিনায়'। 'আজি রক্তনিশি ভোরে, এ কি এ শুনি ওরে, মুক্তি কোলাহল বন্দি শৃঙ্খল' ইত্যাদি গান। এভাবেই কলকাতার সৌখিন গীতিকার ও গায়ক কুমিল্লায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগরণী গান রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশি সংগীত রচয়িতা ও চারণ কবিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। নজরুল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লায় আসেন। সে বছর ২১ নভেম্বর ভারতব্যাপী হরতাল ছিল, নজরুল অসহযোগ মিছিলে শহর প্রদক্ষিণ করে গাইলেন 'জাগরণ' নামক গানটি :

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো,
জাগো রে ! জাগো রে !
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১৪০)

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নজরুল কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফিরে গিয়েই রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাঙার গান- 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করবে লোপাট' এবং 'বিদ্রোহী' কবিতা– 'বল বীর চির উন্নত মম শির'। বাংলা সংগীত ও কবিতার ইতিহাসে অমন বলিষ্ঠ গান ও কবিতা আর রচিত হয় নি। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পরপরই নজরুলের কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অবিভক্ত বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জগতের ইতিহাসে সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। মাত্র ২২ বছর বয়সে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিরূপে যে খ্যাতি অর্জন করেন হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার নজির নেই। ব্যক্তগত জীবনে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা অঞ্চলের নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ এবং প্রমীলার সঙ্গে উল্লেখ্য ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল– যিনি পরবর্তীতে তাঁর জীবনসঙ্গেনী হন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট থেকে ডিসেম্বররের মধ্যে নজরুল 'বিদ্রোহী' ছাড়াও অপর একটি সুবিখ্যাত কবিতা 'কামাল পাশা' রচনা করেছিলেন। তিনি এবং মুজফফর আহমদ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৩/4 সি তালতলা লেনের এক বাড়িতে বসবাস করেছিলেন, যে বাড়িতে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, কিন্তু নজরুল কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন নি, যদিও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নজরুলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্যথার দান গল্পটি করাচির সেনা-নিবাসে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয় এবং সেটি আত্মপ্রকাশ করে ১৩২৬ সালের (১৯২০ খ্রি.) মাঘ মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমনান-সাহিত্য পত্রিকা'য়। গল্পটি রচিত হওয়ার পূর্বেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশবিপ্লব সংগঠিত হয়। মুজফফর আহমদের মতে *ব্যথার দান* গল্পটিতে নজরুলের ওপর রুশবিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যবান স্বাক্ষর আছে। তিনি লিখেছেন, ''ব্যথার দান' একটি ভালবাসার গল্প। এই গল্পের ভিতর দিয়েই ব্রিটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম যে রুশবিপ্লব ও আন্ত র্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।' (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৪১)

নজরুল যে এ সময় *দীওয়ান-ই-হাফিজ* যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ *ব্যথার দান* গল্পটিতে পাওয়া যায়। বেদৌরাকে তার ভণ্ড মামা যখন দারার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন সে দারার কোনো কথা বিশ্বাস করল না। দারা তার স্মৃতিকথায় বলেছে– 'আমার কান্না দেখে সে বললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দিওয়ান পড়ে আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি।' নজরুলের 'ব্যাথার দান' গল্পে রুমীর প্রভাবও লক্ষনীয়। নজরুল লিখেছেন :

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম ! আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা! দারা আমায় ক্ষমা ক'রেছে, আমায় সখা ব'লে কোল দিয়েছে ! এতদিনে না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে উঠল ! এতদিনে না সত্যিকার ভালবাসায়

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার ক'রে দিলে ! রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, –"আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা ক'রেছ?"

সে কান্না–ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে,–

"ওগো প্রিয়তম ! তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে
আমার বুকে আঘাত ক'রেছ, আমি তাই দিয়ে যে
প্রেমের মহান মসজিদ তৈরী ক'রেছি!"

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৬১২)

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে (কার্তিক ১৩২৯) নজরুলের উল্লেখযোগ্য অবদান প্রথম কবিতা সংকলন *অগ্নিবীণা* (*প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর-ধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাত্-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী* ও *মোহাররম* এই বারোটি কবিতা নিয়ে) ও প্রবন্ধ-সংকলন *যুগবাণী* (২৫ অক্টোবর) এবং *ধূমকেতু* পত্রিকার (১১ আগস্ট) প্রকাশ। ধূমকেতু সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীসহ 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।' (উদ্ধৃত, নূরউল ইসলাম[৮], ১৯৮৩ : ১০)

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নজরুল অচিরেই বাস্তবায়িত করেন। নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু' তে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২। এ কবিতার জন্য ধূমকেতু অফিসে পুলিশ হানা দেয় ৮ নভেম্বর ১৯২২। নজরুলের প্রবন্ধ-সংকলন যুগবাণী বাজেয়াপ্ত হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২। একই তারিখে নজরুল কুমিল্লায় গ্রেফতার হন। নজরুলকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয় এবং বিচারধীন বন্দি হিসাবে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে শুনানির সময় নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দির জবানবন্দি' প্রদান করেন। ১৬ জানুয়ারি মামলার রায় প্রকাশিত হয় এবং নজরুল এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারাধীন বন্দিরূপে নজরুল ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি জেলে এবং ১৭ জানুয়ারি থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত গীতি নাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে নজরুলের কাছে আলিপুর জেলে প্রেরণ করেন। রাজবন্দি নজরুল রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সম্মাননায় উল্লসিত হয়ে রচনা করেছিলেন, 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে নজরুলের দোলন-চাঁপা কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল নজরুলকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হয়। ইংরেজ জেল-সুপারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐ দিন থেকেই তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন, 'Give up hunger strick, our literature claims you'। টেলিগ্রাম গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে যদিও নজরুল তখন হুগলি জেলে। 'Address not found' বলে কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামটি রবীন্দ্রনাথকে ফেরত পাঠায়। (রায়[১০], ১৯৯৮ : ৩৪) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে জেল-পরিদর্শক ডঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী হুগলি জেল পরিদর্শন করেন এবং নজরুল তাঁর আশ্বাস ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ভঙ্গ করতে রাজি হন। 'অবশেষে অনশনের ৪০তম দিনে বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস খেয়ে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন।' (গোস্বামী[৩], ১৯৯০ : ১৫৩) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলে রাজবন্দি নজরুল রচনা করেছিলেন 'এই শিকল পরা ছল' আর বহরমপুর জেলে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া' গান ও কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্পর্ক নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ১৩১৪ সালের (১৯০৮ খ্রি.) ৭ চৈত্র। নজরুলের জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ্য ১৩০৬ সাল (২৪ মে ১৮৯৯ খ্রি.)। সুতরাং পিতার মৃত্যুর সময় নজরুলের বয়স নয় বৎসরও পুরো হয় নি। কিন্তু নজরুলের মা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল জীবিত ছিলেন। নজরুল প্রথম জীবনে সংসারের খরচ চালানোর জন্য মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন, মাযার-শরিফের খাদেম হয়েছেন, মসজিদে ইমামতি করেছেন, লেটোর দলের জন্য গান ও নাটক রচনা করেছেন সুতরাং প্রথম দিকে সংসারের সঙ্গে তিনি ভালোভাবেই জড়িত ছিলেন।

সিয়ারসোল স্কুলে থাকতে নজরুল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনের সৈনিকরূপে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌশেরাতে চলে যান। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রায় আঠারো বৎসর পর্যন্ত কিছু কালের কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে চুরুলিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে, পল্টন ভেঙ্গে দেওয়ার কয়েকমাস আগে তিনি সাত দিনের ছুটি পেয়ে কলকাতা হয়ে চুরুলিয়ায় যান। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হলে তিনি কলকাতায় অন্যত্র কয়েকটি দিন কাটিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রিট বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির অফিসে আসেন, এসময় আবার চুরুলিয়ায় গমন করেন। মুজফফর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

> কলকাতার ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়িতে দু'দিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিসপত্র সেখানে রেখে দিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়িতে চলে যায়। আমার যতটা মনে পড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে সাত-আট দিন ছিল। এসময়ে তার মায়ের সঙ্গে কিসের একটা মান-অভিমানের ব্যাপার তার ঘটে। তার পরে যতদিন মা জীবিত ছিলেন ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ইনি, মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায় সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরে নি। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৭৮)

মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব মায়ের সঙ্গে নজরুলের মান-অভিমানের কারণটি উল্লেখ করেন নি। অনশনরত অবস্থায় হুগলি জেলে থাকাকালীন নজরুলের সঙ্গে তাঁর গর্ভধারিনী মা দেখা করতে এলেও তিনি কেন দেখা করেন নি তার বিষয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের বক্তব্য,

> মার সঙ্গে নজরুলের কি একটা প্রচণ্ড মান-অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। পল্টন হতে ফিরে এসে সে একবার মাত্র চুরুলিয়ায় গিয়ে আর কখনও সেখানে যায় নি। হয়তো সেই জন্যই, কিংবা দেখা করলে অনশন ভাঙাবার জন্য কান্নাকাটিই তিনি শুধু করবেন এই জন্যও হতে পারে, মা'র সঙ্গে নজরুল দেখা করে নি। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৭৮)

মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব অন্যত্র আরও লিখেছেন :

> নজরুলের মান-অভিমানের ব্যাপারটি যে কত গভীর ছিল আরও একটি ঘটনা হতে পরে আমি বুঝেছিলাম। ১৯২১ সালে সে যখন আমার সঙ্গে ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়িতে থাকছিল তখন একদিন তার বড় ভাই (জ্যেষ্ঠাগ্রজ) কাজি সাহেবজান ও তার কাকা (বাবার খুড়তু ভাই) কাজি বজলে করীম সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা নজরুলকে একবারটি চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সাধাসাধি করলেন, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের মা হুগলিতে যখন নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন চুরুলিয়া গ্রামস্থ নজরুলের জ্ঞাতিভাই জনাব আবদুর রহিম। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার রায় বলেছেন :

> যাঁরা তাঁদের কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিয়ে এসে নজরুলের সঙ্গে দেখা করানোর চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, অনেক চেষ্টা করেও রহিম সাহেবের কাছ থেকে নজরুল ও তাঁর মায়ের মধ্যকার মান-অভিমানের কারণটি জানতে পারেন নি। এই কারণ জানবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর সব প্রয়াসই বিফল হয়। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ৭৮)

৬

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল হুগলির মিসেস এম. রহমানের উদ্যোগে কলকাতায় নজরুল ও প্রমীলার বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং নজরুল হুগলিতে সংসার পাতেন। প্রমীলা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন, নজরুলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ তাঁর পরিবারের বিরজাসুন্দরীসহ কেউ সমর্থন করেন নি, কেবল প্রমীলার মা গিরিবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে কুমিল্লা ছেড়ে চলে আসেন এবং নজরুল-প্রমীলার বিবাহ দেন। ঐ বিবাহে ব্রাহ্ম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মাসিক প্রবাসী পত্রিকা অফিস থেকে প্রধানত নজরুল-বিরোধিতার জন্য সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি প্রকাশ করা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট নজরুলের কবিতা ও গানের সংকলন *বিষের বাঁশি* এবং একই মাসে *ভাঙার গান* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দুটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যথাক্রমে ঐ বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নজরুলের গান রেকর্ড করা হয় 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কোম্পানি থেকে যদিও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হন নি। নজরুল বহরমপুর জেলে সহবন্দি মাদারীপুর শান্তিসেনার অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে তাঁর চারণদলের জন্য একটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটির পাণ্ডুলিপি জেল থেকে গোপনে বাইরে পাঠাবার সময়ে হারিয়ে যায়। এই নাটকের জন্য রচিত 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি হুগলিতে এসে নজরুলের কাছ থেকে শিখে শিল্পী হরেন্দ্রনাথদত্ত পরজ-মিশ্র সুরে রেকর্ড করেছিলেন :

> জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
> ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া ॥
> হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
> তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'–খান !
> (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১১৬)

নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের আগে একই শিল্পী নজরুলের আরও একটি স্বদেশি গান 'সত্য-মন্ত্র' এইচ.এম.ভি থেকে রেকর্ড করেছিলেন :

> পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর
> বিধির বিধান সত্য হোক!
> বিধির বিধান সত্য হোক!
> (এই) খোদার উপর খোদ্‌কারী তোর
> মানবে না আর সর্বলোক
> মানবে না আর সর্বলোক !!
> (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১১৮)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল নিজেও এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্বরচিত স্বদেশি গান পরিবেশন করতেন, যেমন তাঁর একটি জনপ্রিয় গান ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদপুরের অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে মাহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপস্থিতিতে পরিবেশন করেছিলেন :

ঘোর্–
ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১১৪)

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক থেকে নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি কুমিল্লা, মেদিনীপুর, হুগলি, ফরিদপুর, বাঁকুড়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ছাড়াও শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জন্য সংগঠন 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের *সাম্যবাদী* কবিতাসমষ্টি সংকলিত হয়। *লাঙল* বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণিসচেতন পত্রিকা।

৭

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের কৃষ্ণনগর-জীবনের শুরু। কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুল বাংলা সংগীতে এক নতুন ধারা যোগ করেন। রাজনীতিতে তিনি যেমন কেবল কংগ্রেসের 'স্বরাজ' আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রেণিসচেতন শ্রমিক-কৃষক সংগঠন এবং তাদের সীমিত না রেখে সর্বহারা শ্রেণির গণসংগীতে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নজরুল উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দিলীপকুমার রায় ও সহশিল্পদের নিয়ে পরিবেশন করেন অদ্যাবধি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রচিত সবচেয়ে বলিষ্ঠ সংগীত :

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮৮)

বাংলা গণসংগীতের সূচনা এই ব্যতিক্রমধর্মী গানটি দিয়েই। একই সময়ে তিনি রচনা ও পরিবেশন করেন কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত মজুর স্বরাজ পার্টির (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল) সম্মেলনের *কৃষাণের গান* ও 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল' আর শ্রমিকের গান 'ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল, ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল'। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নজরুল কলকাতার প্রথম বামপন্থী সাপ্তাহিক *গণবাণীর* জন্য রচনা করেছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, রেডফ্ল্যাগ ও 'শেলীর ভাব-অবলম্বনে' যথাক্রমে 'জাগো অনশন বন্দি', 'রক্তপতাকার গান' এবং 'জাগর-তূর্য'। ঐসব গানের মাধ্যমেই ১২ আগস্ট থেকে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক মুখপাত্র *গণবাণী* ও *লাঙল* একত্র হয়ে *গণবাণী* নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গল্প-সংকলন *রিক্তের বেদন*, কবিতা ও গানের সংকলন *চিত্তনামা*, *ছায়ানট*, *সাম্যবাদী* ও *পূবের হাওয়া*।

নজরুলের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চপরিষদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সীমিতসংখ্যক ভোটারের ভোটের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে তিনি পূর্ববঙ্গের জাঁদরেল মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে পেরে ওঠেন নি। তবে এই নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

উপলক্ষে নজরুলকে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক সফর করতে হয়েছিল বিশেষত তদানীন্তন ঢাকা বিভাগে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে কবির প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। এ প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী বলেন :

> ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি নজরুল পূর্ববঙ্গ সফরে বের হন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেট যান। সেপ্টেম্বরের শুরুতে যশোর, খুলনা প্রভৃতি স্থান সফর করে ৮ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর ফেরেন। সেদিনই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল জন্মায়। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্যপদের জন্য ঢাকা বিভাগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও পরাজিত হন। (গোস্বামী[৩], ১৯৯০ : ১৫৭)

এ বছরে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল প্রবন্ধ-সংকলন *দুর্দিনের যাত্রী* ও *রুদ্রমঙ্গল* আর কবিতা ও গানের সংকলন *সর্বহারা*। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর জীবনে স্বদেশি সংগীত রচয়িতা ও সুরকার অর্থাৎ চারণ নজরুলের সৃজনশীল সংগীত-প্রতিভার দ্বিবিধ বিকাশ লক্ষ করা যায়। নজরুল একদিকে হয়ে ওঠেন সাম্যবাদী গণসংগীতের প্রবর্তক, অপরদিকে বাংলা গজল গানের স্রষ্টা। 'গণসংগীত' ও 'গজলে' যৌবনের দুটি বিশিষ্ট গুণ সংগ্রাম ও প্রেমের প্রতিফলন ঘটে। গণসঙ্গীত সংযোজন করে নজরুল বাংলা গানে পৌরুষ সঞ্চার আর গজলের মাধ্যমে বাংলা গানকে নবযৌবন দান করেন। ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর-জীবনে নজরুল-রচিত ও সুরারোপিত গানগুলোর তালিকা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। নজরুলের এসময়ের উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে :

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি– ভাল করেই মরব এবার চল্ ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮০)

ওরে ধ্বংস–পথের যাত্রীদল !
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮১)

আমরা নিচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্ রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে !

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮৪)

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮৮)

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তূফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই ফুল্‌শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল্।
আজো ত'ার ফুল্‌কলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল্ ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯১)

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯২)

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯২)

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা-সনে রহিল আঁকা।

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৩)

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া
উতল হাওয়া কেশের বাসে ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৫)

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকি দাও শারাব।
হায় সাকি এ আঙ্গুরী খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৫)

এত জল ও কাজল-চোখে
পাষাণী, আনলে বল কে।
টলমল জল্ - মোতির মালা
দুলিছে ঝালর-পলকে ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৫)

'আসে বসন্ত ফুলবনে' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৯),

'দুরন্ত বায়ু বহে পুরবইয়া' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০০),

'চেয়োনা সুনয়না, আর চেয়ো না এ নয়ন পানে।' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০১)

নিশি ভোর হল জাগিয়া, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৩)

সুখী, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৬)

Dhaka University Institutional Repository

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল। মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥ (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৬)

এ আঁখি-জল মোছ পিয়া, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৭)

পরদেশী বঁধুয়া, এলে কি এতদিনে। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৭)

কি হবে জানিয়া বল, কেন জল নয়নে। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৮)

আসিলে এ ভাঙা ঘরে, কে মোর রাঙা অতিথি। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪১০)

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪১৩)

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪২১)

কেমনে রাখি আঁখি-বাড়ি চাপিয়া। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪২৩)

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪৪৫)

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯২)

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কবি। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৪)

কে বিদেশী বন-উদাসী, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৬)

বসিয়ে নদীকূলে এলোচুলে কে উদাসিনী। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৪)

কেন দিলে এ কাঁটা, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪০৫)

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী ! (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৩১)

চল্ চল্ চল্ ! ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫৪২) ইত্যাদি গান।

এ সময়ে নজরুল গানের সুর নিজেই স্বরলিপি করে প্রকাশ করতে থাকেন। ঐসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে নজরুলের মৌলিক সৃজনশীল সংগীতপ্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটে ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে। নজরুলের কৃষ্ণনগর-জীবন ছিল অভাব-অনটন রোগ-শোক-দারিদ্র ক্লিষ্ট, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি 'দারিদ্র' ও 'খালেদ'-এর মতো অনুপম কবিতা আর বাংলা সংগীতভুবনে অভিনব গণসংগীত ও গজল গান সৃষ্টি করেন। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি কোনো প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হন নি যদিও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবী নজরুলের ঐসব সৃষ্টিকে বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন আর সংগীতশিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্ত নজরুলের দুটি স্বদেশি গান (জাতের নামে বজ্জাতি সব এবং পুঁথির বিধান যাক পুড়ে) ইতিমধ্যেই এইচ.এম.ভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে রেকর্ড করেছিলেন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি নজরুল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি 'আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪৪৫) সংগীত এবং 'খালেদ' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একদিকে সাপ্তাহিক *শনিবারের চিঠি*-তে অমুসলমান বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজের এক অংশ এবং অপরদিকে গোঁড়া মুসলমান সমাজ থেকে *ইসলাম দর্শন*, *মোসলেম দর্পণ*, প্রভৃতি পত্রিকায় তীব্র নজরুল-সমালোচনা শুরু হয়। *শনিবারের চিঠি*-তে ১৩৩৩ সালের আষাঢ় থেকে ১৩৩৪ সালের কার্তিক পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রচণ্ড নজরুল সমালোচনা এবং নজরুলের বিভিন্ন রচনার প্যারডি় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলকে সমর্থন জানায় *কল্লোল*, *কালিকলম* প্রভৃতি প্রগতিশীল পত্রিকা। এ সময়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সাহিত্যিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজ 'রবীন্দ্র-পরিষদে' এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার আপত্তি জানান, তবে 'হত্যা' অর্থে খুন শব্দের ব্যবহারে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। নজরুল 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নিজের বক্তব্য 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' নামক প্রবন্ধে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে তুলে ধরেন। শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখে ঐ বিতর্কের অবসান ঘটান। নজরুল লিখেছেন :

> আমি শুধু 'খুন' নয়- বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৭)

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নজরুল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসেন। এ সময়ে নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'চল্ চল্ চল্ ! ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫৪২) গানটি রচনা করেন। 'ঢাকায় সেবার অধ্যাপক কাজি মোতাহের হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কবি বুদ্ধদেব বসু ও কবি অজিত দত্ত এবং গণিত বিভাগের ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। জুন মাসে পুনরায় ঢাকা এলে বানু সোম ও উমা মৈত্রের (লোটন) সঙ্গে নজরুলের পরিচয় এবং সঙ্গীতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। (Nazrul Islam[7], 2011 : 11)

১৩৩৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৮খ্রি.) নজরুলের মাতা জায়েদা খাতুন চুরুলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। ১৩৩৫ সালে মাসিক *মোহম্মদী* পত্রিকায় নজরুল-বিরোধিতা শুরু হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের পরিচালনায় মাসিক ও সাপ্তাহিক *সওগাত* পত্রিকা বলিষ্ঠতার সঙ্গে নজরুলকে সমর্থন করে যায়। নজরুল এ সময়ে *সওগাত*- এ যোগদান এবং সাপ্তাহিক *সওগাত*'র 'চানাচুর' নামক রম্য বিভাগটি পরিচালনা করেন। সাপ্তাহিক *সওগাত*'এ নজরুলের সমর্থনে 'নজরুল-সংবর্ধনা' নামক বিশেষ স্তম্ভ খোলা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর *মোহাম্মদী* পত্রিকায় নজরুল-বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করে নজরুল-সমর্থনে 'অনলপ্রবাহে'র কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী *সওগাত*-এ বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, বিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই, নজরুল-প্রতিভার সপক্ষে *সওগাত* পত্রিকার মাধ্যমে একরূপ আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৩৩৪ সালেই সওগাত-এ প্রকাশিত 'কাব্যসাহিত্যে বাঙালি মুসলমান' শীর্ষক নিবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন নজরুলকে 'যুগ-প্রবর্তক' কবি এবং 'বাংলার জাতীয় কবি'রূপে আখ্যায়িত করেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুল চট্টগ্রাম সফরে যান এবং হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুননাহার-ভাইবোনের আতিথ্য গ্রহণ করেন, ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বাতায়ন - পাশে গুবাক-তরুর সারি' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫৪২) এবং 'সাম্পানের গান'। তিনি তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমদের জন্মস্থান সন্দীপও সফর করেন এ যাত্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এইচ.এম.ভি. গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি-অনুযায়ী ঐ সময়ে রেকর্ডের জন্য নজরুল-রচিত গানে অপর কেউ সুর দিতে পারতো না। গ্রামোফোন কোম্পানীতে নজরুলের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণে প্রকাশিত 'নজরুল-সঙ্গীত' এর রেকর্ডে আঙুরবালার গাওয়া প্রথম দুটি গান ছিল 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে, বেদনা-সনে রহিল আঁকা।' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৩) ও 'এত জল ও কাজল-চোখে' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯৫)।

নজরুলের প্রথম রেকর্ড ছিল স্বরচিত 'নারী' কবিতার আবৃত্তি। এছাড়া সে কালের প্রখ্যাত গায়ক কে, মল্লিক নজরুলের প্রশিক্ষণে প্রথম দুটি বিখ্যাত গজল রেকর্ড করেছিলেন– 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯১) এবং 'আমারে চোখ–ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৯২) ঐসব গান ও আবৃত্তি রেকর্ড হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের দিকে আর প্রকাশিত হয়েছিল বছরের শেষ দিকে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যে ছয়জন শিল্পী এইচ.এম.ভি. থেকে নজরুলের দশটি গান নজরুলের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করেছিলেন তাঁরা হলেন আঙুরবালা, ইন্দুবালা, মানিকমালা, উমাপদ ভট্টাচার্য, কে. মল্লিক, প্রতিভা সোম (বসু)। ঢাকার মেয়ে প্রতিভা সোমের (পরে কবি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) রেকর্ড করা নজরুলের দুটি গান ছিল, 'স্মরণপারের ওগো প্রিয়' এবং 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়'। গান দুটির রেকর্ড ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়। (Nazrul Islam[7], 2011 : 12)

নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আর বেতার ও মঞ্চের সঙ্গে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। এ অঞ্চলে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম রেডিও বা বেতারের যাত্রা শুরু ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট কলকাতায় ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানির উদ্যোগে। বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি ও কলকাতা বেতারের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অসুস্থতার পূর্ব সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নজরুল কলকাতা মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কিত হন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছর মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ শচীন সেনগুপ্তের *রক্তকমল* নাটকের জন্য নজরুল ৯টি গান রচনা ও সুর সংযোজন করেছিলেন, যদিও নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময়ে ৭টি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। শচীন সেনগুপ্ত ঐ নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই মন্মাথ রায়ের *মহুয়া* নাটকের জন্য নজরুল ১৫টি গান রচনা ও সুরারোপ করেন। একই বছর মঞ্চস্থ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জাহাঙ্গীর* নাটকের জন্য নজরুল রচনা করেছিলেন 'রঙমহলের রঙমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালি। রূপের কাননে আমরা ফুলদল কুন্দ মল্লিকা শেফালি।' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯২) পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ মন্মথ রায়ের চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী নাটক *কারাগারে* নজরুলের ৮টি গান ছিল, নাটকটি একটানা ১৮ রজনি মঞ্চস্থ হবার পর সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে এক বর্ণাঢ্য জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়, কবিকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলি। সভাপতি কবির হাতে রুপোর আধারে সোনার দোয়াত কলম উপহার তুলে দেন, সভায় শুভেচ্ছা ভাষণ প্রদান করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কবির দ্বিতীয় পুত্র সব্যসাচীর জন্ম হয় আর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে নজরুলের প্রাণপ্রিয় চার বৎসর বয়স্ক পুত্র বুলবুল বসন্তরোগে ইন্তেকাল করেন। বুলবুলের রোগশয্যায় বসে নজরুল অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

করেন *বুলবুল-ই-সিরাজ* হাফিজের রুবাইয়াত। ইতিমধ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের কবিতা ও গানের সংকলন *ফণি-মনসা* এবং পত্রোপন্যাস *বাঁধনহারা,* ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কাব্য *সিন্ধু হিন্দোল,* কবিতা সংকলন *সঞ্চিতা,* গজল গানের সংকলন *বুলবুল,* কাব্য *জীঞ্জীর,* ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্য *চক্রবাক,* গানের সংকলন *চোখের চাতক,* ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা,* অনুবাদকাব্য *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ,* গানের সংকলন নজরুল-গীতিকা, নাটিকা *ঝিলমিলি* এবং কবিতা ও গানের সংকলন *প্রলয়-শিখা,* ও *চন্দ্রবিন্দু* প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থদুটি বাজেয়াপ্ত এবং *প্রলয়শিখা*র জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩০ মামলার রায়ে নজরুলের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। নজরুল হাইকোর্টে আপিল ও জামিনলাভ করেন। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে হাইকোর্ট কর্তৃক নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা খারিজের আদেশ দেওয়া হয়, ফলে নজরুলকে কারাবরণ করতে হয় নি।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন সাহিত্যবার্ষিকী *বর্ষবাণী* -সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে নজরুল দার্জিলিং ভ্রমণে যান, রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিংয়ে অবস্থান করেছিলেন। নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে দেখা করেন, তাঁদের মধ্যে দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্র কাজি অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। এ বছরে প্রকাশিত নজরুলের গ্রন্থাবলির মধ্যে ছিল উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা,* গল্প সংকলন *শিউলিমালা,* স্বরলিপি *নজরুল-স্বরলিপি,* এবং গীতিনাট্য *আলেয়া*। নজরুল-রচিত নাটকসমূহের মধ্যে এ বছরে কলকাতা মঞ্চে *আলেয়া* সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয় নাট্যকিতনে (৩ পৌষ ১৩৩৮)। পুস্তকাকারে প্রকাশিত *আলেয়া* নাটকে গানের সংখ্যা ২৮টি, তবে মঞ্চে অভিনয়ের সময় সবগুলি গান ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। ঐ বছর নজরুল আরো যেসব নাটকের জন্য গান রচনা বা সুর করেছিলেন, সেগুলো হল যতীন্দ্রমোহন সিংহের *ধ্রুবতারা* উপন্যাসের হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাট্যরূপ *ধ্রুবতারা*। এই নাটকের হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ৪টি গানে সুরারোপ, নাট্যনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ মন্মথ রায়ের *সাবিত্রী* নাটকের ১৩টি গান রচনা ও সুরসংযোজনা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বেতার থেকে মন্মথ রায়ের *মহুয়া* নাটকটি প্রচারিত হয়, এ নাটকের গানগুলো ছিল নজরুলের রচনা।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নজরুল সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। সিরাজগঞ্জে নজরুল 'অনলপ্রবাহ'-খ্যাত কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঐ বছর ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে নজরুল যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি কায়কোবাদ। সভায় কায়কোবাদ নজরুলকে মাল্যভূষিত করেন আর নজরুল কায়কোবাদকে কদমবুসি বা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন। প্রবীণ ও নবীন দুই কবির এই মিলন স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩২ সালে নজরুলের প্রকাশনার মধ্যে সবগুলোই ছিল গীত-সংকলন, যেমন *সুরসাকী, জুলফিকার, বনগীতি*। বস্তুত নজরুলের সাহিত্যকর্মের অধিকাংশই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, পরের প্রকাশনা প্রায় সবই ছিল সংগীত-সংকলন।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৩ এক বছর মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ সময়ে তিনি মেগাফোন কোম্পানির কাছে তাঁর গানের স্বত্ব বিক্রয় করেন। যদিও মেগাফোন থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচিত অধিকাংশ গানের সুর নজরুলের নিজেরই ছিল। কিন্তু স্বত্ব বিক্রয় করে দেবার ফলে গ্রামোফোন কোম্পানিতে অন্য সুরকার কর্তৃক নজরুলের গানে সুর করার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মেগাফোন কোম্পনিতেই ঐ রেওয়াজ চালু হয়েছিল। মেগাফোন কোম্পানির প্রথম দুটি 'নজরুল-সঙ্গীতে'র রেকর্ড ছিল ধীরেন দাসের গাওয়া 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী' ও 'লক্ষ্মী মা তুই'। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নজরুল এইচ.এম.ভি গ্রামোফোন কোম্পানিতে ফিরে আসেন

Dhaka University Institutional Repository

'এক্সক্লুসিভ কমপোজার' রূপে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। তখন থেকে এইচ.এম.ভি- তে রেকর্ড করা গানগুলো কোম্পানির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং কোম্পানি অন্য ট্রেনার ও সুরকার দিয়ে নজরুলের গান রেকর্ড করার আইনগত অধিকার লাভ করে। এই অধিকারের কেমন অপব্যবহার করা হয় তার দু-একটি উদাহরণঃ শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় নজরুলের সুর ও প্রশিক্ষণে রেকর্ড করেন, 'যবে সন্ধ্যা-বেলায় প্রিয় তুলসী-তলায় তুমি করিবে প্রণাম' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫৭) এবং 'সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায়', কিন্তু কোম্পানির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং অন্য ট্রেনার ও সুরকারের প্রভাবে রেকর্ডটি বাজারে না ছেড়ে বাতিল করা হয়, অন্য সুরকারের সুরে অন্য শিল্পীকে দিয়ে গান দুটি রেকর্ড করিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। একই ব্যাপার ঘটে 'মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা' গানটির ক্ষেত্রেও।

ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গান মারফতি, মুর্শিদি, কারবালার জারি, বাংলার লোকসঙ্গীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলা গানের নাগরিক ধারায় হিন্দু ঐতিহ্যভিত্তিক কীর্তন বা শ্যামাংগীতের মতো ইসলামি ঐতিহ্যভিত্তিক গান ছিল না। নজরুল আধুনিক বাংলা গানে ইসলামি ঐতিহ্যভিত্তিক হাম্‌দ, না'ত, মর্সিয়া ছাড়াও নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত বিষয় নিয়ে ইসলামি ধারার গান সংযোজন করেন। নজরুল ইসলামি গান লিখতে শুরু করেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। নজরুলের প্রথম যে ইসলামি গানটি হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে রেকর্ড হয় সেটি একটি না'ত, 'রমজানের ঐ রোযার শেষে এল খুশীর ঈদ', শিল্পী আব্বাসউদ্দীন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়। ইসলামি গানের প্রথম রেকর্ড বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করে। ফলে গ্রামোফোন কোম্পানি ইসলামি গানের রেকর্ড প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাংলার সংগীতবিমুখ রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটে ইসলামি সংগীতের পথ ধরে, তারপর বৃহত্তর সংগীতজগতে বাঙালি মুসলমান সমাজের উত্তরণে আর বিলম্ব ঘটে নি। এ প্রসঙ্গে বাংলায় ইসলামি গান যাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেই মহান শিল্পী আব্বাসউদ্দীন 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন :

> ...তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘন্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, 'ও মন রমজানের ঐ রোযার শেষে এল খুশীর ঈদ'। তখুনি সুরসংযোগ করে শিখিলে দিলেন।... পরের দিন লিখলেন, 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। দান দু'খানি লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হল। এরপর কাজীদা লিখে চললেন ইসলামি গান। যার গান শুনলে কানে আঙুল দিত তাদের কানে গেল।, 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি', 'নাম মোহাম্মদ বোলারে মন নাম আহ্‌মদ বোল'। কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান, আরো শুনল 'আল্লা আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়'। মোহররমে শুনল মর্সিয়া, শুনল 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়'। ঈদে নতুন করে শুনল 'এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদগাহে'। তিনি লিখে চললেন, 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন ইসলামি লাল মশাল', 'শহিদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী'। (উদ্ধৃত, Nazrul Islam[7], 2011 : 13)

শুধু ইসলামি গান নয় একই সময় নজরুল রচনা করেন অসংখ্যা উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি। যেমন 'আর লুকাবি কোথায় মা কালি' (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪০), 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪০), 'আমি নন্দদুলালের সাথে এ খেলে ব্রজনারী হোরি' (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪০)। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ছিল *পুতুলের বিয়ে, গুলবাগিচা,* ও *কাব্য আমপারা*।

Dhaka University Institutional Repository

৯

পবিত্র কোরআন শরীফের আমপারা অংশের কাব্যানুবাদ নজরুলের এক অমর কীর্তি। *কাব্য আমপারা* প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর। এই অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশনার পূর্বে কলকাতার প্রখ্যাত আলেম, ইসলাম, আরবি ও কোরআন-বিশেষজ্ঞদের সামনে নজরুল তাঁর অনুবাদ পাঠ করে শোনান। ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞরা নজরুলের অনুবাদের কয়েকটি শব্দমাত্র পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুমোদনক্রমেই প্রকাশক *কাব্য আমপারা* প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ থেকে নজরুলের আরবি ভাষা ও পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর, এই সাড়ে তিন বৎসর নজরুল যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন তা হল *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* এবং *কাব্য আমপারা*। নজরুল রচিত হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী হল *মরু-ভাস্কর*। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে *বুলবুল* পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪০) নজরুলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য'। এ প্রবন্ধটি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ের খবর পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বসাহিত্যের প্রধান দুটি ধারার কথা বলেছেন, একটি অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকা একদিকে নোগুচি, ইয়েট্স, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। আরেকদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, শ, ভেজাভাতে প্রভৃতি। এই দুই ধারার মাঝখানে রয়েছেন লিওনিদ, আঁদ্রিভ, ক্নুট হামসুন, ওয়াদিশল, রেঁমদ প্রভৃতি। প্রবন্ধের শেষে তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মর্মকথা তুলে ধরেছেন। (Nazrul Islam[7], 2011 : 14)

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুল চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম যে ছায়াছবিটির সঙ্গে নজরুল যুক্ত ছিলেন সেটি পাইওনিয়ার ফিল্ম পরিবেশিত *ধ্রুব*, কাহিনী গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এ ছায়াছবির পরিচালনা, সংগীতরচনা, সুর-সংযোজনা ও সংগীত-পরিচালনা এবং নারদের ভূমিকায় অভিনয় ও নারদের চারটি গানে প্লে-ব্যাক করেন নজরুল– যার একটি গান ছিল মাস্টার প্রবোধের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে। *ধ্রুব* চিত্রের মোট ১৮টি গানের রচয়িতা গিরিশ ঘোষ, তবে সুর সংযোজন করেন নজরুল। নজরুল প্রথম যে ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সেটির প্রডাকশনে নজরুলের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'আকাশবাণী'র মুখপত্র *বেতার জগত*-এ নজরুলের 'দোলা লাগিল দখিনা বনে' গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, স্বরলিপিকার ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নজরুলের গ্রন্থাবলির মধ্যে সবগুলোই ছিল সংগীত-বিষয়ক, *গীতিশতদল* ও *গানের মালা* গীতিসংকলন এবং *সুরলিপি ও সুরমুকুর স্বরলিপি-সংগ্রহ।* বস্তুত ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে *বুলবুল* এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে *চোখের চাতক* দুটি গীতিসংকলনের পর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই নজরুলের সবচেয়ে বেশি গান ও সরলিপির বই প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে *নজরুল-গীতিকা, নজরুল-স্বরলিপি, সুরসাকী, জুলফিকার, বনগীতি, গুলবাগিচা, গীতিশতদল, সুরলিপি, গানের মালা* এবং *সুরমুকুর* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত নজরুলের *বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুল-গীতিকা, সুরসাকী, জুলফিকার, বনগীতি, গুলবাগিচা, গীতিশতদল, ও গানের মালা* এই দশটি গ্রন্থে গানের সংখ্যা আট শতাধিক, তার মধ্যে রাগভিত্তিক সুর ছয় শতাধিক গানের, লোক ও কীর্তনের সুর প্রায় একশত আর স্বদেশি ও বিবিধ সুর প্রায় ত্রিশটি গানে। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, নজরুল ত্রিশের দশকের বাংলা গানকে রাগসংগীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নজরুল গ্রামোফোন ছাড়াও চলচ্চিত্র ও মঞ্চ জগতে সক্রিয় ছিলেন। আসাদুল হকের *চলচ্চিত্রে নজরুল* এবং ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের *নাটকে নজরুল* গ্রন্থে ছায়াছবি ও মঞ্চে নজরুলের ভূমিকার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বছর নজরুল তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য-সংবলিত তাঁর জন্মস্থান কয়লাখনি-অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনভিত্তিক *পাতালপুরী* ছায়াছবির জন্য সংগীত রচনা ও পরিচালনা করেন। ছবিতে শৈলজানন্দের গানও ছিল। এই ছবির গানের জন্য নজরুল তাঁর বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল ঘুরে আসেন এবং এ ছবির জন্য গান রচনা ও সংগীত পরিচালনা ছাড়াও নজরুল নৃত্যগীতরত সাঁওতালী মেয়েদের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ সুধীন্দ্রনাথ রাহার *সর্বহারা* নাটকে নজরুলের ৭টি গান ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রঙমহলে মঞ্চস্থ যোগেশ চৌধুরীর *নন্দরানীর সংসার* নাটকের গানগুলোর সুরকার ছিলেন নজরুল। এ বছর কলকাতা বেতারে প্রচারিত জগৎ ঘটক রচিত গীতি-আলেখ্য *জীবনস্রোতের* গানগুলো রচনা করেছিলেন নজরুল। এ ছাড়াও ঐ বছর প্রচারিত 'মীরা উৎসবে' নজরুলের 'নাচত নন্দদুলাল' ভজনটি ছিল।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ মন্মথ রায়ের *সতী* নাটকের ১০টি গানের রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী-উপলক্ষে ঐ বছরে মে মাসে প্রচারিত কলকাতা বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক ছিলেন নজরুল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় এবং সহ শিল্পীবৃন্দ। একই বছরে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত শান্তি দেবীর ব্যবস্থাপনায় একটি সংগীতানুষ্ঠানে নজরুল ভজন পরিবেশন করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেবদত্ত ফিল্মস-এর *গ্রহের ফের* চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত, সংলাপ-রচনা প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিচালনা চারু রায়, সংগীত রচনা অজয় ভট্টাচার্য আর সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বেতার থেকে মনোরঞ্জন সেনের প্রযোজনায় নজরুলের *দেবীস্তুতি* প্রচারিত হয়। ঐ বছর জানুয়ারি মাসের *বেতার জগতের* একটি সংখ্যার প্রচ্ছদপটে নজরুলের ছবি ছাপা হয়। ঐ সংখ্যায় নজরুলের *দেবীস্তুতি*'র পরিচয় ছিল। *দেবীস্তুতি* পরিবেশন করেছিল 'বাসন্তী' বিদ্যাবীথি'র শিল্পবৃন্দ। একই বছরে কলকাতা বেতারে নজরুল শনিমণ্ডলের আসরে সজনীকান্তদাসের 'পথ চলতে ঘাসের ফুলের' অনুষ্ঠানে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। ঐ বছরে কলকাতা বেতারে নজরুলের *পুতুলের বিয়ে* নাটকটি পরিবেশন করেন 'গুহ এবং সম্প্রদায়'। কলকাতা বেতার থেকে নজরুল শুধু আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করতেন না, বেতার থেকে শুধু নজরুল-রচিত সংগীতালেখ্য বা রেকর্ড প্রচারিত হত না, সংগীত সম্পর্কেও বক্তব্য রেখেছেন নজরুল। কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠানে মূল্যবান আলোচনা ছিল 'আধুনিক বাংলা গানের গতি প্রকৃতি' এবং 'গান-রচনা' বিষয়ে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রচারিত নজরুলের কথিকা। দুর্ভাগ্যবশত নজরুলের ঐ দুটি রচনার একটিও পাওয়া যায় নি, অন্যথা ঐ দুটি কথিকা থেকে নজরুলের সংগীতচিন্তা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যেত।(Nazrul Islam[7], 2011 : 15)

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি নিউ-থিয়েটার্সের *বিদ্যাপতি* (বাংলা ও হিন্দী) নির্মিত হয়েছিল নজরুলের রেকর্ড-নাটক অবলম্বনে। এ ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় ছিলেন দেবকীকুমার বসু, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল। একই বছর দেবদত্ত ফিল্মস রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের ছায়াছবি তৈরি করেছিল নরেশ মিত্রের পরিচালনায়। রবীন্দ্রনাথের *গোরা* ছায়াছবির সংগীত-পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। *গোরা* ছবিতে সাতটি গান ছিল, তিনটি রবীন্দ্র-সংগীত, দুটি শ্লোক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং' (রবীন্দ্রনাথের সুরে) আর নজরুলের আশা-টৌড়ী রাগে একটি গান 'উষা এল চুপি চুপি'। *গোরা* ছবিতে রবীন্দ্র-সংগীত থাকায় বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। বোর্ডের প্রতিনিধি শৈলজারঞ্জন

মজুমদার আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু নরেশ মিত্র, সতু সেন ও নজরুল তিনজনে মিলে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে অনুমোদন আদায় করে নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন নাট্যনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় শচীন সেনগুপ্তের কালজয়ী নাটক *সিরাজদ্দৌলা*। এ নাটকের সংগীত-রচয়িতা ও সুর-সংযোজক ছিলেন নজরুল। *সিরাজদ্দৌলা* নাটক ও নাটকের গানগুলোর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণে এইচ.এম.ভি *সিরাজদ্দৌলা* রেকর্ড-নাটক প্রকাশ করে, রেকর্ড অবশ্য মঞ্চনাটকে পরিবেশিত গানগুলোর কিছু রদবদল করা হয়। রেকর্ড-নাটক *সিরাজদ্দৌলা* সে-সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যেত।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দোলপূর্ণিমায় কলকাতা বেতারে চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রচারিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যলীলাকীর্তন' অনুষ্ঠানে নজরুলের 'বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়' গানটি প্রচারিত হয়, কিন্তু গানটি এখন লুপ্ত। ঐ বছরে কলকাতা বেতারে নজরুলের *দেবীস্তুতি* পুন:প্রচারিত হয়। একই বছরে প্রচারিত জগৎ ঘটকের *ঝুলন* গীতিচিত্রের গানগুলো ছিল নজরুলের রচনা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে নজরুল কলকাতা বেতারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কিত হন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনেক মূল্যবান সঙ্গিতানুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণামূলক এবং ব্যতিক্রমধর্মী সংগীতানুষ্ঠান হারামণি, মেল-মিলন, নবরাগমালিকা। বস্তুত এ সময় থেকে শুরু করে অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নজরুল বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগিতায় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সংগীতানুষ্ঠানগুলো প্রচার করেছিলেন বাংলা সংগীতের ইতিহাসে তা এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে *বেতার জগত* -এ একটি সংখ্যায় নজরুলের ছবিসহ *বিজয়া সংগীতালেখ্যটি* প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে কলকাতা বেতার প্রচারিত নজরুলের পলিকল্পনা-অনুযায়ী জগৎ ঘটক রচিত *উদাসী ভৈরব* গীতি-নাটকটির সবকটি গান নজরুল-সৃষ্ট রাগে রচিত ছিল, 'অরুণ ভৈরব', 'আশা ভৈরবী', 'শিবানী ভৈরবী', 'রুদ্র ভৈরব', 'যোগিনী' এবং 'উদাসী ভৈরব'। রাগ ভৈরবের বৈচিত্র প্রদর্শনে নজরুল-রচিত গানগুলো বাংলা রাগসংগীতের ক্ষেত্রে এক অভিনব সংযোজন এবং নজরুলের মৌলিক সংগীত-প্রতিভার নিদর্শন। (Nazrul Islam[7], 2011 : 15)

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় শচীন সেনগুপ্তের বিখ্যাত নাটক *সিরাজদ্দৌলা*। নাটকটির সংগীত-পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ঐ বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা বেতার থেকে *রক্তজবা* নামে যে সঙ্গীতালেখ্যটি প্রচারিত হয় তার গানগুলোর মধ্যে ৭টি ছিল নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত। একই বছর ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রচনা ও সুর সংযোজনায় প্রচারিত হয়েছিল কাফি ঠাটের রাগ-রাগিণীভিত্তিক সঙ্গীতালেখ্য *হরপ্রিয়া*। এই আলেখ্যটিতে কাফি ঠাটের দক্ষিণ ভারতীয় রাগ শিবরঞ্জনী, সৈন্ধবী, সাবন্তী সারং, নীলাম্বরী, সাহানা এবং রামদাসী মুল্লারে বাঁধা নজরুলের গান অর্ন্তভূক্ত ছিল। নজরুলের সুবিখ্যাত *হারামণি* অনুষ্ঠানের প্রথমটিতে 'আহির ভৈরব', দ্বিতীয়টিতে 'আনন্দ ভৈরব', তৃতীয়টিতে 'বসন্ত মুখারী' চতুর্থটিতে 'সৌরাষ্ট্র ভৈরব' রাগের গান ছিল। 'মেল মিলন' অনুষ্ঠানটি ছিল রাগ-রাগিণী ও ঠাটের মিল সম্পর্কিত অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের প্রচারিত নিম্নোক্ত ঠাটে বিভিন্ন রাগে প্রচারিত গানগুলোর বাণী ও সুরকার ছিলেন নজরুল; ঠাট আশাবরী, কাফী, খাম্বাজ, বেলাওল, কল্যাণ, মারোয়াঁ ও বিভাস। ঐসব ঠাট ও রাগ-রাগিণীর জন্য গান রচনার সাথে সাথে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কলকাতা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরে প্রচারিত *কচুরীপানা* গীতি-আলেখ্যের জন্য নজরুল রচনা করেছিলেন 'ধ্বংস করে এই কচুরীপানা' গানটি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এইচ.এম.ভি. মেগাফোন টুইন ছাড়াও কলম্বিয়া, হিন্দুস্থান, সেনোলা কোম্পানি থেকে নজরুলের গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নজরুল-সংগীত-বিশেষজ্ঞ শ্রীবক্ষমোহন ঠাকুর প্রদত্ত পরিসংখ্যান-

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী (*নজরুল গীতির নানা প্রসঙ্গ*, নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্য নজরুল এইচ.এম.ভি. থেকে ৫৬৭টি, টুইন থেকে ২৮০টি, মেগাফোন থেকে ৯১টি, কলম্বিয়া থেকে ৪৪টি, হিন্দুস্তান থেকে ১৫টি এবং সেনোলা থেকে ১৩টি, পাইওনিয়ার থেকে ২টি, ভিয়ালোফোন থেকে ২টি এবং রিগ্যার কোম্পানি থেকে একটি মোট সহস্রাধিক রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এসব রেকর্ডে নজরুলের ১৬৪৮টি গান রয়েছে। এ পরিসংখ্যান শুধু রেকর্ডের গানের; পত্রপত্রিকা, গীতিসংকলন, স্বরলিপি, বেতার, নাটক ও পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত নজরুলের গানের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউ থিয়েটার্সের *সাপুড়ে* এবং *সাপেড়া* (হিন্দী) ছায়াছবির কাহিনী নজরুল ইসলামের, পরিচালক দেবকী বসু। আসাদুল হক *চলচ্চিত্রে নজরুল* (বাংলা একাডেমী) গ্রন্থে জানিয়েছিন, ছাবটির সংগীত-পরিচালকরূপে রাইচাঁদ বড়ালের নাম থাকলেও ছবির আটটি গানের সাতটি ছিল নজরুলের, একটি অজয় ভট্টাচার্যের, আর সবগুলো গানের সুর সংযোজক এ প্রশিক্ষক ছিলেন নজরুল। *পাতালপুরী* ছায়াছবির গানগুলোর মতো *সাপুড়ে* ছায়াছবির গানেও নজরুল রাঢ় বাংলার সাঁওতালি 'ঝুমুর' সুর ব্যবহার করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ মহেন্দ্র গুপ্তের *দেবী দুর্গা* নাটকের ১২টি গানের রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর নজরুলের *মধুমালা* নাটক প্রথম নাট্যভারতীতে মঞ্চস্থ হয়। *মধুমালা* গীতিনাট্যে গানের সংখ্যা ৩৭টি, নজরুলের অপর কোনো নাটকে এত গান ছিল না। (Nazrul Islam[7], 2011 : 15-16) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নজরুল বাংলার গ্রামোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র ও মঞ্চের ব্যস্ততম সংগীত-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বছরেই তাঁর স্ত্রী প্রমীলা নজরুল গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। আমৃত্যু তিনি ঐ অবস্থাতেই স্বামীর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংগীতালেখ্যতে নজরুলের বহু গান সন্নিবেশিত ছিল। জগৎ ঘটক-রচিত 'প্রবাহ' গীতিকানুষ্ঠানের সংগীত-রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। নজরুলের অপর একটি বিখ্যাত রাগভিত্তিক অনুষ্ঠান 'নবরাগমালিকা' প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে– এটি ছিল নজরুলসৃষ্ট নতুন রাগিণীর অনুষ্ঠান। নবরাগমালিকায় প্রচারিত 'নির্ঝরিণী', 'বেণুকা', 'মীনাক্ষী', সন্ধ্যামালতী', 'বনকুন্তলা', 'দোলনচম্পা' রাগিণীতে রচিত নজরুলের গানগুলো গীতিনাট্যরূপো প্রকাশিত হয়েছিল বেতার জগত-এ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'হারামণি' পঞ্চম অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় 'বিরাট ভৈরব' রাগ, কিন্তু গানটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। ঐ বছরে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে নজরুল রচিত আরো যেসব গীতি আলেখ্য প্রচারিত হয় সেগুলো ছিল, 'জিপসীদের সঙ্গে', 'ইরানের স্বপ্ন' বিভিন্ন সারঙ্গ রাগের ভিত্তিক 'সারঙ্গ রঙ্গ', এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল, সাবন্ত সারঙ্গ, লঙ্কাদহন সারঙ্গ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, সুধ সারঙ্গ, মধুমাধবী, রক্তহংস সারঙ্গ ও গৌড় সারঙ্গ রাগে রচিত ৮টি গান। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ 'হারামণি' অনুষ্ঠানে 'বাঙাল ভৈরব' রাগে বাঁধা ১৪ মাত্রার ঝুমরা তালে নিবদ্ধ 'নৃত্যকালী শংকর সঙ্গে নাচে অতি রুদ্র বিভঙ্গে' প্রচারিত হয়। একই বছরে নজরুলের রচনা ও সংগঠনায় *বাসন্তিকা* নাটকের গানগুলো 'বাসন্তীকুঞ্জ' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। ঐ বছর মে মাসে 'মহিলা মজলিসে' *সুগোপন* নামে নজরুলের একটি নাটক প্রচারিত হয়, নাটকটি পাওয়া যায় নি। ঐ বছর ২৫ বৈশাখ বেতারে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিদের স্বরচিত কবিতা-পাঠের আসরে নজরুল যোগদান করেন। একই মাসে 'নবরাগমালিকা', ছোটদের আসরে নজরুলের নাটক *জাগো সুন্দর চির কিশোর* এবং সংগীতালেখ্য 'বাংলার গ্রাম' প্রচারিত হয়। 'বাংলার গ্রাম' সংগীতালেখ্যটিও হারিয়ে গেছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নজরুলের গীতিচিত্র 'অতনুর দেশে' আর জুন মাসে 'যাম যোজনার কড়ি মাধ্যম,' টৌড়ি, গৌড় সারঙ্গ, মুলতান, পুরবী, ছায়ানট, বেহাগ ও পরজ এই আটটি রাগের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শত হয়। একই মাসে ধানেশ্রী (ভৈরবী ঠাটে) রাগে 'সন্ধ্যামলতী যবে ফুলবনে ঝুরে' প্রচারিত হয় সপ্তম *হারামণিতে*, এ গানটির স্বরলিপি আগে মাঘ ১৩৪৫-এর *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই মাসে প্রচারিত হয় 'পল্লীমঙ্গল' আসরে নজরুলের 'বর্ষা মোদের প্রাণ' গীতিকা। একই মাসে অষ্টম 'হারামণি' অনুষ্ঠানে 'প্রতাপবরালী' রাগ 'আদ্ধাকাওয়ালী' তালে প্রচারিত হয়। ঐ মাসে আরো প্রচারিত হয় শ্যামাসংগীতালেখ্য 'এসো মা' নজরুলের রচনা ও সংগঠনায়। এই গীতি-আলেখ্যটিও নিখোঁজ। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের নবম 'হারামণি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় 'পটমঞ্জরী' রাগ। এ মাসে আরো প্রচারিত হয়েছিল নজরুল-রচিত 'হিন্দোলা' গীতানুষ্ঠান এবং শ্রীকৃষ্ণের ও কলকাতা বেতারের জন্মদিনে 'আকাশবাণী' গীতিকাটি। 'আকাশবাণী'র গানগুলো বেতার জগত-এ প্রকাশিত হয়। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রচারিত হয় 'গীতিচিত্র' যাযাবর বেদিয়া গানের সুরের ভিত্তিতে, এটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। একই মাসে দশম 'হারামণি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় 'রামদাসী মল্লার' রাগ এবং *গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ* নামে ৪০ মিনিটের একটি গীতি-আলেখ্য। নজরুল-রচিত এই আলেখ্যটিও লুপ্ত। অক্টোবর মাসে প্রচারিত হয় গীতচিত্র 'আগমনী' আর একাদশ 'হারামণি' অনুষ্ঠানে লুপ্তরাগের পুনরুদ্ধার 'ভিখার', দুটির একটিরও কোনো খোজ নেই। 'আকাশবাণী, 'ইরানের স্বপ্ন', 'সারঙ্গরাগ,' পুনরায় প্রচার করা হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্র মাসে প্রচারিত হয় দ্বাদশ 'হারামণি' অনুষ্ঠানে 'নভরোচিক' বা 'নওরোচিকা' আর 'গুলবাগিচা' নামে গজল-বিচিত্রা। এ মাসে আরো প্রচারিত হয় 'যুগলমিলন' কীর্তন-বিচিত্রা, এটিও লুপ্ত। (Nazrul Islam[7], 2011 : 16)

শুধু কলকাতা বেতার কেন্দ্র নয় ঢাকা বেতার থেকেও নজরুলের অনেক গান প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নজরুলের পরিচালনায় তাঁর রচিত গীতিবিচিত্রা *পূর্বালী* প্রচারিত হয়। তারও আগে ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত শচীন সেনগুপ্তের ঝড়ের রাতে নাটকের গানগুলোর সুরকার ছিলেন নজরুল। ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীতানুষ্ঠানগুলো নজরুলের নব নব সৃষ্টিসম্ভারে যে ভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল তার কোনো তুলনা নেই। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এ বছর বিভিন্ন সময়ে 'হারামণি' অনুষ্ঠানে 'হর্ষকানাড়া', 'কসৌলি ঝিঁঝিট', 'আনন্দী' প্রভৃতি রাগের ওপর গান প্রচারিত হয়। ১৯৪১-৪২ সালে প্রচারিত বিভিন্ন 'হারামণি' অনুষ্ঠানে দরবারী টোড়ি, রবিকোষ, বিষ্ণুভৈরব, শ্যামকল্যাণ, দেশ-গৌড়, রারায়ণী, চাঁদনী কেদারা, কুকুভ, গৌরী (পূরবী), গৌরী (ভেঁরো) রাগে নজরুলের গান প্রচারিত হয় তবে এখন পর্যন্ত 'হারামণি' পর্যায়ের সাত-আটটি অনুষ্ঠানের গান লুপ্ত বা সনাক্তকরণের অভাবে অজ্ঞাত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বেতার থেকে আরো প্রচারিত হয়েছিল নজরুল-রচিত গীতি-আলেখ্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক 'কলহ' এবং 'ঈদউজ্জোহা'। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের নজরুলের আরো যেসব গীতিবিচিত্রা কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয় তার মধ্যে ছিল কীর্তন পদাবলির অনুষ্ঠান 'রূপানুরাগ', 'হারামণি' অনুষ্ঠানে রাগ 'বসন্ত পঞ্চম', দোলউৎসব-উপলক্ষে 'আবীর কুমকুম', 'হারামণি' অনুষ্ঠানে 'নীলাম্বরী' রাগ 'ছন্দিতা', 'পঞ্চাঙ্গনা', 'শারদশ্রী', 'হারমণি'তে 'দত্তরঞ্জনী রাগ', 'প্রহর পরিচায়িকা'। নজরুল তাঁর 'যাম যোজনার কড়ি মা' এবং 'প্রহর পরিচারিকা' অনুষ্ঠানদুটিতে ললিত, টৌড়ি, গৌড় সারঙ্গ, মুলতানি, পূরবী' ছায়ানট (কল্যাণ অঙ্গের), বেহাগ ও পরজ এই আটটি রাগকে আটটি প্রহরের পরিচায়করূপে পরিবেশন করেছিলেন। শুধু সংগীত বা গীতি-বিচিত্রা নয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার দিন প্রচারিত পবিত্র কোরআন শরিফ পাঠ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অনুষ্ঠানেও নজরুল মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঐ বছর বেতারে নজরুলের একটি কথিকা প্রচারিত হয়। বেতার-অনুষ্ঠানে নজরুলের সংগীত-প্রতিভার বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে। বেতারে ঐ সময়ে প্রচারিত নজরুলের প্রতিটি গানের সুর নজরুলের নিজের। গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের সুস্থাবস্থায় তাঁর রচিত ও সুরোরোপিত অন্তত দশটি গানের সুর পরিবর্তন করিয়ে অন্য সরকারের সুরে রেকর্ড করানো হয়েছিল,

Dhaka University Institutional Repository

যে, তাঁর রচিত গান কেবল তাঁরই সুরে প্রচারিত হবে, অন্য কোনো সুরকারের সুরে নয়। কবির সুস্থাবস্থার শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অন্নপূর্ণা* নাটকের অধিকাংশ গানের রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। এ নাটকে ১৭টির মধ্যে ১৪টি ছিল 'নজরুল-সংগীত'। একই বছর মে মাসে মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চস্থ আশুতোষ সান্যালের *বন্দিনী* নাটকের অধিকাংশ গানের সুর সংযোজনা করেছিলেন নজরুল, তবে নজরুল রচিত একটি ছাড়া সব গানের রচয়িতা ছিলেন নাট্যকার নিজে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *হরপার্বতী* নাটকের ১১টি গানেরই রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মিনার্ভায় মঞ্চস্থ দেবেন্দ্রনাথ রাহা-রচিত *অর্জুনবিজয়* নাটকে ১১টি গানেরই রচয়িতা ও সুর সংযোজক ছিলেন নজরুল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের *ব্ল্যাক আউট* নাটকের ১৪টি গানের মধ্যে নজরুলের দুটি গান ছিল, তবে সুরকার ছিলেন রঞ্জিৎ রায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত কে.বি পিকচার্স-প্রযোজিত *নন্দিনী* ছায়াছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, এই ছবিতে নজরুলের একটি বিখ্যাত গান 'চোখ গেল পাখীরে' ছিল শচীন দেব বর্মণের নেপথ্য কণ্ঠে। নজরুল আর যেসব ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেগুলো *চৌরঙ্গী* বাংলা ও হিন্দী, *দিকশূল* এবং অভিনয় নয় যথাক্রমে ১৯৪২, ৪৩ ও ৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত। নজরুল *চৌরঙ্গীর* সংগীত-পরিচালক এবং ৮টি গানের রচয়িতা ও সুর সংযোজক ছিলেন। (Nazrul Islam[7], 2011 : 15-17 অবলম্বনে)

১০

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক দৈনিক *নবযুগ* পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ করেন। নবপর্যায় দৈনিক *নবযুগ*-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, অর্থাৎ সুস্থ জীবনের শেষ পর্বে নজরুল পুনরায় সাংবাদিক জীবনে ফিরে আসেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নজরুল *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকাতেই সাংবাদিক-জীবন শুরু করেছিলেন। নজরুল কলকাতায় তাঁর সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেছিলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটের কার্যালয়ে অবস্থান করে, সুস্থ জীবনের শেষের দিকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ও ৬ এপ্রিল তিনি সেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতিত্ব এবং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ 'যদি আর বাঁশি না বাজে' প্রদান করেছিলেন। এই ভাষণটিকে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগৎ থেকে তাঁর বিদায় নেবার ভাষণও বলা যেতে পারে। এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> যদি আর বাঁশি না বাজে, আমি কবি বলে বলছি নে, আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুণ আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি- আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম। হিন্দু-মুসলমানে, দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তুপের মত জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। ...আমায় ক্ষমা করবেন- মনে করবেন- পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত- আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ১২৭)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের ঐ ভাষণের চার মাস পর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকাহত নজরুল তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করেছিলেন 'রবিহারা' এবং 'সালাম অস্তরবি' কবিতা এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' শোকসংগীত। 'রবিহারা' কবিতা নজরুল স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন কলকাতা বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে। আর 'ঘুমাইতে দাও' গানটি কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে স্বকণ্ঠে গেয়েছিলেন বেতার ও গ্রামোফোন রেকর্ডে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যেই নজরুল নিজেও অসুস্থ এবং ক্রমশ নির্বাক হয়ে পড়েন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪টি বছর কবির কেটেছে এই অসহনীয় নির্বাক জীবন।

১১

কবি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে চিকিৎসা করেন ডাঃ ডি. এল. সরকার, কিন্তু সপ্তাহখানেকের চিকিৎসায় কোনো উন্নতি হয় নি, কবির হাতের কম্পন এবং জিহ্বার আড়ষ্টতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই কবিকে সপরিবারে মধুপুর নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি ডাঃ সরকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীন ছিলেন কিন্তু দুমাস মধুপুরে চিকিৎসায় কোনো ফল হয় নি। তারপর নজরুলকে চিকিৎসা করেন রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। কবিরাজী চিকিৎসায় প্রথমদিকে কিছু সুফল পাওয়া গেলেও কিছুদিনের মধ্যে কবির মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নজরুলকে ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে এবং ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর তত্ত্বাবধানে কলকাতা লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়। লুম্বিনী পার্কে নজরুল চার মাস ছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থার কোনো তারতম্য হয় নি। নজরুল অসুস্থ হবার পর দশটি বছর কলকাতায় ক্রমবর্ধমান বিস্মৃত জীবন যাপন করেন, কেবল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' প্রদান করা হয়। কলকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের উদ্যোগে গঠিত 'নজরুল-নিরাময়-সমিতি' (কাজি আবদুল ওদুদ সাধারণ সম্পাদক) কবি ও কবিপত্নীকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই রাঁচি মেন্টাল হসপিটালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে কবি মেজর ডেভিসের চিকিৎসাধীন ছিলেন চারমাস, কিন্তু সেখানেও সঠিক রোগনির্ণয় সম্ভব হয় নি। এরপর 'নজরুল-নিরাময়-সমিতি'র উদ্যোগে কবিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন নজরুল-নিরাময়-সমিতির রবিউদ্দিন আহমদ, নজরুল, প্রমীলা ও অনিরুদ্ধকে নিয়ে জাহাজযোগে লন্ডন পৌঁছান। লন্ডনে ডাঃ ইউলিয়ম সার্জেন্টের প্রাথমিক পরীক্ষায় বলা হয় যে কবির আরোগ্যলাভের বিশেষ আশা নেই, তবে চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অপরদুজন সদস্য ডাঃ এ. ই. বেটন এবং স্যার রাসেল ব্রেণ ভিন্নমত পোষণ করেন। স্যার রাসেলের মতে কবির মস্তিষ্কের সেল এতটা নষ্ট হয়ে গেছে যে তা আরোগ্যের বাইরে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। ডাঃ ইউলি ম্যাককিক কবির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সুপারিশ করেন, ডাঃ ব্রেণ তার বিরোধী ছিলেন। লন্ডনের বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে একমত হন যে, কবির প্রাথমিক চিকিৎসা ছিল অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ। কবিকে অত:পর ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাঃ হানস্ হফের চিকিৎসাধীন রাখা হয়। তিনিও মত দেন যে কবির ভাল হবার সম্ভাবনা নেই। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর কবিকে সপরিবারে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। বাকি জীবন নজরুলের ঐ অবস্থাতেই কাটে। কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল অসুস্থ হয়েছিলেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে, পরের তেইশ বছর অবশ নিম্নাঙ্গ নিয়ে প্রমীলাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়, তবে তার দেহের ওপরের ভাগ সুস্থই ছিল এবং বিছানা-বন্দিনী প্রমীলা সংসার চালিয়েছেন, স্বামীর সেবা করেছেন। প্রমীলা নজরুল শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন ৫৪ বছর বয়সে (জন্ম মে ১৯০৮)। প্রমীলার ইচ্ছা-অনুযায়ী তাঁকে স্বামীর জন্মভূমি চুরুলিয়ায় সমাহিত করা হয়। কবিপুত্র কাজি অনিরুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি ৪৩ বৎসর বয়সে আর কাজি সব্যসাচীর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ৫০ বছর বয়সে।

১২

সুস্থাবস্থায় নজরুল শেষবার ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার কবিকে প্রদেয় পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মাসিক বৃত্তিপ্রদান অক্ষুণ্ন রাখেন। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত-সফরে কলকাতা গেলে কবির বাসস্থানে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার কবিকে বাংলাদেশে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে বাংলাদেশ বিমানে কবিকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনয়ন করা হয় এবং তেজগাঁ বিমানবন্দরে এক বিশাল জনতা কবিকে গভীর আবেগময় অভ্যর্থনা ও বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। কবিকে বিমান-বন্দর থেকে ধানমণ্ডী ২৮ নং সড়কে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কবিভবনে (বর্তমানে নজরুল ইনস্টিটিউট) নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই কবিভবনে গিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ঢাকায় কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখা হয়। কবি ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত থাকতো প্রতিদিন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে বাংলাদেশে নজরুলের উপস্থিতিতে প্রথম 'নজরুল-জয়ন্তী' উদযাপিত হয় মহাসমারোহে কবির ৭৩তম জন্ম বার্ষিকীতে। ঢাকায় কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১ ফেব্রুয়ারিতে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই থেকে চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য নজরুলকে পি.জি. হাসপাতালের ১১৭ নং কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত মোট এক বছর এক মাস আট দিন পি.জি. হাসপাতালের কেবিনটিই ছিল নজরুলের জীবনের শেষ আবাস। পি.জি. হাসপাতালে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তাঁর শরীরে পানি দেখা দেয়। ২৭ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে তাঁর দেহে উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। ২৮ আগস্ট শনিবার সকালের পর থেকে তাঁর উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯ আগস্ট রবিবার সকালে তাঁর দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকরূপে বর্ধিত হয় এবং তা ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয়, সাক্‌শনের সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করারও চেষ্টা চলে। শেষ চেষ্টা হিসেবে কবির শরীর স্পঞ্জ করানো হয়, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের (১২ ভাদ্র ১৩৮৩) সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে।

বেতার ও টেলিভিশনে নজরুলের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র দেশ-বিদেশ এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর কোটি কোটি বাংলাভাষীর জন্য নজরুলের দৈহিক উপস্থিতিও ছিল অনুপ্রেরণার উৎস ও গৌরবের বিষয়। তাঁর তিরোধানে বাঙালি মাত্রেই গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেমে যায়। ঢাকায় অগণিত মানুষ ছুটে যায় পি.জি. হাসপাতালে কবিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখার জন্য– সবার চোখে পানি। কবিকে শেষ দেখার সুযোগ দেবার জন্য বেলা এগারটার দিকে তাঁর মরদেহ কেবিন থেকে বের করে

Dhaka University Institutional Repository

আউটডোরের দোতলায় মঞ্চে স্থাপন করা হয়, কিন্তু জনতার ভিড়ে সে স্থানটি অপ্রতুল বিবেচিত হওয়ায় দুপুর দুটোর দিকে কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখ-প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়। মরদেহ অতিক্রম করে যেতে থাকে হাজার হাজার নর, নারী, শিশু, ফুলে ফুলে ঢেকে যায় কবির মরদেহ। বিকেল সাড়ে চারটায় রমনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নামাযে জানাযার জন্য রৌদ্রোজ্জ্বল শরতের অপরাহ্নে লাখো মানুষের ঢল নামে। বিকেল পাঁচটায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। নজরুল গেয়েছিলেন, 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই'। কবি চিরনিদ্রায় শায়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় মসজিদ-প্রাঙ্গণে, সম্মুখের ঐতিহাসিক রাজপথটি এখন 'কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ'।

নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রতিবছর তাঁর জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় পর্যায়ে। কবির স্মৃতির প্রতি দেশব্যাপী নিবেদিত হয় দেশবাসীর হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর কবর ছেয়ে যায় পুস্পস্তবকে। বিদ্রোহী কবি ও বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের মানুষের কাছে জাতীয় কবিরূপে আদৃত। কারণ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাসে তিনিই এখন পর্যন্ত সৃজনশীল প্রতিভা। বিশ শতকের প্রথমাংশ বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা এবং দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কারের শিকার। সেই অন্ধকার ও হতাশাচ্ছন্ন যুগে কাজী নজরুল ইসলামের মতো সৃজনশীল মৌলিক প্রতিভা ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের উদ্ভব পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। বাঙালি মুসলমান হীনমন্যতা মুক্ত হয়ে আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পায়। বাঙালি মুসলমান সমাজে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং সমাজ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। কাজী নজরুল ইসলামের যাদুকরী প্রতিভার সংস্পর্শে অতি অল্প সময়ে ঐ অসম্ভব কর্মটি সম্ভবপর হয়েছিল। তাই নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজ তথা বাংলাদেশের মানুষের ঋণের কোনো শেষ নেই।

বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তশালী সম্পর্কে তাঁর প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিজে যুদ্ধে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ও যুদ্ধোত্তর বাংলার বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপ ও অতি কাছের থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্রগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এ জন্যই যুদ্ধোত্তর বাংলার ভিতর ও বাইরের রূপ নজরুল সৃষ্টির মাঝে স্মরণীয়ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে নজরুল বলেন :

> জেল থেকে বেড়িয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাঙলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাঙলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাঙলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হল, এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দররূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে। (নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৩৩)

বাঙালি মুসলমান সমাজের নবজাগরণের অগ্রদূত কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্যই সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি করেন নি। বাংলার দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তাঁর সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

সমানভাবে আদৃত। কারণ বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নজরুলই প্রথম ও একমাত্র সৃজনশীল প্রতিভা যিনি তাঁর সৃষ্টি-কর্মে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন। নজরুলের কবিতা ও গানে হিন্দু ও মুসলমানগণের পুরাণ এবং ইতিহাস যেমন সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অপর কোনো কবি বা গীতিকারের সৃষ্টিকর্মে তা হয় নি। ফলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে বাংলার মুসলমান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি বলে ঘোষণা করেন। বর্তমান যুগের সবচেয়ে সক্রিয়, প্রাণবন্ত ও যুগধর্মী কবি ও সংগীতকর্মী হিসাবে স্বীকৃত কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সমস্যা ও সংকট স্বীয় সৃষ্টিকর্মে তুলে ধরেছেন। 'জনসমাজের আশা-আকাঙ্খা ও বেদনা-নৈরাশ্যের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিলেন বলেই দেশ তাঁকে জাতীয় চারণ কবির মর্যাদা দিয়েছে।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ২৬) কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি, কারণ বাংলার সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ তিনি। সেজন্য শুধু বাংলাদেশের নন, বাঙালির জাতীয় কবি, নজরুলের চেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে আজও জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে নজরুলের অমর বাণী- 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' চিরস্মরণীয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীন: *ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, প্রকাশকাল, জুলাই, ১৯৯৮।

২. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার : *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জপাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারী ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৩. গোস্বামী, করুণাময় : *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৯৬/ মার্চ ১৯৯০, বা/এ-২৩৭৮।

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৫. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৬. নজরুল ইসলাম, কাজী, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

৭. Nazrul Islam, Kazi: *The Rebel Poet*, A Pictorial Biography, Published in June 2011, Published by Nazrul Institute, Kabi Bhabon, House 330-B, Road 28 (old), Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209

৮. নূরউল ইসলাম, মুস্তফা:*সমকালে নজরুল ইসলাম*, ১৯২০-১৯৫০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ/ ১৩৯০, নভেম্বর, ১৯৮৩; প্রকাশনা নং বা.শি.এ. ২৪।

৯. মোদাব্বের, মোহাম্মদ : *নজরুল ইসলাম*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জীবনী সিরিজ ২, তৃতীয় মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪০০, আগষ্ট ১৯৯৩, বাশিশুএ-২৪১।

১০. রায়, ডঃ কৃষ্ণগোপাল : *কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশিকা : শ্রীমতি শিখা সরকার, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৮,

১১. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ: দিওয়ানে হাফিজ, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিচিতি

ফারসি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা এবং উন্নত সাহিত্য। আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্যে তিক্ত-মধুর বহু ঘটনা নিয়ে ইরানের ইতিহাস। ইরানিগণ দীর্ঘকাল মানুষের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালিয়েছেন এবং তাদের ইতিহাসে জুলুম, নির্যাতন, অবিচার, হত্যাকাণ্ড এবং বিভীষিকার আশ্রয় রয়েছে। অন্যদিকে যাঁরা মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করেছেন, ইনসাফ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছেন, মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক, রোম, আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ইরানীয় ভূখণ্ডের এ ভাষাকে ফারসি বলে অভিহিত করতেন এবং এ ভূখণ্ড তাইগ্রীস থেকে সিন্ধু উপত্যকা এবং কাস্পীয়ান সাগর ও অক্সাস থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্য এ বিস্তৃত ভূখণ্ডের অংশবিশেষ।

ইরানে মোগল শাসন চলাকালে 'ইল্ কাজার' নামে একশ্রেণির যাযাবর জনগোষ্ঠী ইরানে আসে এবং আর্মেনিয়া এলাকায় বসবাস শুরু করে। শাহ্ ইসমাইল সাফাভী কর্তৃক ইরানে সাফাভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে[১] বিভিন্ন যাযাবর গোত্র তাঁকে সহায়তা করে; 'ইল্ কাজার' ছিল তাদের অন্যতম। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ১১৭৪ ফারসি সাল) তেহরানে আগা মোহাম্মদ খানের অভিষেকের মধ্য দিয়ে ইরানে কাজার বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কাজার বংশ থেকে পরম্পরায় সাত জন শাহ ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আগা মোহাম্মদ খান (শাসনকাল ১২১০-১২১১ হিজরি) এবং সর্বশেষ আহ্মাদ শাহ[২]।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের আবর্তন-বিবর্তনের সঙ্গে বহু রাজশক্তির উত্থান-পতন জড়িয়ে রয়েছে। যেমন সাসানীয় (২২৮-৬৪১ খ্রি.), আব্বাসীয় (৬৪১-৮৭৯ খ্রি.), সাফারী (৮৮০ -৯০১ খ্রি.), সামানীয় (৯০১- ৯৯৮ খ্রি.), গজনবী (৯৯৮- ১০৬০ খ্রি.), সালজুক (১০৬০-১১৯৩ খ্রি.), আতাবেগ (১১৯৪-১২২৫ খ্রি.), মোংগলীয় (১২২৬-১৩৩৫ খ্রি.), মোজাফফরীয় (১৩৩৬-১৩৮৭ খ্রি.), তৈমুরীয় (১৩৮৭-১৪৫০ খ্রি.), সাফাভী (১৪৫১-১৭৩৬ খ্রি.), নাদিরশাহ প্রবর্তিত শাসন (১৭৩৬-১৭৬০ খ্রি.), জান্দীয় (১৭৬০- ১৭৯৪ খ্রি.), কাজার (১৭৯৪-১৮৮৬ খ্রি.) ও তার পরবর্তী শাহদের শাসন এবং ইরানে হযরত ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান শাসনকাল পর্যন্ত। প্রত্যেকটি রাজশক্তি ও শাসনের সঙ্গে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যোগ নিবিড় এবং রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ উভয়ই এর সঙ্গে জড়িত। (আবদুস্ সাত্তার[৩], ১৯৮৭ : প্রথম সংস্করণের নিবেদন)

১

বাংলা ভাষায় ছয়শহস্রাধিক আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে। অধিকাংশ আরবি শব্দগুলো এসেছে ফারসির মাধ্যমে। ইরানের অধিবাসীগণ আর্য বংশোদ্ভূত ছিলো। এঁরা খ্রিস্টপূর্ব চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বসবাসযোগ্য ভূমির সন্ধানে 'সামির' এলাকা থেকে ইরানের দিকে যাত্রা করেছিল। (মকবুল বেগ[৪], ১৯৬৭ : ১৮)।

---

[১] সাফাভী রাজত্বকাল ১৫০১-১৭২২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯০৭-১১৩৫ হিজরি।

[২] সাংবিধানিক বিপ্লবের পর ১২ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর পিতা রেযা খান তাঁর নিকট থেকে সিংহাসন কেড়ে নেন। (ইরানের সমকালীন ইতিহাস[২], ১৯৯৬ : ২৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে এরা বর্তমান তাজিকিস্তানের অন্তর্গত সমরখন্দ ও বোখারা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলো। পরবর্তীকালে সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্থানাভাবের কারণে খৃ. পু. ১৫০০ থেকে ১২০০ সালে এদের একটি দল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এবং অপর দলটি ইরানে প্রবেশ করে। ইরানি দলটির একটি অংশ উত্তর ইরানে ক্যাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী উর্বর এলাকা মিডিয়ায়; অপর অংশ দক্ষিণ ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা 'ফার্‌স'-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অত:পর মিডিয়ায় 'আলমাদ রাজবংশ' এবং 'ফার্‌স' এ 'হাখামানশি' রাজবংশ নামে দুটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ফারস-এর 'হাখামানশি' রাজবংশ অধিকতর উন্নতি সাধন করে এবং মিডিয়া দখল করে নিজেদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। তখন থেকেই সমগ্র এলাকা 'ফার্‌স' নামে অভিহিত হয়। (মকবুল বেগ[৪], ১৯৬৭ : ৭৭)। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পাশ্চত্যের ইরান পারস্য নামেই পরিচিত ছিল। এর পর ইরানে বিভিন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ইরানি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কাছে দুটি ভাষাই প্রসিদ্ধ ছিলো– *প্রাচীন ফারসি এবং আভেস্থা*। আর্যরাও তখন এ *প্রাচীন ফারসি* ভাষাকেই মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে এ আর্যসমাজ সে ভাষার পরিবর্তন সাধন করে সংস্কৃতে রূপ দেন এবং এ সংস্কৃতেরই প্রথম ফলশ্রুতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ এবং ঋগ্বেদ।

ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে পৃথিবীতে যেসব ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলোর আদিরূপ কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একই পর্যায় বা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোষ বা ব্যাকরণে বিশেষ ঐক্য দেখা যায়, তাহলে সে ভাষাগুলোর মধ্যে বংশগত মৌলিক সম্পর্ক থাকতে বাধ্য– ভাষাবিদদের মতে ইহা ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্র। এ সুত্রানুযায়ী সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, আর্মানীয়, প্রাচীন শ্লাভিক, প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানিক, প্রাচীন কেলতিক ইত্যাদি ভাষাগুলো একটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। তাই এই ভাষা-গোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।

উপরিউক্ত ভাষাগুলোর বর্তমান বংশধর স্থানীয় ভাষাসমূহ ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও ইউরোপের মধ্যবর্তী এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান। যে আদিম মূল ভাষা হতে এ গোষ্ঠীর ভাষাগুলো উদ্ভুত হয়েছিল তার কোনো নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নি। তবে এ গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা হতে এ মুল ভাষার মোটামুটি রূপ যে কিরূপ ছিল তা অনুমান করা সম্ভব। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূলভাষা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এ গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছিল। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ৬) পরবর্তীতে ইহা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার আদিস্থান যে কোথায় ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সম্ভবত: মধ্য ইউরোপই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিদদের আদিস্থান। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ৬)

ইরানি ভাষার ইতিহাসের কয়েকটি স্তরের মধ্যে রয়েছে –১। প্রাচীন ইরানীয় (Old Iranian), আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে। ক) পূর্বী প্রাচীন ইরানীয় বা আবেস্তার ভাষা; খ) প্রাচীন পারসিক (Old Persian); ২। মধ্যযুগীয় ইরানীয় (Middle Iranian), আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ; ক) পূর্বী ইরানি উপভাষা। খ) মধ্য পারসিক বা পাহ্‌লবী (Middle Persian or Pahlavi Language); গ) সোগ্‌দীয়; ঘ) কৃষাণ, শক ও প্রাচীন খোতানী (Old Khotani); ৩। নব্য ইরানীয় (New Iranian), ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ক) পশ্‌তো (পূর্বী ইরানি জাত) খ) নব্য পারসিক বা ফারসি Modern Persian Language (ঈরানী); গ) ঘল্‌চা উপভাষা (Ghalchah Dialects) – মধ্য এশিয়ায়। ঘ) কুর্দী; ঙ) বলোচী; চ) ওস্‌সেতী (Ossetic)।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ফারসি ভাষার ইতিহাসের দুটি স্তর– ক) পুরাতন ফারসি (Classical Persian), আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৭০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত; খ) আধুনিক ফারসি (Modern Persian), আনুমানিক ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ৮-৯)

২

ইরানের প্রাচীন ভাষার দুটি রূপ *আবেস্তার ভাষা* ও *প্রাচীন পারসিক ভাষা*। যারথুষ্ট ছিলেন ইরানিদের প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী, ঋষি এবং ধর্মসংস্কারক। তাঁর জীবনকাল সঠিকভাবে যানা যায় নি। তবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি ইরানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইরানিদের মধ্যে প্রাচীনকালে যেসব ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সেগুলো *বেদ*-এর ন্যায় ইরানি পুরোহিতদের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত ছিল। ঋষি যারথুষ্ট তাঁর বিশিষ্ট মতবাদ, তাঁর উপাস্য পরমেশর 'আহুরমাজদা'কে উদ্দেশ্য করে লিখিত ব্যক্তিগত আত্মনিবেদন 'গাঁথা' বা কবিতা-ছন্দে প্রচার করেন। ইরানিদের প্রাচীন ধর্মবিষয়ক দেবতাদের স্তবস্তুতি ও অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্য এবং যারথুষ্ট রচিত গাঁথা সব একত্রিত করে *আবেস্তা* সংকলিত হয়। সাসানীয় বংশের সম্রাটগণ মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের রচনার অনেক কাল পরে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইহা সংকলন করেন। কিন্তু এর পূর্বেই প্রাচীন *আবেস্তা* সাহিত্যের অনেকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সংকলিত *আবেস্তা* এক বিরাট ধর্ম সাহিত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পাহলাবি ভাষায় গ্রন্থটির নাম 'অপিস্তক-উ-জান্দ (Apistak-u-Zand)' অর্থাৎ মূল লিখিত গ্রন্থ 'অপিস্তক' এবং ব্যাখ্যা বা টিকা 'জান্দ'। পরবর্তীতে ফারসি ভাষায় এই নামের রূপ দাঁড়ায় 'আবেস্তা-উ-জান্দ' (Avesta-u-Zand)'।

আভেস্তা ছিল ইরানের ধর্মীয় ভাষা। প্রাচীন ইরানি কবি ও দার্শনিক যারথুষ্ট *আবেস্তার* মাধ্যমে দার্শনিক মত প্রচার করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারা পৃথিবীর সকল দার্শনিককেই উদ্বুদ্ধ করে। এ যারতুশতীয় ধর্মমতের প্রবক্তা ইরানের আদি ধর্মগুরু 'যারতুশ্‌ত' প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ *আভেস্তা* এ ভাষায়ই লিখেছিলেন। এ *আভেস্তা* নাম থেকেই এ ভাষা *আভেস্তা* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উত্তর ইরানের মিডিয়া এলাকায় এ ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। 'যারতুশ্‌ত'-এর লিখিত *আভেস্তা* গ্রন্থে কল্পিত দেবতা 'আহুরমাজদা' এর স্তুতি, স্রষ্টার উপাসনা, ভাল কাজের প্রশংসা, মন্দ কাজের নিন্দা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন যে অংশ পাওয়া যায় তা 'গাঁথা' নামে পরিচিত। এ অংশে গজল ও কবিতার মাধ্যমে খোদার প্রশংসা ও বিভিন্ন নৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাচীন ইরানি সাহিত্য শুধু ভাবের গভীরতার জন্যই সমাদৃত নয়; বরং ভাষাবিদদের নিকট *আবেস্তার* ভাষা বিশেষ অমুল্য সম্পদ। পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে বৈদিক (সংস্কৃত) ভাষা অতি প্রাচীন বলে ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অধিক। আবেস্তীয় ভাষা ইরানের উত্তর বা ইরানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্য ভাষা। এর প্রাচীনতম অংশ হলো জরথুষ্ট রচিত কতকগুলো গাঁথার (কাব্যের) অংশ। পরবর্তীতে আবেস্তা সংকলনকালে বানান ও উচ্চারণের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। জরথুষ্টই প্রাচীন ইরানি কবি। তাঁর কাব্যের একটি অংশ:

অহ্য় ইয়স নেমংঘহা -Ahya yasa nemangha

উস্‌তানজসতো রফেদ্রহ্য়া - Ustanazasto rafedrahya

মন্যেউশ্‌ মজদা পৌরুভীম - Manyeush mazda pourvim

স্পেন্‌তহয়া অশ বীসপেং শ্যওথ্‌না - Spentahya Asha vispeng shyaothna

Dhaka University Institutional Repository

বনঘেউশ খ্রাতুম মনংহো -Vangheush khratum manangho

(ই) য় খশ্নেবীশ গেউশ্চ উরভানেম্ - Ya khshnevisha geushcha urvanem

(হে আমার প্রভু, অদৃশ্য দয়ালু, পরমাত্মা! হস্ত প্রসারিত করিয়া বিনয়ের সহিত তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি; অনুগ্রহ করিয়া এই আনন্দের মুহূর্তে আমাকে কর্মে সততা (এবং) সৎমনের জ্ঞান দান কর, যাহাতে জীবাত্মাতে আনন্দ বর্ধন করিতে পারি।)

(শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল৬, ১৩৬০ : ১১)

আবেস্তাগ্রন্থে কাল্পনিক প্রধান দেবতা ছিলো 'আহুরমাজদা'। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ষড়ঋতু প্রভৃতি সকলই দেবতা। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন,

> জরথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিয়া পূর্বে ঈরানীয় আর্যেরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ ও দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। যরথুশ্ত্রীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ঈরানীরা দেব- বিদ্বেষী হইয়া পড়িল এবং দেব শব্দের অর্থ দাঁড়াইল 'অপদেবতা'। ফলে আর্যদিগের অনেক প্রাচীন দেবতা অপদেবতা হইয়া গেল। তবে দুই একটি দেবতা তাহাদের আসন অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবেস্তায় 'দেব' শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যের ঠিক অনুরূপভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থ বিপর্যয় হইয়াছে।... আবেস্তায়ও দেখি ইশ্বরের নাম হইতেছে অহুর মজ্‌দা অর্থাৎ অসুর মেধা: 'মহৎ জ্ঞান স্বরূপ'। ... সম্ভবত: 'দেব' এবং 'অসুর' শব্দের এই অর্থ বিপর্যয়ের মধ্যে ঈরানীয় এবং ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্ম বিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। (উদ্বৃত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল৬, ১৩৬০ : ১২-১৩)

৩

অতি প্রাচীন যুগেই লিখার প্রচলন ছিল এবং প্রাচীন ঋষিগণ তাঁদের সব বক্তব্য লিখার উপযোগী গরুর চামড়া প্রস্তুত করে লিপিবদ্ধ করত। আবেস্তার অক্ষর ছিল ৪৪ টি এবং ইহা ডান দিক থেকে লেখা হত। সে প্রাচীন যুগে আরও এক প্রকারের লেখার প্রচলন ছিল– যাকে বানমুখ বা Cuneiform লিপি বলা হত। হাখামানশীয় সম্রাটগণ এ লিপি পর্বতের গাত্রে বা প্রস্তরের উপরিভাগে লিপিবদ্ধ করত। এ সম্রাটগণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। কুরুশ্ (Cyrus) হাখামানীশীয় রাজাদের প্রথম সম্রাট। দারীউস (Darius) আধুনিক ফারসি 'দারাব' (খ্রিস্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) ও তৎপুত্র খুষরসা (Khshayarsha) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাদের শিলালিপিও ধাতুলিপি হতে তাদের লিখিত ভাষা সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়। ইহাই প্রাচীন পারসিক ভাষা। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল৬, ১৩৬০ : ১৩)

প্রাচীন ফারসি ভাষা সাংকেতিক মিখ বা পেরেক আকৃতির চিহ্নবিশেষের মাধ্যমে লিখা হত। খৃ. পূ. ৫৫০ সালে হাখামানশিদের যুগে এ ভাষার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ইরানের প্রথম রাজধানী কেরমানের 'বিসতুন-পর্বত' 'তাখতে জামশিদ', 'নাকশে রোস্তম' ইত্যাদি শিলালিপিতে এ ভাষার নিদর্শনগুলো এখনও অক্ষত রয়েছে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে, তাতে বিভিন্ন বাদশার পরিচয়, শাসননীতি, অধ্যাদেশ, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ফারসি সম্পর্কে আবদুস সাত্তার বলেছেন,

> খৃস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে জরথুস্ত্র প্রবর্তিত পার্শী ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষার সঙ্গে ফারসী ভাষার সাযুজ্য রয়েছে বহুল পরিমাণে। আবেস্তা বা জেন্দাবেস্তা গ্রন্থের ভাষা পাহলাবি। প্রাচীন গ্রীক,

Dhaka University Institutional Repository

সিরীয় এবং সংস্কৃত ভাষার অবদানে পাহলাবি ভাষার সমৃদ্ধি ঘটলেও প্রাচীন ফারসী ভাষা ছিল পাহলাবি ভাষার চেয়েও প্রাচীন এবং উন্নত। (আবদুস্ সাত্তার[১], ১৯৮৭ : ১)

প্রাচীন পারসিক ছিল ইরানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ পার্‌স (পারস্য) প্রদেশের ভাষা। এ প্রদেশের হাখামানীশীয় বংশীয় সম্রাটদের প্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে তাঁদের মাতৃভাষা প্রাচীন পারসিক সমগ্র ইরানের রাজকার্যের ভাষায় পরিণত হয়। সে প্রাচীন সম্রাটের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও তাঁদের অনুশাসন-লিপি প্রস্তরগাত্রে আজও দেখা যায়। এতে তাঁদের প্রভু বা 'আহুরমাজদা'র প্রশংসা ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এসব অনুশাসন ও লিপির মধ্যে দারীউস (Darius) এর বিসুতন্ নামক স্থানের প্রস্তর গাত্রের লিপিই প্রসিদ্ধ। যেমন:

> আদম্ দারয়বহুশ্ খশায়থিয়া ভাজরকা খোসায়থিয়ানাম্ খসায়থিয়া পার্সৈও খসায়থিয়া দহিয়ুনাম ভিসতাসপাহিয়া পোশা আরসামাহিয়া নপা হাখামানিশীয়া।
>
> adam darayavahush khshayathiya vazarka khshayathiya-nam khshayathiya parsaiy khshayathiya dahyunam vishtaspahya pussa arshamahya napa hakhamanishiya
>
> (আমি এই দারীউস, শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজাদের রাজা, পারস্য প্রভৃতি রাজ্যের রাজাধিরাজ, গোযতাসবের পুত্র (ও) অরশাম হাখামানীশীয়র পৌত্র)

(শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ১৪)

হাখামানীশীয় সম্রাটগণ তাঁদের কয়েক শতাব্দীর রাজত্বকালে স্বীয় সাম্রাজ্যের গৌরবময় কীর্তিস্বরূপ ধর্ম, সভ্যতা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সনে ইসকনদর বা সেকেন্দর শাহ (Alexender the Great) আরবেলার যুদ্ধে ইরানিদের পরাজিত করে গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী তাঁর বংশধরগণ ইরান রাজত্ব করেন। আলেকজান্ডার প্রমত্ত অবস্থায় হাখামানীশীয়দের রাজধানী পারসিপলিস (Persepolis) পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গৌরবময় কীর্তিসমূহ প্রায় সবই নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ সনে আশকানী বংশের ষষ্ট সম্রাট মিথরিদাতেস (Mithridates) সেলুকিম রাজ্যের ধ্বংস করে পুনরায় পরথিয়ার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরথিয়ার সম্রাটগণ ক্রমে ক্রমে ইরানসহ অন্যান্য স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ১৫) এ পারস্য সম্রাটগণ হাখামানীশীয় সম্রাটদের ভাষা ও সাহিত্যের আবার প্রচলন করেন। কিন্তু পরথিয়ার সম্রাটদের ইতিহাস ঘন-অন্ধকারে আচ্ছন্ন; তাঁরা তাঁদের ভাষা ও সাহিত্যর কোনো প্রমাণ রেখে যেতে পারেন নি। এ যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস সাসানীয় বংশের সম্রাটদের রক্ষিত প্রস্তরলিপি ও বিভিন্ন প্রকার পুরাতন পুঁথির সাহায্যে কিছুটা জানা যায়।

সাসানীয় বংশের প্রথম সম্রাট 'অর্দশীর' ২২৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ পরথিয় সম্রাটকে পরাস্ত করে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অর্দশীর ছাড়া আরো কয়েকজন সম্রাটই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন–যেমন মহান শাহপুর (৩০৯-৩৭১), বাহরাম গোর ও ন্যায়পরায়ণ নৌশেরওয়ান (৫৩১-৫৭৯) এবং শেষ প্রসিদ্ধ সাসানীয় সম্রাট খসরু পারভেজ (৫৯০-৬২৮)। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ১৬)

আশকানিযুগে (খৃ. পূ. ২৪৯-২২৬) ইরানে পাহলাবি ভাষার উৎপত্তি হয়। এটি মূলত আভেস্তা ও প্রাচীন ফারসির বিবর্তিত রূপ। পরবর্তীতে সাসানিদের রাজত্বকালে (খৃ. পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ) এ ভাষার উচ্চারণ ও

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গিকে উৎকর্ষ সাধিত হয়। আশকানি ও সাসানিদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছর ব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রচলিত ছিল। আশকানি যুগে পাহলাবি ভাষায় বেশ কয়েকটি বই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। কিন্তু দু'চারটি ছাড়া সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। (সালিম নিছারি[৮], ১৩২৮ : ৪)

প্রাচীন ইরানের ইতিহাসে সাসানিদের রাজত্বকালকেই স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। এ যুগেই ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে। তাঁরাই প্রথমে গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান বইপত্র, 'পাহলাবি' ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। বিখ্যাত সাসানি সম্রাট 'নওশেরওয়ান' ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' পাহলাবি ভাষায় অনুবাদ করান। (সালিম নিছারি[৮], ১৩২৮ : ৭) পরবর্তীতে সাসানি যুগের অন্ধ কবি রোদাকি এর কাব্যনুবাদ করেছিলেন। পাহলাবি ভাষায় বেশ কিছু রম্য রচনা, ঘটনাপঞ্জি, ছোটগল্প, কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হয়েছিল। এগুলোর কিছু কিছু পরবর্তীতে ফারসি কবিরা ফারসি ভাষায় কাব্যানুবাদ করেছিলেন। *খসরু ও শিরিন, রোস্তমনামা, বাহরামনামা, ইসকান্দারনামা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও সাসানিযুগের *হাজার দাস্তান* এর ফারসি অনুবাদ থেকে আরবি ভাষায় *আলেফ-লাইলা ওয়া লাইলা* (হাজার এক রজনি) নামে অনূদিত হয়েছিল বলে অনেকে দাবি করেন (সালিম নিছারি[৮], ১৩২৮ : ৮) সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন ইরানিরা বিশেষত সাসানিযুগ মোটেই পশ্চাদপদ ছিল না; বরং পরবর্তীতে সাসানি ও গজনভি যুগে (৮৭৪-৯৯৮ খ্রি.) ফারসি সাহিত্য বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন তুলেছিল তার উৎস সাসানিযুগের পাহলাবি সাহিত্যসম্ভারেই লুকায়িত ছিল।

মধ্যযুগের এ ভাষার নাম হল পাহলাবি বা মধ্য পারসিক (Middle Persian) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এবং পালি-প্রাকৃতে পরিণত হয়েছিল। সেরূপ প্রাচীন পারসিক ভাষার বিবর্তনের ফলে ইহার প্রাকৃত স্থানীয় পাহলাবি ভাষার উৎপত্তি হয়। পাহলাবি ভাষা দুই ধরনের লিখার প্রচলন ছিল–এক প্রকারের লিপি যার প্রচলন শুধু প্রস্তরগাত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া সাসানীয়গণ অন্য এক প্রকারের লিপির প্রচলন করেন যার সাহায্যে পাহলাবি পুস্তকাদি লিখিত হয়েছিল। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ১৬)

আবেস্তার লেখা যদিও প্রায় অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু এই লিপি কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় আবেস্তার অক্ষরের ন্যায় ছিল, এবং ইহাও ডান থেকে আরম্ভ করে বাম দিকে লিখা হত। প্রাচীন পারসিক থেকে রূপান্তরিত পাহলাবি ভাষাতে দেখা যায়, রূপান্তরিত ভাষা হাখামানীশয়দের ভাষা থেকে শব্দের গঠন, অব্যয় ও অন্যান্য ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ব্যাপারে শক্তিশালী হয়েছে। যেমন নব্য ইরানি ভাষার অন্তর্গত ফারসি ভাষা পাহলাবি ভাষা থেকে রূপান্তরিত হয়ে আরো সহজ হয়েছে। পাহলাবি ভাষা হলো ফারসি ভাষার জননী, যেমন প্রাচীন পারসিক ভাষাকে বলা হয় পাহলাবি ভাষার জননী।

পাহলাবি ভাষায় পালি বা প্রাকৃত ভাষার ন্যায় ব্যাকরণের খুঁটিনাটির প্রভাব যথেষ্ট আছে। ফারসি ভাষা আপাতদৃষ্টিতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত বলে মনে হয় না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পাহলাবি ভাষা থেকেই উদ্ভুত। ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফ এবং এর ভাষা আরবির প্রভাবেই এরূপ প্রতীয়মান হয়। 'সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইরানীয় ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন কায়েম হয় তখন থেকেই ফারসী সাহিত্যের নবজন্মের সুত্রপাত হয় এবং কবি-সাহিত্যিকরাও নব উন্মাদনায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ফারসী সাহিত্যের আসল রূপ ইসলামি শাসন আমল থেকেই আরম্ভ হয় বলা চলে। (আবদুস্ সাত্তার[১], ১৯৮৭ : ১)

সাসানী সম্রাটগণ তাঁদের কীর্তিস্বরূপ বহু গ্রন্থরাজি রেখে গিয়েছেন। পুরাতন ফারসি ও আরবি গ্রন্থাদিতে বহু পাহলাবি সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল পুস্তকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পুস্তকাদির উল্লেখও দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়– যা সাসানী বংশীয়দের রাজত্বকালে বিশেষ করে খসরু-অনুশীরওয়ানের সময়ে লিখিত হয়েছিল। গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও বহু পুস্তক পাহলাবিতে অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়, ইসলাম আধিপত্যের প্রথম পর্যায়ে আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য বিষয়ের বহু পুস্তকাদি পাহলাবি থেকে পা-জেন্দ ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে, আরবদের আধিপত্য, লেখার রীতি ও অক্ষরের পরিবর্তন যেমন বাম থেকে ডান দিকে লেখার পদ্ধতি ও আরবি অক্ষরের প্রবর্তন ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সাসানীয়দের গৌরবময় কীর্তির অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে যা জরতুশত্র ধর্মাবলম্বীগণ নবম শতাব্দীতে ও তার পরবর্তী যুগে ভারতে বহন করে নিয়ে এনেছেন বা ইরান দেশেই কিছু কিছু রক্ষিত রয়েছে। (উদ্ধৃত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ১৫-২০)

আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে পাহলাবি থেকে আধুনিক ফারসি ভাষার উৎপত্তি ঘটে। ইংরেজির ন্যায় ফারসি ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণের বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে। শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদগারদ (৬৪৩-৬৫২ খ্রি.) এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ইরান দখলের পর ইরানের জনগণ বিপুলভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ফলে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কারণে সাসানিদের প্রচলিত পাহলাবি ভাষা আরবি ধারায় ধীরে ধীরে ফারসিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। পাহলাবি বর্ণমালা পরিবর্তন করে আরবি বর্ণমালায় পরিণত করা হয়। তবে কিছু কিছু পাহলাবি বর্ণের আরবি প্রতিবর্ণ না থাকায় আরবি 'বে' (ب) হরফের নিচে তিনটি নোক্তা লাগিয়ে 'পে' (پ), আবার 'জিম' (ج) এর পেটে তিনটি নোক্তা বসিয়ে 'চে' (چ) , 'যে' (ز) হরফের উপরে তিনটি নোক্তা বসিয়ে 'ঝে' (ژ), 'কাফ' (ک) হরফের উপর একটি টান দিয়ে 'গাফ' (گ) বর্ণ তৈরির মধ্য দিয়ে আরবি ভাষাবিদদের সহযোগিতায় আধুনিক ফারসি ভাষার রূপান্তর করা হয়। আধুনিক ফারসির উৎপত্তি এবং পাহলাবি সাহিত্য ইসলামি ধ্যান-ধারণার অনুকূল না হওয়ায় এর প্রতি জনগণের আকর্ষন কমে যায়। এভাবেই পাহলাবি ভাষার ন্যায় পাহলাবি সাহিত্যের বহু বই-পুস্তক বিলুপ্ত হয়ে যায়। (রেজা যাদেহ শাফাক[১০], ১৯৭৪ : ১০৪-১০৫)

৪

সাসানীয়গণ তাদের যেসব অমূল্য সাহিত্য সম্পদ কয়েক শতাব্দী নিজেদের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করেছেন, ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদগারদ আরবদের সাথে পরাজিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তাদের প্রায় সমস্ত গৌরব লুপ্ত হয়ে ইরান সাম্রাজ্য আরব খলিফাদের আধিপত্যে চলে যায়। যদিও খলিফাগণ ইরানে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু ইরানের প্রাদেশিক কর্তা হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের শাসনকাল পর্যন্ত (৭০০ খ্রি.) রাজকার্য ফারসি ভাষায় চলতে থাকে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম আরবি ভাষায় রাজকার্য পরিচালনার সূচনা করেন। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২২) সে সময়ে আরবরা ছিল বর্বর; রাজকার্য পরিচালনার কোনো যোগ্যতাই তাদের ছিল না। শাসনকার্য পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সাহায্য নিতে হত। আরবদের প্রধান গুণ ছিল একনিষ্ঠ দৃঢ়তা, শরীর ও মনের প্রবল শক্তি ও সাহস এবং ইসলামের প্রতি একান্ত বিশ্বাস। এ কয়েকটি কারণের জন্যই তারা চারিদিকে তাদের রাজ্য প্রসার করতে সক্ষম হন। ইসলাম ধর্ম যখন বিস্তার লাভ করল ইরানিগণও এতে আকৃষ্ট হলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইরানিগণ পবিত্র কোরআন তাদের আয়ত্বে আনার জন্য ও উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং অচিরেই সক্ষমতা লাভ করলেন। ইরানিগণ তাদের মার্জিত রুচি, বুদ্ধি ও জ্ঞানে আরবদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইরানিগণ তাদের পাহলাবি ভাষা পরিত্যাগ করে আরবি ভাষা শিক্ষা করতে

Dhaka University Institutional Repository

লাগলেন এবং বেশ কিছু আরবি পুস্তক রচনা করলেন। এদের মধ্যে প্রথমেই আব্দুল্লাহ বিন মুকাকাফার নাম করা যেতে পারে। তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং পাহলাবি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। 'কালীলা ও দিমনা' তিনিই প্রথম পাহলাবি থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইরানিগণ এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে লাগলেন। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২২-২৩)

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের পর প্রথম ৪ খলিফা রাজকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফাগণ (৬৬১-৭৪৯ খ্রি.) ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপ-জুলুম-নির্যাতন প্রিয় এবং নিষ্ঠুর। তাঁদের প্রায় কারোই ধর্মজ্ঞান ছিল না। পরাজিত ও অধীনস্থ ইরানিগণ তাদের কাছে লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। বিশেষকরে আহলে বাইত (আ.)গণের অনুসারিদেরকে কঠোরভাবে নির্যাতন করা হত। ফলে ইরানিগণ আবু মুসলিমের নেতৃত্বে 'আব্বাসী খলীফাদের (৭৫০-১২৫৮) প্রতিষ্ঠা করেন। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২৩) আব্বাসীয়দের রাজধানী ছিল বাগদাদ। ইরানিদের সাহায্যে আব্বাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কারণে ইরানিগণ রাজ দরবারে কিছুটা সম্মান ও অনুগ্রহ পেয়েছেন কিন্তু আব্বাসীগণও আহলে বাইতের অনুসারীদের প্রতি কঠোরতার কোনো দিক বাকি রাখেন নি। 'সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যখন আব্বাসীয় শাসন সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতদ্‌ঞ্চলের ভাষার কোনো পরিবর্তন তাঁরা করেন নি, যদিও তাদের শাসন সংক্রান্ত ভাষা ছিল আরবি। পাহলাবি ভাষার অনেক শব্দ যদিও আরবি ভাষায় সংমিশ্রিত ছিল তথাপি তাঁরা আরবি হরফে ফারসি ভাষার নবজন্ম দান করলেন এবং এই ভাষা অভিহিত হলো আধুনিক ফারসি ভাষা বা দারী ভাষারূপে। (আবদুস্ সাত্তার[১], ১৯৮৭ : ১)

আব্বাসীয় খলিফা মামুন ৮১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সাম্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন ইরানি বংশীয়। সেহেতু মামুনের স্বভাবতই ইরানিদের প্রতি কিছুটা পক্ষপাত ছিল। তাহির নামক একজন ইরানি মামুনের যুদ্ধে সহযোগিতা করার কারণে ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্বদেশীয় রাজ্যসমূহের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধতাবশত: শীঘ্রই তিনি গোপনে নিহত হন এবং তাঁর পুত্র তালহা খোরাসান নগরে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এভাবে প্রথম ইরানি স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এর নাম তাহেরীয় সাম্রাজ্য (৮২০-৮৭২ খ্রি.)।

তাহেরীয় সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাফারীয় সাম্রাজ্য (৮৮০-৯০১) প্রতিষ্ঠিত হয়। সাফারীয় সম্রাটগণ ইরাক, ফার্‌স, খোরাসান, সিস্তান ও তাবারিস্তানে রাজ্য শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইরানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রূপে ফারসি সাহিত্যেরও প্রতিষ্ঠা হয়। সামানীয় সাম্রাজ্য (৯০১-৯৯৮) স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফারসি সাহিত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামানীয়গণ ছিলেন প্রাচীন ইরান রাজবংশীয় এবং তাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাদের রাজধানী ছিল বোখারা শহরে। তাঁরা ফারসি ভাষাকে রাজভাষা বলে ঘোষণা করলেন। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২৪) সামানীয় সাম্রাজ্যের পর গজনবী সাম্রাজ্য (৯৯৮-১০৬০) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মাহমুদ ছিলেন এ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। এসব রাজবংশীয় প্রায় সকল সম্রাটই ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের রাজ দরবারে ফারসি কবিতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হত।

Dhaka University Institutional Repository

৫

ইরানে আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করার পর ইরানিদের প্রতি আরবরা ছিল খুবই কঠোর। আরবদের এ ইসলাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজ কার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। তারা ছিল বেদুইন (যাযাবর)- মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। আর ইরানিগণ বংশ পরম্পরায় রাজ্য শাসন করে এসেছেন। ইরানিগণ আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর আরবদের ধর্মের মূল কোরআন ও তার ভাষা আরবির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইরানে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ইরানিগণ তাদের ভাষার প্রতি মোটেই খেয়াল করেন নি, যদিও তাদের কথ্য ভাষা তখনও পাহলাবিই ছিল। যাতে ইরানি ধর্ম ও তাদের পাহলাবি সাহিত্যের প্রচার না হয় আরবগণও তার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। যেমন–

> ৮১৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মামুন ইদুল আযহা উপলক্ষে আরব বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গসহ রাজ দরবারে উপবিষ্ট হয়ে এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন, এখানে কেউ কি আছে যে ভালভাবে ফারসি ভাষা পড়িতে ও এই ভাষায় কবিতা লিখিতে পারে ? আব্বাস নামক একজন ২৫ বছরের যুবক বিনয়ের সাথে বলল, 'আমি ফারসি ভাষা বেশ ভালই জানি এবং এই ভাষায় কবিতাও লিখতে পারি।' মামুন ইহা শুনে তার প্রশংসা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার নিকট ইহা শিক্ষা করেছ ? যুবকটি উত্তর করিল, 'আমার পিতার নিকট'। তিনি আমাকে প্রত্যহ নির্জন প্রকোষ্ঠে ফারসি ভাষা শিখাতেন। খলীফা আদেশ করলেন, 'যদি ইহা সত্য হয়, তাহলে একটি কাসিদা আমার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। যুবক তৎক্ষণাৎ একটি কাগজের টুকরা নিয়ে তাতে একটি কাসিদা লিখলেন। ... মামুন তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। কেহ কিছু বলার সাহস পেল না। মামুন তখন বললেন, 'রাজনীতি অতি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, সাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। (উদ্ধৃত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২৬)

জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ সম্রাটগণ পুনরায় যখন নব পরিবর্তিত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করলেন, তখন তা মধ্য যুগের পাহলাবি ভাষা থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ইহা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু ভাল সকলই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফারসি ভাষার উপর আরবি ভাষার প্রভাব ব্যাপভাবে পরিলক্ষিত হয়। পাহলাবি ভাষাও আরবি ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তখন অনেক আরবি শব্দ ফারসি ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। আরবি ভাষা তখন ইরানিদের ভাষার উপর গভীরভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, কারণ বিগত কয়েক শত বছর ধরে ইরানিগণ আরবি ভাষার গভীর চর্চা করে এসেছিলেন। তখন ইরানের সব জ্ঞানী ব্যক্তি আরবি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা করতে গর্ব বোধ করতেন এবং জ্ঞানের সাধনাও আরবি ভাষাতেই করতেন। যখন ফারসি ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হল তখন নতুন পরিবর্তিত ফারসি ভাষা আরবি ভাষার প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হল। আরবি ভাষার প্রভাবের কারণ হল, ইরানিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর *কোরআনুল কারিম* ছাড়া অন্য কিছু পড়া ও ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা পাপ বলে মনে করত। এজন্যই তারা পবিত্র *কোরআন* এবং উহার ভাষা আরবিই সমগ্রভাবে আলোচনা করতেন।

নতুন পরিবর্তিত ফারসিতে ইরানিগণ পাহলাবির অক্ষর ত্যাগ করে আরবির অক্ষর গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া পাহলাবি ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের তুলনায় আরবি ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে বেশি শব্দ ছিল। সেজন্য ইরানিগণ অনেক শব্দ আরবি ভাষা থেকে গ্রহণ করেছেন যার তুল্য পাহলাবি শব্দ পাওয়া যায় নি। পাহলাবি ভাষা ব্যাপক চর্চা না হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে। ফেরদৌসি খাঁটি ফারসি শব্দ ব্যবহার দ্বারা তাঁর বিখ্যাত শাহনামা (প্রাচীন সম্রাটদের জীবন চরিত) রচনা করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাকে তুল্য খাঁটি ফারসি শব্দ না পাওয়ার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

অনেক স্থানে আরবি শব্দের ব্যবহার করতে হয়েছে। আরবি ভাষা ছাড়াও অনেক বিদেশি ভাষা, যেমন আর্মানীয়, গ্রীক ও লাতীন্ ভাষার প্রয়োগও আরবি ভাষার মধ্য দিয়ে বা সোজাসুজি ফারসিতে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন, আরবি ভাষার মধ্য দিয়ে ফারসিতে ব্যবহৃত কিছু ইউরোপীয় শব্দ, যথা– আবনুস (Ebony বা আবলুস কাঠ), চাচ্লীক্ (Catholic বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়), কইস্বর্ (Caesar, বা কাইজার বা সম্রাট), কানুন (canon বা নিয়ম) ইত্যাদি। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ২৭)

সামানি সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর গজনবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সুলতান মাহমুদ ইহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন যোদ্ধা ও দেশ বিজেতা হলেও বিশেষ সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি কবি ছিলেন এবং ফারসি কবিতাও লিখতেন। তাঁর ন্যায় গজনবীর পরবর্তী সম্রাট সুলতান মসউদ ইব্রাহিম ও বাহরাম শাহেরও ফারসি কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি বেশ অনুরাগ ছিল, কিন্তু কেহই সুলতান মাহমুদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর রাজ দরবারে প্রায় ৪০০ জন কবির সমাবেশ ছিল। উনসুরী (জন্ম-৯৬১ খ্রি, মৃত্যু-১০৪০ খ্রি.) ছিলেন তাঁর রাজদরবারের প্রধান কবি। তাছাড়া অন্যান্য কবির মধ্যে ফেরদৌসি, ফররূখী (মৃত্যু-১০৩৭ খ্রি.), মনুচেহরীর (মৃত্যু-১০৪০) নাম প্রসিদ্ধ।

সুলতান মাহমুদের সময় থেকেই সালজুকীদের প্রাধান্য পারস্যে বিস্তৃতি লাভ করে। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পরই তাঁর পুত্র মসউদকে পরাজিত করে সলজুকের দুই পৌত্র চঘরী ও তঘরীল্ ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে নিজেদের স্বাধীন রাজা ঘোষণা করে। সালজুকীয়গণ খোরাসানকে তাঁদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল করলেন এবং তাঁদের সাম্রাজ্য প্রায় এক শতাব্দীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সালজুকীয় সম্রাট মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২) ও সনজর (১০৯২-১১৫৬) এর নাম পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরনীয় থাকবে। সালজুকীয় সম্রাটদের প্রায় সকলই, বিশেষ করে মালিকশাহ্ ও সনজর নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ও উন্নতি করেছেন। সালজুকীয় সম্রাটদের আধিপত্য সময়ে ফারসি সাহিত্যের যত উন্নতি সাধন হয়েছে এমন আর কোনো সময়েই হয় নি। (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[৬], ১৩৬০ : ৫০)

৬

ইরানিগণ তাঁদের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করেছে। আরবি ভাষার মধ্যে লুপ্ত হতে দেয় নি। কারণ ইসলাম ধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম যেখানে ভাষা মৌল বিষয় নয়। তাই ইরানিরা ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবন ইসলামের মৌলনীতির পরিপন্থি বলে কখনোই চিন্তা করে নি। ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবন ইসলামের বিরোধিতার জন্য হলে ইরানিগণ আরবি ভাষার শব্দ গঠন (صرف), বাক্য গঠন (نحو), ব্যকরণগত বিষয় এবং অলংকারশাস্ত্র প্রণয়ন ও ভাষার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধিতে এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতো না। আরবগণ আরবি ভাষায় ইরানিদের ন্যায় ইসলামে অবদান রাখতে পারে নি। যদি আরবি ভাষা ও ইসলামের বিরোধিতার লক্ষেই ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়ে থাকে তাহলে ইরানিরা এত আরবি অভিধান রচনা, আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্র চর্চা না করে ফারসি অভিধান রচনা ও ফারসি ব্যাকরণবিধি প্রণয়নে মনোনিশে করত। তা না হলে অন্তত আরবি ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে ভূমিকা রাখা থেকে বিরত থাকত। তাই ইরানিদের ফারসি ভাষার প্রতি আগ্রহ ইসলাম ও আরবি ভাষার প্রতি বিদ্বেষের কারণে ছিল না এবং আরবিকে তাঁরা বিজাতীয় ভাষা হিসাবে মনে করত না। আরবিকে তাঁরা ইসলামের ভাষা হিসেবে জানত, আরবদের ভাষা হিসেবে নয়। যেহেতু ইসলাম সব মুসলমানের, তাই আরবি ভাষাকেও তারা সকল মুসলমানের ভাষা মনে করত। (মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারীর মতে,

> ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি ও অন্যান্য ভাষা কোন জাতি বা গোত্রের কিন্তু আরবি ভাষা শুধু একটি গ্রন্থের ভাষা। কোন জাতীর ভাষা নয়। ফারসি ভাষা একটি জাতীর সম্পদ, অসংখ্য মানুষ এ ভাষায় জীবন্ত ও টিকে থাকার পেছনে ভূমিকা রেখেছে। যদি তারা এ ভূমিকা না রাখত, তা হলেও এ ভাষা পৃথিবীতে টিকে থাকত। ফারসি ভাষা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থের ভাষাই নয়, নয় শুধু ফেরদৌসি, রোদাকী, নেজামী, সা'দী, মৌলাভী, রুমি, হাফিজের ভাষা; বরং সকলের ভাষা, কিন্তু আরবি কেবল একটি গ্রন্থের ভাষা। আর তা হলো আল-কোরআন। কোরআন এ ভাষার জীবনদাতা, সংরক্ষক ও অমরত্নদানকারী। এ ভাষার যত কীর্তি ও এতিহ্য স্থাপিত হয়েছে তা কোরআনের আলোকরশ্মির বিকিরণ হতেই এবং এ গ্রন্থের কারণেই। এ ভাষার যত বিধিবিধান তৈরি হয়েছে তাও এ গ্রন্থের কারণেই। যে কেউ এ ভাষায় অবদান রেখেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, কোরআনের স্বার্থেই তা করেছেন। দর্শন, এরফান, ইতিহাস, চিকিৎসা, গণিতশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও অন্য যে সকল গ্রন্থ এ ভাষায় অনূদিত হয়েছে তা কোরআনের সেবার মানসিকতাতেই হয়েছে। তাই আরবি ভাষা কোন জাতির নয়, বরং কোরআনের ভাষা। অনারবরা আরবি ভাষাকে তাদের ধর্মীয় ভাষা এবং মাতৃভাষাকে নিজেদের ভাষা বলে মনে করে। (মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৫৬-৫৭)

মাওলানা রুমী তাঁর *মাসনাভী* গ্রন্থের প্রসিদ্ধ কয়েকটি কবিতা আরবিতে লিখেছেন। যেমন :

أقتلونى أقتلونى يا ثقات

إنّ فى قتلى حيوة فى حيوة

উকতুলুনি উকতুলুনি ইয়া ছেকাত
ইন্না ফি কাতলি হেইওয়াতু ফি হেইওয়াত

আমাকে হত্যা কর, হত্য কর হে বিশ্বাসিগণ !
আমাকে হত্যার মাঝেই জীবনের জীবন।

(উদ্ধৃত, মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৫৬-৫৭)

মাওলানা রুমী পবিত্র কোরআনুল কারিমের আয়াত[১] অবলম্বনে আরবিতে লিখেছেন:

ايت انسوكم ذكرى بخوان   قدرت نسيان نهادنشان بدان

আ'য়াতে আনসাওয়কুম যিকরী বেখা'ন
কুদরাতে নেস্য়া'ন নেহা দান্‌শা'ন বেদা'ন

আনসাউকুম যিকরী আয়াতখানি পড়
ভুলিয়ে দেয়ার কি শক্তি তাদের, জেনে নাও

(রুমী[৯], ২০০৮ : ৫০০)

---

[১] 'তখন তোমরা (কাফেররা) তাদেরকে (আমার খাস বান্দাদের নিয়ে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছ। শেষ পর্যন্ত তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণের কথা ভুলিয়ে গিয়েছে। অথচ তোমরা তাদের নিয়ে হাসি মশকরা করতে।' (কোরআনুল কারিম[৩], সূরা মুমেনুন : ১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা রুমী আরেকটি কবিতায় বলেছেন,

ফারসি বল, যদিও আরবি আরো মধুর,
শত ভাষা হতে অধিক ভালবাসার।
(উদ্ধৃত, মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৫৭)

মাওলানা তাঁর এসব কবিতায় তাঁর মাতৃভাষা ফারসির ওপর আরবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ আরবি ইসলাম ও কোরআনের ভাষা। সা'দী তাঁর *গুলিস্তান* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তুর্কিস্তানের কাশগর নামক স্থানের এক যুবকের সঙ্গে কথোপকথনের কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ গল্পে যুবকটি 'যামাখশারী' রচিত আরবি ব্যাকরণ পড়ত। তার ভাষায় হাফিজ বলছেন, ফারসি সাধারণ মানুষের ভাষা, কিন্তু আরবি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাষা। শেখ সা'দী *গুলিস্তান* গ্রন্থে 'কাশগর জামে মসজিদের ছেলেটি' নামক গল্পে লিখেছেন:

> যে বছর মোহাম্মাদ খাওয়ারেয্ম্শাহ্[১] (রহ্.) কল্যাণ বিবেচনায় খাতা[২]-র সাথে সন্ধি করেন সে বছর আমি কাশগর[৩]-এর জামে মসজিদে হাযির হই। সেখানে একটি ছেলেকে দেখতে পাই, যেমন তার অঙ্গসৌষ্ঠব তেমনি তার সৌন্দর্য। এর মতো যারা তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে :
>
> معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت — جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
> دگر نه عزم سیاحت کند نه یادِ وطن — کسی که برسر کویت مجاوری آموخت
> من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و روش — ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت
>
> শিক্ষক তোমায় শিখিয়েছেন ধৃষ্টতা ও হৃদয়হরণ, নিষ্ঠুরতা, মান-অভিমান, রাগ আর জুলুম শিখিয়েছেন।
> সে আর যাবে না সফরে কোনো, স্বদেশে স্মরিবে না যেই জন শিখেছে তোমার গলির প্রতিবেশী হতে।
> হেন আকৃতি, প্রকৃতি, উচ্চতা আর চেহারার মানব দেখি নি'ক; যেন এসব শিখেছে পরী থেকে।
>
> তার হাতে ছিলো যামাখশারী[৪] লিখিত আরবি ব্যাকরণের ভূমিকা অংশ। সে পড়ছিলো : 'যায়েদ আমরকে মেরেছে, আর আমর ছিলো নির্যাতিত।' আমি বললাম : 'ওহে বালক! খাওয়ারেয্ম্ আর খাতা-র মধ্যে সন্ধি হয়েছে, তারপরও কি যায়েদ ও আমর আগের মতোই পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে?' সে হাসলো এবং আমার জন্মস্থান কোথায় জানতে চাইলো। বললাম : 'শীরাযের মাটিতে।' সে বললো : 'সা'দীর কিছু কথা আপনার কী জানা আছে?' বললাম :
>
> بُلیتُ بنَحْوِیٍّ یُصُولُ مُغَاضِبًا — عَلَیَّ کَزَیْدٍ فِی مُقَابَلَةِ الْعَمْرِو
> عَلَی جَرِّ ذَیْلٍ لَیْسَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ — وَ هَلْ یَسْتَقِیمُ الرَّفْعُ مِنْ عَامِلِ الْجَرِّ؟
>
> 'ব্যস্ত ছিলাম ব্যাকরণ পাঠে, ক্রুদ্ধভাবে পড়লো ঝাঁপিয়ে আমার ওপর, যেমন করে যায়েদ পড়ে আমরে দেখে
> ঘাগড়া তুলে পথ চলে যে, মোটেই মাথা তোলে না'ক সে 'জার্রের' কারক থেকে রাফ্' তুলে নেয়া সঠিক হবে কী গো?'

---

[১] সুলতান আলাউদ্দীন মোহাম্মাদ খাওয়ারেযমশাহ্ (রাজত্বকাল : হিজরি ৫৯৬ থেকে ৬১৭ সাল) যিনি চেঙ্গিয খানের নিকট পরাজিত হয়ে রাজত্ব হরান।

[২] মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তান সমন্বয়ে গঠিত তৎকালীন রাজ্য যা চেঙ্গিয খানের শাসনাধীন ছিলো।

[৩] পূর্ব তুর্কিস্তান (বর্তমানে চীনের সিনকিয়াং বা জিনিজিয়াং প্রদেশ)-এর প্রধান শহর।

[৪] বিখ্যাত মুফাসসির, 'তাফসিরে কাশশাফ'-এর রচয়িতা; জীবনকাল : হিজরি ৪৬৭ – ৫৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সে মুহূর্তের জন্য চিন্তায় ডুবে গেলো। তারপর বললো, 'এ বিষয়ে তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই ফারসি ভাষায় লেখা। আপনি তা থেকে পাঠ করলে কিছুটা বুঝতে পারবেন। 'লোকদের সাথে তাদের সমঝ ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলো।'[১] বললাম,

طبع تو را تا هوس نحو کرد — صورت عقل از دل ما محو کرد
ای دل عشاق به دام تو صید — ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید

'তোমার ঝোঁক যদিও রয়েছে ব্যাকরণ শেখার দিকে — তোমার চেহারা হৃদয় থেকে মোদের 'আকল্ দিয়েছে মুছে
শোনো ওহে প্রেমিকের হৃদয় তব ফাঁদে পড়েছে ধরা — তোমায় নিয়ে ব্যস্ত মোরা, তুমি আমর ও যায়েদ নিয়ে।'

সকালবেলা যখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তাকে বলা হয়েছিলো যে, অমুক ব্যক্তি হচ্ছেন সা'দী। সে দৌড়ে এলো, খেদমত করলো এবং আফসোস করলো আর বললো : 'আগে কেনো বলেন নি যে, 'আমিই সে-ই'! তাহলে আপনার মতো মহৎ ব্যক্তির আগমনের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ খেদমত করে ধন্য হতাম। বললাম, 'তোমার উপস্থিতিতে আমার ভিতর থেকে এ কথা বেরোতে চায় নি যে, আমি অমুক।' সে বললো, 'আপনি যদি এখানে আরো কয়েক দিন থাকেন এবং আপনার সেবা-যত্ন করে ধন্য হতে পারি – তাতে সমস্যা কী?' বললাম, 'এ ঘটনার কারণে পারছি না :

بزرگی دیدم اندر کوهساری — قناعت کرده از دنیا به غاری
چرا، گفتم، به شهر اندر نیایی؟ — که باری، بندی از دل بر گشایی
بگفت: آن جا پریرویان نلغزند — چو گل بسیار شد، پیلان بلغزند

'দেখিলাম বুযুর্গ এক রয়েছেন পাহাড়ের ওপরে — দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্ত হয়ে গুহার ভেতরে
বলিলাম আমি : আসেন না কেন শহরের মাঝে? — একবার এসে খুলুন না হৃদয়ের একটি বন্ধন।
বললেন :সেথা পরীমুখী সুন্দরীদের বাস — হাতীর পা-ও পিছলে যায় কাদা বেশী হলে।'

আমি এ কথা বলার পর আমরা পরস্পরের চেহারায় চুম্বন করে বিদায় নিলাম।

بوسه دادن به روی دوست چه سود؟ — هم در آن لحظه کردنش بدرود
سیب گویی وداع یاران کرد — روی از این نیمه سرخ و زان سو زرد

বন্ধুর চেহারাতে চুম্বন করে বলো কিবা লাভ — তা-ও যে সময় তাকে হয় জানাতে বিদায়?
আপেল যেন বন্ধুদের বিদায় জানালো, তাই — আধেক চেহারা লাল অনুরাগে, অর্ধেক বিষাদে হলুদ।

*

إنْ لَمْ اَمُتْ يَومَ الْوداعِ تَأسُّفاً — لا تَحْسَبُونی فِی الْمَوَدَّةِ مُنْصِفاً

যদি না মরে থাকি আফসোসে বিদায়ের দিনে — ভেবো না প্রেমেতে আমি ন্যায়ের ওপরে।

মাসউদী তাঁর 'আত তানবীহ্ ওয়াল আশরাফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'যায়েদ ইবনে সাবিত রাসূল (সা.) এর নির্দেশে মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে ফারসি, রোমীয়, কিবতি ও হাবাশি ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তিনি রাসূল (সা.)-এর অনুবাদকের ভূমিকা পালন করতেন।' ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (আ.) কখনও কখনও ফারসি ভাষায় কথা বলেছেন। (উদ্ধৃত, মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৫৮)

---

[১] এ বাক্যটি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর একটি হাদীসের অংশ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

যদি ফারসি ভাষা বিলুপ্ত হতো তবে আমরা ইসলামের অনেক মহামূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম, যেমন, *মাসনাভী*, *গুলিস্তান*, *দিওয়ানে হাফিজ* এবং এরূপ শত সহস্র স্মরণীয় নিদর্শন যার সর্বত্র ইসলাম ও কোরআনের জ্ঞান তরঙ্গায়িত তা পেতাম না এবং ইসলামের সঙ্গে ফারসি ভাষার এক বন্ধনও রচিত হতো না।

আরব জাতির আব্বাসীয় খলীফাগণ ইরানিদের চেয়ে অধিক ফারসির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাদের লক্ষ ছিল বনি উমাইয়্যার আরব জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার বিরুদ্ধে অনারবীয় রাজনৈতিক চিন্তার জাগরণ সৃষ্টি, এ জন্যই আরব জাতীয়তাবাদীরা বনি উমাইয়াদের প্রশংসা ও বনি আব্বাসের সমালোচনা করে থাকে। বনি আব্বাস বনি উমাইয়ার সঙ্গে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তাদের আরব জাতীয়তাবাদ এবং আরব ও অনারবের মধ্যে পার্থক্যের নীতির অবস্থান নেয়। এ লক্ষে তারা অনারব জাতিগুলোর স্বকীয় উপাদানসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত এবং প্রচেষ্টা চালাত যাতে করে তারা আরবদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

বনি আব্বাসের অন্যতম ভিত্তিদাতা ইবরাহীম ইমাম আবু মুসলিম খোরাসানীকে পত্র লিখে নির্দেশ দেন, 'এমন কাজ কর যাতে কোন ইরানিই আরবি ভাষায় কথা না বলে, যদি কাউকে আরবিতে কথা বলতে দেখ তবে তাকে শাস্তি দাও।' (মুতাহ্‌হারী[৫], ২০০৪ : ৫৯)

ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'আমার বিশ্বাস স্বয়ং আরবগণ প্রাচ্যে ফারসি ভাষার প্রসারে সাহায্য করে। এ বিষয়টি এ অঞ্চলের সুগদী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বিলুপ্তি ঘটায়।' (উদ্ধৃত, ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক সম্পর্ক, পৃ. ৫৯) *রাইহানাতুল আদাব* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> একশ' সত্তর হিজরিতে মামুন খোরাসানে এলে ঐ এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই প্রশংসা ও সেবার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। আবুল আব্বাস মুরুজী যিনি আরবি ও দারী (ফারসি ভাষার একটি রূপ) ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তিনি আরবি ও ফারসি ভাষার মিশ্রণে একটি প্রশংসা-কবিতা ও বক্তব্য রাখেন যা মামুনের বেশ পছন্দ হয়। তিনি খুশী হয়ে তাঁকে এক হাজার দিনার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন এবং তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের সম্মান লাভ করেন। এরপর হতে ফারসি ভাষীরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে; পূর্বে এরূপ বিন্যাস প্রত্যাখ্যাত হলেও এ সময় হতে প্রচলন লাভ করে। (মুতাহ্‌হারী[৫], ২০০৪ : ৫৯)

অনেক ইরানি মুসলমানই ফারসির প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করতেন না–যেমন তাহেরীয়ান, দাইলামি ও সামানিগণ নিখাঁদ ইরানি হওয়া সত্ত্বেও ফারসি ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের কোনো প্রচেষ্টা করেন নি, অথচ অ-ইরানি গজনভি শাসকগণ ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।

ফ্রয় তাঁর 'প্রাচীন ইরানি সভ্যতার উত্তরাধিকার' নামক গ্রন্থের ৪০৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'আমরা জানি তাহেরীয়ান তাঁর দরবারে আরবি ভাষা প্রচলনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পরবর্তীরা বিশেষ আরবির প্রচলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। (উদ্ধৃত, মুতাহ্‌হারী[৫], ২০০৪ : ৫৯)

সামানি শাসকরা ইরানি বংশোদ্ভুত হলেও কখনই তাদের রাজদরবারে ফারসির প্রচলন ছিল না এবং তাঁরা একে উৎসাহিত করতেন না। তাঁদের মন্ত্রী ও সভাসদরাও ফারসির প্রতি কোনো আগ্রহ দেখানেত না। দাইলামী ইরানি শিয়রারাও এরূপ ছিল। (মুতাহ্‌হারী[৫], ২০০৪ : ৬০) এর বিপরীতে তুর্কী বংশোদ্ভুত গজনবী গোঁড়া সুন্নী শাসকদের দরবারে ফারসি ভাষার চর্চা হতো। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে জাতিগত গোঁড়ামি নয়; বরং অন্য কোনো উপাদান ও কারণ ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সাফারিগণ ফারসির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এর কারণ আরবি ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নাকি ফারসির গোঁড়ামি-এ সম্পর্কে ফ্রয় বলেন, 'সাফারী বংশের শাসকদের রাজসভার কবিরা আধুনিক ফারসির প্রচলন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। কারণ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব আরবি জানতেন না। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি চাইতেন কবিতা এমন ভাষায় পড়া হোক যা তিনি বুঝতে পারেন।' (মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৬০)

সাফারীদের ফারসির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণ তাদের অজ্ঞতা। ফ্রয় সামানিদের শাসনামলে আরবি-ফারসি মিশ্রিত ভাষা প্রচলনের আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন,

> আরবিমিশ্রিয় আধুনিক ফারসি সাহিত্য ইসলাম বা আরবির প্রতি বিদ্বেষ থেকে সৃষ্টি হয় নি। যেসব কবিতায় যারথুস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা মানুষের যারথুস্ত্র ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কারণে নয়; বরং প্রচলিত সাহিত্যের ধারার কারণে ঘটেছিল। সে সময়ে অতীত নিয়ে আক্ষেপ করার বেশ প্রচলন ছিল। বিশেষত সংবেদনশীল কবিদের মধ্যে অতীতের অনুতাপ অধিকতর লক্ষনীয় ছিল, কিন্তু অতীতে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ তাঁদের ছিল না। এই নতুন ধারার ফারসি, আরবির পাশাপাশি অন্যতম ইসলামি ভাষায় পরিণত হয়েছিল। সন্দেহ নেই তখন ইসলাম আরবির ওপর নির্ভরতা হতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। কারণ ইসলাম অসংখ্য জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতা লাভ করেছিল এবং ইরান ইসলামি সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। (উদ্ধৃত, মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৬১)

ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের ৪০০ পৃষ্ঠায় ফারসি ভাষায় আরবি শব্দ ও পরিভাষার অনুপ্রবেশ ও এর প্রভাব নিয়ে 'ইরানে নতুন জীবনের শুরু' শিরোনামে যে আলোচনা করেছেন সেখানে বলেছেন,

> কোন কোন সংস্কৃতিতে ভাষা সমাজ ও ধর্ম অপেক্ষা সংরক্ষণে অধিক ভূমিকা রাখে। এ কথাটি ইরানি সংস্কৃতির জন্য খুবই সত্য। কারণ সাসানী আমলের প্রাচীন ফারসির সঙ্গে ইসলামি আমলের আধুনিক ফারসির সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো আধুনিক ফারসিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবি শব্দ ও পরিভাষার প্রবেশ যা একে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিশ্বজনীনতা দান করেছে যা প্রাচীন পাহলাবি ফারসিতে ছিল না। বাস্তবিকই আরবি ভাষা নতুন ফারসি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে গতিশীল সাহিত্য (বিশেষত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে) রচনার পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। মধ্যযুগের শেষ দিকে ফারসি কবিতা সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আধুনিক ফারসি ভিন্ন এক পথ ধরেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন আরবি ভাষায় দক্ষ একদল ইরানি মুসলমান। তাঁদের যেমন আরবি সাহিত্যে দক্ষতা ছিল তেমনি তাঁদের মাতৃভাষার প্রতিও ছিল তীব্র অনুরাগ। আধুনিক ফারসি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখা হতো এবং তা খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পূর্ব ইরানে উদ্ভাসিত ও সামানি রাজত্বের রাজধানী বোখারায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। (উদ্ধৃত, মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৬১)

ফ্রয় তাঁর গ্রন্থের ৪০২ পৃষ্ঠায় ফারসি কবিতায় আরবি ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন,

> এ ধরণের কবিতা গঠনে ফারসি পদ্ধতির সঙ্গে আরবি কর্তৃবাচক শব্দের মিশ্রণের আশ্রয় নেয়া হয় এবং বিভিন্ন মাত্রা ও ছন্দের কবিতা তৈরি করা হয়। এ ধরনের পদ্ধতির সবচেয়ে প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট নমুনা হলো কবি ফেরদৌসির 'শাহনামা' যা এরূপ সমধর্মী ছন্দে রচিত হয়েছিল। (মুতাহ্হারী[৫], ২০০৪ : ৬১)

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে ইরানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও ইরানিদের ভূমিকা রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মপ্রচারকগণের অধিকাংশই ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত। ইরান থেকে আগত এ সকল সুফি-দরবেশগণ ইসলামি বিশ্বের বাইরে অবস্থান গ্রহণ করে জনগণের মধ্যে ইসলামের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিতেন। তাদের সংস্পর্শে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তারা এসব ইরানি সুফি দরবেশদের হাতেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে কোরআন ও সুন্নাহর যাবতীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞান লাভ করেছেন।

ইরান ও ফারসি ভাষার বহু শতাব্দির ইতিহাসের পর ইরানের ইসলামি বিপ্লবের চারাগাছটি ইরানের সর্বোত্তম সন্তানদের রক্তে সিঞ্চিত ও ফলবর্তী হয়ে ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র বিশ্বের যে কোনো প্রান্তরে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাড়ানোর ঘোষণা দিলেন হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মতত্ত্ববিদগণ তাঁকে কাফের ফতোয়া দিতে থাকেন। বিভিন্ন দেশসমূহে ফারসি ভাষা রপ্তানির মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাদের এ ফতোয়া ভুল। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল ইসলামি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ঘোষণা করলেন,

> তোমাদের জন্য মোবারক হোক এ শাসন ব্যবস্থা যেখানে কোনো বংশীয় সাদা-কালো, তুর্কী-পারসিক-কুর্দী- বেলুচের পার্থক্য নেই। সকলেই এক সমান। পার্থক্য শুধু তাকওয়া আর চারিত্রিক গুণাবলি ও সৎকর্মের ভিত্তিতে। আর ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় নারী-পুরুষ কিংবা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। (উদ্ধৃত, নিউজলেটার[১১], মার্চ-এপ্রিল, ২০০৭ : ১২)

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. আবদুস্ সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ-১৩৯৪ / জুন-১৯৮৭, ই.ফা.বা. প্রকাশনাঃ ১১৭১/১।

২. *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, অনুবাদঃ নূর হোসেন মজিদী, রচনায় : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দফতরের ইতিহাস বিভাগ, প্রকাশকাল : শাবান-১৪১৭, পৌষ-১৪০৩, ডিসেম্বর-১৯৯৬, দেই-১৩৭৫, প্রকাশনায়-ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৩. *কোরআনুল কারিম*।

৪. মকবুল বেগ, *তারিখে ইরান*, ১ম খণ্ড, তেহরান, ১৯৬৭।

৫. মুর্তাজা মুতাহ্হারী, শহীদ আয়াতুল্লাহ : *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, প্রকাশকাল, মুহররম-১৪২৫, ফারভারদিন-১৩৮৩, চৈত্র-১৪১০, এপ্রিল-২০০৪।

৬. শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, Printed & Published by Ajit Ch. Ghosh, Sree Jagadish Press, Calcatta, ১ম সংস্করণ ১৩৬০।

৭. সা'দী শিরাজী, শেখ মুসলেহ উদ্দিন, *গুলিস্তানে সা'দী*, অনুবাদক, নূর হোসেন মজিদি, জুন ২০০৮ (অপ্রকাশিত)

৮. সালিম নিছারি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, তেহরান, ১৩২৮ সৌর বর্ষ।

৯. রুমী, মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ, *মসনবী শরীফ*, বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

১০. রেজা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদায়িাতে ইরান*, তেহরান, প্রকাশকাল ১৯৭৪।

১১. *নিউজলেটার*, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৭, কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

ক. কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ

খ. নজরুল-রবীন্দ্রনাথ ও পারস্যপ্রেম

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ

প্রভু, কবি নজরুল,
তাঁর বিপ্লবি জীবনে যদি করে থাকে কোন দোষ ভুল,
নিপীড়িত মানবের ব্যাথা উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
তাঁকে যে উন্মাদ করে তুলেছিল-
ভুল যদি করে থাকে সে যে উন্মাদ নজরুল,
মানব ব্যাথায় মানব দরদী নজরুল।
প্রভু তুমিত মাফ করিতে ভালবাস-
মাফ করো তার সব ভুল।
(জুল্‌ফিকার হায়দার[৫], ১৯৮৪ : ভূমিকা)

১

কাজী নজরুল ইসলাম স্বার্থপরতার সকল মোহ-মায়া ত্যাগ করে একটি মুমূর্ষ ঘুমন্ত জাতীকে জাগ্রত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, বিশাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে একাকী লড়াই করতে গিয়ে নিজের আকাশচুম্বী যৌবন শক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয় করে কালব্যাধির শিকার হয়েছেন তবু সেই দুর্জয় পশুশক্তির কাছে তিনি মাথানত করেন নি। তাঁর আগমন অভ্যুদয় ও সংগ্রাম ছাড়া উপমহাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব ছিল না ; শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের পক্ষে সংস্কৃতির রৌদ্রজ্জ্বল প্রাঙ্গন উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। মানুষের মনে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন, প্রেম জাগিয়েছেন, অত্যাচার, নির্যাতন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার দারুন শক্তি জুগিয়েছেন। তাই তিনি প্রায় হাতে ধরে একটি শিশু সমাজকে দাঁড়াতে, হাটতে ও ভাষা শিখতে সাহায্য করেছেন। তাঁকে যখন সংকীর্ণ, স্বার্থপর, গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় গোড়ামী মনোভাব নিয়ে বিচার করা হয় এবং ঈর্ষাতুর সমালোচকেরা সমালোচনা করেন, ইসলাম বিদ্বেষী বলে মনে করেন তখন সত্যিই হৃদয়ে ব্যথার কম্পন সৃষ্টি হয়। নজরুলের ভাষায় :

মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুন্‌তে পাই ॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাযীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুন্‌তে পাবে।
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই ॥

কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌,
সেই কোরান শুনে' যেন আমি পরান জুড়াই ॥

কত দরবেশ ফকির রে ভাই মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে ;
আমি তাদের সাথে কে'দে' কে'দে'
আল্লার নাম জপিতে চাই ॥
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ৪৮০)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাই তাঁর বুলেট ও বোমা– যা তিনি বিপ্লবীদের মতই নিশ্চিত শাস্তির কথা জেনেও সমানভাবে লিখে যেতে পশ্চাদপদ হন নি। ফলস্বরূপ বিপ্লবীদের মতোই তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, জেলের মধ্যে অনশন করতে হয়েছে, অন্যদিকে তাঁর একটির পর একটি গ্রন্থ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। *যুগবাণী, বিষেরবাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু* ইত্যাদি গ্রন্থগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে, আর *অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফণিমনসা, সর্বহারা* ও *রুদ্রমঙ্গল*- গ্রন্থ নিষেধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যদিও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয় নি।

এক সময় মুসলমানগণ পৃথিবীর সভ্যতায় উজ্জ্বল-মশাল জ্বালিয়েছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ অধিবিদ্যা, স্থাপত্যশিল্প, গণিত ও জোতিষশাস্ত্র সংগীত ও সাহিত্য অনাগত ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য যে প্রকল্প সৃষ্টি করেছিল যোড়শ শতাব্দীর পর সে আশার আকাশে ধীরে ধীরে অমাবস্যার করাঙ্গুলি সঞ্চারিত হতে থাকে। স্পেনে মুসলিম রাজত্বের অবসান হয়, তাতারদের হাতে বাগদাদের খলিফার পতন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তুর্কীর মোঘলসাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে মুসলিম গৌরবের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। এ অস্তমিত অবস্থায় দুঃখ সাগর পাড়ি দিয়ে মুসলমানগণ উনবিংশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে আবার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ইরান, আরব, তুরস্ক ও ভারতবর্ষে এ জাগরণের সাড়া দেখতে পাওয়া যায়। শোষক ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে চতুর্দিকে এক বিদ্রোহের সুর বাজতে থাকে। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে এক গৌরবময় সময়ে বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ছয়শত বছরেরও অধিক সময় ধরে রাস্ট্রীয় ভাষার আসনে অধিষ্ঠিত থাকে। এ রকম এক আধো অন্ধকার আধো আলোর ক্রান্তিকালে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। সুতরাং ইরান ও ফারসি ভাষা-সাহিত্যের জাগ্রত চেতনার অশ্ববল্গাটি হাতে নিয়ে নজরুল দুরন্ত গতিতে তার কাব্যের সাধনা চালিয়ে যান।

নজরুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশি-বিদেশি শোষকদের আত্মরক্ষার কূটচক্রে, ধর্মীয় গোড়ামীদের ফতোয়ার প্রেক্ষিতে যখন নজরুল এক বিতর্কিত কবি ব্যক্তিরূপে এবং অকবি হিসাবে পরিণত হলেন ; তখন তাঁর কবি শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, কালিদাস রায়, শাহাদৎ হোসেন, বুদ্ধদেব বসুর মত কবিবৃন্দ ; শরৎচন্দ্র, তারাসঙ্কর, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রমথনাথ বিশী, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদের মত সাহিত্যিকবৃন্দ ; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিজ্ঞানী, এগিয়ে আসেন রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ, আরো আসেন বিপনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং সুভাষচন্দ্র বসুরাও। সে কালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা, কণ্ঠশিল্পী ও সুর-শিল্পীরা এই শ্রেষ্ঠ সুরকার ও গীতিকারের পতাকাতলে নম্রশিরে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। জ্ঞান গোস্বামী, শচীন দেব বর্মন, জগন্ময় মিত্র, কে.মল্লিক, মৃণালকান্তি ঘোষ, আব্বাসউদ্দিন, বেচুদত্ত, মানবেন্দ্র, সতীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, সরযুবালা, হরিমতী, যুথিকা রায়, কানন বালা, ফিরোজা বেগমের মত প্রতিভাময়ী ও জনপ্রিয় গায়িকারা যেমন একদিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর নির্দেশকে মাথা পেতে নিয়েছেন–তেমনি সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জগৎ ঘটক, অনুপ ঘটক, কমলদাস গুপ্ত, ফিরোজা বেগম প্রমুখ সংগীত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী তাঁর শিষ্যত্ব মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি। এমন প্রতিভা 'রবীন্দ্রনাথের পরে কোনো একক প্রতিভার মধ্যে বাংলাদেশে এত বৈচিত্র্যময় প্রতিভার সংমিশ্রণ তাঁর পূর্বে ও পরে আর কারও মধ্যে ঘটতে দেখা যায় নি।'(জুল্‌ফিকার হায়দার[৫], ১৯৮৪ : ২)

কবি, প্রাবন্ধিক, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও বাদ্যকার ইত্যাদি গুণাবলি এক হয়ে মহৎ ব্যক্তিত্বে রূপায়িত হয়ে মহৎ নজরুলকে আরো মহোত্তম করে তুলেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের 'নতুন চাঁদ', 'জিজ্ঞাসা', ও 'অগ্নিবীণা' কবিতায় কিংবা মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করে অন্যান্য ইসলামি গান লিখার পিছনে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানগণ নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্য ভুলে, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান ভুলে যে নিষ্ক্রিয় অসাড় জাতিতে পরিণত হয়েছিল সেই মর্মবেদনাই তার ইসলামি গানের উদ্দেশ্য ছিল। সাম্যের মন্ত্র ভুলে মুসলমানদের শ্রেণিভেদে প্রত্যাবর্তন, ঐক্যের উপদেশ ভুলে ব্যক্তি স্বার্থচর্চায় অনৈক্যের মধ্যে উত্তরণ, মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তিকরণ, ঔদার্য ও শান্তির পথ ভুলে অশান্তির পথ অনুসরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগামী চিন্তার পথ ছেড়ে অনুষ্ঠান সর্বস্ব আচারের মধ্যে জাতীয় ভাবনাকে আবদ্ধকরণ নজরুল ইসলামকে ব্যথিত করেছিল। এ শৃঙ্খল উন্মোচন করে মুসলমানদের বিজ্ঞানানুসারী জীবনমুখী জাতিতে পরিণত করাই ছিল নজরুলের সংকল্প। জাতীর প্রতিদানে অতি কষ্টের সাথে নজরুল বলেন :

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে !
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত -লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৯৫)

২

মুসলমানদের ধারণা নজরুল 'মুসলিম বিদ্বেষী' এবং হিন্দুদের ধারণা 'নজরুল হিন্দু বিদ্বেষী' অবশ্য এ সম্পর্কে নজরুলের নিজেরও উক্তি প্রণিধানযোগ্য। নজরুল চাবুক মেরে মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার রোগিকে রোগ থেকে মুক্ত করতে ইনজেকশন দিয়ে থাকেন। কিন্তু রোগি যদি শুধু ইনজেকশনের ব্যথাই দেখেন আর ইনজেকশন দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবগত থাকেন তখন আর ডাক্তারের কি করার থাকে। তেমনি নজরুল এ ঘুমন্ত জাতীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, সমাজের সমস্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানে তিনি বলেছেন :

ধর্মবর্ণ জাতির উর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।
(উদ্ধৃত, শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ[১১], ১৯৮৭ : ৯)

তিনি ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের গোড়ামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আর তা অনাগত ভবিষ্যত মুল্যায়ন করবে। উপরোধ-অনুরোধের পরিবর্তে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রোপ ও কষাঘাতের পথ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য নজরুলের কবিতা ও গানের ভাষা গর্জন মুখর–কখনও সে ভাষায় মিশেছে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের তিক্ততা। তিনি জাতীয় গোড়ামির কারণে সোহাগের বদলে ভর্ৎসনার ভাষা বেছে নিয়েছিলেন। যার কারণে সমাজের এক শ্রেণির লাক তার প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সরকার শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ বলেছেন, 'এই স্বার্থপর শকুনী-আত্মার অধিকারীরা ইসলামের দৃষ্টিতে নিজেদের মুসলমানিত্ব নিয়ে বিচারে বসল না, বিচারে বসল নজরুল ইসলামের মুসলমানিত্ব নিয়ে'। (শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ[১১], ১৯৮৭ : ১০)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেভাবে মানুষের মহত্ব, অমৃতত্ব, বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অসীমের সঙ্গে সীমারূপী তার বিচিত্র আনন্দলীলা বারবার অপূর্ব বাণীমূর্তি লাভ করেছে ; মধ্যযুগে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণবপদকর্তা চণ্ডীদাস যেভাবে ঘোষণা করলেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই' ; সতেন্দ্রনাথ যেভাবে জাতি-ধর্মের সকল সংকীর্ণ গণ্ডীর উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে মানুষের সত্যরূপ উপলব্ধি করেছেন ; ঠিক একইভাবে নজরুল ঘোষণা করেছেন – 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' ! নজরুল সুগভীর ও বাস্তবধর্মী আস্তিক্যবাদী প্রেরণায় মানুষকে জাতি-ধর্ম-দেশ-কালের উর্ধ্বে বিশ্বজোড়া একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে কল্পনা করেছেন। নজরুল আল্লাহকে সবদেশে, সবকালে মানুষের জ্ঞাতি বলে বুঝাতে মানুষের মহত্ব বর্ণনায় বারবার আল্লাহকে স্মরণ করেছেন :

সব দেশে, 'সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি'
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৪)

নজরুল তাঁর *মানুষ* কবিতায় মানুষের মূল্যায়ন করে দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- প্রথমত : ক্ষুধার্ত ভজনালয়ের এক পুরোহিত স্বপ্নে শুনতে পেল কে যেন তাকে মন্দিরের দরজা খুলতে বলছে, পুজার সময় হয়েছে, ক্ষুধার্ত দেবতা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম ভেঙ্গে পুজারি ভাবল হয়ত দেবতার আগমণে সে বাদশা হবে। কিন্তু সে ভজনালয়ের দরজা খুলে দেখতে পেল : একজন জীর্ণবস্ত্র পরিহিত, শীর্ণ দেহী ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক। ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানাল, সে সাতদিন কিছু খায় নি। তীব্র বিরক্তিতে পুজারি দরজা বন্ধ করে দিল। আঁধার রাতে ক্ষুধায় দিশেহারা ভিক্ষুক মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে :

আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করোনি প্রভু!
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৫)

দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে নজরুল বর্ণনা করেন, মসজিদের শিরনীর অঢেল গোস্ত ও রুটি বেঁচে গেছে। মোল্লার আনন্দের সীমা নেই। এমন সময় সাত দিনের ক্ষুধার্ত মুসাফির এসে খাদ্য প্রার্থনা করল।

তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !
কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা !
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৫)

নজরুল লক্ষ করেছেন একশ্রেণির ধর্মান্ধ ; মানুষকে ঘৃণা করে *কোরআন, বেদ, বাইবেল* প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত। নজরুলের মতে, মানুষ থেকে গ্রন্থের উৎপত্তি, গ্রন্থ থেকে মানুষের উৎপত্তি নয়। তিনি তাদেরকে মূর্খ সম্বোধন করে বলেছেন :

পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল !-মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ ; –গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো !
...
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের এ বক্তব্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। হিন্দু মতে গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত অতি পবিত্র ধর্মবাণী আবার মুসলমানদের মতে পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু নজরুল তা বিশ্বাস না করে বলছেন- 'মানুষ এনেছে ধর্ম'। প্রকৃতপক্ষে নজরুল আদম, দাউদ, ঈসা, মূসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবীর সকলকেই আমাদের 'পিতা-পিতামহ' বলে মনে করেছেন। নজরুলের ভাষায় :

আদম দাউদ ঈসা মূসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশি প্রতি ধমনীতে রাজে।

… … …

হেসে না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহীম
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৫)

এ প্রসঙ্গে যতগুলো নাম তিনি উল্লেখ করেছেন তারা ধর্মগুরু তবে গুরু কৃষ্ণ ধর্মগুরো নয়, তিনি স্বয়ং আল্লাহর অবতার। অন্যান্য ধর্মপুরুষদের সঙ্গে একই নিঃস্বাসে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে কবি ত্রুটির শিকার হয়েছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং আল্লাহর সমকক্ষ (হিন্দু ধর্ম মতে), মোহাম্মদ বা ঈশার সমপর্যায়ী নন। নজরুল মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও মূল্যায়ন করে বলেন :

কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি ?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি !

… … …

চাষা বলে কর ঘৃণা!
দেখো চাষা রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কিনা !
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী- যা আছে র'বে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৪)

নজরুল একান্তভাবে খোদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভগবান মনুষ্যত্বেরই পূর্ণ প্রকাশ। তিনি সৃষ্টিকর্তার হাতে শোষন ও অত্যাচারের বিচার ও দণ্ডের ভার না দিয়ে মানুষকেই আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। তাঁর বিদ্রোহ নতুন যুগের মানবধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যায়, অত্যাচার, শোষন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনে তিনি মুখর। তিনি ধনীদেরকে কাঙালের ঋণ পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

আসিছে ফিরিয়া এই বাঙলায় কাঙালের শুভদিন
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ কর তাহাদের ঋণ
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২৩৪-২৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

৩

নজরুলের ধর্ম মানবধর্ম। তাঁর এ ধর্মবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার শ্রেণির লোক রয়েছে। প্রথমত : এক শ্রেণির লোক নজরুলকে পুরোপুরি প্রগতিশীল কবিরূপে মনে করেন এবং ধর্মবাদীরূপে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। *নজরুল রচনাবলী*-এর বিভিন্ন কবিতার প্রচার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর এমনসব রচনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান যেগুলো শুধু তাদেরই উৎসাহের সমর্থক।

দ্বিতীয়ত : এ শ্রেণির ভক্তদল তাঁকে গোঁড়া মুসলমান তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের প্রতীক ও কবি রূপে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তারাও তাঁদের মতের স্বপক্ষে *নজরুল রচনাবলী*-এর নির্বাচিত কিছু অংশ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন যেগুলো তাঁকে শুধু একজন খাটি ভক্ত মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তৃতীয়ত : কিছু সংখ্যক (সমর্থক) পাঠক ধর্ম সম্পর্কে নজরুলকে বিভ্রান্ত মনে করে নিজেরাই বিভ্রান্ত। তাদের মতে নজরুল 'পরস্পর বিরোধী' দুটি ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এবং তার লিখিত 'পরস্পর বিরোধী' দুটি ধর্মেই তিনি ভক্ত। একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকা এবং স্বাভাবিকভাবে সকল ধর্মের প্রতি বিরাগ দেখানো তো কেবল তখনই সম্ভব যখন ঐ ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে বিভ্রান্ত ও অস্থিরমতি হন।

চতুর্থত : এ শ্রেণির লোক তাকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও অধার্মিক বলে মনে করেন। কারণ তাঁর কোনো কোনো লেখায় প্রতীয়মান হয় তিনি ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। যেমন, নজরুল বলেছেন : 'কিসের ধর্ম ? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল ঝড়কে আমি বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারে-খারে দিয়েও আমি বাঁচবো।' (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৯)

স্বাভাবিকভাবেই আংশিক বিশ্লেষনে যে কোনো কবিকেই যে কোনো রূপে প্রমাণ করা সম্ভব। তবে *নজরুল রচনাবলী* মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে ও অনুধাবন করলে দিবালোকের মত এ কথাই প্রমাণ হবে যে, নজরুলের ধর্ম সম্পর্কিত উপরিউক্ত মতামত ও ধারনাগুলোর কোনোটিই তাঁর প্রতি সুবিচার করে না। কারণ প্রতিটি ধারনাই একপেশী ও এককেন্দ্রিক এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। এ সকল বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষে *নজরুল রচনাবলী*-এর প্রকৃত মূল্যায়ণ অপরিহার্য। এ সকল অভিযোগ ও বিভ্রান্তির উত্তর দিতে ও বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যই ১৯২৫ সালে নজরুল সাহিত্যিক জীবনের প্রায় শেষের দিকে *আমার কৈফিয়ৎ* শীর্ষক কবিতায় বলেন :

সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা।'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে',
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে।
ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও!
'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!'
হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত- নেড়ে'
...
নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!
'বিলেত ফেরনি? 'প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদ্যে ছি!'
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি'!-
যুগের না হই হুজুগের কবি
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৯৩)

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) রবিবার, কলকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে নজরুলকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সে সংবর্ধনার জবাবে নজরুল বলেন :

> কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৯১)

তিনটি কারণে ধর্মের প্রতি নজরুলের মনোভাবের ব্যাপারে পাঠক মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে,–'বিদ্রোহমূলক' উক্তি, একাধিক ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ, এবং সকল ধর্মের প্রতি বিরাগ প্রকাশ। নজরুলের *বিদ্রোহী* কবিতটির আলোকে অনেকেই ধর্মবিদ্রোহী, অধর্মাচার, উচ্ছৃঙ্খল ও নিরীশ্বরবাদী বলে তাঁকে অভিহিত করেছেন। এ দলের অন্যতম প্রধান নেতা গোঁড়া ধর্মবাদী কবি গোলাম মোস্তফা নজরুলের *বিদ্রোহী* কবিতার জবাবে *নিয়ন্ত্রিত* শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন। আবার তাঁর বিচ্ছিন্ন কিছু উক্তি ও তাঁর প্রতি বিরূপের কারণ:

○ ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
○ আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার!
○ আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
○ আমি মানি না কোন আইন,
○ আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
○ আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
○ আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
○ আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
○ আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৭-১০)

যাঁরা নজরুলকে নিরীশ্বরবাদী বিদ্রোহী বলে মনে করেন তাদের উৎসাহের কারণ তাঁর উপরিউক্ত উক্তিসমূহ। নজরুলের প্রতি বিদ্রুপভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জবাবে এ কথা বলা যায়, নজরুল বিদ্রোহমূলক উক্তির মধ্যে খোদা তথা ভগবানের উল্লেখ করে বিদ্রোহী নজরুল পূর্বাহ্নেই মহান আল্লাহর একক সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন। নজরুলের 'ভৃগু' সম্পর্কিত উক্তিটির বিশ্লেষণে বলা যায় :

> পুরাণে বর্ণিত ভৃগু উপাখ্যানের সারকথা, ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে পদাঘাত হেনেছিলেন তাঁর নিদ্রাভঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এই উপাখ্যানের

Dhaka University Institutional Repository

আলোকে স্থাপিত, নজরুলের উক্তিটির অর্থ তাই সরাসরি সাধারণজন স্বীকৃত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিদ্রোহ বা অবিশ্বাস নয়, পুরাণোক্ত ঈশ্বরের খেয়ালিপনার প্রতিবাদ মাত্র। (আতোয়ার রহমান[১], ১৯৯৪ : ১৯১-১৯২)

নজরুলের এ প্রতিবাদ অন্যত্র দেখা যায় অনুযোগ ও অভিমানের আকারে। যেমন তিনি ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন:

আমার আবার ধর্ম কি ? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি ? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি ? দু বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি ? (নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৯৩ : ৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় *নবাগত উৎপাত* শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি লেখেন :

ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।
হে পরম পুরুষোত্তম ! বলো, বলো, আর কতদিন
উদাসীন হয়ে রহিবে ?-তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্তনাদ !...
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতিঃ সুন্দর তরবারি
দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও !
বন্দী আত্মা কাঁদে কারাগারে, দ্বার খোলো, খোলো দ্বার !
পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খুলে দাও !
পিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দীর দেশে।
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২০৭-২০৮)

এ কবিতায় নজরুল অনুযোগী। কিন্তু *শেষ সওগাত* এ সংকলিত *চির বিদ্রোহী* কবিতায় তাঁকে অভিমানী হিসাবে দেখা যায়,-

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না !
তোমার সর্বশক্তি আমায়
বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায় !
হায় ! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না ?
হেরে গেলে ! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।
...
লক্ষ্মী ছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে ?
লোভী ভোগীলক্ষ্মী লয়ে
রাক্ষস আর দৈত্য হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কি নির্যাতন করছে তোমার সৃষ্টিতে।

...

হে মৌনি, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধরে,
পূজা করে ক্ষমা করে
তোমায় মানুষ জনম ভরে,
কী দিয়েছ তাদের বলো, থেকো না ক চুপ করে !

...

লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময় !
পুত্র মরে, মা তবু হায় !
প্রেমভরে ডাকে তোমায় ;
ওগো কৃপণ ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয়।

...

বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই ত কাঁদে আমার প্রাণ !
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান!

...

বিদ্রোহী মোর থাম্‌বে কিসে, ভুবন-ভরা দু:খশোক !
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়–
শান্ত হব আগে তা'রা সর্ব্বদুঃখ-মুক্ত হোক !
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২২০-২২২)

এ সকল ব্যাখ্যা নজরুলের আস্তিকতা প্রমাণের দুর্বল যুক্তি স্বরূপ। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের রচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত ঈশ্বরদ্রোহিতার অভিযোগের জবাব লক্ষ করা যায়। যেখানে তার বক্তব্য অত্যন্ত শক্তিশালী। এ বিষয়ে ১৯২৩ সালে *ধুমকেতু* সম্পর্কিত একটি মামলায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে তাঁর লেখা *রাজবন্দীর জবানবন্দী* প্রণিধানযোগ্য। এ জবানবন্দীতে তিনি বার বার মহান আল্লাহ্‌কে তাঁর পক্ষ সমর্থক এবং মহা বিচারক বলে উল্লেখ করেছিলেন। নজরুল বলেন :

> আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন-ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোন বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট ; সে-আইন সর্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে-পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি ; আমার পক্ষে-আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা। রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে-রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ সত্য, লাভ পরমানন্দ। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৮৪ : ৮৪৯)

মহান আল্লাহর প্রতি নজরুলের এ বিশ্বাস তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিলো। তৃতীয় দশকের শেষ দিকে *মৃত্যুক্ষুধা* রচনার পর এ বিশ্বাস আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পরে। মৃত্যুক্ষুধার বাইশ নং অনুচ্ছেদে নজরুল বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ...বড়-বৌ সমজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বলে, 'যাব না, আমি শিন্নি খাব, আমার বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে গো। আমি যাব না।' মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোরানের সেই অংশ- যার মানে-'আমি তাহাদের নামাজ কবুল করি না, যাহারা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয়। (নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ৬১৩)

নজরুলের কাছে মহান আল্লাহ সুন্দররূপে আবির্ভূত। পরবর্তীকালে একাধিক ভাষণে তিনি 'সুন্দর' এর কথা নানা ভাবে প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে চট্টগামে এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর জন্য এবং ১৯৪১ সালে নওগা সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণগুলোতে। তারপর আসে তাঁর জীবনের শেষ দিকের লেখা *আমার সুন্দর* এর কথা। তাঁর সুন্দর ও সাহিত্য সাধনা যেন এক হয়ে গেছে। এতে তিনি বলেন,

> আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।' 'ধুমকেতু' 'লাঙল' গণবাণীতে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৩২)

১৯৪২ সালের ২ জুন এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি গদ্যাকারে যা লেখেছেন তাই দেখা যায় *চির নির্ভয়* শীর্ষক কবিতায়। সুতরাং যিনি মহান আল্লাহকে মানেন, তা যে নামেই হোক না কেন, তাঁকে নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী বলি কেমন করে ? নজরুল বলেন :

ইচ্ছা-অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ- কায়া,
দেখিবে, তোমারী সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে করো না ক বীর ভয়,
তাহারা খোদার খোদ্ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' ত নয়।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৪)

ধর্ম সম্পর্কে নজরুলের বিভিন্ন ধরনের উক্তিতে পাঠক মহল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি একাধিক প্রসঙ্গ ও বিবিধ বক্তব্যে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর এ করণেই অসতর্ক পাঠক পথ হারিয়ে ফেলেন। কেননা নজরুলের মূল বিষয়, প্রসঙ্গ ও বক্তব্য তারা খুঁজে পান না।

নজরুলের ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্যগুলোর দুটি দিক লক্ষ করা যায়। কোথাও তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ঈশ্বর, দেবদেবী, অবতার, পয়গম্বরের প্রশংসায় মুখর আবার অন্যদিকে সমকালীন সমাজের ধর্মবোধ আর তাঁর প্রয়োগরীতির ছিদ্রান্বেষী। কখনো তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জাগরণের দূত আবার তাদেরই সমালোচক। কোথাও তিনি ধর্ম তথা খোদা-ভক্ত, আবার কোথাও তিনি বিদ্রোহী। কোথাও তিনি ঈশ্বর, ভগবান বা দেব-দেবীদেরকে সার্বিক শক্তি ও প্রেরণার উৎসরূপে দেখেন আবার কোথাও তিনি তাঁদেরকেই গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলে অভিহিত করেন। এ দুটি ধারায় যে পরস্পরবিরোধীতার আভাস রয়েছে তা নজরুলের ধর্মমত সম্পর্কিত প্রথম ও তৃতীয় বিভ্রান্তির সাথে সম্পৃক্ত। নজরুল আল্লাহকে স্বীকার করে ধর্মের আস্থাবাদী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এখানেই তাঁর ধর্মবোধ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। 'ধর্মকে তিনি ভক্তির লক্ষ এবং শক্তির উৎসরূপেও দেখেছেন। প্রকৃত ধর্মবাদীর পক্ষে এই-ই স্বাভাবিক।' (আতোয়ার রহমান[২], ১৯৯৪ : ১৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তাঁর সকল ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তাই ধর্মের উক্ত রূপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'তাকে তিনি কখনো দূর থেকে প্রদক্ষিণ করেন, কখনো নিকট থেকে। এবং এটুকু যদি স্মরণ রাখি, তাহলে তাঁর ধর্মস্পৃষ্ট-ভক্তিবাদী আর শক্তিবাদী-রচনাগুলির মর্মার্থ উদ্ধারে কিছু মাত্র অসুবিধা হবে না।'(আতোয়ার রহমান[২], ১৯৯৪ : ১৯৪)

নজরুলের *রক্তাম্বরধারিণী মা*, *খেয়াপারের তরুনী*, *বড়দিন*, *আরতি*, আর *আত্মগত*-এর মতো কবিতা, *মরু-ভাস্কর* কাব্য, *শ্যামাসংগীত*, *জুলফিকার*-এর গীতাবলি ইত্যাদিতে তাঁর যে সকল বক্তব্য লক্ষনীয় তা প্রকৃতপক্ষে একই সুরে বাধা। সে-সুর সর্বমানব তথা সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ এবং তাকে দুর্বল ও নিপীড়িতের শক্তিশালী রক্ষকরূপে জানবার আগ্রহে রচিত। *একি আল্লার কৃপা নয়?* কবিতাটিতে তিনি বলেছেন :

হউক হিন্দু, হোক খ্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাহার ধরায় অকল্যাণ।

...

সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই !
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,
কবির না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হতে।
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২৫৪-২৫৫)

এসকল আলোচনার পরও যারা প্রশ্ন করেন, ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তাকে এভাবে দেখার পরও নজরুল এসবের সমালোচনা করলেন কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, তাঁর বিদ্রোহমূলক আলোচনায় নজরুল নিজের মুখেই বলেছেন, তার 'বিদ্রোহ অভিমানজাত'। *একি আল্লার কৃপা নয়?* কবিতায় তাঁর ঈশ্বর নির্যাতিতের রক্ষক এবং উৎপীড়কের শাসক। অন্যত্র *আমার সুন্দর* এ বিদ্রোহ ও বিপ্লব একই। নজরুলের এসব বক্তব্য প্রমাণ করে, 'তাঁর ঈশ্বর সমালোচনার মূল লক্ষ ঈশ্বরের অনুশাসনের অবমাননায় তাঁর প্রতি আনুগত্য অক্ষুন্ন রেখে ক্ষোভ প্রকাশ। যা কার্যতঃ নজরুলের ভক্তিবাদ আর শক্তিবাদের ভিন্নতর রূপ।' (আতোয়ার রহমান[২], ১৯৯৪ : ১৯৫)

তাছাড়া সমকালীন মানবসমাজের ধর্মবোধের বিকৃতি ও ধর্মের অপপ্রয়োগে ব্যথিত হয়েও নজরুল ধর্ম বা ঈশ্বরের সমালোচনা করেছেন। কারণ যে বিকৃতি বা অপপ্রয়োগে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতনের রূপ নেয়। 'বিষেরবাশী', 'সর্বহারা', 'চন্দ্রবিন্দু', 'শেষ সওগাত' ইত্যাদি কবিতা এবং *যুগবাণী*র ছুঁৎমার্গ, *রুদ্রমঙ্গল*-এর 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু মুসলমান' ইত্যাদি প্রবন্ধ তার দুঃখ ও বেদনাবোধের ফল। তিনি তার ভক্তির লক্ষ ও শক্তির উৎস হিসাবে যে ধর্মকে জেনেছেন; সে ধর্মের বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ সইতে না পেরেই সমালোচনায় মুখরিত হন। তাঁর সমালোচনার মূল লক্ষ ধর্ম নয় বরং ধর্মের বিকৃতি ও অপপ্রয়োগকারী ধর্মবাদীর দলই। ধর্মবাদীদের বিরুদ্ধে তার 'একি আল্লার কৃপা নয়?' কবিতায় বলেছেন :

লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জাতি,
তাহাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি।
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর বিরোধিতাজনিত বিভ্রান্তিও ক্ষেত্রে নজরুল একই সঙ্গে একাধিক ধর্মের ভক্ত আবার সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। প্রথম দুটি আলোচনায় দেখেছি নাস্তিকতাকে মেনে নেয়া তো দুরের কথা বরং ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধার কখনও অভাব ঘটে নি। তার রচনাবলিতে ধর্ম বা ঈশ্বরের যে সমালোচনা রয়েছে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ ভিন্ন। ধর্মের খুঁটিতে বাঁধা থেকে ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে তিনি ঈশ্বর নামে আল্লাহর সমালোচনা করেছেন।

একাধিক ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি সম্পর্কে নজরুল নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যে জবাব সর্ব ধর্মের সমন্বয়ের সাধনের নয়, তার নিজস্ব মহতী ধারনায় নিষিক্ত। বাঁধনহারা, উপন্যাসে সাহসিকতার এক পত্রে তাঁর এ ধর্ম ধারনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, নজরুল লিখেছেন, '... মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এগুলো তো বাইরের বিধি... সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তর সত্যের পর- যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে।' (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৭২৭-৮০৬)

নজরুল ধর্মকে শুধু ভক্তিবাদীদের চোখেই দেখেন নি, বরং শক্তিবাদীর চোখেও দেখেছেন। সর্ব ধর্ম থেকেই শক্তিবাদীর বিষয়গুলো বেছে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মের মধ্যকার সীমারেখা নজরুলের কাছে বিলুপ্ত। তার মতে ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে ধর্মবাদীর দল। নজরুল ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, এ প্রসঙ্গে 'গোড়ামী ধর্ম নয়', কবিতায় তিনি বলেন :

> শুধু গুণ্ডামী ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
> এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
> এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
> একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
> তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
> তার বিচারক এক সে আল্লা-লিখিত আল্-কোরানে।
>
> (নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ২৬১)

রুদ্রমঙ্গল এর 'আমার পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে একই কথার পুনধ্বনি দেখা যায়। 'আমার ধুমকেতু'র আদর্শের ব্যাখ্যাদানের উদ্দেশ্যে লিখিত উক্ত প্রবন্ধটিতে স্বধর্মবোধ পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক, 'যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।' (আতোয়ার রহমান[১], ১৯৯৪ : ১৯৭)

নজরুলের ধর্ম গোড়ামি বর্জিত ধর্ম। তিনি সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন। ধর্ম তার কাছে প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়, মানুষের কল্যাণকামী এক ঈশ্বর-আশ্রয়ী মতবাদ। নজরুল এর নাম দিয়েছেন মানবধর্ম। এবং 'মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দুশমনীর ভাব আসে না।' (আতোয়ার রহমান[১], ১৯৯৪ : ১৯৭) নজরুল এসব শুধু মুখেই বলেন নি; নিজ জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তার ইসলাম বিষয়ক কবিতার সংখ্যা অন্যান্য কবিতার থেকে অনেক বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

৪

পবিত্র কোরআনের কোথাও পৌত্তলিকদের সঙ্গে আপোসের উল্লেখ নেই। পৌত্তলিকদের সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌمِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَي الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

এবং মুশরিক ও মূর্তিপুজক রমনী যে পর্যন্ত না ঈমান আনে, তোমরা বিবাহ করো না। (যদিও ক্রীতদাসীদের সাথে বিবাহ ছাড়া তোমাদের জন্য উপায় না থাকে, কেননা) অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ঈমানদার ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমাদের কন্যার বিবাহ দিও না! মুশরিক পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ঈমানদার ক্রীতদাস তদপেক্ষা উত্তম। কারণ ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদের নিজ অনুগ্রহে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ! (বাকারা : ২২১)

মহানবী (সা.)ও পৌত্তলিকদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তাই তিনি মক্কা বিজয়ের পর নিজ শত্রুদের ক্ষমা করলেও পুতুলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিষয় আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামে জিহাদের বিধান রয়েছে। ইহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। এ বিষয়ে আপোসহীন মনোভাব থাকতে হবে। ইসলামের এ কঠোর নিদের্শ হয়ত নজরুল গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু গরীব, দুঃখী, লাঞ্চিত, অপমানিত, উৎপীড়িত, নিগৃহীত, অনাদৃত, উপেক্ষিত মানুষের প্রতি যে ইসলামের মমতার ও সহমর্মিতার মনোভাব রয়েছে তিনি ইসলামের সে আদর্শ গ্রহণ করেছেন। ১৩৪৭ সালে কলিকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন,

> সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে।... আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে-এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোনো ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ১১৪)

মুসলমান বলতে তিনি স্বাধীন মানুষকে বুঝিয়েছেন। পাশবপ্রবৃত্তির দ্বারা শৃঙ্খলিত ও লোভী মানুষ স্বাধীন নয় এবং যে স্বাধীন নয় সে মুসলমান নয়। কাজী নজরুল ধর্মে বর্ণিত জিহাদের গভীর অর্থে প্রবেশ করেছেন, ইসলামে যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে তিনি সে জিহাদ বলতে সাধনা ও প্রচেষ্টাকে বুঝেছেন। জিহাদ বলতে তিনি শুধু যুদ্ধ বোঝেন নি। তার মতে শান্তিপূর্নভাবে অথবা যুদ্ধ দ্বারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা সম্ভব। জিহাদের চারটি অবস্থা রয়েছে, – মনের জিহাদ, জিহ্বার জিহাদ, হস্তের জিহাদ এবং তরবারির জিহাদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৃষ্টিতে মনের জিহাদ সবচাইতে বড় জিহাদ অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। যদিও 'ইসলামের মূল পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে জিহাদ গণ্য নয়।' (শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ[১১], ১৯৮৭ : ৭)

তাছাড়া জিহাদের আরো গভীর অর্থ হলো – নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কারণ, যে নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না সে প্রকৃত মানুষ নয়। সুতরাং আত্মশাসন, লালসা, লিপ্সা তথা ইন্দ্রিয় ক্ষুধার কাছে পরাজিত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির কাছে জিহাদ অর্থহীন। যে মুসলমান সেই আত্মমুক্ত এবং আত্মমুক্ত স্বাধীন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেন না। যারা নিজ পাশবপ্রবৃত্তি দমণে অক্ষম তারা আত্মভীত। আত্মভীত মানুষ নিজ বাসনা ত্যাগ এবং স্বভাবশত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। নজরুল আত্মভীত নন বরং আত্মমুক্ত ছিলেন। নজরুল বলেন:

> সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারো নিকট মাথা নত করব না-... দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দেইনি। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির'- এ গান আমি আমার এ-শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি। (নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ১১৬)

জিহাদের গভীর রূপটির সঙ্গে নজরুল পরিচিত ছিলেন। নজরুলের মতে, যে সর্বত্যাগি তিনিই শহীদ। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন, 'সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে-এ সাধনা তাহারই, এ শহীদি দরজা শুধু তাহারই'। (নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৯৭)

যেহেতু ইসলাম আত্মত্যাগ এবং আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয় তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম। আত্মত্যাগের ক্ষমতা অর্জন করলেই সকল বিভেদ দূর হবে। তাই নজরুলের মতে জিহাদের যুদ্ধ মানে ত্যাগের যুদ্ধ তাই ত্যাগের যুদ্ধে যে জয়ী হয় সেই শান্তি এবং আল্লাহকে লাভ করতে পারে। ইসলামের মূল লক্ষ হল আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ মানেই আত্মসমর্পন, এবং আত্মসমর্পন মানেই হলো আত্মত্যাগ ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ। আল্লাহর পথে জেহাদ অর্থ হলো আত্মত্যাগের জিহাদ এবং আত্মত্যাগের এই জিহাদ হলো সকল প্রকারের অন্যায়, অত্যাচার, সঞ্চয়কারী, বর্ণবিদ্বেষী, অহংকারী ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ। যেহেতু পৌত্তলিকরা আল্লাহর অনন্য স্বরূপকে খণ্ডিত করে এবং এ অভেদ আত্মাকে খণ্ডিত করার কারণে বিভেদ সৃষ্টি হয়, শান্তি বিনষ্ট হয়; তাই বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং শান্তি বিনষ্টকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয করেছে ইসলাম। 'এখানে যে যুদ্ধ করা হয় সে যুদ্ধ পরোক্ষভাবে বিভেদকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। নজরুল ইসলাম ইসলামের এই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।' (শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ[১১], ১৯৮৭ : ১০)

466269

৫

নজরুলের মতে ইসলাম সাম্যের ধর্ম। সাম্যের ধর্ম তথা একের ধারণার ধর্ম। যেখানে এক থাকে সেখানে অনেক থাকে না, আবার যেখানে অনেক থাকে না সেখানে ভেদ থাকে না, যেখানে ভেদ থাকে না সেখানে বিভেদ থাকে না। যেখানে বিভেদ থাকে না সেখানে উচু-নীচু থাকে না। আবার উচু-নীচু না থাকলে অসমতা থাকবে না। যেখানে অসমতা নেই সেখানেই সাম্য। সাম্য সৃষ্টির জন্যই একের ধারণার সৃষ্টির প্রয়োজন। একের ধারণা হলেই এক আল্লাহর ধারণা সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনসহ সকল আসমানি কিতাবেই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। তাই নজরুল বলেন :

> ইসলাম জাগো ! মুসলিম জাগো ! আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী, -সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ, তুমি জাগো ! মুক্ত বিশ্বের বন্যশিশু তুমি, তোমায় পোষ মানায় কে ? দুরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য -রাগ তোমার রক্তে, তোমাকে থামায় কে ? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে ? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু- তোমায় মারে কে?...

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তোমার অদম্য শক্তি, দুর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে ? ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। (নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৯৩ : ৩৬)

নজরুল বিশ্বের সকল জাতিকে মুসলমান করার উদ্দেশ্যে নয় বরং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, মানবজাতি হিসেবে সম্মিলিতভাবে, সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া একত্রে অবস্থানের সপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সকল জাতিকে 'ধর্ম-বর্ণ' নিবিশেষে একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন :

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান...
কে তুমি ?-পার্সী ? জৈন ? ইহুদী ? সাঁওতাল, ভীল, গারো ?
কন্‌ফুসিয়াস্ ? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!
বন্ধু যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ?-পথে ফোটে তাজা ফুল !
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৯৩ : ২৩৩)

৬

ইসলামের কঠোর নীতিতে কঠিন অনুশাসনের নিয়মে বাঁধা অবস্থায় নজরুল থাকতে চান না, এ ক্ষেত্রে তাঁকে কিছুটা সুফি চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত পাওয়া যায়। আরবের ইসলাম ইরানের বাতাস গায়ে লাগিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। ইসলাম মুসলমানদের অভ্যন্তরীন বিবাদের আঘাতে দূর্বল হয়ে পড়ে। কঠোর নিয়ম মেনে জিহাদী আদর্শ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারা ইসলামকে উদারনীতির আদর্শে রূপান্তর করেন এতে সৃষ্টি হয় সুফি সম্প্রদায়ের। সুফি জালালউদ্দিন রুমী তাঁর এক কবিতায় বলেছেন :

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন জানিবে কেমনে কে ভগবান,
নই খৃষ্টান, ইহুদীও নই, কাফের কিংবা মুসলমান।
(উদ্ধৃত, শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ[১১], ১৯৮৭ : ১৬)

সুফিবাদের এ ঝড় ভারতবর্ষে আন্দোলিত হয়। তারা প্রচার করতে থাকেন ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি তারা পছন্দ করতেন না। এ আদর্শ রয়েছে নজরুলের গানে, খৈয়াম গীতিতে নজরুল বলেন :

কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায় ॥
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রৌশন্
যেথায় থাকুক সমান তাহার-

Dhaka University Institutional Repository

খোদার মস্‌জিদ, মূরত-মন্দির
ঈসাই-দেউল, ইহুদ-খানায় ॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায় ॥
(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ৮১-৮৪।

সুফিদের অন্তরে আল্লাহর অবস্থান, সৃষ্টিকুলের প্রতি ভলোবাসা ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে বাঁধা সৃষ্টি হয়, সুতরাং নজরুল সুফিদের এ আদর্শের অনুসারী কিন্তু সুফিদের নিস্তেজ, নির্বিকার স্বভাবকে অস্বীকার করেছেন।

নজরুল ইসলামি ভাবধারায় বহুকাব্য রচনা করেছেন। তাঁর *অগ্নিবীণা* কাব্যে ১২টি কবিতার মধ্যে ৭ টি কবিতা মুসলিম ঐতিহ্যের আলোকে রচিত। তাঁর আনোয়ার পাশা কোরবাণী, মুহররম, খেয়াপারের তরুণী ও রণতরীতে ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব সৌন্দর্য ও শৌর্যবীর্যের রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শক্তি, স্বাধীনতা, ত্যাগ, বীরত্ব, আত্মমর্যাদার মহত্তম রূপ নজরুল উপরিউক্ত কবিতাগুলোতে বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরেছেন। কয়েকটি উদাহরণ :

কোথা বাবা আস্‌গর? শোকে বুক ঝাঁঝরা,
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা !...
আস্‌গর সম দিব, বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্‌।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩: ৪০-৪১)

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম-জিভ ধরে টানো তার !
বেইমান জানে শুধু জান্‌টা বাঁচানো সার !
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩: ৩০)

'এয় ইবরাহীম আজ কোরবাণী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন !'
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩: ৩০)

গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাচ্ছিল, সে যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনে নজরুল লেখেন তার 'রণ-ভেরী' কবিতা। এ কবিতার এক অংশে নজরুল বলেন :

ওরে আয় !
তোর জান্‌ যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায় !

Dhaka University Institutional Repository

ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পঞ্জায় !
তোর মান যায় প্রাণ যায়–
তবে বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান ! বৃথা ভীরু সমঝায় !...
মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুশী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।...
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩: ৩১, ৩৩)

নজরুল *জিঞ্জির* কাব্যগ্রন্থে ১৬ টি কবিতার মধ্যে ৫টি কবিতা ইসলামি ভাবাদর্শ অবলম্বনে রচনা করেন। সেই ৫টি কবিতা হল : 'খালেদ', 'সুবহ্-উম্মেদ', 'ঈদ-মোবারক', 'আমানুল্লাহ' ও 'উমর ফারুক'। নজরুল ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, কৃষ্ণনগরে খালেদ কবিতাটি রচনা করেন। 'খালেদ' কবিতায় ত্যাগ, শক্তি, বীরত্ব ও তেজের মহত্বের মাধ্যমে নজরুল বুঝতে চেয়েছেন শক্তি সাধনা, বীরত্ব ও সাহস ছাড়া নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যুর ফেরেশতা বাদশার আদেশ মেনে জালিমদের ধ্বংশ করতে অসমর্থ হলেও সেখানে খালেদ অত্যাচারীদের উৎখাত করে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কবির ভাষায় :

সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত্ কোথায় আছিল বসি ?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি'
বেছে বেছে ঐ 'সঙ্গ-দিল্'দের কবজ্ করে নি জান্?
মালেকুল্-মৌত্ সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফরমান !
(নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

নজরুল অগ্রহায়ণ ১৩৩১ হুগলিতে 'সুবহ-উম্মেদ' (পূর্বাশা) কবিতাটি 'সত্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের প্রয়োজন' চেতনায় রচনা করেছিলেন। কবি সেদিন কয়েকটি মুসলিম দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে আনন্দিত, দীর্ঘ কবিতার শেষ অংশে বলেন :

জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।-
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
এলো কি আবার ইসলামের ?...
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা ! এই জাগরণ-রোলে
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের।
(নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

নজরুল ১৯ চৈত্র, ১৩৩৩ কলিকাতায় ইসলামি সাম্যবাদী রূপকে ফুটিয়ে তুলতে 'ঈদ মোবারক' কবিতাটি রচনা করেন। নজরুলের মতে ঈদের উৎসব ; আনন্দ ও ত্যাগের উৎসব। একটি গরু কোরবানী করে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সকল অসমতা, দূর করে, সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, সঞ্চয় নিষিদ্ধ করে, সর্বজনীন মানবতার উদ্দেশ্যে নজরুল আহবান জানান :

আজি ইসলামি-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান,

Dhaka University Institutional Repository

রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমির তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি ; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ।
ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ-সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের !...
ভোগের পেয়ালা উপ্‌চায়ে পড়ে তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালাতে..
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪৫৬-৪৫৭)

ভোগ বিলাসী বাদশাকে সত্যিকার মুসলমান বলে নজরুল মনে করেন না। কারণ, ইসলাম ভোগ-বিলাসিতার ধর্ম নয় ; ত্যাগের ধর্ম, ভোগ বিলাসীতা উৎখাত করার ধর্ম। সব ধর্মের মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে প্রত্যাশায় নজরুল বলেন :

বুকের খুশির বাদশাহ তুমি, -শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই-তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ্‌, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি একখানি ইট মন্দিরের।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪৫৬-৪৫৭)

৭

কবি আনাল হক (انا الحق) চেতনায় জেগে উঠেই ভৃগুকে আঘাত করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন-'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন' বলেছেন। ঈশ্বরের বুকে আঘাত মারার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড আত্মশক্তি এবং সেই আত্মশক্তি কবি খুঁজে পেলেন আনাল হক (انا الحق) তত্ত্বের মধ্যে। সেই দূর্বার দূর্দম আত্মশক্তির ঘোষণাই তার 'বিদ্রোহী' কবিতা। নজরুল যে ভগবানকে জাগাতে চেয়েছেন সেই ভগবান কোনো ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি সকল মানুষের সকল ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বে। তাই ইসলামে তার বিশ্বাস নেই এ কথা বলা চলে না। কারণ তিনি কখনই বলেন নি, তিনি মুসলমান নন। মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁর মধ্যে কোনো ক্ষোভের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর লেখায়, তার ইসলামি গানে, কবিতাগুলোতে, প্রবন্ধে তিনি যে ইসলামে বিশ্বাসী একনিষ্ঠ মুসলমান তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় :

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালোবেসে—
আরশ কুর্সী লওহ্‌ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে ॥
রসুল নামের রশি ধরে
যেতে হবে খোদার ঘরে,
নদী-তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই,
দরিয়াতে সে আপনি মেশে ॥

(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ৫০২)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই নজরুল কৃষ্ণ, রাধা, মহাদেব, লক্ষ্মী, ভোলানাথ, দেবদেবী, চৈতন্য দেবের প্রতিও ভক্তি জানিয়ে গান-কবিতা লিখেছেন। ইসলামের সত্য সারকে নজরুল জেনেছিলেন বলেই অন্য যে কোনো ধর্মের প্রতি তিনি ভক্তি ও সম্মান জানাতে পেরেছেন। 'ইসলামের পথ দিয়ে তিনি বিশ্বদেবতার স্বরূপকে জেনেছিলেন ; তাঁর শিকড় ইসলাম, তাঁর ফুল সর্ব ধর্মের সমস্ত উপাসের চরণে। ইসলাম তাঁকে রক্ষনশীল আচরণের সূত্রে বাঁধে নি, তাঁকে বিশ্বের সকল ধর্মস্থানে পৌছানোর পথ দেখিয়েছে। ইসলামের আলোয় আলোকিত নজরুলের উদার ধর্মবোধ।' (কৃষ্ণগোপাল রায়[৪], ১৯৯৮ : ৯৫)

নজরুল শুধু ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেন নি, তিনি হিন্দু ধর্মের তীক্ষ্ণ সমালোচনাও করেছেন। *যুগবাণী* কাব্যগ্রন্থের 'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, -মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা। হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপণ করিতেছ তোমরা ! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই !' কি ভীষণ প্রতারণা ! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! (নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৮২৪)

হিন্দু সমাজের এ সমালোচনা করার অধিকার ও যোগ্যতা নজরুলের ছিল। কারণ, হিন্দুদের প্রতি মানুষ হিসাবে তাঁর ভালোবাসা ও দরদ কোনো অংশে কম ছিল না। তিনি তাঁর লেখায় নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেছেন এবং হিন্দুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁনকে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিতে বলেছেন,

> হিন্দু-লেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তাছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,– আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন। (নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৩৯৪)

একইভাবে *আমার সুন্দর* নামক আত্মজীবন নির্ভর লেখায় তিনি বলেছেন, 'জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেন নি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন।' (কৃষ্ণগোপাল রায়[৪], ১৯৯৮ : ৯৬)

ছুঁৎমার্গ -এ নজরুল হিন্দুদের সংকীর্ণতার কথা বলেছেন আবার 'আমার সুন্দর'-এ তার বিপরীত কথা বলেছেন- কিন্তু এ বৈপিরীত্বের জন্য নজরুল দায়ী নন, দায়ী হিন্দু সমাজের বিপরীত জীবন ধারা। আবার মুসলমান সমাজের সংকীর্ণতার ও তীক্ষ্ম সমালোচনা আমরা দেখেছি। তিনি উভয় সমাজের মধ্যে মিলন কামনায় বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান ॥
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই,
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥
চিনতে নেরে আঁধার রাতে করি মোরা হানাহানি,
সকাল হ'লে হবে রে ভাই ভায়ে ভায়ে জানাজানি।
কাঁদব তখন গলা ধ'রে,
চাইব ক্ষমা পরস্পরে,
হাসবে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান ॥
(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ২০৪)

বজলে করিমের প্রেরণায় নজরুল জীবনের সূচনালগ্নেই ইসলামি গানে মনোনিবেশ করেন। সে গান দ্বারা প্রতীয়মান হয় নজরুল ছোটবেলা থেকেই ইবাদত-বন্দেগি করতেন এবং মসজিদে গিয়ে নামাযের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। সেসময়কার নজরুল রচনার প্রায় সবই অবলুপ্ত। সেসময়ের তার গানের নমুনা :

কর ভাই বন্দেগী
খোয়াইওনা আর অবহেলায় জেন্দেগী
করমেন্দেগী হবে হাশরের মাঝে।'
নামাজ পড় মিঞা, ওগো নামাজ পড় মিঞা
সবার সাথে জামাতেতে সমজিদেতে গিয়া
(উদ্ধৃত, করুণাময় গোস্বামী[৩], ১৯৯০ : ১৩৪)

৮

নজরুলের কোনো কোনো লেখা আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম বিদ্বেষী বলে মনে হওয়ার কারণে অনেকেই তাঁর প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠেছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে আজাযীল, শয়তান এমনকি কাফের বলেও অভিহিত করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়; কবি প্রতিভার স্ফুরণ লাভ করেছেন খোদাকে অস্বীকার, অমান্য ও অপমান করে। কবির *অগ্নিবীণা* পুস্তকটি এক্ষেত্রে প্রণীধানযোগ্য। আল্লাহর প্রতি জঘন্য ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা এ পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। এতে মনে হয় ইসলামের প্রতি এক রতি পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান থাকলে কেউ তাকে আপন বলা ত দূরের কথা-অন্তর থেকে ধিক্কার না দিয়ে পারে না। ইসলামের চোখে এ অপরাধ অমার্জনীয়। নজির আহমদ চৌধুরী 'এছলাম ও নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেন :

> বস্তুতঃ কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের পরস্পর বিরোধী আদর্শগুলোর প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই জানা যায় তিনি এসলামের তওহীদকে দুনিয়ার পিঠ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দু বঙ্গের নিম্ন শ্রেণির

Dhaka University Institutional Repository

পৌত্তলিক ভাবকে সেই স্থানে বসাইয়া দিতে চান। তাই এই অবাধ্য বিদ্রোহী কবি কালী দুর্গা প্রভৃতির নামে ভক্তিরসে একদম ঢল ঢল গল গল হইয়া পড়িয়াছেন।

কবি নজরুল ইসলাম এছলামের এই চরম ও পরম শিক্ষার মূল কাটিতে চাহিয়াছেন- একদিকে আল্লাহ কে অমান্য করিয়া তাঁহার বুকে পদাঘাত করার ও হাতুড়ির ঠেকিবার চরম ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া অন্যদিকে কালী, দূর্গা ও স্বরস্বতী প্রভৃতির পুজা অর্চনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পাইয়া। সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে এছলামের সর্বপ্রকার শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। (মোবাশ্বের আলী[১৩], ১৯৯৪ : ১৮২)

মাসিক মোহাম্মদীর ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৩৫) এম. আজিজার রহমান 'ইসলাম ও নজরুল কাব্য সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখেন :

নজরুল ইসলাম খোদার বিরুদ্ধে যেরূপ স্পষ্টভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সেরূপ কোনো সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই বটে, তবুও পরোক্ষভাবে তিনি যথেষ্টই করিয়াছেন। নামাজ পড়াকে, হযরতের প্রধানতম নির্দেশকে তিনি 'কাছা খুলিয়া পাঁচ ওক্ত ওঠ-বোস করা' বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। 'যাহারা নজরুলের কাব্য' সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার অধিকাংশ ধষষঁংরড়হ ও ৎবভবৎবহপব রামায়ণ মহাভারতের দেবদেবী সংক্রান্ত। কাজেই তাঁহার চিন্তাধারা ও আদর্শও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি! (মোবাশ্বের আলী[১৩], ১৯৯৪ : ১৮৩)

নজরুলের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে অনেকেই বলেছেন, নজরুল ইসলাম যাবতীয় নীতির মস্তকে পদাঘাত করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি চোর ডাকাত ও মিথ্যাবাদী বারাঙ্গনা প্রভৃতির যাবতীয় দুর্নীতিমূলক কার্যকেই জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন, বারাঙ্গনাকে নজরুল মা বলে সম্বোধন করেছেন :

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও- গায়ে ?
হয়ত তোমার স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী তবু ত তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি ;
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি ;
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ- দ্বারে।–

...

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৯)

মুসলমানদের প্রেমশক্তির সমস্ত উৎস ও দেবদেবি পূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, জেনা, চুরি, ডাকাতি মিথ্যা-এসমস্তই যদি তাঁর বাণী হয়ে থাকে তাহলে ইসলামের কি থাকে। এস. ওয়াজেদ আলীও মাসিক মোহাম্মদী পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যায় 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

আমাদের 'প্রতিভাশালী' কবি কাজী নজরুল ইসলামই হিন্দু মুসলেম কালচার সমন্বয়ে অপূর্ব স্বপ্নটি দেখেছেন। হিন্দু পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইসলামের তৌহিদকে মিলিয়ে তিনি নূতন একটা কিছু সৃষ্টি করতে চান। কবি নজরুল ইসলামের চিন্তার এবং সাধনার ধারা দেখলে কিন্তু মনে হয়, পুরাণই হবে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত কালচার খিচুড়ীর প্রধান উপকরণ, আর তাকে মুখরোচক করবার জন্য ইসলামিক একটা ফোড়ন দেওয়ার ব্যবস্থা হবে মাত্র। (মোবাশ্বের আলী[১৩], ১৯৯৪ : ১৮৪)

১৯২২ থেকেই *ইসলাম দর্শন* পত্রিকায় নজরুল-বিরোধী জেহাদ ঘোষিত হয়। সে জেহাদ অভিযানে, যোগ দেয় গোড়া, পত্র-পত্রিকা- *মোসলেম জগৎ, মোসলেম দর্পণ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী* ইত্যাদি। তীব্র কটুবাক্যে নজরুলকে আক্রমন করে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হল- 'এছলাম ও নজরুল সাহিত্য'। অন্যদিকে নজরুল-বিরোধিতার সর্বাত্মক অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিল *প্রবাসী* কর্তৃপক্ষ এবং *শনিবারের চিঠি*। ১৯২৪ থেকে সে বিরোধিতার সূত্রপাত এবং কয়েক বছরব্যাপী তা অব্যাহত থাকে। অভিযানের নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। নজরুলের সাহিত্যাদর্শ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে ছিল *শনিবারের চিঠির* আক্রমন। (নূরউল ইসলাম[১০], ১৯৮৩ : ১১)

নজরুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার বেড়েই চলল। নজরুলের সংবর্ধনা সভা পণ্ড করার চেষ্টা হয়। সংবর্ধনার জবাবে কবি যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি শত্রুপক্ষকেও পরোক্ষ বন্ধু বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু 'শত্রু' পক্ষের নিন্দাকুৎসা ও বিদ্রূপবাণে তিনি ক্ষতবিক্ষত হতেই থাকেন। হয়ত তাই এক সময় গভীর ক্ষোভে তিনি বলেন, 'দুঃখ হয়, এদেশে কেন জন্মালাম-এই নিন্দুকের দেশে। মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে। তবু এই মানুষ-এই পশুর জন্য আমি গান গাই।' (উদ্ধৃত, মনিরুজ্জামান[১২], ১৯৯৬ : ৭২)

নজরুল বিদ্রোহী কবি বলেই সর্ব মহলে পরিচিত। অনেকেরই ধারণা নজরুল প্রচলিত সবকিছুর বিরোধী ও সর্ববিষয়ে বিদ্রোহী। তাই তাদের ধারনা ধর্মের প্রতি নজরুলের কোনো আনুগত্য ছিল না। তাছাড়া তাঁর প্রতি গোঁড়া ধর্মবাদীদের আক্রমণে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার কারণে সর্বমহলে সমালোচনার স্বীকার হয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা করে গোলাম মোস্তফা 'নিয়ন্ত্রিত' (সওগাত, মাঘ ১৩২৮) কবিতায় লিখেছিলেন, –

ওগো 'বীর'
সংযত কর, সংহত কর 'উন্নত' তব শির।
'বিদ্রোহী ?'-শুনে হাসি পায় !
বাঁধন-কারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায় ?
সে কি সাজেরে পাগল সাজে তোর ?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোর?
ছি ছি লজ্জা, ছি ছি লজ্জা !
তোর কোথা রণ-সাজ-সজ্জা ?
তোর কোথা অনুচর অশ্ব-পদাতি-সৈন্য ?
শুধু হাহাকার, শুধু আঁখিধার, শুধু দৈন্য !
তোর স্থান কোথা ওরে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়াবার–
নিজ-অধিকারে দাঁড়াবার আর শত্রুসেনারে তাড়াবার ?
নাই নাই তোর কিছু নাই–
এই বাঁধন কাটিয়া বাহিরে কোথাও দাঁড়াবার তোর ঠাই নাই...
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৮৯০)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল চেতনায় যে আধ্যাত্মবাদের সন্ধান পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ কোরান-হাদিস ও ইরানি সাহিত্যের অধ্যাত্মিক গ্রন্থাবলির প্রভাব ভিত্তিক। হযরত আদম -হাওয়া (আ.) থেকে আধ্যাত্মবাদ শুরু হলেও পরবর্তীতে গ্রিক দর্শন ও ইরানীয় দর্শনের কথা প্রনিধানযোগ্য। ইরানি সম্রাট নওশেরোয়ানের রাজত্বকালে ইরানে আধ্যাত্মবাদ খুব প্রবল হয়ে ওঠে। তারই একটা পরিবর্তিত রূপ বরং বলা চলে সুফিবাদ বা আধ্যাত্মবাদের নবরূপ পরিগ্রহ করে ষষ্ঠ শতাব্দীতে (১৫০ হিজরি) আবু হাসিম এবং জুননুন মিশরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় তাঁদের আধ্যাত্মবাদের মূল ভিত্তি ছিল পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ। (আবদুস সাত্তার[২], ১৯৯২ : ৫)

মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঐদলভূক্ত ছিলেন 'তাপসী রাবেয়া'। তাঁদের থেকেই সুফিবাদ বিস্তৃতি লাভ করে মনসুর হুল্লাজ এবং বায়েজিদ পর্যন্ত এসে এক অলৌকিক রূপ নেয়। পরবর্তীতে বিশেষকরে ইরানীয় পণ্ডিত দার্শনিক, গবেষক ও কবিরা এ আধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য ফারসি কবিতার বিস্তৃত অংশই সুফিবাদে আবর্তিত। এ মতবাদে উল্লেখযোগ্য হলেন- ফারসি কবি হাফিজ, রুমী, সা'দী, আত্তার, জামী, শামস তাবরেজী, আনোয়ারী, নিজাম আল আরোদী, ভারতীয় কবি আমির খসরু দেহলভী, জেবুন্নেসা, ফারসি ও উর্দু কবি হালী, গালিব, ইকবাল প্রমূখ।

নজরুল উপরোক্ত কবিদের কাব্যের নির্যাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্য-সাহিত্যে। এ অধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে আরও অবদান রেখেছেন- হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.), খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.), নিজামউদ্দিন (র.), মোজাদ্দেদ আলফে সানী (র.) প্রমূখ অলি ও দরবেশগণ। এ অধ্যাত্মিকতার মূল সুর হল মহান আল্লাহ পরম সৌন্দর্যময়। পবিত্র কোরানের বাণী– الله نور السموات الارض (আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ) অর্থাৎ 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত আলোই আল্লাহ' (সূরা নূর : ৩৫)।

কাজেই সেই মহা সৌন্দর্যময় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ অন্যায়, অত্যাচার, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থ, পাপ, ইত্যাদি পরিহার করে মহান আল্লাহর সেই পরম সৌন্দর্যে নিজেকে ধাবিত, একাকার করে দেওয়া। ইরানের মানবতাবাদী কবি শেখ সা'দীর বাণী অনুযায়ী এক ফোটা শিশিরবৃন্দ যখন সমুদ্রের পানিতে পড়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ঠিক তেমনি মহান আল্লাহর পরম সোন্দর্য ও পবিত্র নূরে নিজেকে হারিয়ে ফেললে অভিষ্ট সিদ্ধ হবে এবং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। সুফিতত্ত্বের এ পর্যায়কে বলা হয় 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায় অর্থাৎ আল্লাহর আলোতে নিজের বিলুপ্তি। অধ্যাত্মবাদের এ 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায় পৌঁছতে আরও তিনটি অধ্যায় অতিক্রম করতে হবে। যেমন– শরিয়ত, হাকিকত ও তরিকত। এ তিন পর্যায় অতিক্রমের পরই হলো মারেফাত বা ফানাফিল্লাহ অর্থাৎ আত্মবিলোপের পর্যায়।

মনসুর হুল্লাজ এ মারেফাত বা ফানাফিল্লাহ পর্যায়ে পৌছে 'আনতাল হক' (انت الحق) 'তুমি সত্য' এর পরিবর্তে উচ্চারণ করলেন 'আনাল হক' (انا الحق) 'আমি সত্য'। তাঁর 'আনাল হক' বলার কারণ হলো মনসুর হুল্লাজ যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে তাঁর নূরের আলোতে বিলিন হলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করার আদেশ হলো। মনসুর হুল্লাজের নিজের উক্তি-

من نمی گویم انا الحق یار می گوید بگو

نمی گویم مرا دلدار می گوید بگو

'মান নেমি গুইয়াম আনালহক ইয়া'র মিগুইয়াদ বেগু

Dhaka University Institutional Repository

নেমি গুইয়াম মারা' দিলদা'র মিগুইয়াদ বেগু'
আমি বলতে চাইনা 'আনাল হক' কিন্তু বন্ধুর আদেশ 'বলো'
আমি বলতে চাইনা অথচ আমার বন্ধু বলেন 'বলো বলো'।
(উদ্ধৃত, আবদুস সাত্তার[২], ১৯৯২ : ৬)

মনসুর হুল্লাজ আত্মবিলোপের পূর্বে ঘোষণা করে রেখেছিলেন, 'এমন পর্যায়ে পৌঁছে যদি আমি শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে ফেলি তবে তার জন্য আমার প্রতি উপযুক্ত শাস্তি প্রযোজ্য'। অবশ্য তাই করা হয়েছিল। তাঁর শাস্তি স্বরূপ যখন তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হলো ; তখন আল্লাহর অপার রহস্যে সেই বিচ্ছিন্ন শিরের মুখ থেকেও অনর্গল উচ্চারিত হতে লাগল, 'আনাল হক, আনাল হক'। সুফিবাদের এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করে কবি হাফিজ মনসুর হুল্লাজ সম্পর্কে বলেছিলেন,

انا که مثل منصور بربرنده، هردند

'আনাকে মেছলে মনসুর বর বারান্দা, হরদান্দ'

[মনসুরের মতো যাঁরা শির ত্যাগ অর্থাৎ আত্মদান করতে পারেন তবে তারাই আল্লাহ প্রেমের উপযুক্ত।]

এ প্রসঙ্গে হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) বললেন 'ফানাফিল্লাহ' এর পর্যায় পৌঁছে কোরআন-সুন্নাহ সম্বলিত শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ করলে তিনি শাস্তি পাবার যোগ্য হবেন। তিনিও শাস্তি পেয়েছিলেন, 'সুবহানা'(**سبحانا**) 'তুমি পবিত্র' এর স্থলে তিনি যখন বলেছিলেন 'সুবহানী' (**سبحانى**) 'আমি পবিত্র' তখন পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করা হলো আর একই সঙ্গে পাথর নিক্ষেপকারীরাও মারা গেল। 'অলৌকিক এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই, মুহূর্তের মধ্যে বায়জিদ হয়ে গেলেন এক স্বচ্ছ আয়না এবং সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলো মৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ অবয়র। আল্লাহর রহস্যময় জগতে এসব কি কম রহস্যময় ব্যাপার ?' (আবদুস সাত্তার[২], ১৯৯২ : ৭)

উপরোল্লিখিত বিষয়ের সাথে নজরুলকে এনে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব– হযরত আলীর বাণী, (**من عرف نفسه فقد عرف ربه**) 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু', অর্থাৎ 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকেও চিনতে পেরেছে'; সংস্কৃতে শ্লোক আছে, 'আত্মানং বিদ্ধি'; ইংরেজিতে আছে, 'Knoweth thyself'; এমন কি আমাদের লালন ফকির বলেছেন- 'আগে আপনারে চিনলে পরে যাবে অচেনারে চেনা' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনে সে তার প্রভূকে চিনে'। নিজেকে জানলেই সব সাফল্য। ইত্যাদির মাধ্যমে নজরুল নিজের মধ্যে খুঁজলেন তাঁর সেই চরম চাওয়া পরম ধন মহান বস্তু আল্লাহকে। নজরুল বললেন, 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন/ খুঁজি তাঁরে আপনায়'। নজরুল আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে বলেন :

সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার সকলের মাঝে তিনি !
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্ম দাতারে চিনি।
... ...
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা ! সত্য- সিন্ধু জলে।
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল 'আমার সুন্দর' কবিতায় আবেগ উচ্ছ্বসিত ভাষায় সুন্দরের ব্যাখ্যা করেছেন। আমার সুন্দর-কে খোঁজা মানে কবির নিজেকে-'আমি'কে খোঁজা। কবির নিজস্ব সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে মিলেছে কবির শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। আপন সৃষ্টিবৈচিত্রের সঙ্গে পরিবর্তমান মনোভঙ্গির একটা সুসঙ্গত সূত্রবদ্ধতা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

যখন নজরুল ইসলাম আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে গেলেন তখন একটা নূর বা আলোর ঝিলিক তাঁকে স্তব্দ করে দিলো। তাঁর ভাষায়– অশনি আলোকে হেরি তাঁরে/ থিরবিজলী আলোকে 'অভিরাম'। অভিরাম অর্থাৎ পরম সৌন্দর্যের জ্যোতিতেই তিনি শুধু হতবাক হলেন না, একদম বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল এবং উপলব্ধি করলেন :

আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়।
(আবদুস সাত্তার[২], ১৯৯২ : ৮)

নজরুল নিজেকে চিনেছেন বলেই বলেছেন :

আমি চির বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

নজরুল আত্মবিলোপের পর্যায়ে পৌঁছে বললেন, 'আমি পাগল লা-ইলার' অথবা 'খোদার নামের শরাব নিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে'। তারপর থেকেই নজরুল 'পাগল' বা 'বেহুশ' এবং নীরব ছিলেন। আর এ রহস্য হলো নজরুলের 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়।

নজরুলের সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। এ ভাণ্ডার আলো স্বরূপ। যার কোনো ক্ষয় নেই। সংস্কৃত শ্লোকের ন্যায় :- 'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম'। অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞান দান করলে কখনো নিঃশেষ হয় না বরং 'যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে'। নজরুলের সুফিতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত জ্ঞানও তদ্রূপ। (আবদুস সাত্তার[২], ১৯৯২ : ৮)

'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌছার যে স্তরভাগগুলো চিত্রের মাধ্যমে নজরুল এমন বিষদভাবে প্রদর্শন করেছেন যে, তা একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পরিপক্ক সুফি কবির পক্ষেই সম্ভব। শরিয়ত, হকিকত, তরিকত এই তিন পর্যায়ে পার হয়ে তবে মারেফাত বা 'ফানাল্লিাহ' পর্যায়ে পৌঁছতে হয় এবং এই স্তরে পৌঁছানোর পূর্বশর্ত- ঈমান (অদৃশ্য মহাশক্তিশালী আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস) ; তালাব (অদৃশ্য মহাশক্তির অনুসন্ধান) ; ইরফান (আল্লাহ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহর নূর বা আলোতে বিলীন বা লয়প্রাপ্ত)।

উপরোক্ত পূর্বশর্ত ছাড়াও আছে বহু স্তর ভাগ এবং সবগুলো স্তরের মূল কথা নিজেকে পবিত্র বা নির্মল করা। পবিত্র না হলে মহা পবিত্রে পৌঁছা অসম্ভব। বহুস্তর ভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : তওবা (অনুশোচনা– জাগতিক লালসা ত্যাগ করে অনুশোচনার মাধ্যমে কেবল আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা) ; তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয়) ; তাওয়াজ্জু (নত থাকা, নতি স্বীকার করা) ; তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল) ; জিহাদ (ষড়রিপু দমনে যুদ্ধ) ; জোহদ (লোভ লালসা থেকে বিরত থাকা) ; শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) ; একিন (আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস) ; তওহিদ (আল্লাহর একত্ব স্বীকার করা) ; জিকর (আল্লাহকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্মরণ করা) ; সিদ্‌ক (সকল কাজে সততা পালন করা) ; ইরাদা (আল্লাহকে পাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করা) ; কুতোয়া (জীবনের ঝুঁকি থাকলেও পরের উপকার করা) ; মাহাব্বা (আল্লাকে পাবার জন্য সৃষ্টের সেবা করা) ; শওক (আল্লাকে পাবার

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্খা বা ইচ্ছা)। এ ধরনের যত মহৎ গুণাবলি আছে সবই অর্জন করতে হবে 'ফানাফিল্লাল' পর্যায়ে পৌঁছুতে এবং নজরুল ইসলাম চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন এই তথ্য। তাঁর ব্যাখ্যা যুক্তি নির্ভর।

শুধু মুসলিম দর্শন সম্বলিত সুফিতত্ত্বের ব্যাখ্যাই নয় বরং একই সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন সম্পৃক্ত যোগসাধন ও শূন্যবানদের তত্ত্বকথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন চিত্রের মাধ্যমে। নজরুল ইসলামের পাণ্ডিত্য যে, কত বিচিত্রমুখী ছিল এসব তাই প্রমাণ করে।

নজরুল ইসলামের কাছে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ কোনো এক চিঠিতে বলেন, 'ভাই নজরুল, তোমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যারা বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাদেরই একজন তোমার সুবেহ উম্মিদ পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন... বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে, বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর।' উক্ত চিঠির উত্তরে নজরুল লিখেছিলেন,

> শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান সাহেব... ইসলামের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিত স্বীকার করি, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন,' নজরুলের কবিতা, 'আল্লাহ বলরে ভাই নবী কর সার/ মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার' অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও দুলল এবং ভবনদীও পার হওয়া যায়। আমার বিদ্রোহী পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তারা যে হাফিজ-রুমীকে শ্রদ্ধ করেন এ-ও আমার মনে হয় না। জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। (নজরুল ইসলাম[৯], ১৯৯৩ : ৩৯৪)

নজরুল ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক গ্রন্থাবলির সাথে সাথে কোরআন, তাফসির-ই-হোসাইনী, তাফসির-ই-বাইযাকী, তাফসির-ই-বাকি, তাফসির-ই-আজাদী, আকরম খান ও মাওলানা রুহুল আমীনের আমপারাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলি অধ্যায়ন করতেন। তিনি সূরা ফাতেহার অনুবাদে লিখেছেন-

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভূ ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু !
(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ৩৩৯)

সে কালের বিখ্যাত আলেমগণের ১২ দিনের বিভিন্ন পর্যালোচনায় নজরুলের আমপারার অনুবাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনেকেই নজরুলকে 'আজাজীল' ও নাস্তিক বলে ভূষিত করেছেন। তবে তিনি কেমন নাস্তিক যে কবি জগদীশ্বরকে পদাঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ করেন আবার 'অগ্নিবীণা'য় দেখি সেই 'আজাজীল' কবির মুখ থেকেই বের হচ্ছে :

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ !
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩: ৩০)

সরকারী প্রচার দফতরের প্রকাশনা শাখা 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক লেখেন :

> জাতীয় জীবনের উদ্‌গাতারূপে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবেই বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তাহার মতো এমন করিয়া মনে প্রাণে, কাজে কর্মে কোন বাঙালি কবি নিজের দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসিতে পারেন নাই, দেশের জনগণের ভালাবাসাও এমন করিয়া আর কেহ পান নাই। কবি যে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করিলেন, তাহাই বাংলা সাহিত্যের নূতন যুগের ভিত্তি প্রোথিত করিল ; তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যে এই বিদ্রোহের সুরই সর্বত্র অনুরণিত হইয়াছে। এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, তাহার পুরোভাগে যুগ-প্রবর্তক কবিরূপে নজরুল ইসলামই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। (উদ্ধৃত, মনিরুজ্জামান[১২], ১৯৯৬ : ৭৪)

যে ব্যক্তি ভগবানের বুকে লাথি মারে; সেই আবার 'আল্লার নামে জান কোরবানী' করে; এ কেমন আজাজীল, কেমন কাফের ? তাঁর অপরাধ তিনি ভগবানের বুকে লাথি মেরেছেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কি বুক আছে ? যদি বুক থাকে তবে ভগবতীও আছে। তাতে অবশ্য হিন্দুদের ক্ষেপার কথা ; কিন্তু মুসলমানরা ক্ষেপলেন কেন ? অনেকের অভিযোগ ; নজরুল কখনও কখনও জগদীশ্বর, ভগবান ও ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য, তাদের কাছে প্রশ্ন এ শব্দগুলো কি 'রব্বুল আলামিন' শব্দের প্রতিশব্দ ? কবি যদি বলতেন ; 'ভগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি, ভগবতী বুকে এঁকে দিব পদচিহ্ন' তাহলে কি তারা খুশি হতেন ? কবির বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ; তাঁর লেখার মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ রয়েছে, তাঁর উত্তরে যদি বলি, পারস্য সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'শাহনামা'য় মুসলমান কবি ফেরদৌসি অগ্নি-উপাসক ফারসি রাজাদের গুণগান গেয়েছেন, অবশ্য এ জন্য কোনো মুসলমান সমালোচক নিন্দা করেছেন কি ? অবশ্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল – কাউকে আপন করতে হলে প্রেম দ্বারা করতে হবে, হিংসা দ্বারা নয়। কোনো লেখককে বিচার করতে হলে তার সমস্তটা নিয়েই বিচার করতে হবে আর নজরুলের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর হাজার হাজার গণ্ডা ইসলামি কবিতা বাদ দিয়ে 'বিদ্রোহী' আর 'ধূমকেতু' নিয়ে কেহ কেহ বিচার করেছেন। তারা যেভাবে সে দু-তিনটি কবিতা নিয়ে বিচার করেছেন কবি কি সে হিসেবে 'বিদ্রোহী' ও 'ধুমকেতু' লিখেছেন ? নাকি তারা কবির এ দু-তিনটি কবিতার অমর্যাদা করেছেন ? অবশ্য কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পড়ে বিচার করলে প্রকৃত বিষয় পরিস্কার হবে। সাপ্তাহিক-মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা যেভাবে নজরুলকে কাফের, শয়তান ও আজাজীল বলে চিহ্নিত করেছিল সওগাত এর সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করেছে। আবার সওগাতের উদ্যোগে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হলে দেখা যায় মোহাম্মদী পত্রিকা তা ভণ্ডুল করতে সচেষ্ট হয়। (মোবাশ্বের আলী[১৩], ১৯৯৪ : ২০৮-২০৯)

নজরুল মনের কষ্টে লিখেছেন :

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে,
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশে, বেণী যাবে যবে খুলিতে
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ১২৮)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. আতোয়ার রহমান, *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল : ফালগুন, ১৪০০/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

২. আবদুস সাত্তার : *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, প্রকাশনায়- নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল- ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৯৬/ মার্চ ১৯৯০, বা/এ-২৩৭৮।

৪. কৃষ্ণগোপাল রায়, ডঃ : *কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশিকা : শ্রীমতি শিখা সরকার, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৮।

৫. জুলফিকার হায়দার, সুফি : *নজরুল-প্রতিভা-পরিচয়*, সুফি জুলফিকার হায়দার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশঃ ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৯১/ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

৬. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৭. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশঃ ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৮. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৯. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

১০. নূরউল ইসলাম, মুস্তফা : *সমকালে নজরুল ইসলাম*, ১৯২০-১৯৫০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ/ ১৩৯০, নভেম্বর, ১৯৮৩; প্রকাশনা নং বা.শি.এ. ২৪।

১১. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *ইসলাম ও নজরুল ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণঃ বৈশাখ-১৩৯৪/ এপ্রিল-১৯৮৭, ই.ফা.বা. প্রকাশনাঃ ৬০০/১।

১২. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ : *নজরুলচেতনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০৩/জুলাই ১৯৯৬, প্রকাশক : রশিদুন্ নবী, গবেষণা কর্মকর্তা, কবিভবন, বাড়ীনং-৩৩০-বি, সড়ক নং ২৮৯ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

১৩. মোবাশ্বের আলী : *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল-রবীন্দ্রনাথ ও পারস্যপ্রেম

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কিছু লিখলেই বাংলা সাহিত্যের অপর শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এসে যায়। উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায়, তাঁদের পারিবারিক পটভূমি, জন্ম থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও মৃত্যু পর্যন্ত উভয়ের শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে পদচারণাসহ সমগ্র জীবন ধারাতেই ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এঁদের একজন যেখানে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে অন্যজনকে বাল্যকাল থেকেই জীবিকার তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াতে হয়েছে।

শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত এই বাস্তবতার নিরিখেই নয়– জীবন-কালের নিরিখেও রবীন্দ্রনাথ যেখানে পেয়েছিলেন ৮০ বছরের দীর্ঘ জীবন, নজরুল সেখানে ১৯৪২ সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার কারণে পান মাত্র ৪৩ বছরের কর্মক্ষম জীবন। ফলে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির সময় পান মাত্র দুই দশকের সামান্য বেশি। এতসব পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দু'জন কবির নাম করতে বললে যে কেউ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নামই বলবেন।

নজরুলের সাহিত্য জীবন শুরু এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-খ্যাতি মধ্যগগনের সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল এবং রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে সাহিত্যচর্চা অসম্ভব বলে গণ্য করা হতো। নজরুলই প্রথম কবি যিনি রবীন্দ্র ধারার বাইরে কাব্যের এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আকুতি জানিয়েছেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে/ তোমার চরণ ধূলির তলে/ যত অহংকার হে আমার/ ডুবাও চোখের জলে'; সেখানে নজরুল বীরদর্পে ঘোষণা করেছেন, 'বলবীর! বল উন্নত মমশির'। নজরুলের কবিতার এই বিদ্রোহাত্মক, বীররসাত্মক ভাবধারার কারণে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম উভয়ই জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত পরাধীন ভারতে। পরাধীন ভারতে বিদেশি শাসকদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ উপহার পেয়েছিলেন 'নাইট' উপাধি[১] আর নজরুল ব্রিটিশবিরোধী ব্রিটিশবিরোধী লেখালেখি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এসব কারণে ১৯২৯ সালেই যখন রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি দেশজোড়া, তখন কলকাতার এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমান বিশিষ্ট নাগরিকরা নজরুলকে সংবর্ধনা দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির জাতীয় কবি[২] আখ্যায় ভূষিত করেন।

শুধু ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, নজরুলের কবিতা ও গান পরাধীন দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের ক্ষেত্রেও প্রেরণা যুগিয়েছে আগা-গোড়া।

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল এক মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক- যাঁরা অবিরল সাধনায় উচ্চারণ করেছেন মানবমুক্তির বাণী। তাঁদের জীবন, জগৎ-ভাবনা ও সাহিত্য সৃষ্টির ধারা লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা ছিলেন

---

[১] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এ উপাধি জালিওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফিরিয়ে দেন।

[২] আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবী রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, নজরুল আমাদের জাতীয় কবি, কারণ তাঁর কবিতা ও গান যেমন আমাদের রাজপথে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহস যোগায়, তেমনি আমরা যখন জেলে যাই তখন কারার লৌহ কপাট ভাঙতে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতেও প্রেরণা যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায়, অত্যাচার, আগ্রাসন ও মানবসত্তার অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। যখনই বিশ্ব মানব-সমাজের কোনো অংশ অত্যাচারী শাসকের হিংস্র আগ্রাসনের শিকার, যখনই পৃথিবীর কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত; তখনই তাঁদেরকে দেখা যায় প্রতিবাদে মুখর ও দ্রোহিতায় শাণিত। তাঁদের সকল চিন্তা ও কর্মের প্রাণশক্তি ছিল মানবকল্যাণদর্শন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভা নিয়ে নজরুলের জন্ম না হলেও রবীন্দ্রনাথের পর এত বড় প্রতিভাবান কবি দেখা যায় না। নজরুল আমাদের যা দিয়েছেন আর কেউ সেরূপ দিতে পারেন নি। কেউ কেউ নজরুলকে খাটো করার জন্য বলেন, নজরুল সাধনাহীন কবি, রবীন্দ্রনাথের মতো জ্ঞানার্জন দ্বারা স্বীয় প্রতিভা উন্নত ও উজ্জ্বল করতে সচেষ্ট হন নি। তাঁদের এ মনোভাব গ্রহণযোগ্য নয়। আলাওল থেকে নজরুল-পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বাংলা সাহিত্যে বহু কবির আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু নজরুলের ন্যায় কেউই সাহিত্য-প্রেমিকের বিহ্বল মনকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হন নি। এজন্য তাঁর মধ্যে বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের ভালবাসা অর্জন করেছেন। তাঁর রচনার স্বচ্ছতা ও সবলতাই সকলকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। নজরুল রবীন্দ্রযুগের সমসাময়িক কবি হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রবির উজ্জ্বল জ্যোতি নজরুল-প্রতিভাকে ম্লান করতে পারে নি। নজরুলের যুগ প্রবর্তক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আর এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছে। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবীর চৌধুরী বলেছেন, 'এরা আমাদের দুই অনির্বাণ বাতিঘর, আমাদের তাজমহল ও কান্তজীর মন্দির, আমাদের আইফেল টাওয়ার ও স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আমাদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস।' (রশীদ হায়দার[২০], ২০১৩ : ১৬)

ভাষা ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু হিন্দুদের কবি নন; মুসলমান বাংলাভাষীদেরও কবি। তেমনি নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের কবি নন; বাংলাভাষী হিন্দুদেরও কবি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয়েই বাঙালি সম্প্রদায়ের সম্পদ ও গৌরব। ধর্মের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকর্ম অসাম্প্রদায়িক বলে প্রমাণ করা যায় না। তবে নজরুল ইসলাম অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার রেখে গেছেন, নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনিই একমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের কবি। তিনি সাম্যবাদী কবি, বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি ও প্রেমের কবি হিসেবে উজ্জ্বল ও স্মরণীয় হয়ে আছেন। নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন-রেখা অতিক্রম করে উভয় সম্প্রদায়ের কবি হবার চেষ্টা করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ধর্মীয় বিভাজন-রেখা অতিক্রম করতে পারেন নি।

নজরুল ছিলেন ভোগে নয়; ত্যাগে বিশ্বাস কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ত্যাগে নয়; ভোগে বিশ্বাসী। ভোগবাদী ব্যক্তিত্বগণ সুন্দর সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে কিংবা বাক্যের বিলাসিতায় যতোই আকর্ষণীয় কবিতা, গাণ, গল্প ও উপন্যাস রচনা করুক না কেন তাঁরা কখনো ব্যক্তিগত জীবনে স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। এঁরা যতোই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোক না কেন তাঁদের সৃষ্টি কর্মে সমষ্টিগত স্বার্থ বা সর্বজনীনতা থাকে উপেক্ষিত। তাই দেখা যায় ১৭৫৭ সালের পর স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান মুজাহিদরা একদিনের জন্যও বসে থাকেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সাহিত্যকর্মে তাঁদের গৌরব গাঁথা এমনকি নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়েও কোনো বক্তব্য ও মন্তব্য নেই।

বৃটিশরা ছলে বলে কৌশলে এদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, এদেশের সম্পদ পাচার করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন অজুহাতে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে না খাইয়ে মেরেছে, এমনকি '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব যখন ব্যর্থ হয় তখন বিজয়ী ইংরেজরা সমগ্র দেশে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। শুধু ঢাকায়ই এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ৬০ জন নিরীহ মুসলমানকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো। সেসব হতভাগ্যের লাশ দাফন করতেও দেয়া হয়

Dhaka University Institutional Repository

নি। মাসাধিককাল গাছের ডালে ঝুলিয়ে অসভ্য বর্বর ইংরেজরা উল্লাস প্রকাশ করেছিলো।'(আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ঞ, পূর্বকথা)

এসব পাশবিক উল্লাসে মত্ত লুণ্ঠনকারী ইংরেজরাই ছিলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে খুবই সুসভ্য জাতি। এ প্রসঙ্গে নির্ঝরিনী সরকার নামে এক মহিলাকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন; 'বৃটিশ শাসন হল ঈশ্বরের শাসন। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অন্যায়।' (আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ঞ, পূর্বকথা)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতি হলো সুসভ্য জাতি। অপরদিকে নজরুলের দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতি ছিলো জালেম জাতি, পররাজ্যে দখলকারী-লুণ্ঠক। রবীন্দ্রনাথ যখন এই ইংরেজ জাতির ভালোবাসায় লিপ্ত; নজরুল তখন ইংজের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত। ইংরেজ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' বইটি প্রকাশিত হয়ে কারাগারে বিতরণ হয়েছে; আর নজরুলের বই একটার পর একটা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার পরও যখন নজরুলকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করা যায় নি তখন তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কয়েদিদের প্রতি কারাগার কর্তৃপক্ষের অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কবি যখন ৩৯ দিন অনশনের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি লিখেন। এ সম্পর্কে আবুল হাশিমের উদ্ধৃতি দিয়ে এস. মুজিব উল্লাহ তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ' গ্রন্থে লিখেছেন :

> মনীষী আবুল হাশিমের মুখে শুনেছি, কবি নজরুল ইসলামকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ করেছেন না বলে সভা সমিতি বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা হচ্ছিল।... অনুরোধে তিনি এক চিঠি লিখেন। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, রবন্দ্রিনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতা করাকে জাতীয় কর্তব্য মনে করেছিলেন; আর অন্যদিকে নজরুল আজাদী আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তাই কবি নজরুলকে তাঁর চরম শত্রুরাও বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করতে পারেন নি। (উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ট, পূর্বকথা)

তবে বয়সের জ্যৈষ্ঠতার কারণেই হোক বা বিস্ময়কর প্রতিভার কারণেই হোক বা ভক্তির আতিশয্যেই হোক নজরুল রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নজরুলের বহু বক্তব্য ও মন্তব্যে এর প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের অতি ভক্তি প্রমাণের জন্য রবীন্দ্র প্রেমিকেরা প্রায়ই একটি মন্তব্য জুড়ে দেয়। নজরুল বলেছিলেন : 'বিশ্ব কবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রোপ করেছে।' (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৪)

এ মন্তব্য নিয়ে সুধী মহলে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই এটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এস, মুজিবুল্লাহ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল হাশিমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন :

> আবুল হাশিমের মুখে শুনেছি অন্যরকম কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের যেমন শ্রদ্ধা ছিল তেমনি ছিলো প্রত্যাশা। তিনি আশা করেছিলেন উপনিবেশবাদে বিরোধী সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিবেন। অসাধারণ শক্তিশালী কলম নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং এসে দাঁড়াবেন পুরোভাগে কিন্তু দেখলেন, সংগ্রামের কাতারে তিন তো এসে দাঁড়ালেনই না। উপরন্তু ইংরেজদের শাসনকে ঈশ্বরের শাসন বলে অভিহিত করলেন। প্রকৃত পক্ষে তখনই তার মোহভঙ্গ ঘটে এবং তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রদত্ত শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধার বাজে খরচ হিসেবে মনে করতে থাকেন নজরুল। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি সম্ভবতঃ ইতরসুলভ কলহ এড়ানোর জন্যই। (আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ট, পূর্বকথা)

Dhaka University Institutional Repository

বয়সের জ্যেষ্ঠতার কারণেই হোক বা বিস্ময়কর প্রতিভার কারণেই হোক বা ভক্তির আতিশয্যেই হোক নজরুল রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কবি নজরুল বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দাবি মিটাতে গিয়ে পৌত্তলিকতার দর্শন তাঁর সাহিত্যকর্মে স্থান দিয়েছেন। এজন্য তিনি পরবর্তী জীবনে তওবাও করেছেন। তাছাড়া তাঁর জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন এধরনের কবিতায় :

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোসলমান,
আল্লাহ ভিন্ন মানিনা অন্য আমি চির-নির্ভীক-প্রাণ।
আমি মৃত্যুর মাঝে চিরদিন খুঁজি নব জীবনে সন্ধান,
আমি আগুনের হল্কা, ঘূর্ণিত উল্কা খোদ-ই তেজে তেজীয়ান।
(উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ঠ)

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে আমরা তৃপ্তি ও গর্ব বোধ করি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের তুলনা নজরুল নিজেই; আর রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কাউকে ছোট বা খাট করার লক্ষে এ পর্যালোচনা নয়। মহামূল্যবান বস্তু অথবা অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সাধারণ লোকেরাই যাচাই-বাছাই করে থাকে, যাতে প্রতারিত না হয়। কারণ সাধারণ লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতারিত হলে সারা জীবনেও সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায় না। এক আউন্স স্বর্ণ ক্রয় করতে গেলে এর মান, উৎকৃষ্টতা কষ্টি পাথর দিয়ে যাচাই করা হয়। কিন্তু লৌহখণ্ড টনের পর টন ক্রয় করলেও কষ্টিপাথর দিয়ে কেউ যাচাই করে না। মূল্যবান বস্তু এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কবি নজরুল বলেছেন-

মোরা সত্যের লাগি যুঝিব পরান পণ
মোরা বুঝিব সত্য, পুঁজিব সত্য
খুঁজিব সত্য ধন।
(উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ঢ)

১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই কবিতাচর্চায় প্রবেশ করেন। তেরো বছর বয়স থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি সুদীর্ঘ ৬৭ বছর বিনা বাধায়, বিনা উপদ্রবে জমিদারি স্টাইলে সাহিত্যচর্চা করেছেন। নজরুল রবীন্দ্রনাথের ৩৮ বছরের ছোট। নজরুলের জন্মের সময় রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *চৈতালী*, *কল্পনাট*, *ক্ষণিকা* প্রকাশিত হয়েছে। বারো-তেরো বছর বয়সে নজরুল যখন অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য-সংস্কৃতির নায়ক ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে নন্দিত। কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্য জগতে নজরুলের পাকাপাকি প্রবেশের পূর্বেই *গীতাঞ্জলি*, *নৈবেদ্যর পর্ব*, *বলাকা*, *পলাতকা* কাব্য লেখা শেষ করে *পূরবীর* কবিতাগুলো লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর দেশ ও সমাজ সমস্যাবিষয়ক উপন্যাস 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'; নারী-স্বাতন্ত্র্যের বার্তাবাহী বেশ কিছু কবিতা এবং 'স্ত্রীর পত্রে'র মতো গল্প প্রকাশিত হয়েছে। দেশ সমাজ-ভারতবর্ষীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা, ধর্ম, ইতিহাস রাজনীতি-আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন সভায় পঠিত হয়েছে এবং গ্রন্থ হিসাবে বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ 'বহুমুখী চিন্তায় রবিরশ্মি তখন বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র সাহিত্য সাম্রাজ্যের মধ্যে রবীন্দ্র প্রতিকূল রেখায় গর্জে ওঠেন- যা সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কিছুটা সক্ষম হলেও কুমুদরঞ্জন, কিরণধন, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান প্রমুখ কবিগণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সক্ষম হন নি।

যেখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল অভিজাত পরিবারে কাটে সেখানে নজরুলের বাল্যকাল কেটেছে ইরানি কবি হাফিজের অর্ধাহার, অনাহার, পিতৃবিহীন অভাবী সংসারে, রবীন্দ্রপরিমণ্ডল থেকে বহু দূরে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবিতা-গান নয়; বরং তাঁকে টেনেছিল লেটো গান -লেটো গানের দল, যেখানে থেকে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গেয়েছেন। ১২/১৩ বছর বয়সে ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে পড়ার সময় স্কুলের অনুষ্ঠানে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি' আবৃত্তি করতে দেখা গিয়েছিল। কবিতাদ্বয় তাঁকে বেছে দেওয়া হয় নি, তিনি নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। 'পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই কবিতা দুটি আবৃত্তি করেছিলেন নজরুল; আগে থেকে বেছে দেওয়া হলে তাঁকে প্রস্তুতি নিতে দেখা যেত।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩০)

কবিতা দু'টি তাঁর মুখস্থই ছিল। এতে প্রমাণিত হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার আকর্ষণে পড়েছিলেন। এ কবিতায় আরো প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রোমান্টিক কবিতার তুলনায় অবহেলিত মানুষকে নিয়ে লেখা কবিতাই তাঁর বেশি পছন্দনীয়। তাই নজরুলের জীবনের অধিকাংশ কবিতা গরিব, দুঃখী, অসহায়, অনাহারী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় বলেছেন :

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু জানো তো হে, করেছি বাগানখানা
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা-
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে-
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি-
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

...

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!

...

আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।'

Dhaka University Institutional Repository

আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে-
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!'
(উদ্ধৃত, মওলা[৫], ১৯৯২ : ২৮৪-২৮৬)

নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছেন। সুতরাং পরিবেশের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাহিত্যেও লক্ষণীয়। মাসিক মোহম্মদীর জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ সংখ্যার 'আমাদের কথা-সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়েছে :

> কাব্যে নজরুল ইসলামের স্থান বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পরেই, উপরন্তু কতকগুলি বিষয়ে নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের উপরে স্থান দিতে পারি। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতিগত প্রভেদ রয়েছে,-একজন সমস্ত অত্যাচার, অনাচার, দুঃখ, দারিদ্র, অভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন-এ বিদ্রোহ তার চিরন্তন, এর মধ্যে কোথাও সন্ধির স্থান নেই। আর একজন আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হয়েছেন, সাহিত্য তার নিকট অনেকটা বিলাসের সামগ্রী-বুর্জোয়া ইনটেলেকচুয়ালের অবসর বিনোদনের একটা উপাদান। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভাকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না, তবে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কার প্রতিভা বড় এ নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবসর রয়েছে। (আলী[৯], ১৯৯৪ : ১৯৫)

জীবনের প্রথম দিন থেকে নজরুল সর্বহারাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আর এ সংগ্রাম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ীত্ব ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের 'দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়' নামক একটি প্রবন্ধ কবিতায় তিনি বলেন :

দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই;
আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই।
তাদের সাথে কাঁদিব, তাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম;
দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।
(উদ্ধৃত, আহমদ[১১], ১৯৮৭ : ৫১৪)

১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাবস্থায় গোপনে 'লাল ফৌজের' নতুন নতুন অভিযানের বার্তাবহ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতেন। ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন উঠে গেলে করাচি থেকে ফিরে আসেন কলকাতায়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে একসঙ্গে অবস্থানকালে সাম্যবাদী চিন্তায় জড়িয়ে পড়েন। স্থিতচিত্তে সাহিত্য পাঠের অবকাশ তাঁর কম হলেও 'মুজফ্ফর আহমদের সাক্ষ্যে জানা যায় মার্কসবাদের ওপর কয়েকটি বই তিনি কিনে আনলেও নজরুল সেগুলো পড়েন নি। কিন্তু তাঁর কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান বা প্রবন্ধের উল্লেখ, চরণ উদ্ধার অথবা প্রভাবরশ্মি লক্ষ করে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা চলে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তালোক তাঁর কবিচিত্তেও আলোক বিচ্ছুরণ করেছে।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩০)

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় আমরা দেখতে পাই তিনি কাউকে কুর্নিশ করেন না, কবির ভাষায় :

বল বীর-
আমি চির-উন্নত শির।
আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।

...

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৮)

কাজী নজরুল ইসলাম কি সত্যিই কুর্নিশ করেন নি! আমরা দেখতে পাই তিনি ১৯২১ সালে বাইশ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ষাট বছর বয়সের কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সঙ্গে ছিলেন মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ যিনি বর্তমানে বহু ভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ নামে খ্যাত। ঘরে ঢুকেই কবিগুরুর পা ধরে সালাম করলেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে নজরুল নিজেই বলেছেন[১], 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।' (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৪)

'রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাকাল ৬১ বছর বিস্তৃত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার'। (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ৮৪) ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত বলেন : 'নজরুল সর্বসমেত প্রায় তিন হাজারেরও বেশী সঙ্গীতের রচনাকার। পৃথিবীতে সংগীত রচনার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় রেকর্ড আমার জানা নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা আনুমানিক দু'হাজারের কিছু বেশি গান রচনা করেছিল।' (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ৩০৮)

রবীন্দ্রনাথের বাড়িটি ছিল সংস্কৃতিচর্চার এক অসামান্য কেন্দ্র। এ পরিবারে ইরানের কবি হাফিজের গজলের চর্চা হত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসি সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। যাঁকে 'হাফিজে হাফিজ' বলা হতো; যিনি ইরানের কবি হাফিজের কাব্যসমগ্র মুখস্থ করেছিলেন বলে কথিত আছে। 'দেবেন্দ্র ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর আমলে সংগীতকেন্দ্ররূপে এই বাড়ীর বিপুল অভ্যুদয় ঘটলেও এর সঙ্গে সাংগীতিক আবহ সম্পৃক্ত হয়েছিল আরো আগে, দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ রামলোচন ঠাকুর (১৭৫৪-১৮০৭) এর সময়ে। রামলোচন সংগীতামোদী ছিলেন এবং পেশাদার গায়ক বাদকদের স্বগৃহে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে সমারোহের সঙ্গে সংগীতানুষ্ঠান করতেন। রামলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন[২] স্বয়ং সংগীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ গায়ক, রাগসংগীত ও পাশ্চাত্যসংগীত পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ।' (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ৭৭-৭৮)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পারস্যপ্রেমিক। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'পারস্যে' উল্লেখ করেন, পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না।' ফারসি ভাষা নিজস্ব এবং বাংলা ভাষা ধার করা- এ সত্যটি স্বীকার করে এবং পারসিয়ানদের অতিথিপরায়ণতার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *পারস্যে* বলেন :

---

[১] নজরুলের এ মন্তব্যটি নিয়ে সুধী মহলে বিতর্ক রয়েছে।

[২] দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা শিখে আইন ব্যবসা শুরু করেন। একজন 'ল' এজেন্ট হিসাবে তিনি পরবর্তীকালে পাবনায় এক বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। দ্বারকানাথ ছিলেন জমিদার। জমিদারি ছিল তাঁর ব্যবসা। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুতে এ সমস্ত জমিদারির দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। তিনি জমিদারি সুরক্ষায় একজন নিষ্ঠুর শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

Dhaka University Institutional Repository

> যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভ কামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৫৮)

রবীন্দ্রনাথের দেশ ও কাল চিন্তায় সর্বভারতীয় ও সর্বদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে তাঁর রচিত *পারস্যে*। এ *পারস্যে* রবীন্দ্রনাথ একজন ইতিহাস পর্যবেক্ষক, যিনি ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এতে পরস্পর গৌরবের ঘটনাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আবার ভারতের কষ্ট, বেদনাক্রান্ত বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ঈদ সংখ্যা ১৩৪৫-এ ফজলুল রহমান 'আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে' নজরুলের প্রশস্তি সম্পর্কে লিখেছেন :

> বাংলার জাতীয় ও বিশ্ব মানবতার কবি হিসাবে নজরুলের স্থান মাইকেল হেম-নবীন-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চেয়ে উর্ধ্বে। দানের দিক দিয়েও বাংলায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয়না, তাঁর দান এমনি উঁচুতে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'মেঘনাদে'র ভাব-ব্যঞ্জনা দান হিসাবে বাংলা সাহিত্যে অভিনব উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু 'অগ্নিবীণা', 'সর্বহারা', 'বুলবুল', 'জুলফিকার' প্রভৃতির নুতন ছন্দ, ভাব-ভাষ্য-সুর এ সকল কোন অংশে নিকৃষ্ট? ...কল্পনা- গৌরবের দিক দিয়ে নজরুল-প্রতিভা মাইকেল হতে শ্রেষ্ঠ না হলেও নিকৃষ্ট কোন অংশেই নহে। কিন্তু শিল্প কলাকুশলতাও স্বসৃষ্ট সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ভাষা-ছন্দ-সুর, সর্বোপরি দার্শনিকতার দিক দিয়ে মনে হয়, নজরুল-প্রতিভা মাইকেল প্রতিভার চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ তাঁর প্রতিভা যে মাইকেলের মত সঙ্কীর্ণ নয়, বিরাট ও বহুমুখ এতে সন্দেহ নেই। (আলী[৯], ১৯৯৪ : ২০২)

২

রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, ১৯০৫-এর পর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নেপথ্য সক্রিয়তা প্রায় চিরকালই ছিল; কিন্তু সরাসরি কোনো দিনই রাজনীতিকে তাঁর কবিতারাজ্যে প্রবেশ করতে দেন নি। সত্যেন্দ্রনাথও রাজনীতিতে তেমন উৎসাহী নন। যদিও অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'চরকার গানে'র মতো কতিপয় কবিতা লিখেছিলেন; যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল রাজনীতিকে আদৌ প্রশ্রয় দেন নি; কিন্তু নজরুল রাজনৈতিক ঘূর্ণিবার্তা সঙ্গে নিয়েই কাব্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। '১৯২৫ সালের শেষের দিকে তিনি (নজরুল) প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেন।' (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ১৫৫)

রাজনীতিকে বাদ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি; এমনকি রাজনীতির কারণে তাঁর একটির পর একটি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। নজরুল ইসলামই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার একমাত্র কবি যাঁকে রাজনৈতিক কবিতা লেখার দায়ে জেল খাটতে হয়েছিল। তিনি রাজনীতি ব্যবসায়ী নন। তাঁর রাজনীতির উৎস সুগভীর দেশ প্রেম। দেশ বলতে নজরুল নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটিকে বোঝেননি, মানুষকে বুঝেছিলেন। সেই মানুষের বিপদাপদ, সংকট, সমস্যা, দুর্গতি ও মানসিক ক্ষোভ মোচনের জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এ জন্যই তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের উৎখাত করার প্রসঙ্গের পাশাপাশি, দেশীয় নেতাদের ঠকবাজী সরল বিশ্বাসী মূঢ় মানুষদের

Dhaka University Institutional Repository

শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি গর্জে উঠেছিলেন; তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতি শোষণের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছিলেন।

নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশরাজ উৎখাত করে তথাকথিত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা হলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে না– দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য চাই সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত এক স্বচ্ছ সমাজ। এ কথা যদি তিনি না বুঝতেন তবে তিনি কেবল 'লৌহ কপাট', 'ভাঙ্গার গান' বা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' জাতীয় ব্রিটিশবিরোধী কবিতাই লিখতেন; ধর্ম, অর্থ, স্বরাজ, রাজনীতি, দেশপ্রেম, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির নামে নানাবিধ - বলা যায় সর্ববিধ শোষণ আর ভারতবাসীর যুগ-যুগান্ত পালিত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন না। অতএব, নজরুলকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলতেই হবে; এই দূরদৃষ্টির পরিচয় তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যময় করে তুলেছে। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ২৭)

১৯২২ সালের অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ। ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা। ব্রিটিশ সরকার ঐ কবিতা ও *যুগবাণী* গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে এবং নভেম্বরে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ করে। ১৯২৩ এর জানুয়ারিতে বিচারে নজরুলের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন; তাই নজরুল আলীপুর জেলে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন :

বসন্ত নাটিকার উৎসর্গ পত্র, ফাল্গুন, ১৩২৯,

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু

১০ই ফাল্গুন, ১৩২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ইসলাম[১০], ১৯৮৩ : ২৪)

নজরুল এ সম্পর্কে তাঁর মানস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> তাঁর এই আশীর্বাদ মালা পেয়ে আমি জেলের সব জ্বালা, যন্ত্রণা, অনশন ও ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নি, তিনিও বলেন নি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিন হস্ত দিয়ে আমায় 'সুন্দরে'র আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা ক্লেশ দূর করতে।' (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৩২)

১৯২২ সালের মে মাসে হুগলি জেলে নজরুল অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ সংবাদ গোপন করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয় নি। দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, খবর গিয়ে পৌঁছেছে শিলঙে রবীন্দ্রনাথের কাছেও। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেলের ঠিকানায় তারবার্তা লিখে পাঠিয়েছেন : 'Give up hunger strick, our literature claims you" (উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৪)

তবে জেল-কর্তৃপক্ষ সে তারবার্তা নজরুলকে না দিয়ে 'Address not found' লিখে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৫ লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপাত্র হিসাবে 'লাঙল' পত্রিকা বের করেন, এর ত্রয়োদশ সংখ্যা (২৫ মার্চ ১৯২৬) থেকে পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের একটি আশীর্বাণী প্রকাশিত হতে থাকে; যেখানে তিনি নজরুলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন :

জাগো জাগো বলরাম
ধরো তব মরুভাঙা হল।
ফল দাও ফল দাও
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।
(উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৪)

নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হলে সেখানে রাজবন্দির ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ থেকে অনশন পালন করেন। 'আমার সুন্দর' নিবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন :

> তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি, রাজবন্দিদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানা রকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিঙক-ফেটার্স', 'বার-ফেটার্স', 'ক্রস-ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৩২-৩৩)

নজরুল চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র ছিলেন, তাই তাঁর আবদারকে তিনি সর্বদাই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিযাত্রাকে উৎসাহিত করেছিলেন। নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করায় যাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাঁকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি, আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ, আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি; অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছমাত্র।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৪) আবার কবিতায় লিখেছেন :

হে সুন্দর বহ্নি দগ্ধ মোর বুকে তাই।
দিয়েছিলে বসন্তের পুষ্পিত মালিকা।

রবীন্দ্র-অনুচরেরা নজরুলের প্রতি বিশ্বকবির এই স্নেহ প্রকাশে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা কটাক্ষ করেছিলেন- 'বসন্ত দিল রবি, তাইত হয়েছ কবি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের কটুকাটব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, 'আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।' (উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৩)

জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল; তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি।' (উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৩)

রবীন্দ্রনাথের উক্তির সত্যতা অনুভূত হয় 'বসন্ত' নাটিকাটি পাঠ করলে। এখানে বকুল-মাধবী-মালতী-নদী- দখিনা হাওয়া-ঝুমকো-লতা- আকন্দ-ধুতুরা- আম্রকুঞ্জ- বেণুবন- দীপশিখা-বনভূমি সবার মধ্যে আনন্দ জাগিয়ে তুলেছে ঋতুরাজ-'সুখের বাসা ভেঙ্গে ফেলে', 'অস্তগিরির শিখর চূড়ে', 'ঝড়ের মেঘের ধ্বজা', ওড়ানোর-

Dhaka University Institutional Repository

'খেলা ভাঙার খেলা'য় মাতিয়ে তুলেছে, যার তীব্র আকর্ষণে রাজার রাজগৌরবও তুচ্ছ হয়ে গেছে। সেই ঋতুরাজের জীবনবাণী ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে- 'আয়রে সবে/ প্রলয় গানের মহোৎসবে/'। কবি গুরুর রচনা বৈগুণ্যে ঋতুরাজ তার স্বরূপ হারায় নি অথচ আমাদের এও মনে না হয়ে যায় না যে এই ঋতুরাজই যে নজরুল। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৩)

গ্রন্থটি পাওয়ার পর নজরুল যে কতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য তাঁর 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতা- যা এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রচিত হয়ে 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল-

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে-
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৪৭)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের অকৃত্রিম ও সুগভীর ভক্তির সাক্ষ্য কখনই কম ছিল না। 'সঞ্চিতা' সংকলনটি নজরুল বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন। আবার বন্ধুদের 'নাগরিক' পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে গিয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে ২৮/৪/১৯৩৫ তারিখে লিখেছিলেন :

> শ্রীচরণারবিন্দেষু, গুরুদেব! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্যলক্ষ্মী হিজ্ মাষ্টার্স, ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি, আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি। আমার কয়েজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু 'নাগরিক' পরিচালনা করছেন। গতবার পূজায় আপনার কিরণ-স্পর্শে 'নাগরিক' আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবারও আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আপনার যে কোন লেখা পেলেই ধন্য হব। ভাদ্রেরই শেষেই পূজা সংখ্যা 'নাগরিক' প্রকাশিত হবে, তার আগেই আপনার লেখনী-প্রসাদ পাব, আশা করি। আপনার স্বাস্থ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করলাম না। ইতি-প্রণত- নজরুল ইসলাম। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৪৩০-৪৩১)

বরীন্দ্রনাথ লেখা দিতে পারেন নি; কিন্তু তিনি ১/৯/১৯৩৫ তারিখে নজরুলের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন অত্যন্ত স্নেহ-সুকোমল ভাষায় :

> কল্যাণীয়েষু, অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুশি হল। কিছু দাবি করেছ- তোমার দাবি অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এ পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনও অনেক দেরী আছে এই জন্য আমার শীর্ণ শক্তি ও জীর্ণ দেহের পরে তোমার দয়া নাই। ...তুমি তরুণ কবি, এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক করুণা দাবি করতে পারে। নিক্কিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিওনা। ...শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়- কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আসতে পারো খুশি হবো। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি ১৫ ভাদ্র, ১৩৪২, স্নেহরত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৬)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সু-সম্পর্ক সত্ত্বেও একবার নজরুল রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। ১৯২৭ (১৩৩৪ ফাল্গুন) প্রেসিডেনসি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভ্যর্থনার উত্তরে 'কবির অভিভাষণ'[১]-এ বরীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছিলেন :

সে দিন কোন একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তাহলে বুঝব, সেটাতে তারই আকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে। আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণ বর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাখবার জন্য যাদের উষাকে নিউমার্কেটে 'খুন' ফরমান করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু। তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৭)

'শনিবারের চিঠিতে' সজনীকান্ত এর যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সেখানে এ অংশটি বেরিয়েছিল 'সেদিন কোন একজন বাঙালি কবির কাব্যে দেখলুম...' এইভাবে। অর্থাৎ 'হিন্দু' শব্দটি বাদ গেছিল।'(রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৭)

নজরুল এ সম্পর্কে বলেন, 'কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি'-ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যাই করুন (জানি না এ সংবাদ সত্য কি-না) ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।' (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৯)

নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি তখন বেশ বিখ্যাত। সেখানে তিনি ফারসি 'খুন' শব্দের ব্যবহার করে লিখেছিলেন,

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর'!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।
(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৮৮)

নজরুল সন্দেহ করলেন বরীন্দ্রনাথ কথাগুলো তাঁর সম্পর্কেই বলেছেন! তিনি লিখে ফেললেন 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধটি এবং তা 'আত্মশক্তিতে' প্রকাশিত হল। এ প্রবন্ধে তিনি তাঁর মনের ক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। এ ভালবাসার লোকের এ কথাটি কবিকে কতটা কষ্ট দিয়েছিল তা আমরা উক্ত প্রবন্ধে লক্ষ করতে পারি, এখানে নজরুল বরীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখলেন :

---

[১] পরে কবি নিজেই এই মোখিক ভাষণ লিখে নিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

> আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে। 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর। আমি শুধু 'খুন' নয়- বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৭)

একদিন নজরুল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর একটি গান শুনিয়েছিলেন, সে গানে তিনি ফারসি 'খুন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'খুন' শব্দের তিরস্কার সম্পর্কে নজরুলের ধারণা, হয়ত রবীন্দ্রনাথ ঐ গানের মধ্যে 'খুন' শব্দটি দেখেই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। নজরুল বলেন,

> আমার একটা গান আছে- 'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' এ গানটি সেদিন কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও- কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে-'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার'ও করা চল্‌ত। চল্‌ত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্তখারাবি'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ২৭)

রবীন্দ্রনাথ 'খুন' শব্দের ব্যবহার কেন করেছেন, অথবা আগন্তুক শব্দকে কোনো পরিস্থিতিতে কবিরা ধরে থাকেন-এখানে সেই পরিস্থিতি রয়েছে কিনা নজরুল তা পরিস্কার করতে পারেন নি। কিন্তু নজরুলের প্রকৃতি এমনই ছিল যে, তাঁর উত্তেজিত হতে এবং শান্ত হতে বেশি সময় লাগত না। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ সালে তৎকালীন সাহিত্য-সমাজের সম্প্রাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে নজরুল লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, 'দেখ্ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত কীটস-এর মত খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ।' জীবনে সেই ট্রাজেডি দেখবার জন্য আমি কতদিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি, কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেছিল বিশুষ্ক মরুভূমির মত তপ্ত-মেঘের উর্ধ্বে শূন্যের মত। কেবল হাসি কেবল গান। কেবল বিদ্রোহ-যে বিপুল সমুদ্রের ওপরে এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না। তাতে কত বড় বড় জাহাজ-ডুবি হল, সেইটেরই হিসেবে রাখলে শুধু, -আর সে যে কত যুগ ধরে আপনার অতল তলায় বসে কেবলই শুক্তির পর শুক্তির বুকে মুক্তা-মালা রচনা করে গেলে এবং আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রইল তার সেই মুক্তামালা, -এ খবর কেউ রাখলে না। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৪০৩)

কারও কারও বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নজরুল-প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সে গোড়াতেই।[১] এ সম্পর্কে শ্রী অবিনাশ ভট্টাচার্যের জবানী থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নজরুলের 'বিদ্রোহী'

---

[১] অনেকে বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নজরুলের অঘোষিত অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথ যতো দিন বেঁচেছিলেন ততোদিন নজরুলের ওপর কোন আঘাত আসে নি। তিনি পুত্রস্নেহে তাঁকে আগলে রেখেছেন। কিন্তু সজনীকান্তের কুৎসা, মোহিতলালের অভিশাপ এবং রবীন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারী তা প্রমাণ করে না। রবীন্দ্রনাথের

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা সম্পর্কে এ রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন : 'আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে সন্দেহ নেই।' (উদ্ধৃত, ভট্টাচার্য[৩], ১৩৬২ : পুরানো কথা)

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলের গুরু, তা শরৎচন্দ্রের এক পত্রে ফুটে উঠে। ১৯২৩ সালে ১৭ মে কানপুরে শ্রীমতি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র এক পত্রে নজরুল সম্পর্কে লেখেন :

> 'হুগলি জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১ টায় গাড়িতে যাইতেছি। দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যিকার কবি, রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এবার কেহ আর এত বড় কবি নাই। (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ৫৮) 'অবশেষে অনশনের ৪০তম দিনে বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস খেয়ে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন।' (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ১৫৩)

নজরুলের হৃদয়ে বরীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটি ছিল স্থায়ী। তাই বরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি 'রবিহারা' নামে যে কবিতা রচনা করেন এবং যা বেতারে আবৃত্তি করেন, পরে রেকর্ডও হয়েছে, সওগাতে ভাদ্র, ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেও এই শ্রদ্ধার প্রকাশ পায় :

তব ধরিত্রী মাতার রোদন তুমি শুনছিলে না কি
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলেনা আর আখি?
আজ বাংলার নাড়ীতে নাড়ীতে বেদনা উঠেছে জাগি;
কাঁদিছে সাগর নদী-অরণ্য, হে কবি, তোমার লাগি।
... ...
তোমার গরবে গরব করেছি ধরারে ভেবেছি সরা;
ভুলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য দীনতা উপবাস ক্ষুধা জরা।
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মত।
তোমার গরবে ভাবিতে পারিনি; আমরা ভাগ্য হত।
... ...
আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে আশিস যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৮৪ : ৩৮-৩৯)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল গভীর শুন্যতা উপলব্ধি করেন। 'ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে জাগায়ো না' অথবা 'সালাম অস্ত-'রবি'' তেও এই ভাব আমরা দেখতে পাই। 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না' কবিতায় কবি বলেন :

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না।

সাথে সজনীকান্তের ছিলো দারুণ সখ্যতা। কিন্তু একদিনের জন্যও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা থেকে সজনীকান্তকে বিরত রাখেননি। সুতরাং নজরুলের বিরুদ্ধে হিন্দু বাবুদের সুগভীর চক্রান্তের ধারাবাহিকতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। (আহমেদ[১১], পৃ. ৫৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না।
যে সহস্র করে রূপরস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া,
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না।
যে তেজ শৌর্য শক্তি দিলেন আপনারে করি' ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও।
বিদেহ রবিও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও
অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেই খানে তাঁরে নিত্য কর প্রণতি
(আর) কে'দে তাঁরে কাঁদায়ো না।
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৮৪ : ১৩৫)

'সালাম অস্ত-রবি' তে কবি বলেন :

কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে! বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণী জানি না সে কত দিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা;
রেখায় রেখায় রূপ দিবে আর কাহার ছন্দ-লেখা?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া?
...
ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী
আরবের ইমরুল-কায়েস্ যে ছিলে এক সাথে তুমি!
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি'
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি'
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস!
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৮৪ : ৩৫৩)

১৯৪১ এ রবীন্দ্র জন্মদিনে নজরুল এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন :

রচণারবিন্দে লহ অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত -এ কবির।
অশীতি বার্ষিকী তব জন্ম উৎসবে
আনিয়েছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।

Dhaka University Institutional Repository

(উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৮)

নজরুল 'কিশোর রবি' ও 'পচিশে বৈশাখ' নামে আরো দুটি কবিতা রচনা করেন। প্রথমটিতে বরীন্দ্রনাথকে চির কিশোর এবং দ্বিতীয়টিতে মৃত্যুঞ্জয়ী রূপে উপলব্ধি করেছেন। 'কিশোর রবি' কবিতায় নজরুল বলেন :

হে চির-কিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন্ রসলোক হ'তে
আনন্দ-বেণু হাতে ল'য়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি ক'রে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
কত যে কথায় কাহিনীতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চির-কিশোর সে প্রেমময়।
...
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝরে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া কর দয়া কর বলি' বারে বারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক, হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে'
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৮৪ : ৩১-৩২)

'রবির জন্মতিথি' কবিতায় নজরুল বলেন :

রবির জন্মতিথি দেখেনি সেজন
আজো তার কাছে রবি অপ্রয়োজন।
কবি হয়ে এল রবি এই বাঙলায়
দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয়?
রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
তাঁরি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
অক্ষর-জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অ-ক্ষর অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে। মানুষ দিবে তাঁরে প্রেমপ্রীতি।'
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৮৪ : ২৩০)

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪২ এ নজরুল 'তীর্থ পথিক' নামে যে কবিতা রচনা করেছেন, সেখানে বরীন্দ্রনাথের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী:

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা
পর্বত সম শত দোষ ত্রুটি ও চরণে হ'ল জমা
জানি জানি তার ক্ষমা নাই, দেব, কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে।
(রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৮)

যুদ্ধ-প্রত্যাগত নজরুল কলকাতায় প্রথম আসর জমাতেন বরীন্দ্রনাথের গান গেয়ে। রবীন্দ্র সংগীত যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী ছিল তার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে, নানা গানে ও কবিতায়। আড্ডায়, সংগীত আসরে, একান্ত পত্রলিখনে, প্রবন্ধ লেখায়, গানে, পত্রিকায়, হাস্য-পরিহাসে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিক্ষেপে বরীন্দ্রনাথ নিবিড় হয়ে যেন চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছেন নজরুলের মধ্যে। নজরুল 'রবীন্দ্র-বিরোধী' কবি, এটা বলা হয় অন্য অর্থে, 'আসলে বরীন্দ্রনাথের এতবড় ভক্ত কবি খুব বেশি নেই। নজরুল তাঁর জীবনের শেষ যে সভায় যোগদান করেছিলেন সেটি ছিল বরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আয়োজিত হাওড়ার বিরাট শোক সভা। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৩৯)

১২ আগস্ট, ১৯২২ সালে নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শিরোভূষণ রূপে মুদ্রিত আশীর্বাণী প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নজরুলকেই। এ পত্রিকার জন্য প্রেরিত রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণীতে বলেন : কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েযু-

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ১০)

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বিখ্যাত আশীর্বাণী বহন করে ধূমকেতুর যাত্রা শুরু হয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করে চলাই ছিল ধূমকেতুর লক্ষ। তখন রাজনৈতিক পরিবেশে এ পত্রিকাটি যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনও এ পত্রিকার কাছে ঋণী। 'ধূমকেতুর মাধ্যমে (১৩ই অক্টোবর, ১৯২২ সংখ্যা) বাংলা থেকে নজরুল ইসলামই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান' (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ১৫২)

আবার রবীন্দ্রনাথ যখন পারস্য সফরে গিয়েছিলেন তখন হাফিজের মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে, হাফিজের দেওয়ান হাতে নিয়ে চোখের পানি ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করে ফালগ্রহণ করেছিলেন। কবির ভাষায় : 'মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধকার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।' (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৬১)

Dhaka University Institutional Repository

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি মুদ্রণের জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং ২৩ নভেম্বর ১৯২২ কুমিল্লায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারাধীন নজরুলকে রাখা হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে। ১৬ জানুয়ারি ১৩২৩ প্রদত্ত রায়ে কবির ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আদালতে আত্মসমর্পণ করে নজরুল যে বিবৃতি প্রদান করেন তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে খ্যাত। নজরুলকে পাঠানো হয় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। কারাবরণ করে নজরুল দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেন। ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ কবিকে আলীপুর জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে কবিকে রাজবন্দির পরিবর্তে সাধারণ কয়েদী হিসাবে গণ্য করে জেল সুপার 'আর্স্টন' কবির সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। 'এই সুপারের উদ্দেশেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির প্যারড়ি করে রচনা করেন তাঁর 'সুপার (জেলের) বন্দনা' : তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।' (গোস্বামী[৮], ১৯৯০ : ১৫৩)

নজরুল আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা এদেশের রাজনীতিক চেতনার ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। জবানবন্দিটি ২৭ জানুয়ারী ১৯২৩ (১৩ মাঘ ১৩২৯) তারিখে ধুমকেতুতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নজরুলের ছবিসহ পুস্তকাকারে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতা প্রেসিডেন্স জেল থেকে ৭ জানুয়ারি, ১৯২৩ রবিবার দুপুরে তিনি তা লিখেন। এতে সম্ভবত নজরুল রবীন্দ্রনাথকে তার বিচারক হিসাবে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

> আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।... আমি ভগবানের হাতে বীণা। বীনা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে?... শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার-বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে, তাঁকে ডাকছে মরন, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়তারার আলোর মিলন হবে কিনা বলিতে পারি না।... আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধুমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। (নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৫০)

রবীন্দ্রনাথ ১৪০০ সাল কবিতায় বলেন :

> আজি হতে শতবর্ষ পরে
> কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
> কৌতূহলভরে-
> আজি হতে শতবর্ষ পরে।
> (উদ্ধৃত, মওলা[৫], ১৯৯২ : ২০১)

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কবিতাটি পড়ে শতবর্ষ পরের পাঠকের পক্ষ থেকে জবাব দিয়ে নজরুল লিখেছিলেন :

আজি হতে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে,
আজি হতে শত বর্ষ আগে। ...
আজি মোরা শত বর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে। ...
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি ক'রেছিলে নবীনেরে
রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কমল হ'য়ে তব পদতলে!
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫২২-৫২৫)

একজন অগ্রজ এবং অনুজ কবির মধ্যে ভক্তি ও ভালবাসাই আদান প্রদানের একমাত্র বিষয় নয়; তার চেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ হল উত্তমর্ণ অধমর্ণের ব্যাপার। বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে বরীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ধনীতম ও সম্রান্ত পরিবার থেকে এবং নজরুল এসেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ্রদাস প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় দরিদ্রতম পরিবার থেকে। বরীন্দ্রনাথ যত সুসংযত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সুপরিনিয়োজিত, সুসন্তুলিত, ঠিক নজরুল তার উল্টো–তত বেহিসাবী, কবির ভাষায় :

আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৭)

বরীন্দ্রনাথ শান্ত রসের কবি, আর নজরুল শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত, হাস্য ইত্যাদি নানাভাবে কিছু কবিতা লিখলেও স্বকীয় হলেন রুদ্ররসে। যেখানে নজরুল বিদ্রোহী সেখানে বরীন্দ্রনাথ সত্যার্থী; যেখানে নজরুল প্রমূর্ত যৌবন, সেখানে বরীন্দ্রনাথ সুপরিণতি। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল দুজনেই গায়ক, সুরকার, জনতার দরবারে গান গেয়ে দু'জনেই নাম করেছেন জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রথম ধাপে।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪০)

৩

নজরুলের রোমান্টিক কবিতা ও গানগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় ; যদি নজরুল বিদ্রোহ বিপ্লবের গান ও কবিতা না লিখতেন তাহলে তিনিও রবীন্দ্র-রশ্মি সমাচ্ছন্ন কবিদেরই দলভুক্ত হতেন। বিদ্রোহ-বিপ্লবের গান ও কবিতাগুলো তাঁকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। কবি নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তার গুরুত্বই এখানে। বরীন্দ্রনাথ নিজেও নজরুলের এদিকটিকে ভালবাসতেন। 'ধূমকেতু' বা 'লাঙ্গলের' আশীর্বাণী যার সাক্ষ্য। তাঁরা উভয়েই ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

মানবদরদী কবি। নজরুল মানবজীবনের আর্থিক সংকট-সমস্যা, দারিদ্রের পীড়ন এবং যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আপন বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা যা বরীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পুরুষানুক্রমে সংসারে জমিদারি লক্ষ করেছিলেন। এদেরই ছবি তিনি এঁকেছেন রতন, উপেন, কেষ্টা, রাইচরণ প্রভৃতির মধ্যে; 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এদেরই কথা বলার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। কবির ভাষায় :

> সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
> তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
> মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে...
> (উদ্ধৃত, মওলা[৫], ১৯৯২ : ১৭৪)

কিন্তু 'সত্যমূল্য' দেবার সাধ্য ছিল না জেনেই বানিয়ে বানিয়ে তাদের গল্প লেখার শৌখিন মজদুরি করে 'সাহিত্যের খ্যাতি' তিনি চুরি করতে চান নি। এই 'সত্যমূল্য' দেবার শক্তি ছিল নজরুলের। হয়ত বরীন্দ্রনাথও সেটা বুঝেছিলেন। কিন্তু নজরুল পরবর্তীকালে 'দারিদ্র', 'ধীবরদের গান', 'চাষার গান', 'ছাদ পেটার গান', 'শ্রমিকের গান', 'কৃষাণের গান' বা সাম্যবাদী কবিতার ন্যায় কতিপয় কবিতা লিখলেও 'বাংলার খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী ও সমস্যাপীড়িত মানুষের বাস্তব আর্থ সামাজিক অবস্থান, আর্তনাদ ও মহিমার কথা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সত্য অভিজ্ঞতার অভাবে বরীন্দ্রনাথও এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিয়ন্ত্রিত জীবন্ত চলচ্ছবি আঁকতে এগিয়ে আসেন নি, এগিয়ে আসতে চান নি। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে সভ্যতার পিলসুঁজ এই যারা 'চিরকাল ধরে থাকে হাল/ যারা মাঠে মাঠে বীজ বোনে/ পাকা ধান কাটে' ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় তাঁদের আর্থ সামাজিক অবস্থান, আবহমান সময় প্রবাহে সভ্যতার ভাঙাগড়ার মধ্যে তাদের ভূমিকা বরীন্দ্রনাথ তাঁর পারমিত প্রজ্ঞায় সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন– যার সাক্ষ্য তাঁর শেষ বয়সের নানা কবিতা।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪১)

বরীন্দ্রনাথ কোনো একটি জাতির মন্দ অংশকে বর্জন করে তার ভালকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী; অপরদিকে নজরুল এর বিপরীত। নজরুলের মধ্যে দেশ ও জাতির ভেদাভেদ বর্তমান। তিনি সমগ্র ইংরেজ জাতির ঘোর বিরোধী। ইংরেজ সহায়ক জাতি ও দেশের প্রতি তিনি বিদ্বেষপূর্ণ; অপরদিকে রাশিয়া, চীন, প্রভৃতি দেশের প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে। তুর্কী এবং কামাল পাশার প্রতি তাঁর উৎসাহ, আয়ারল্যান্ডের প্রতি তাঁর সমর্থন। কারণ, তারা ইংরেজদের শত্রু।

কবি হিসাবে তিনি সকল কালের সকল মানুষের হতে চেয়েছেন[১], রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বিষ্ট, সুতরাং উগ্রজাতীয়তাবাদী এবং চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী, আবার রুশ বিপ্লবের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতির স্বপ্নদর্শী। একদিকে তিনি 'সকল কালের' কবি বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে লিখেছেন, 'বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই 'নবী'। (নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৯২)

কিংবা 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে' (নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৯৫) কিম্বা 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি- এরি অভিযান সেনাদলের তুর্য-বাদকের একজন আমি-এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।' (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৯০) এখানে 'তাঁর ইচ্ছা, দাবি এবং আত্মঘোষণার সংহতিহীন বৈপরীত্য। সুতরাং তাঁকে 'সকল কালের, সকল মানুষের কবি' বললে বাড়িয়ে বলা হবে,

[১] এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বরীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী বলাও ঠিক হবে না। আসলে তাঁর নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক দর্শন নেই, আবার কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের কাছে তিনি প্রতিবদ্ধও নন। বরীন্দ্রনাথে রয়েছে চিন্তার পরম সংহতি, নজরুলে রয়েছে চিন্তা শৃঙ্খলার অভাব।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪২-৪৩)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ বাঙালি কবি প্রবক্তা নজরুল। বরীন্দ্রনাথ ভারত বর্ষের আদর্শ তাঁর কবিতায় তুলে ধরলেও, পৃথকভাবে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কোনো কবিতা লেখেন নি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। বিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে চরঘোষপুরের পটভূমিতে অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ছবি এঁকেছেন। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম, সেক্ষেত্রে হিন্দু-নেতাদের ত্রুটি কোথায়, ভ্রান্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপের ফল কী এবং ভবিষ্যৎ সমস্যার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভারতচিন্তায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মতোই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরও সম্মানিত স্থান সাদরে স্বীকৃতি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের প্রতিটি দাঙ্গায় কবি অত্যন্ত বেদনার্ত হয়েছেন।

১ মার্চ ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কবি বলেছিলেন, 'ধর্মের নামে যে ভাতৃ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে নাস্তিকতাও সমাজের এত অনিষ্ট করিতে পারে নাই।... ধর্মের ইতিহাসে অধর্মের কার্যাবলি ভ্রাতৃ- শোণিতের অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।'... সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাবিরোধী সভায় (টাউন হল, কলকাতা) অতিজীর্ণ শরীরে উপস্থিত হন বরীন্দ্রনাথ (তাঁকে সভাতে এসেই অক্সিজেন নিতে হয়); সাম্প্রদায়িকতার উৎস এবং নিরাকরণ প্রসঙ্গে এদিন (১৫ জুলাই ১৯৩৬) তিনি বলেন : 'আমার চিরদিনের বিশ্বাস এই যে, প্রধানত মূর্খতা ও প্রাচীন যুগীয় যুক্তিহীনতা বশতই আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দ্বারা সেই ভেদ বিভেদ দূর করা সম্ভব।' (উদ্ধৃত, রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪৩)

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন তাঁর অনবদ্য কবিতা ও গানের অগ্নিসম্ভার নিয়ে। স্বদেশি আন্দোলন তাঁর কাছ থেকে আশাতীত প্রেরণা, সাহায্য ও সমর্থন লাভ করল, কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় দেশজোড়া হাহাকার, নৈরাশ্য ও আর্থিক সমস্যা কবিকে গভীরভাবে বিচলিত করতে পারল না। মহাযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি 'বলাকা' (১৯১৬)-তে মহাযুদ্ধকালীন ভগ্নহৃদয়, দারিদ্রজর্জর ও নৈরাশ্যপীড়িত দেশ ও সমাজের বিশেষ কোনো ছাপ পড়ল না। মহাযুদ্ধের শেষে নিদারুন আর্থিক সংকট দেখা গেল। দেশে বিদেশি শাসকদের অকথ্য-অত্যাচার ও শোষণের নিষ্ঠুর অভিযান শুরু হল। এ সময় রাশিয়ার সর্বহারাদের বিপ্লব বয়ে আনল আশার সাফল্য। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। ঠিক এ সময় রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' শেষ করে 'পূরবী'র যুগে প্রবেশ করলেন, কিন্তু দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনায় এগিয়ে এলেন না।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেণিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চমৎকার গ্রন্থ 'সহজ পাঠে' নিম্নশ্রেণির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে মার্কসবাদে বিশ্বাসী পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার স্কুল পাঠ তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নজরুল নির্যাতিত, শোষিত ও উৎপীড়িত জনগণের সংঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো লিখেছিলেন। সমাজের দুঃখী মানুষের একজন হয়ে অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল শ্রমিকদের উদ্দেশে 'কুলি-মজুর' কবিতায় লিখেছেন :

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
...
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে আছে কলে,
বলত এ-সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?- ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক', কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!
...
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশি।
এক জনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৪৬-২৪৭)

নজরুলের কবিতা ও গানের ছন্দে ফুটে উঠেছে শোষিত, উৎপীড়িত ও ব্যথিত মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা। যেমন :

সারাদিন পিটি যার দালানের ছাদ গো,
পেট ভরে ভাত পাইনা, ধরে আসে হাত গো।

তিনি নিঃস্ব মানুষের পক্ষে লিখেছেন :

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইকি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে র'বে তেতালার পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল 'সর্বহারা'র 'কূলি-মজুর' কবিতায় লিখেছেন :

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৮০)

কবি নজরুল 'কৃষাণের গান' কবিতায় লিখেছেন :

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ ক'ষে লাঙল।
আমরা মর্‌তে আছি-ভাল ক'রেই মর্‌ব এবার চল্ ।
...
আজ জাগ'রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৮০)

তিনি আরো লিখেছেন :

একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা-সকলের অপমান!
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান!
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৪৭)

কবি নজরুল 'শ্রমিকের গান' কবিতায় লিখেছেন :

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে!
...
ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে!
...
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে এই বিপ্লবী ও প্রতিবাদী গান লিখেও কবি নজরুল নোবেল প্রাইজ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ বিশ্বকবি 'ভারত বিধাতা' কবিতার মাধ্যমে নোবেল প্রাইজ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। বলিহারী পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীদের মানবতাবোধ! (আহমেদ[২১], ১৯৯৮ : ১৬৭)

সমগ্র ভারতবাসী যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণায়, বিরোধিতায় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে একাকার, রবীন্দ্রনাথ তখন সোনার হরিণের প্রত্যাশায় ব্রিটিশের সঙ্গে আঁতাতে ও তোষণে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষে তাঁর প্রশংসায় এবং ইংরেজ বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'ভারত বিধাতা' নামক সংগীত। পঞ্চম জর্জকে ভারতের বিধাতা আখ্যায়িত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

জন-গন-মন-অধিনায়, জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা
দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্দ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা
উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গ...
(উদ্ধৃত, আহমেদ[২১], ১৯৯৮ : ১৬৭)

এ গানটি রচনার পরের বছরই ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত 'ভারত বিধাতা' কবিতার মাধ্যমে বৃটিশের বন্দনার জন্যই পুরস্কার পেয়েছিলেন। গীতাঞ্জলি একটি উপলক্ষ মাত্র। কারণ পঞ্চম জর্জ ছিলেন নোবেল পুরস্কার কমিটির প্রভাবশালী সদস্য। (আহমেদ[২১], ১৯৯৮ : ১৭১)

সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে রচিত 'জনগনমন অধিনায়ক' সংগীতটি প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের কত প্রিয় ছিলেন ! তৎকালে মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মন্তব্য করেছেন : 'পার্সি উর্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরের অনেক কবি গীতাঞ্জলির কাব্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান, ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এক মধুরতর রস সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছে।' (ইসলাম[১০], ১৯৮৩ : ৩৬৬)

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবি' যখন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : তোমার পথের দাবি পড়া শেষ করেছি। বই খানি উত্তেজনক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।... একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশি বা বিদেশি প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। (আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ :১৭২)

রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :

> ...আমার 'পথের দাবি' পড়ে আমার দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয়ই এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবি'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। (উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ১৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসনের মহিমাসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি লেখকের অনুমতি নিয়েই ইংরেজ সরকার শত শত কপি বিভিন্ন বন্দি নিবাসে আটক রাজবন্দির নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে-গঞ্জে নাটক আকারে অভিনয় করান। কলকাতার শ্রমিক মুসলমান ও গরীব শ্রেণি যখন ইংরেজকে মার! মার! করে ইটপাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করল তখন ইংরেজ দালালরা তাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি ও তাদের শাস্তির দাবি জানায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা রাজা' প্রবন্ধে বলেন : কিছু দিন হইল একদল ইতর শ্রেণির অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লৌহ খণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল তাদের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষটা বিশেষরূপে ইংরেজদের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল।... কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলো একেবারে উড়ায়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক...। (উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ৪২৮-৪২৯)

এক কালের 'নৌ-দস্যু' বলে কথিত এই ইংরেজরা এ দেশে নৈতিকতাবিরোধী এমন কোনো অপকর্ম ছিল না– যা তারা করেন নি। শঠতা, প্রতারণা, ভণ্ডামি, সম্পদ লুণ্ঠন, দুর্নীতি কোনো কিছুই বাদ যায় নি। তারা এদেশে অত্যন্ত নির্মমভাবে বহু হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এজন্য বিশ্বকবির হৃদয় আহত হয় নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন বিপ্লবীরা কিছু ইংরেজ হত্যা করে তখন তাঁর হৃদয় আহত হয়েছিল। অথচ এই নিষ্ঠুর ইংরেজদের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খুবই কোমল।

রবীন্দ্রনাথ এক সভায় তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য করে (পরোক্ষভাবে নজরুলকেই) বলেছিলেন : 'তরুণ-সাহিত্যিকদের লেখায় 'দুধ নেই শুধু ফেনা' ।নজরুল এর জবাবে সাপ্তাহিক 'সওগাতে'র চানাচুর বিভাগে 'শুধু গাভী' শিরোনামে বলেছিলেন :

> রবীন্দ্রনাথ দুধের এক্সপার্ট কিনা জানি না। অন্তত করপোরেশনের 'মিউন্যাসিপাল গেজেটে'ত তাঁর নাম বেরুতে দেখিনি। কিন্তু দুধ ছাড়া শুধুতে ফেনা হয়?... যুক্তি না দিয়ে উপমাই যদি সবটা হয়, তাহলে তারাও বলতে পারে বুড়ো সাহিত্যিকদেরও গোয়াল-ঘরে দুধ নেই, শুধু গাভী! শুধু ফেনাতে যদি ছানা না বেরোয়, শুধু গাভীতেও ছানা বেরোয় না।! (আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ :৪১৯)

নজরুলের বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল লেখা নিয়ে চারিদিকে যখন জনগণের মাঝে আলোড়ন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল-প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আশিষের ভাষায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় নজরুলের কবিপ্রতিভাকে বিধাতার অপার অলৌকিক দান বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ! অগ্নি সম দেবতার দান
উদ্ধ শিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ!
(উদ্ধৃত, আহমেদ[১৯], ১৯৯৮ : ৪১৯)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজ অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে' বসে 'সংকীর্ণ বাতায়নে' থেকে তিনি দেখেছেন জগৎ সংসারকে, চিরকালের সাধারণ মানুষ থেকে দূরে 'সম্মানের চির নির্বাসনে' তাঁর অবস্থান। তাই তিনি লিখেছেন :

চাষি খেতে চালাইচে হাল
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-

Dhaka University Institutional Repository

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার'
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আরো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানবসভ্যতার শান্তি, স্বস্তি এবং কল্যাণসাধন কোনো মহামানবের বাণীর দ্বারা অর্জিত হওয়া আর সম্ভব নয়। তাকে অর্জন করবে অগণিত সংগ্রামী মানুষ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর যীশুখ্রিস্টের জন্মদিনে তিনি 'শান্তিনিকেতন' এ দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করলেন :

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।
(ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ১৯)

দেশের প্রবল বিক্ষোভের বন্যাকে ধারণ করার ক্ষমতা সতেন্দ্রনাথের শৌখিন, বিলাসী ও ললিত কাব্যের আয়ত্ত্বের বাইরে ছিল। মোহিতলাল তাঁর অতি আত্মসচেতন কাব্যের গণ্ডি বাড়িয়ে দেশের বৃহৎ জনসমাজের বেদনানৈরাশ্যকে বুকে টেনে নিতে পারলেন না। যতীন্দ্রনাথ সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারকে রূপায়িত করতে গিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়তার অভাবে সফলতায় সমর্থ হলেন না। এ যুগ সন্ধিক্ষণে এগিয়ে আসলেন নজরুল। যিনি তাঁর জীবনের সূচনালগ্নে দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করেছেন। পল্লীগ্রামের মাটিঘেঁষা মানুষদের তিনি আত্মীয়তা সূত্রে বাঁধতে সমর্থ হলেন। এ সকল কারণে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলালের কাব্যসাধনার উত্তর সাধক হয়েও নজরুল তাঁর বিদ্রোহ-শক্তিকে সমস্ত কৃত্রিমতা ও ভাবাবেশের আবরণ কাটিয়ে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় ঝলঝল করে উঠলেন। যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিলেন তিনি। তাঁর মধ্যেই যুগ তার প্রতিভূকে খুঁজে পেল।

নজরুল নিজেই জানিয়েছেন যে, গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মনের ঘরেও তিনি সাদর আপ্যায়ন পেয়েছেন কিংবা ইব্রাহিম খাঁকে চিঠিতে তিনি লিখেছেন; 'হিন্দু লেখকেরা তাঁদের সমাজের কুসংস্কার বা কুনিয়মের বিরুদ্ধে যেমন কলম চালাচ্ছে, মুসলমান কোনো লেখক তেমন চেষ্টা করতে গেলে তাঁর কথা শোনা দূরে থাক মুসলমানেরা তাঁকে ছুরি মেরে বসবে।'

মুসলিম সমাজের অন্ধ গোঁড়ামিকে নজরুল জানতেন, তার বিরুদ্ধে নির্ভীকতার সঙ্গে কলমও ধরেছেন, গান গেয়েছেন, 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান', আবার তিনি বলেছেন, 'আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি'। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৯১)

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেন নি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সভায় তিনি নেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন, ১৯৩৭ মুসলিম ছাত্ররা বয়কট করলে তিনি গর্জে ওঠেন নি; রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলে তিনি কোনো প্রতিবাদ জানান নি, হক মন্ত্রীসভায় মুসলমানদের শতকরা ২৫ আর হিন্দুদের শতকরা ২ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে সারা দেশ যখন উত্তাল তখনও তাঁর কোনো মতামত পাওয়া যায় নি। অথচ চিরকাল তিনি আচারে-আচরণে, ব্যক্তি বা সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে ষোলো আনা অসাম্প্রদায়িক, চিরকাল ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষকে দেখতে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানে নিবিড় সংহতি কামনা করে অজস্র উদাত্ত কবিতা রচনা করেছেন।

নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চিন্তা করেই তাঁর 'মানুষ' কবিতায় হিন্দু ধর্মভিত্তিক কোনো প্রসঙ্গের পরেই সমপর্যায়ী ইসলামি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। পুরোহিত কর্তৃক ভিখারির লাঞ্ছনার পর মোল্লা কর্তৃক ভুখা মুসলিমের প্রসঙ্গ এনেছেন। ধর্মের ইজারাদারদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য চেঙ্গিস, গজনী, মাহমুদের পাশাপাশি কালা পাহাড়ের নাম বলেছেন, আবার কোরআনের পাশাপাশি বেদের নাম, মোহাম্মদ (সা.)-এর পাশে কৃষ্ণের নাম বলেছেন। নজরুলের ভাষায় :

তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!
... ...
আদম দাউদ ঈসা মূসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ,
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৩৫)

নজরুল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্থায়ী সুপ্রীতি-সম্প্রীতি বন্ধন করতে চান এবং এ চাওয়াটা বাঙালির ইতিহাসে কবি নজরুলের এক মহৎ দান। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা তেমনটি প্রত্যক্ষ করি না। নজরুল ১৯২৬ সালের কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উদ্বোধনী গানরূপে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনা করেন। এ গানে তিনি বলেন :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম!' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৮৮)

'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল প্রধানত রবীন্দ্ররোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে। সাহিত্যিক ভাব ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কার ও পরিবর্তন মূলত এই লক্ষভিসারীই। তাঁর বাস্তববাদ অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্র আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতিবাদ হিসাবেই রচিত। (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ :৩২)

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মধ্যে কাব্য রুচিগত যে কিছু পার্থক্য রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। নজরুলের কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তির অপচয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> সে দিন সকালে আমি আর নজরুল দু'জনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইল 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল',...। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন- নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরণ আছে। সে দিন দু'চারটি কথার পর নজরুলকে বললেন- শুনছি তুমি নাকি

Dhaka University Institutional Repository

মন-যোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছ, বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছিলেন দাড়ি চাঁচবার জন্য! (ইসলাম[১০], ১৯৮৩ : ২৭৬)

রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলো নিয়ে নজরুল নিম্নের কবিতাটি লিখেন :

গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৯৩)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর ব্যথারই অভিপ্রকাশ বলে মনে হয়; মনে হয় তিনি নজরুলকে তাঁর স্বধর্মচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন। এভাবে আর কাউকে রবীন্দ্রনাথ সচেতন করেন নি। এটাই সেই চিহ্ন যা নজরুলের প্রতি তাঁর সুকোমল-সুগভীর স্নেহ প্রতিপন্ন করে।

আবার ওমর খৈয়ামের ন্যায় পাপের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। 'বারাঙ্গনাকে' তিনি মায়ের সমান মর্যাদা দিতে চান, শ্রমিক-মজুরকে দিতে চান মানবোচিত মর্যাদা। যার ফলে তিনি বহু সমালোচনার স্বীকার হয়েছেন। এ সম্পর্কে শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী (আবু নুর) 'ইসলাম-দর্শন', ফাল্গুন, ১৩৩২ সংখ্যায় নজরুলের সমালোচনা করে বলেন :

নজরুল ইসলাম নামক হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের বাহ্‌বা-প্রাপ্ত জনৈক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের 'অগ্নিবীণা' এবং আরও কি একখানি বই পড়িয়াছি। উক্ত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে উহার লেখক যে একজন ধর্মদ্রোহী কুলাঙ্গার, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।... শিবের পূজা, কালীর স্তব, দুর্গার আরাধনা, সরস্বতীর বন্দনা প্রভৃতি অংশীবাদিতায় তাহার লেখা ভরপুর।... ঐ হতভাগ্য ধর্মদ্রোহী পাষণ্ড হযরত ইব্রাহিমের (আ.) সঙ্গে মিঃ সি.আর, দাসের এবং বিবি মরীয়মের সহিত চরিত্রহীনা বারাঙ্গনার তুলনা করিয়া এবং রোযা, নামায, হজ, জাকাত, কেতাব, কোরান ও পীর পয়গম্বর সম্বন্ধে মরদুদ কাফেরের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলিয়া অভিশপ্ত ইবলিশ অপেক্ষাও পামরতার পরিচয় দিয়াছে। অবশ্য তাহার কোন কোন লেখায় কবিত্বের বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সেই কবিত্ব এত বিষাক্ত যে, কোন সুরুচিপ্রিয় ভদ্র সন্ত নেই তাহা গলধঃকরণ করিতে সমর্থ নহে। (ইসলাম[১০], ১৯৮৩ : ৬৭-৬৮)

এভাবে নজরুল সম্পর্কে বহু সমালোচনা হয়েছে[১]।

মার্ক্সীয় সাম্যবাদে রয়েছে অর্থনীতি; নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে মানবনীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যিনি নিজেকে কখনও সাম্যবাদী বলে দাবি করেন নি, রাশিয়া ভ্রমণের সময়ে বা তারপরে মার্ক্সীয় সাম্যবাদের বাস্তব রূপায়নের ভূয়সী প্রশংসা করা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে একটা ছাঁচে ঢেলে মানুষ ও তার সামাজকে সাজানোর চেষ্টা রয়েছে এবং সেই ছাঁচ যে মানব প্রগতির ইতিহাসে একদিন পরিত্যক্ত হতে বাধ্য তা উপলব্ধি ও বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তিনি সমাজ চিন্তায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিরই ওপর। তিনি মনে করেন, মানুষকে মানুষ হিসাবে জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথমে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আবশ্যক। এ জন্য 'তিনি নিজে সমবায়িক কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছেন, আপন জমিদারীতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, সমবায়িক সঞ্চয়, জনগণের সঞ্চিত অর্থে গ্রামের রাস্তাঘাট, কূপ, বিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন তিনি। ১৯৩০ এর রাশিয়ায় এমন কিছুই তিনি দেখেননি যা ইতিপূর্বে তাঁর সীমিত পরিসরে তিনি না করেছেন। সমাজ-

[১] 'কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মবোধ' পর্বে সমালোচনার বিবরণ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতি চিন্তায় সমকালীন চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই অনেক বেশি বাস্তবতামুখী-নজরুল এ বিষয়ে তাঁর উত্তরাধিকার বহন করছেন না। (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪৬)

মানবিক প্রেমগীতির মধ্যে নজরুলের গজলগুলো সর্বোৎকৃষ্ট। নজরুলের পূর্বে অতুল প্রসাদ গজল রচনা করেছিলেন। গজল পারস্য দেশের প্রেমগীতি। অতুল প্রসাদ কর্তৃক যে গজল প্রণীত হয় তা অত্যন্ত উর্দু ঐতিহ্য ঘেঁষা বলে তার মধ্যে বাঙলা গানের চরিত্রটি ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। নজরুলই প্রথম বাঙলা গানের কাঠামোতে তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে গজল রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য প্রেমগীতিতে রবীন্দ্র প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রেম যেখানে সীমা থেকে অসীমের অভিসারী, নজরুলের প্রেম সেখানে মুখ্যত দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ভক্তিমূলক সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুলের ইসলামি সংগীত অপূর্ব। তাঁর শ্যামা সংগীত রামপ্রসাদের আদর্শে রচিত। কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গানে নজরুলের ওপর রবীন্দ্র প্রভাব খুবই বেশি। প্রকৃতি প্রেমগীতিতে নজরুল প্রধানত রবীন্দ্রানুসারী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতুল প্রসাদের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়। (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ :৩৩৭)

নজরুল নিজেকে সাম্যবাদী বলে দাবি করেছেন এবং বাংলার প্রথম সাম্যবাদী কবি হিসাবে সাধারণভাবে তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তবে তাঁর সাম্যবাদ মার্কসীয় সাম্যবাদ নয়; তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ দীন-হীন-অভাজন-অবহেলিত- শোষিত- অপমানিত মানুষের প্রতি সুগভীর সহমর্মিতা থেকে তার মধ্যে এই সাম্যবাদী চিন্তার উদয় ও বিস্তার; মার্কসীয় বা অন্য কোনো ভাববাদী সাম্যবাদের নিবিষ্ট পঠন-পাঠন থেকে এই চিন্তা তাঁর মাথায় আসে নি। ধর্মের ইজারাদারদের সরিয়ে দেবস্থানের দরজা উঁচু-নিচু-ধনী-কাঙাল-নিষ্ঠাবান-আচারবাদী অথবা নিরুপায় শরণাগত সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন, পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে চান নারীকে, প্রমাণ করতে চান জগতের যা কিছু সুন্দর অর্ধেক তার করেছে নর, অর্ধেক করেছে নারী; কবির ভাষায় :

সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
...
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
...
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!

Dhaka University Institutional Repository

যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ২৪১)

প্রেমের ক্ষেত্রে একজন নারীর ছলনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নজরুলের মন সমগ্র নারী জাতির প্রতি আক্রোশে ভরে ওঠে। হতাশ প্রেমিকের এ মানবিক অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা ও ক্ষোভ নজরুলের প্রেমকে অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগসাধ্য ও দেহমুখী করে তুলেছে। কবি মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও ক্ষোভে উদ্বেলিত হয়ে বলেন :

ইহাদের অতিলোভী মন
এক জনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।
...
যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।'

আবার রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কিত 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় আমরা দেখি :

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার-
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ১২৭)

নজরুলের প্রেমিক হৃদয়ের অস্থির, উদ্বেলিত ও দিশাহারা অবস্থার বর্ণনার মোকাবিলায় রবীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' কবিতায় আমরা দেখতে পাই :

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা নিশা খুঁজে পাই না–
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ১২৮-১২৯)

রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অপর নাম ভালবাসা। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এ গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ পাঁচটি রসই রতি এবং পাঁচটি রতির মধ্যে মধুর রতিই শ্রেষ্ঠ। এ মধুর রতির প্রকাশই কান্তাপ্রেম। বাস্তব বা লৌকিক জগতের প্রিয় ও প্রিয়ার সম্পর্কের রূপকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের কান্তাপ্রেমকে বোঝানো হয়। কিন্তু আসলে এই প্রেম পরিশুদ্ধ রাগানুরাগের সঙ্গে বিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে প্রেমের প্রসাধনকলা প্রকাশিত হলেও সমগ্রভাবে তা আধ্যাত্ম সাধনের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
কেহ নহে তোমার আমার।
...
শতদল উঠিতেছে ফুটি-
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী-
চেয়োনা তাহারে।
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ১৩০)

রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সৌন্দর্যকে দৈহিক কামনাবাসনায় কলুষিত করতে অসম্মত। 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মর্ত্যপিপাসাময় ও দেহপ্রীতিমূলক কিছু কিছু কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ও ভোগবিমুখ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কাল থেকে কালাতীত, সীমা থেকে অসীম, রূপ থেকে অরূপ, পাত্র থেকে পাত্রাতীত এবং মরত্ব থেকে অমরত্বের দিকে প্রসারিত। ব্যক্তিগত প্রেম বৃহত্তর প্রেমসাধনার পাদপীঠ বইতো অন্য কিছু নয়। তিনি দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে উত্তরণ করতে চান। মানবিক প্রেম তার সকল জ্বালাবেদনা, আবেগোন্মত্ততা ও আকাঙ্খাতৃষ্ণা নিয়ে রবীন্দ্র কাব্যের মূল ভাবস্রোতের সঙ্গে কখনই গভীরভাবে সংবদ্ধ হতে পারে নি। (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ :১৩২)

নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়েই উৎসাহী। নারী ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের অভিযাত্রা বঙ্কিমের সময় থেকে। বিধবা নারীকে বঙ্কিম সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'তে বিধবা নারীর সমমানের ছবি এঁকেছেন এবং *চতুরঙ্গে* এসে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিলেন। গদ্যে-পদ্যে নারী প্রকৃতির বিচিত্র ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে নজরুলের রচনায় এরূপ বৈচিত্র্যময়তা নেই। রবীন্দ্রনাথের দামিনী, কুমু, মৃণাল প্রভৃতি বহ্নি-কন্যাদের বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কবিতায়– নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার; হে বিধাতা ?

কিন্তু নজরুলের কবিতায় নারীর অনুরূপ বিদ্রোহ লক্ষণীয় নয়। মানবসমাজে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী– তাকে নরকের দরজা বলে, পতিতা বলে, অবলা বলে অশ্রদ্ধা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। জগতের সব মহৎ কর্মের অর্ধেক নর করেছে– অর্ধেক করেছে নারী। নারী মর্যাদার প্রসঙ্গে এটিই নজরুলের বক্তব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে নারীকে শীল-সৌন্দর্যে শোভাময়ী, প্রেরণাদায়িনী, প্রকৃত স্বরূপিনী, পুরুষের সৃজন ধারিকা-পালিকা-পোষিকা বলে মনে করেছেন। ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ কলকাতা এলবার্ট হলে নিখিল বঙ্গ মহিলা কর্ম সম্মেলনের ভাষণে 'মানব সভ্যতা রচনার মধ্যে মেয়েরা অল্প স্থান পেয়েছে যদিও পুরুষের কর্মে তাদের নেপথ্য প্রেরণা ছিল', উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের নবীন সভ্যতা নির্মাণে শক্তিকে দীপ্ত, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল, কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করে

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে আসার জন্য নারীকে আহ্বান করেছেন। তিনি মনে করেন পুরুষের চিত্তবৃদ্ধির এবং নারীর হৃদয়বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা। নজরুল লিখেছেন– 'সেদিন সুদূর নয় যেদিন ধরনী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়', অবশ্য নারীভাবনায় নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বিদ্যমান, কিন্তু নারীর নিজস্ব বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে জোড়ালোভাবে তুলে ধরেছেন, নজরুল তা করেন নি। নজরুলের নারী বিদ্রোহ করে নি, নারীদের হয়ে বিদ্রোহ করেছেন স্বয়ং নজরুলই। (রায়[৮], ১৯৯৮ : ৪৮)

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয়ের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান। ঔপনিষদিক চেতনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় উপলব্ধির বিকাশ, তবে তাঁর ধর্মীয় উপলব্ধির মধ্যে মোক্ষলিপ্সার প্রশ্রয় নেই, আছে রঙে: রূপে-রসে-মানবতায় পরিপূর্ণ জগতকেই আরো নিবিড় করে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা। আবার, তাঁর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্ব জাগতিক দায়-দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁর ভাবনা জগতে ধর্ম-অসীম-পরমেশ্বর ইত্যাদি বিষয়গুলো মুখ্য হিসাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর সকল অনুভূতি ও রচনার ধারা ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। আস্তিক্যবাদ কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বস্তুবাদী হয়ে উঠেন নি তবে তাঁর চিন্তাধারার বিবর্তনে উজ্জ্বলতর হয়েছে মানুষ। নজরুলের ধর্মীয় বিশ্বাস মূলত প্রথাগত, স্বতন্ত্র কোনো চেতনায় উদ্বুদ্ধ নয়; ইসলামের নতুন তাৎপর্য তাঁর কল্পনায় দীপ্তিময় হয়ে উঠে। হাসান-হোসাইন আর এজিদের কাহিনীর মধ্যে তিনি পরাধীন ভারতবাসী এবং অত্যাচারী, ইংরেজদের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। ধর্মে ছিল নজরুলের সুগভীর বিশ্বাস। তবে ধর্মের আচরণবাদে তাঁর বিশ্বাস নেই; নামায-রোযা ইত্যাদিতে তিনি অনীহ, মোল্লা-মৌলবীর ইজারাদারির তিনি সোচ্চার বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেন এই মৌলবী-মোল্লা আর পাণ্ডা-পুরোহিতরাই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়ে তোলে; ধর্মের উদ্দেশ্য হল মিলন। কবির ভাষায় :

শুধু গুণ্ডামী ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।

...

কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম লয়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ হয়ে,
কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র, কেন চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময়?
কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ!
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৮৪ : ২৬১)

ধর্ম প্রসঙ্গে নজরুলের সবচেয়ে বড় অবদান সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়– বিশেষ করে ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সাধন। নজরুল কাব্যসম্ভারে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্ব বিষয়ের মতই এই বিষয়ের প্রয়োজন ও দাবিকে অস্বীকার করেন নি আবার অতিরিক্ত গুরুত্বও দেন নি। প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য ভাবনা কবিতাগুলোতে তাঁরা একে অপরের কাছাকাছি। ছন্দ, কাব্যের উপাদান, শব্দ ইত্যাদি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সন্নিকট হতে নজরুলের দ্বিধা নেই। আসলে স্বভাবকবির প্রেরণায় তিনি প্রকাশ শিল্পে তেমন ছুঁৎমার্গী নন। তবে যে বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন– বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের মিশ্রণ, রবীন্দ্রনাথ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, এতে বাংলা ভাষার সাবলীলতা নষ্ট হবে অথচ তেমন ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হবে না বলেই তিনি মনে করেছেন। নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র যুগের কবি; রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি, রবীন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা সর্বদাই ছিল। 'রবীন্দ্র জ্যোতির্বলয় ভেদ করে যেখানে তাঁর কবি স্বাতন্ত্র্য দীপ্তিময় সেখানেও তিনি রবীন্দ্র বিরোধী নন, স্বকীয় চেতনায় স্বপ্রকাশিত। প্রধনত বিদ্রোহের বাণীশিল্পই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য অবদান, অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে অন্যান্য বিষয়েও তাঁর অনন্য-পরতন্ত্রতার যথেষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিরবধি স্বতোৎসারিত স্নেহের ভিতর নিহিত রয়েছে নজরুলের স্বকীয়তার সম্মান ও স্বীকৃতি।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ৪৮)

নজরুল সমালোচক অশোক চট্টোপাধ্যায় সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠিতে' নজরুলকে ব্যঙ্গ করে নাম দেয় গাজী আব্বাস বিট্‌কেল। গাজী আব্বাস বিট্‌কেলকে লক্ষ করে সজনী কান্ত 'আবাহন' নামে শনিবারের চিঠিতে (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮ ভাদ্র, ১৩৩১) লিখেন :

ওরে ভাই গাজি রে-
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাপে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের সবিতা!'
(গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ : ৩৭)

নজরুলের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও দেখতে পাই যিনি রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। সতেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম মহাসাম্যের গান গেয়েছিলেন, শ্রমিক শক্তির বন্দনা করেছেন, ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রাচীন শ্রমিক ধর্মঘটের ওপর কবিতা লিখেছেন। নজরুল পূর্বসূরীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই হয়ত নজরুল সবচেয়ে বেশী ঋণী। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'কাজী নজরুলের অনুকরণ কোরতে গিয়ে অনেক নিজের শক্তিকে অপমান করেন, যেমন কাজী সত্যেন্দ্রদত্তকে আদর্শ কোরতে গিয়ে নিজেকেও অবমাননা করেছেন, আদর্শকেও করেছেন।' (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ :২৭)

সতেন্দ্রনাথ দত্তই (১৮৮২-১৯২২) সেই প্রথম কবি যিনি রবীন্দ্রভাবসমূদ্রে আকণ্ঠ নিমর্জ্জিত থেকেও মাথাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-কাব্যমণ্ডলের বাইরে। তাঁর 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', বেনুওবীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ সলিল' (অনুবাদকাব্য), 'তীর্থরেণু' (অনুবাদকাব্য), 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা' (অনুবাদ কাব্য), 'অভ্রআবীর', 'হসন্তিকা', 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'-এই সর্বমোট চৌদ্দটি কাব্য (এ ছাড়া তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতার সংকলন 'শিশুকবিতা'ও রয়েছে) পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি স্পষ্টতই ধরা পড়ে যে রবীন্দ্রপ্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েও-তিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরিক্ত কাব্যজগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নবনব আবিস্কারের আলোকবন্যার পাশে দাড়িয়েও ছন্দের অসামান্য জাদু দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'নানান সংস্কৃত ছন্দ থেকে বাংলার এক পর্বের চরণ, কিম্বা মাত্রাবৃত্ত-যড়বৃত্তের নানা প্রকারভেদের পাশাপাশি নানা চরণের-নানা ছবির স্তবক বন্ধন করে বাঙালি পাঠকের মনোপীঠে নিজের স্বতন্ত্র কবি অস্তিত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ২০)

রবীন্দ্রযুগে যে-কবিরা রবীন্দ্র ব্যতিরিক্ত কবিতার নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল ইসলাম। এই কবিত্রয়ের মধ্যে কাব্য প্রকাশের দিক থেকে মোহিতলাল কিঞ্চিৎ অগ্রজ আর যতীন্দ্রনাথ সর্বপেক্ষা অনুজ। মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯, 'স্বপ্নপসারী' ১৯২২-এ; নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীনা' ১৯২২-এ, আর যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'মরিচিকা' বেরিয়েছিল ১৯২২-এ। যতীন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে কলকাতার বাইরে থাকতেন বেশীর ভাগ সময়, সেই জন্য তাঁর সঙ্গে নজরুলের তেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি, কিন্তু মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের রীতিমতো হার্দ্য সম্পকই ছিল, পরে 'বিদ্রোহী' কবিতাকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক ফাটল ধরে।' (রায়[৬], ১৯৯৮ : ২২)

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা সত্যেন্দ্রনাথই প্রথমে তাঁর কবিতায় নিয়ে এলেও সে চিন্তাধারার উৎস যতটা ভাবকল্পনায় ততটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিলনা। কিন্তু নজরুলের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্য চিন্তা ও বক্তব্যকে সত্যেন্দ্রনাথের থেকেও অনেকক্ষেত্রে বহুগুনে তীব্র ও গভীর করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, 'অনেক কবিকেই কাব্য রচনার প্রাথমিক যুগে তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক সহৃদয়ভাবাপন্ন কোনো শক্তিশালী কবির রচনাকে মডেল করে অগ্রসর হতে হয়, যতদিন না কবি নিজস্ব বাণীভঙ্গি খুঁজে পান।' (গুপ্ত[৭], ১৯৯৭ :২৭)

৪

বাংলা সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি ইরানের তথা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তিনি কখনও ইরান সফর করেন নি। এমন কি ইরানের পক্ষ থেকে কখনও তাঁকে পারস্য সফরের আমন্ত্রনও করা হয় নি। তিনি পারস্যকে ভালবেসেছিলেন। তাই পারস্যের ভাষা ও সাহিত্য স্বীয় সাহিত্যকর্মে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় সাহিত্যকর্মে ফারসি ভাষা খুবই স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। তবে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে তিনি পারস্য সফরের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের *পারস্যে* তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর বিবরণ রয়েছে এবং এতে পারস্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সৃষ্টি সম্ভারে নয়টি ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী *পারস্যে*। তাঁর চৌদ্দবার বিদেশ যাত্রার পঁয়ত্রিশটি দেশ ভ্রমণের প্রথম যাত্রা ছিল ১৭ বছর বয়সে ১৮৭৮ সালে। ভ্রমণসাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য রচনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। *পারস্যে* রবীন্দ্রজীবনের সর্বশেষ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফসল। সুতরাং তাঁর শেষ জীবনের এ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম। ১১ এপ্রিল ১৯৩২ সালে এ প্রবীণ কবির ইরান ভ্রমণের সময়সীমা ছিল ২৩ দিন এবং এর সঙ্গে ইরাক ভ্রমণে যুক্ত হল আরো তিন দিন। তাঁর এ ভ্রমণকাহিনী *পারস্যে* ১০৬ পৃষ্ঠায় ১৯৩৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগারটি পর্বে বিন্যস্ত এই ভ্রমণকাহিনীতে রয়েছে; সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি বিশ্লেষণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নিয়ে ভাবনা, ইন্দো-ইরানীয় ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক তথ্যাবলিসহ ব্রিটিশ-মার্কিনী শক্তিসমূহের আগ্রাসী তৎপরতার তীব্র সমালোচনা। রাজকীয় আতিথ্যে রবীন্দ্রনাথ আত্মউপলব্ধিতে ইন্দো-ইরানীয় সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও এ ভ্রমণের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয় তাঁর সপ্তরতম জন্মোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে প্রেরিত আমন্ত্রণ পত্রসূত্রে। এ জন্মোৎসবে যেসব শুভেচ্ছাপত্র আসে তার মধ্যে ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলভিরও একটি পত্র ছিল। এতে ইরান সন্দর্শনের জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শাহানশাহ এ কথাও জানান যে যাতায়াতের ব্যয়ভার পারস্যরাজই বহন করবেন। গ্রীষ্মকালে রেল এবং পানিপথে প্রৌঢ় কবির যাত্রা সুখকর হবে না বিবেচনা করে পারস্যরাজের আয়োজক কর্তৃপক্ষ ওলন্দাজ বিমানে তাঁর ভ্রমণের আয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বোম্বাইয়ের পারসিক কনসাল কেহান সাহেব পারস্য সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন কবির যাত্রার সকল আয়োজন করার এবং সাহচর্য দেবার। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

> রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হয়। সাহিত্যিক, রাজনীতিকরা সাড়া দেন নানা ভাবে। এই বিষয়ে যেসব পত্রাদি আসে তাহার মধ্যে ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলবীর একখানা পত্র ছিলো। উহাতে ইরান সন্দর্শনের জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শাহানশাহ এ কথাও জানান যে পাথেয়াদির ব্যয়ভার পারস্য রাজই বহন করিবেন। (উদ্ধৃত, স্বপন[১১], ১৯৯৩ : ৫৭)

রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণ ছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবস্থায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের অমানবিকতা ও কঠোরতা কবিকে দারুনভাবে পীড়িত করে। কবির মন কেঁদে উঠেছে। নানা মানবিক বাণী বর্ষণের মাধ্যমে কবি এসব অমানবিকতার প্রতিবাদ করেছেন। মানবিকতাই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রধান ধর্ম। তাই গীতার যে ধর্ম মানুষ মারার বিধান দেয় রবীন্দ্রনাথ সে ধর্মের বাণীকে প্রশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানান। খ্রিস্টের অনুসারী যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ মারে রবীন্দ্রনাথ তাদেরকেও অবিশ্বাস করেন। কেননা, এ সময় রবীন্দ্রনাথ অবহিত হন ব্রিটিশ আকাশফৌজ পারস্যে শেখদের গ্রামে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করেছে। সেখানে আবালবৃদ্ধবণিতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে ব্রিটিশ বায়ুফৌজের ধর্মযাজকের কাছে প্রতিবাদ বাণী পাঠান।

পারস্যের প্রথম কয়েকপাতা জুড়েই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের প্রতি পূর্বের সম্ভ্রম প্রেম হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তিক্ততা অনুভবে লিখেছেন : 'আমরা এশিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা, এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি'। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৪৩)

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যখন কবি য়ুরোপে গিয়েছিলেন তখন একজন ইংরেজ কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল : 'তুমি এখানে কেন এসেছ।' কবি বলেছিলেন, 'য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।' য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে, প্রাণের আলো জ্বলছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানা দিকে প্রকাশ করছে। সেদিন পারস্যেও কবিকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কবি বলেছিলেন, 'পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি।' তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। বৈকালে পারসিক পার্লামেন্টের একজন সদস্য কবির সঙ্গে দেখা করতে এসে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন 'কবি কী জানতে চায়'। কবি বললেন, 'পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই, যে পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।' (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৪৯)

য়ুরোপ সফর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *পারস্যে* বলেন, 'য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়; এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমার জন্মদিনে এখানকার বহুলোকের কাছ থেকে আমি যে বহু সমাদর পেয়েছি একত্রে তার উত্তর দেবার জন্য একটি কবিতা রচনা করেছিলুম। এখানকার মজলিস ভাঙবার পূর্বে সেটা আমি সকলকে শোনালুম।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি হল :

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দন বাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।
ইরান, তোমার সম্মানমালে
নবগৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক-
ইরানের জয় হোক।

(উদ্ধৃত, স্বপন[১২], ১৯৯৩ : ৫০-৫১)

পারস্যে গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি' (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৩৩)।

তাই পথের ক্লান্তির কথা বিবেচনায় এনেও তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। যৌবনে কবি আরব বেদুঈন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বার্ধক্যে সেই বেদুঈনদের আবাসভূমির কাছে যেতে পারার সুযোগ তিনি সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৭০-১৪১০ খ্রি.) পারস্যের বিখ্যাত কবি শামসউদ্দিন হাফিযকে (মৃ. ১৩৯০ খ্রি.) সোনারগাঁও সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ পথযাত্রায় অপারগ হয়ে কবি হাফিয সুলতানের এ নিমন্ত্রণে সশরীরে সাড়া দিতে না পেরে সুলতানের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ কবিতায় হাফিয ভারতের তোতাপাখি, পারস্যের মিছরি আর সুলতান গিয়াসউদ্দিনের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলেন। কবিতাটি :

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود
وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

Dhaka University Institutional Repository

(হাফিজ সিরাজী[১৬], :১৩৬২: ১২৯)

সাকি হাদিছে সার্ভ ব গুল ব লা'লে মিরাভাদ
বেইনে বাহাছ বা' সালা'ছে কাচ্ছা'লে মিরাভাদ
শেকার শেকান শাভান্দ হামে তুতিয়া'নে হিন্দ
জিন্দ গ্যান্দ পা'রসি কে বে বাঙা'লে মিরাভাদ
হা'ফেয যে শুগে মাজলেছে সুলতান গিয়াছ দীন
কা'ফেল মাশো কে কা'রে তু আয না'লে মিরাভাদ

কবিতাটির মর্মার্থ নজরুলের ভাষায়,

আজকে পাঠাই বাঙলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।
(নজরুল ইসলাম[১৮], ১৯৯৩ : ৪৫)

৫

৭০ বছর বয়স্ক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১১ এপ্রিল, ১৯৩২) পারস্য সফরের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। বিমানযোগে এলাহাবাদ, যোধপুর, করাচি হয়ে ১২ এপ্রিল পৌঁছান প্রথমে জাস্কে এবং পরে পারস্যের বন্দর নগরী বুশেহরে। এ ভ্রমণ সম্পর্কে কবি রসালোভাবে তাঁর *পারস্যে* লিখেছেন :

> প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল।... এখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশযাত্রা শুরু, অবশেষে অপরাহ্নের দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বঙ্গে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্রপাখির হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুনবার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরের তখন প্রাণধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্‌বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্তব্য সেরে হোটেলে এলুম। হোটেলটি বায়ুতরীযাত্রীর জন্য মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যতরকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত!' পরের দিন ১২ই এপ্রিল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হল। হাওয়ার গতিক পূর্ব-দিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ব অন্ন ভোগ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম। সুমদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার সাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না শুনি গর্জন, না দেখি তরঙ্গের উত্তালতা। এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্নর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্কে পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই

Dhaka University Institutional Repository

> সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপটা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৩৫-৪৩৭)

পারস্যসম্রাটের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত এ সফরে কবির সঙ্গী ছিলেন পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বন্ধু দিনশা জে জে বাবায়ী ইরানি। পারসী বন্ধু দিনশাহ ইরানি আগেই জাহাজযোগে যাত্রা করে নির্দিষ্ট সময়ে পারস্যের বন্দর নগরী বুশেহরে কবির সাথে মিলিত হন। পারস্যসম্রাটের প্রতিনিধি এবং জ্ঞানী, গুণী, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা কবিকে স্বাগত জানান। ১৩ এপ্রিল বুশেহরে গিয়ে গবর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবি এ সম্পর্কে তাঁর *পারস্যে* লিখেন :

> শিরাজের গবর্নর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেট-পাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সামনে ফলমিষ্টান্নসহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোটো ছোটো টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণির প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজ-নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই– শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবি জীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চির বিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে উর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনই কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৫৭-৪৫৮)

১৬ এপ্রিল শিরাজ পৌঁছে ১৭ এপ্রিল কবি শেখ সা'দীর মাযার প্রাঙ্গনে গণ ও সরকারী সম্বর্ধনায় যোগ দেন। কবি এ সম্পর্কে তাঁর *পারস্যে* লিখেন :

> আজ অপরাহ্নে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্নর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধিস্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, কৃচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ। আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৫৮-৪৫৯)

পরের দিন কবি হাফিজের মাযারে যান। খাজা হাফিজের কবরের পাশে উপস্থিত হয়ে তিনি দিওয়ানে হাফিয থেকে 'ফাল' গ্রহণ করেন। 'ফাল' গ্রহণ হলো 'ভাগ্য গণনা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেওয়ানে হাফিজের মাধ্যমে 'ফাল' গ্রহণ করে জানতে চেয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হবে কি না। দিওয়ানে হাফিয খোলার পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে দিওয়ানের দু'টি চরণ ভেসে উঠল :

يوسف گم گشته باز آيد بكنعان غم مخور

كلبه احز ان شود روزى گلستان غم مخور

ইউসুফ গুম গাশতে ইয়া'জ অয়াদ বেকেনআন কাম মাখুর

কালবে আখ্জ আন শাভাদ রোজি গোলিস্তা'ন কাম মাখুর

(হাফিজ সিরাজী[১৬], ১৩৬২ : ১৫২)

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ১০৩)

ব্রিটিশের আধিপত্য থেকে ভারত একদিন স্বাধীন হবে, স্বাধীনতার ফুলে ফলে গুলবাগিচা মুখরিত হবে– এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ঐ গণনায়। হাফিজের মাযার যেয়ারত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যে, চোখ থেকে ঝলঝল করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কবির ভাষায়:

> হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিস-রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।
>
> ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্নরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধকার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।
>
> যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানি ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।
>
> প্রথম অংশ। কুমুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।
>
> দ্বিতীয় অংশ। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্য যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।
>
> বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।
>
> এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাবে সূর্যের আলোকে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৬০-৪৬১)

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় কবি ছিলেন পারস্যের জগদ্বিখ্যাত শামসউদ্দিন হাফিয। মহর্ষি তাঁর চতুর্দশতম সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কবি শামসউদ্দিন হাফিজের নামটি। মহর্ষির জীবনীগ্রন্থে এর ইঙ্গিত আছে। শামস=সূর্য (রবি) অর্থাৎ শামসউদ্দিন বঙ্গতর্জমায় রবীন্দ্রনাথ। কবি বলেন :

> একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌঁচেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের।
>
> আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেকে শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৫১২)

২২ এপ্রিল ৭ দিন শিরাজে থাকার পর সঙ্গীদের নিয়ে সড়কযোগে ইসফাহান যাত্রার পথে প্রাচীন পারস্য সভ্যতার লীলা ভূমি পার্সিপোলিশ পরিদর্শন করেন। সাদাতাবাদ গ্রামে মধ্যাহ্ন ভোজন এবং শাহরেজা গ্রামের গণমানুষের পক্ষ হতে ইসফাহানে কবিকে ব্যাপক সম্মান ও সম্বর্ধনা দেয়া হয়। ২৩ এপ্রিল মধ্যাহ্নে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা ইসফাহান প্রবেশ করেন। বাগ-এ-জেরেশকে ইসফাহানের গবর্নরের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এ নগরীতে ৬ দিন অবস্থানকালে ইসফাহান পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে কবিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং ইসফাহানের বিখ্যাত মসজিদ, প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা, গীর্জা, ঐতিহাসিক স্থান সমূহে কবিকে পরিদর্শন করানো হয়। সর্বত্রই আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। কবির ভাষায় :

> চলেছি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর শিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা শুরু হল। পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে শিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েছে।
>
> শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেছে এঁকে-বেঁকে সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।
>
> প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যখেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখি নে, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া-লোম-ওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও-বা ছাগলের কালো রোঁয়ায় তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল, যেন তারা পাহাড়ের শাবক।
>
> এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অনতিদূরে পর্সিপোলিস। দিগ্‌বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো পাথরের থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্মম কালকে ধিক্কার দিচ্ছে। ... আলেকজান্দার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। এখান থেকে আর এক ঘণ্টার পথ গিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন। একটি বড়ো রকমের গ্রাম, পথের দুই ধারে ঘনসংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডান পাশে মাটি চেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় করে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হল। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।...

Dhaka University Institutional Repository

> ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি অন্তহীন, আলের-চিহ্ন-হীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়। চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না। হাটের দিন হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের খেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায় ঐ দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও মানুষের নানাদ্বন্দ্ববিঘটিত সংসারযাত্রা চলেছে। মাঠে কোথাও-বা ফসল, কোথাও-বা বহুদূর ধরে আগাছা, তাতে উর্ধ্বপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোটো নদী, কিন্তু তাকে আঁকড়ে নেই গ্রাম। মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরুবাছুর জল খায় না; নির্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলে-ঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই। আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়। পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে, আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারি দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্য কাঠের-তক্তা-ফেলা সংকীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজদিখস্ত। দুপর বেজেছে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন করে মোটর-রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। ...পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্‌ পপ্‌লার অলিভ ও তুঁত গাছের শ্রেণি। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূরপ্রসারিত ইস্ফাহান শহর। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্ফাহানকে দেখছি তার উপর থেকে অনেক দিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে। দেখা যায় এতকালের দুর্যোগে ইস্ফাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি। আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে, তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুন নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ– আকেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েছে।(ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৬২-৪৮০)

২৯ এপ্রিল কবি ইসফাহান থেকে যাত্রা করেন রাজধানী তেহরানের উদ্দেশে এবং সন্ধ্যার দিকে তেহরান পৌঁছান। দু'সপ্তাহ তেহরানে অত্যন্ত ব্যস্ততা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কবির দিনগুলো অতিবাহিত হয়। এ সময়ের মধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে ১৮টি অনুষ্ঠান হয়। যেমন : ২ মে কবির সাথে পারস্যসম্রাট রেজাশাহ পাহলভীর সাক্ষাৎ; ৫ মে কবিকে নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান; ৬ মে কবির ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে পারস্যসম্রাটের আদেশে বাগ-এ-নিরুদ্দৌরায় সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। কবিকে হাজার হাজার লোকের অভিবাদন, অভিনন্দন, টেলিগ্রাম, পুস্পস্তবক ও উপহার এবং পারস্য রাজের পক্ষ হতে বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণির রাজকীয় পদক ও সনদ প্রদান। তেহরান অবস্থানকালে আফগান, মিশরীয়, ব্রিটিশ রাজ দূতাবাসের পক্ষ হতে কবিকে সম্বর্ধনা। কবি তাঁর *পারস্যে* লেখেন :

> আজ ৬ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারি দিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানা রকমের। এখানকার গবর্মেন্ট থেকে একটি পদক ও সেইসঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের– আমি দ্বিজ। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ৮ মে তেহরান ত্যাগ করে হামাদান যান। সেখানে প্রাচীন পারস্য রাজধানী পরিদর্শন করে কেরমান শাহ ও কাছরে শিরিন হয়ে স্থল সীমান্ত পথে ইরাকে প্রবেশ করেন ১১ মে। *পারস্যে* রবীন্দ্রনাথ ইরান ও ইরাক এ দুটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখেছেন এখানে সাধারণ মানুষ থেকে রাজপুরুষ, বিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে মরুভূমির বেদুঈন– সকলের মধ্যে যে ধর্মবোধ, তার সাথে তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের কোনো বিরোধ নেই– বিরোধ শুধু যেখানে তত্ত্ব স্থান নেয় প্রাণের। এ গ্রন্থে তিনি সর্বকালীন, সর্বদেশীয় হয়েছেন– তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ বিভিন্ন ধর্মের অভিন্ন সূত্রগুলোকে গ্রন্থিত করে একই মানববোধে উজ্জীবিত হয়েছেন। পারস্যবাসীদের অতিথিপরায়ণতা বিষয়ে কবি তাঁর *পারস্যে* বলেন :

> এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার– এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে– অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণির অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম-প্রচারক, কোরানপাঠক, সৈয়দ– এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সংকুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস করে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি-অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার পাওয়া যায়।... পরদিন তিনটে-রাত্রে উঠতে হল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই এপ্রেল তারিখে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল। বুশেয়ারের গবর্নর আমাদের আতিথ্যতার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৩৭-৪৩৮)

১৫ মে ইরাকের বাদশা ফয়সলের আমন্ত্রণে বাগদাদের উদ্দেশে সড়কপথে তেহরান ত্যাগ। কাজভীন শহরে রাত্রি যাপন। ১৬ মে ভোরে ঐতিহাসিক নগরী হামাদান অভিমুখে যাত্রা। সেখানে ক্ষণিক বিশ্রামের পরে বেহিস্থানে দারিয়ুসের শিলালিপি এবং তাকিবুস্তানে সাসানীয় যুগের খোদাই চিত্র দেখার পর কের্মানশাহ'র দিকে যাত্রা ও সেখানে রাত্রি যাপন। ১৭ মে ভোরে কের্মানশাহ হতে যাত্রা করে ইরাক সীমান্তবর্তী পারস্য-শহর 'কাসরে শিরিনে' প্রবেশ। এখান থেকে পারস্য-সীমান্ত অতিক্রম এবং ইরানি ও ইরাকি রাজ কর্মচারীদের বিদায় ও স্বাগত অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে রেলপথে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা। ৩ জুন ১৯৩২ এক মাস বাইশ দিন পর পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ শেষে কবির কলকাতা প্রত্যাবর্তন। (স্বপন[১২], ১৯৯৩ : অবলম্বনে)

পারস্যে কবি যে সম্মান ও আপ্যায়নে ভূষিত হয়েছেন তা শুধু পারস্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের কারণে সম্ভব হয়েছে। কারণ তাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে কবির মন। পারস্যের কবিমনও রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবে তাদের স্বগোত্রীয় কবির ভালোবাসায় সিক্ত করেছিল। তাই ইরান সফরের পর তাঁর লিখিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর *পারস্যে* অংশে বলেন :

> কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সংগে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোন দান না দিয়েই পেয়েছি। ... এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেই জন্য এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইন্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য-অভিমানবোধ

Dhaka University Institutional Repository

> বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সংগে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তার পরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেচে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি, এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজপথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে– এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনাপাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করে নি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্টই অনুভব করা গেল। (ঠাকুর[১৪], ১৯০৮ : ৪৫০-৪৫১)

এর দু'বছর পর ১৯৩৪ সালে মহাকবি ফেরদৌসীর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কবিকে পারস্য সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালে একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রীলঙ্কা সফরের ফলে তিনি এ আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক ডি.লিট্. ডিগ্রি প্রদান করে। অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ এ ডিগ্রিপ্রদান অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধিতে ইন্দো-ইরানীয় সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও এই ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রবীন্দ্রনাথের *পারস্যে* গ্রন্থের মূল উদ্ধৃতি প্রয়োগের মধ্যেই এই বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ভ্রমণ পরবর্তী এই সম্পর্ক আরো বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে– সর্বোপরি ইরানে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা বেড়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালে তেহরানে সরকারীভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় *সাদ বান্দে তাগোর* (ঠাকুরের শতগীতি সঞ্চয়ন)। রবীন্দ্র কবিতার এ ফারসি অনুবাদ সংকলনটির অনুবাদক ও সম্পাদক ভাষা সাহিত্য অনুষদের অধ্যাপক ইব্রাহীমপুর দাউদ। রবীন্দ্র কবিতার আরেকটি ফারসি অনুবাদ জি.এল. টিকু অনূদিত *সুরুদ হায়ে জাভিদানে* (চিরঞ্জীব কাব্যগীতি) প্রকাশ করে তেহরানের মোয়াস্‌সেসেহ্ এন্তেশারাতে বমশাদ প্রকাশনা। প্রখ্যাত আলেম আয়াতুল্লাহ শরীয়ত সাঙ্গালজী প্রণীত *মোসাহেবেহ ব তাগোর* (ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎকার) গ্রন্থটিও এ সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। রবীন্দ্রনাথের ইরান সফর সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ইরানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ, রবীন্দ্রজীবন ও কর্ম সম্পর্কে নির্যাস আলোচনা এবং সেইসাথে পারস্য সফরের সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা ইরানের প্রশস্তিমূলক কবিতার ফারসি অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মেলন-অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনধর্মী গ্রন্থ *তাগোর দার ইরান* (ইরানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। মাহমুদ তফাজ্জলি সম্পাদিত এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে তেহরানের এন্তেশারাতে এলমী প্রকাশনা ১৯৬৩ সালে। হাসান শাহবাজ সম্পাদিত এই প্রকাশনার রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলির* ফারসি সংস্করণের শিরোনাম *গীতাঞ্জলি ওয়া জিন্দেগানী নামেহ*– এ রাবীন্দরানাত তাগোর ওয়া মায়ারফিয়ে আছারে উ' (গীতাঞ্জলি এবং রবীন্দ্রজীবন ও তাঁর রচনা পরিচিতি)।

পরবর্তীকালে ফতেহউল্লাহ মুজ্‌তাবায়ী অনূদিত ও সংকলিত *চিত্রা ও চান্দগজল আজ বাগবানে এশক্* (চিত্রা এবং প্রেমের মালিনী হতে সংকলিত কতিপয় কাব্যগীতি); মোহাম্মদ তাইতী অনূদিত *কিস্তি সেকাস্তে* (ভাংগা নৌকা) *নৌকাডুবি* উপন্যাসের ফারসি অনুবাদ: ফেরেদুন গোরাকানী অনূদিত *পোস্ত খোনেহ* (ডাকঘর), *মোরতাজ* (সন্ন্যাসী), *কোরবানী* (বিসর্জন) এবং *শাহ ও মা-লেকা* (রাজা ও রানী)– এ পাঁচটি রবীন্দ্রনাট্যের অনুবাদ প্রকাশ করে তেহরানের বোঙ্গায়ে হরজমে ও নাশরে কেতাব। দেখা যাচ্ছে তেহরান ও ইরানের অন্যান্য শহরের প্রকাশনা থেকেও রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেরই ফারসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে নজরুল এবং নজরুলকে নিষিদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ নয়; বরং উভয়কে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ রচিত সংগীতকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ এবং নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি প্রদান প্রমাণ করে এ দুই মহান কবি বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। বিশেষকরে নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব বিষয়টি সার্থক করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পারস্য-প্রেমিক কবি। তাঁর পারস্য ভ্রমণ পর্যালোচনা, পারিবারিক পরিবেশে পারস্য-কবিদের সংগীত চর্চা তা প্রমাণ করে। তা ছাড়া তিনি পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে পারস্য-প্রেম লাভ করেন এবং নজরুল যেহেতু রবীন্দ্রযুগের, তাই তাঁর ওপর ঐ যুগের চেতনা থাকাই স্বাভাবিক।

নজরুল রবীন্দ্রযুগের কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্র জ্যোতি ভেদ করে যেখানে তাঁর স্বাতন্ত্র দীপ্তিময় সেখানেও তিনি রবীন্দ্রবিরোধী ও বিদ্বেষী নন; বরং তিনি স্বকীয় চেতনায় স্বপ্রকাশিত। বিদ্রোহের বাণীশিল্পই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য অবদান– অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে অন্যান্য বিষয়েও তাঁর স্বকীয়তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম স্নেহের মধ্যে রয়েছে নজরুলের স্বকীয়তার সম্মান ও স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল তাঁদের সৃষ্টিসম্ভারে আমাদের জন্য অফুরন্ত ভাবসম্পদ রেখে গেছেন। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বেই এ দুই কবি মনীষীর অবস্থান। বিশেষত ধর্মান্ধতাকে কেন্দ্র করেই যত বিপত্তি। নজরুলের চেতনা, আসল ও প্রকৃত রূপটি ধারণ করলে একটি অশুভ শক্তির মুখোশ উন্মোচিত হবে। তাই সংকীর্ণ করার প্রয়াসে তাঁকে 'মুসলমানদের কবি' হিসাবে প্রচার করেন এবং হিন্দু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুসলমান নজরুলকে দাঁড় করিয়ে এক ধূম্রজালের সৃষ্টি করেন। তাই নজরুল ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই সে ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ সে কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল আমাদের অগ্রসর চেতনাদীপ্ত আলোর সন্ধান দিয়েছেন। সে আলোতেই আমরা মানব ধর্মের পথ চিনে নিতে পারি। নজরুল রবীন্দ্রনাথের শেষ বিদায়ে বলেন :

আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে আশিস যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৮৪ : ৩৯)

গ্রন্থপঞ্জি

১. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

২. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায়ঃ আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ; ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১, ২৫ শে মে, ১৯৮৪, ব/এ-১৪৪৫।

৫. মওলা, মনজুরে, *রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতা*, সংকলিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন-১৩৯৮/ ফেব্রুয়ারি-১৯৯২, বাএ-২৫৬৪।

৬. রায়, ডঃ কৃষ্ণগোপাল, *কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশিকা : শ্রীমতি শিখা সরকার, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৯৮।

৭. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার, *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৮. গোস্বামী, করুণাময়, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৯৬/ মার্চ ১৯৯০, বা/এ-২৩৭৮।

৯. আলী, মোবাশ্বের, *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

১০. ইসলাম, মুস্তফা নূরউল, *সমকালে নজরুল ইসলাম*, ১৯২০-১৯৫০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ/ ১৩৯০, নভেম্বর, ১৯৮৩; প্রকাশনা নং বা.শি.এ. ২৪।

১১. আহ্‌মদ, শাহাবুদ্দীন, *ইসলাম ও নজরুল ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ-১৩৯৪/ এপ্রিল-১৯৮৭, ই.ফা.বা. প্রকাশনা : ৬০০/১।

১২. স্বপন, আনিসুর রহমান, *পারস্যে রবীন্দ্র চর্চা*, বুক ভিউ, প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৪০০/৮ আগস্ট, ১৯৯৩/১৭ মোরদাদ-১৩৭২।

১৩. ভট্টাচার্য, শ্রী অবিনাশ: *পুরানো কথা*, বসুমতী (মাসিক), কার্তিক ১৩৬২।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাবিংশ খণ্ড; বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯৩ : ১৯০৮শক; 'পারস্যে'।

১৫. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, *নজরুলচেতনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০৩/জুলাই ১৯৯৬, প্রকাশক : রশিদুন্ নবী, গবেষণা কর্মকর্তা, কবিভবন, বাড়ি নং-৩৩০-বি, সড়ক নং ২৮৯(পুরাতন), ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

১৬. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ : *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ, *রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ*, ৭ পৌষ ১৮৮৪ শকাব্দ।

১৮. ইসলাম, কাজী নজরুল, *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ : ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

১৯. আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীন, *ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রকাশকাল, জুলাই, ১৯৯৮।

২০. রশীদ হায়দার, সম্পাদনা : *রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল*, প্রকাশনায় : নজরুল ইনস্টিটিউট, দ্বিতীয় সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০১৩।

২১. আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীন, *ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রকাশকাল, জুলাই, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব

ক. নজরুল কাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব।

খ. বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ

গ. ফারসির অনুপ্রেরণায় নজরুলের অনুবাদকর্ম

ঘ. হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য

ঙ. খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথের পর বর্তমান শতাব্দীর জনপ্রিয়তার মাপ কাঠিতে সর্বপ্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও নির্ভীক কণ্ঠস্বর একমাত্র তাঁরই। যাঁরা বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রকাব্য থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা গতিপথে এগিয়ে নিতে প্রতিজ্ঞ তাঁদের নায়ক হলেন নজরুল। উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, পারস্য কাব্যের অনুবাদে ও সাংবাদিকতায় নজরুল প্রতিভার বিকাশ লক্ষণীয়। তাছাড়া গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি স্পষ্ট। বড় প্রতিভা যে কোনো ধরা-বাঁধা পথে আত্মপ্রকাশ করে না, নজরুল তারই এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। নজরুলের ফারসি মিশ্রিত কাব্যসৃষ্টিতে তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে এক নতুন চমক সৃষ্টি হয়েছে। যুগের প্রভাবকে তুচ্ছ করে শুরু হয় নজরুলের সৃজনী-প্রতিভার জয়যাত্রা। অভিনবত্ব শুধু এখানেই নয়। নজরুলের কবি-প্রতিভা যে কি অসাধারণ মৌলিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে জন্মেছিল; তা তাঁর ফারসি মিশ্রিত কাব্যসমূহ পরিচয় প্রদান করে।

মধুসূদন যেভাবে হোমরের অনুকরণে দেবদেবীর কল্পনা করেছেন, হোমরের অনুকরণে রাক্ষস-নায়কদেরকে বীর্যবান করে সৃষ্টি করেছেন, ট্যাসোকে অনুকরণ করে প্রমীলার চরিত্রে যোদ্ধজনোচিত শৌর্য আরোপ করেছেন, ঠিক সেভাবেই নজরুল পারস্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ফারসি কবিদের অনুকরণে সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। 'ইংরেজি সাহিত্যের কোন বিশেষ প্রভাব নজরুলের উপর পড়ে নি, কেননা এই সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়ের কোন প্রমাণ নেই।' (গুপ্ত[৪], ১৯৯৭ : ২)

মধুসূদনের কাব্যে যেভাবে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করে আছে নৈতিক শক্তি, রামচন্দ্রের ভীরুতা যেরূপ মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত, রক্ষোরাজ যেরূপ নীতিধর্মের কাছে নতশির হয়েছে ঠিক নজরুলকাব্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধর্মবিরোধী বক্তব্য থাকলেও তাঁর সমস্ত কাব্য নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ এবং ধর্মান্ধ লোকেরা তাঁর কাছে মাথা নত করেছে। নজরুল অসংখ্য আরবি, ফারসি শব্দ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলার ন্যায় স্বীয় কাব্যে ব্যবহার করেছেন। শুধু শব্দ ব্যবহার নয়; ফারসি কবিতার রুবাই, মিসরা ইত্যাদি ছন্দরীতির ব্যবহার দেখিয়ে বাংলা ভাষা এমনকি আরবি-ফারসি সম্বলিত ছন্দের যে মাত্রা, লয়, অনুপ্রাস সবই তিনি বাংলা কবিতায় ব্যবহার করে বাংলা ভাযাভাষী পাঠকদের বিস্মিত করেছেন।

১

ফারসি ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ভাষার মধ্যে অন্যতম। আরবি ভাষার বত্রিশটি অক্ষরের সাথে ফারসি ভাষায় আরও চারটি অক্ষর বর্ধিত করা হয়েছে। ইরান ও খোরাসানের অধিবাসীরা এতে তৃপ্তিবোধ করেছেন এবং তাদের কার্যকরী ভূমিকায় 'আধুনিক ফারসি' বা 'দারি' ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে এ ভাষা সুদূর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গজনবী, মোঙ্গল এবং তৈমুর শাসন আমলে ফারসি বা দারি ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ফারসি।

আধুনিক যুগে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ইরানি সম্রাটদের শিলালিপি ও ধাতুলিপির পাঠোদ্ধার করে জ্ঞানের পরিসীমার বিস্তার ঘটিয়েছেন। ফারসি ভাষা বলতে সাধারণত আরব আধিপত্যে প্রভাবান্বিত মুসলিমযুগীয় ইরানি ভাষাকেই বুঝানো হয়। আরবগণ তাঁদের সাম্রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তার করতে থাকলেও সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় ইরানিদের সমকক্ষ হতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকি যেমন রামায়ণ লিখে ধন্য হয়েছেন তেমনি ফেরদৌসি শাহনামা লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ইহা একাধারে কাব্য, দর্শন ও ইতিহাসের সমাবেশ। তাছাড়া ভাষাবিদদের কাছেও ইহা এক অমূল্য সম্পদ। শাহনামার ভাষা সম্পর্কে শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল বলেছেন, 'ফেরদৌসি তাঁহার জাতীয় ইতিহাস শাহনামা লিখিবার কালে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংকল্প করিয়াছিলেন যে, ইহাতে তিনি কোন বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করিবেন না।' (শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল[১১], ১৩৬০ : ২)

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত বা চতুষ্পদী কবিতা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আত্তার, রুমী, শেখ সা'দী, হাফিজ ও জামী প্রভৃতি মরমী কবি হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। আত্তারের সুফিতত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ রূপক কাব্য *মানতেকুত তায়ের* (পাখিদের কথোপকথন) বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মাওলানা রুমী পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক কবি। তাঁর রচিত মসনবীকে লক্ষ করে পরবর্তী কবি জামী লিখেছেন :

مثنوی معنوی مولوی　　　　هست قرآن در زبان پهلوی

মাসনাভীয়ে মা'নাভীয়ে মৌলাভী　　　　হাস্ত কুরআন দার যাবা'নে পাহলাভী
মওলভীর আধ্যাত্মিক দ্বিপদী কাব্য
পাহলাভী ভাষায় প্রণীত কুরআন।
(উদ্ধৃত, রুমী[৬], ২০০৮ : ১১)

শেখসা'দী ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর রচিত *গুলিস্তান* এবং *বুস্তান* বিশ্ব খ্যাত। হাফিজের প্রেমগীতিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ানে হাফেজ* বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সুফি কবি জামীর *ইউসুফ জুলেখা* ও *লায়লি মজনুর* নাম সুপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক ডক্টর আল্লামা ইকবাল যদিও উর্দু কবি হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তাঁর ফারসি কাব্য *আসরারে খুদী* (আত্মার গোপন রহস্য) ও *পায়া'মে মাশরেক'* (প্রাচ্যের বাণী) বিশেষভাবে খ্যাত। রাজা রামমোহন রায় ফারসি পণ্ডিত ছিলেন। মোগল যুগে ফারসি দরবারি ভাষা ছিল। তাই বহু ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ইহা চর্চা করেছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ভারতীয় ভাষা ও কৃষ্টির উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে খাঁটি ফারসি ও ফারসির মাধ্যমে আরবি শব্দ ব্যাপক লক্ষণীয়।

নজরুলের ফারসি চর্চা তাঁর কাব্যের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প রচনা এবং কাব্যের সামগ্রিক অবয়র সৃষ্টিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস হলেন ইরানের কবি ওমর খৈয়াম[১] ও হাফিজ[২]। এ দুই শক্তিশালী কবির জীবন দর্শন ও বিদ্রোহী চেতনার সাথে সাথে রূপ ও সৌন্দর্যচেতনা এবং সমুজ্জ্বল কাব্যিক কল্পনা কবিকে প্রভাবিত করেছিল। নজরুলের কবিতায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হবে সেটা ফারসি কবিতার রঙিন চিত্রকল্পের কথা। নজরুলের কবিতায় এই রঙিন চিত্রকল্পের রূপ দেখা যায়। যেমন :

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,–
'আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া!'
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩৮)

---

[১] 'খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য' অংশে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।
[২] 'হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য' অংশে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্
বাঁকে বাঁকে রোধে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
জিন্দা বীর!
'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর–
শাতিল-আরব! শাতিল্- আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।
ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩৪)

সতি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই–
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধরে কলজেখানা পেষে!
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই জলজেখানা পেষে!!
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৫)

তবু নজরুল এই রঙিন চিত্রকল্পের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে বা গীতি কবিতায় :

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোট,
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ।
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপী রং শারাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর খোঁপায় যেমন তোন চুনোট।
(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৯৩)

কাজী নজরুল ইসলাম শৈশবেই ফারসি-আরবি ও ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর যৌবন ও সৈনিক জীবনে ফারসির সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাবি মৌলভীর কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষা নজরুলকে তাঁর সাহিত্যে বিশেষভাবে কবিতা-গানে বহুলপরিমাণে ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, 'আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।' (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ১৫)

নজরুল সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায়ই ইরানি কবি হাফিজ, রুমী, সা'দী ও খৈয়ামসহ অন্যান্যের কাব্য পাঠ করেন। তিনি তাঁর কবি জীবনের প্রাথমিক পর্বেই বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে যে ফারসি বিদ্যমান রয়েছে ; সে ফারসি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেন, ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটান, বিদ্রোহি চেতনার রূপকার হিসাবে সাড়া জাগান। 'বিভিন্ন ভাষা ও ভাষার শব্দ সম্পর্কে নজরুল ইসলামের এই যে বিরাট অর্জন তা তাঁর শক্তিশালী ও স্বতঃস্ফূর্ত কবি প্রতিভা প্রকাশের সহায়ক হয়েছিল এবং প্রতিভা দক্ষতায় তিনি তাঁর সাহিত্য তথা কবিতায় সেগুলির সঠিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগও করেছিলেন।' (আরিফ[২], ১৯৯৭ : পচিশ)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ফারসি আয়ত্বের সাথে সাথে সা'দী, খৈয়াম, হাফিজ প্রমুখ কবিদের কাব্যের গভীরতায় প্রবেশ করে হাফিজ ও খৈয়ামের কবিতা-গান অনুবাদ করেন এবং সে সবের প্রভাবে ও অনুসরণে বহু কবিতা-গান ও গজল রচনা করেন। তিনি ভারতীয় হিসেবে ভারতীয় মিথ-পুরাণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অধ্যয়নকালে সংস্কৃত ভাষার কঠিন ও অপ্রচল শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তা আয়ত্ত্বও করেছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাছাড়া তাঁর চাচার তত্ত্বাবধানে ফারসি-আরবি ভাষায় বুৎপত্তিও অর্জন করেন। সৈনিক হিসাবে যোগদান করার পর করাচিস্থ সেনানিবাসে ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম তথা ওমর খৈয়াম, হাফিজ প্রমুখের রচনাবলি অধ্যয়ন করে আরবি-ফারসি ভাষা তথা শব্দ সম্পর্কে একধরনের পারদর্শিতা অর্জন করেন।

নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক বহুভাষী ঔপনিবেশিক সমাজে। সে উপনিবেশের রাজভাষা ছিল ইংরেজি। তাই ইংরেজি ভাষা তথা শব্দে নজরুল ইসলামের অধিকার ছিল স্বাভাবিক। নজরুলের জন্মগ্রহণ আসানসোল বিহার-ঘেঁষা পশ্চিম বাংলার একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ফলে 'ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে বিহারের প্রচলিত হিন্দি ভাষার যেসব শব্দ আসানসোলের আঞ্চলিক বাংলায় প্রচলিত ছিল; সেগুলো তিনি কৈশোরেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলাম হিন্দি-উর্দু ভাষায় বুৎপত্তিও অর্জন করেছিলেন।' (আরিফ[২], ১৯৯৭ : চব্বিশ-পচিশ)

নজরুল 'খেয়াপারের তরুণী', 'মোহররম', 'কোরবাণী', 'শাতিল আরব', 'কামাল পাশা', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' ইত্যাদি ইসলামি ঐতিহ্যমূলক কবিতাগুলোতে ব্যাপকভাবে ফারসি শব্দ ব্যবহার করে, কবিতার ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পে নতুনত্ব এনে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এসব কবিতা রচনার মাধ্যমেই প্রতীয়মাণ হয়ে যে, ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহারে তিনি সুদক্ষ।

নজরুলের পরিবারে ব্যাপকভাবে ফারসির চর্চা হত। তাঁর চাচা বজলে করিম ফারসির পন্ডিত ছিলেন। তিনি ফারসি কাব্য চর্চাও করতেন। চাচা বজলে করিমের কাছেই নজরুলের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রপাত বিশেষত নজরুল কাব্যে ফারসি শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনুপ্রেরণার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। লেটোর দলে থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর গান ও কবিতায় প্রচুর পরিমাণে ফারসি-আরবি শব্দ অত্যন্ত নৈপূন্যের সাথে ব্যবহার করেছেন।

২

কোন কবি অন্য ভাষার কবিতার মধ্যে স্বীয় আত্মফলন আবিষ্কার করেন দুই উপায়ে; অনুবাদ করে ও অনুপ্রেরিত হয়ে। প্রথমটি প্রত্যক্ষ এবং পরেরটি পরোক্ষ। প্রথমটি অবলম্বন করেছেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তাঁর প্রিয় ফারসি কবি ও কবিতার রূপান্তর সেধে স্বীয় কবিতা, গান ও গজলে তাঁদের দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছেন। অপর পথটি অনুসরণ করেছেন মধুসুদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ। বাংলা সাহিত্যের কবি প্রধানগণ ইংরেজি, ফরাশি, জার্মান, গ্রিক কবি ও কবিতা থেকে আহরণ ও পরিগ্রহণ করেছেন। তবে নজরুল ঝুঁকেছিলেন ফারসি সাহিত্যের বিশাল ঐতিহ্যের প্রতি। অবশ্য বাঙালি কবি সাহিত্যিক বিশেষকরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় দীর্ঘদিনের। মধ্যযুগের বহু কবি ও সাহিত্যিক ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রতি মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় *মিরাতুল আখবার* নামে ফারসি ভাষার একটি পত্রিকা পর্যন্ত বের করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬) এর *সদ্ভাব শতক* (ঢাকা-১৯৬১) এর সারাংশ *দিওয়ান-ই-হাফিজ* থেকে গৃহীত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু ফারসিই জানতেন না, বরং কবি হাফিজের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'মহির্ষিদেব নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তিনি পরম বৈরাগী ও প্রমত্ত প্রেমিক হাফিজের ভাব-রসে নিমগ্ন হইয়া গভীর তৃপ্তি লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতকার জানিয়েছেন যে, উপনিষদ ও হাফিজ তার নিত্যপাঠ্য ছিলো।' (শেলী[১০], ২০০৫ : ২৬)

হাফিজের কিছু কবিতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লোকেন্দ্রনাথ পালিত, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার, সতেন্দ্রনাথ দত্ত, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেন। সতেন্দ্রনাথ ফারসি, আরবি, উর্দু ও তুর্কি থেকে প্রচুর অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত এসব কবির মধ্যে আছেন; আবু মুহম্মদ আবদল সালাম বিন রাগোয়ান, আলতাফ হুসেন আনসারি, ইমাম সাফাই মুহম্মদ বিন ইদ্রিস, এজিদ, ওমর খৈয়াম, জেবুন্নিসা, মক্কিন, অলদারাজি, সা'দী, সিরাজ অল ওয়ারক, হাফিজ, নিমতুল্লা, নেজাতি, নৈলি, জয়নাব, জামি, সুলতান, রুমী, রাবেয়া বসরী, মামুদ শাবিস্তানী, বাবর, ফৈজি, ফর্দুসী প্রমুখ। সতেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন রুমীর দশটি কবিতা (তীর্থরেণু), 'রুবাইয়াৎ' নামে ওমর খৈয়ামের বারোটি রুবাই (তীর্থসলিল), রুবাইয়াৎ নামে হাফিজের আটটি রুবাই ও অন্য দু'টি কবিতা 'সাকির প্রতি' ও 'প্রিয়া যবে পাশে' (তীর্থসলিল)। মোহিতলাল মজুমদার অনুবাদ করেন রুমীর একটি 'গজল' এবং 'ফারসি-ফরাস'[১] শীর্ষ একগুচ্ছ ফারসি কবিতা।' (শেলী[১০], ২০০৫ : ২৭-২৮)

ইংরেজগণ যখন ফারসিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছিলেন ঠিক তখন নজরুল পরিকল্পিতভাবে তাঁর সাহিত্যে এ ভাষা ও সাহিত্যের বীজ বপণ করেছিলেন। ইরানের ফারসি কবি শাম্‌স তাবরেজি, রুমী, সা'দী, হাফিজ, খৈয়াম, আনোয়ারি, নিজামি, আত্তার, জামীর কাব্যকর্মের প্রভাব নজরুলের চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যা আমাদের সুন্দর, সুস্থ্য ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি রক্ষায় অবদান রয়েছে। নজরুলের ফারসি জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে আবদুস সাত্তার বলেন,

> রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু ফারসী-আরবী শব্দের সফল প্রয়োগ দেখা গেলেও এবং সত্যেন দত্ত, মোহিতলালের মধ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাস্তবতা তথা সাফল্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান থাকলেও, কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যেই এইসব শব্দরাশি সততায় ও আন্তরিকতায়, ঐশ্বর্যের গভীরতায় ও অর্থব্যাপকতায় এবং ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ও নান্দনিক তাৎপর্যের সম্প্রসারে -এক কথায় নানা বিচিত্রতায় ও উজ্জীবিত অভীপ্সায় নবরূপ ধারণ করতে দেখা গেল। এইভাবে নজরুলের হাতেই বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ হলো এবং যোজিত হলো আধুনিকতার নতুন এক যাত্রা। (আবদুস সাত্তার[১], ১৯৯২ : ১)

১৯২০ সালে নজরুল রুমীর ভাবালম্বনে 'বাঁশির ব্যথা'[২] কবিতাটি রচনা করেন; যা প্রকাশিত হয় *বঙ্গনূর* পত্রিকায় (কার্তিক ১৩২৭)। তিনি হাফিজ অবলম্বনে 'আশায়'[৩] ('প্রবাসী', পৌষ ১৩২৬) কবিতাটি রচনা করেন। নজরুলকৃত হাফিজের কবিতার আদি রূপান্তর কি রূপ ছিলো তা-ও এ থেকে স্পষ্ট হবে। ইরানের মানবতার কবি শেখসা'দীর 'বনি আদম আ'যায়ে এক দিগারান্দ' (সব আদম সন্তান এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র) কবিতার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল ছোটবেলায় কবি চণ্ডীদাসের এ কাব্যপঙ্‌ক্তি গাইতেন, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। কৈশোরে জয়দেব-গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস-চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতির গান শুনে পরবর্তীকালে নজরুল পদাবলি কীর্তনসহ হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকেন্দ্রিক বহু গান-কবিতা রচনা করেছিলেন। যেমন:

---

[১] মোহিতলাল এই নামটি চয়ন করেছেন নজরুলের কবিতা থেকে। নজরুলের 'বাদল প্রাতের শরাব' ও 'পূবের হাওয়া' কবিতার একটি পঙক্তি: ('কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুল-বালারা)। (শেলী[১০], ২০০৫ : ২৮)

[২] কবিতাটি 'হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য' পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩] কবিতাটি 'হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য' পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কি সুখে লো গৃহে র'ব।
আমার শ্যাম হ'ল যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হ'ব ॥
সে আমারই ধেয়ান করিত গো সদা
তার সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫৮৪)

শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়।
আকাশ সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।
আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি'
আকাশ-আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে তাবিয়া
কালো সাগর-সলিল গো।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫৮০)

নজরুল ফারসি-আরবি শব্দাবলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বীয় রচনায় ব্যবহার করেন। এতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে বহু বছর ধরে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য ছিল; তা আধুনিককালে মাইকেল ও রবীন্দ্র কাব্যভাষা অনুসরনের যুগে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। নজরুল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষকরে কাব্যে ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার তার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। নজরুলের ব্যবহৃত ফারসি 'খুন' শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু মন্তব্য করেছিলেন; তাই নজরুল বলেন :

> আমি শুধু 'খুন' নয়-বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিকে থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানি ঢং-এর। বাইরের এ-ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন। (নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৯৩ : ২৭)

ফারসি-আরবি কাব্য ব্যবহারেই নয়, সংস্কৃতি ও হিন্দু ঐতিহ্যবাহী শব্দাবলি ও অন্যান্য ধারার শব্দ ব্যবহারেও নজরুল অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ফারসি-আরবি শব্দাবলি নজরুলের কবিতায় কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নয় বরং ছন্দ ঝংকার ও একক অস্তিত্ব নিয়ে মিশে গেছে। যেসব কবিতায় নজরুল স্বল্প পরিমাণে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন; সেসব কবিতাও বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্যের রূপ নিয়েছে। যেহেতু মূল ফারসির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, তিনি ফারসি-আরবি জানতেন, দিওয়ানে হাফিজ ও রুবাইয়াতে খৈয়াম অনুবাদ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি গজলের অনুকরণে বাংলা গজল[১] রচনা করে বাংলা গজলের স্রষ্টা রূপে অভিহিত হয়েছেন; তাই তাঁর কাব্যে ফারসি-আরবি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ ও ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। পুঁথি-সাহিত্যিকদের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে নজরুলের আরবি-ফারসি ব্যবহারের পার্থক্য হল—পুঁথিকাররা যেখানে আরবি -ফারসি শব্দে বাংলা রূপ ব্যবহার করেছেন, সেখানে নজরুল ব্যবহার করেছেন মূল শব্দ। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নজরুল আরবি -ফারসি শব্দের ব্যবহার-রীতির পুনরুজ্জীবনে সচেতন ছিলেন, আর পুঁথিকারেরা সচেতন ছিলেন দৈনন্দিন জীবনে ঘরোয়া কথাবার্তায় প্রচলিত শব্দ-সম্ভার ব্যবহারে।

মধ্যযুগের কবিগণ ছাড়াও আধুনিক বাংলাকাব্যে নজরুলের আগে ও পরে এবং তাঁর সমসাময়িককালে মুসলমান এমনকি বহু হিন্দু কবিও তাদের রচনায় ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। নজরুলের পূর্বে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেনসহ বহু হিন্দু-মুসলমান কবি, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দদাশসহ অনেকে তাঁদের রচনায় ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার করলেও তাদের কেউই নজরুলের ন্যায় সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। নজরুলের আবির্ভাবের আগে আধুনিক মুসলিম কবিদের রচনায়ও উপজীব্য বিষয়ের দিক থেকে যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পরিস্ফুট ছিল, বাস্তবপক্ষে রচনার ভাষা ও প্রকরণের দিক থেকে তা তেমন বলিষ্ঠ ছিল না; ইসলামি ও মুসলিম ঐতিহ্যমূলক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও, তারা ভাষার ক্ষেত্রে প্রধানত মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারারই অনুসরণ করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দাবলি তেমন ব্যবহার করেন নি। নজরুলকাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক ও যথাযথ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত ও প্রেরণা-সঞ্চারি ব্যবহারের পর, তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরসূরি মুসলিম কবিগণ এমন কি অনেক হিন্দু কবিও বিষয়ানুসারে তাঁদের কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। মাসিক মোহাম্মদীর কার্তিক ১৩৪৫ সংখ্যায় মুহাম্মদ আবদুল বারী 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে বলেছেন :

> যে আরবি-পারসী শব্দকে বিতাড়িত করিয়া বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবার অপচেষ্টা কিছু দিন হইতে চলিতেছে, সেই মুসলমানী শব্দ সমাবেশেই নজরুল কবিতার বীররস এমন গুরুগম্ভীর বজ নির্ঘোষের মত প্রকাশ পাইয়াছি। বস্তুত এই চয়ন ও তাহার সুবিন্যাস নজরুলের নিজস্ব, বাংলা কাব্যে অতুলণীয় কীর্তি। নজরুলের গজল গান, পারসী 'রুবাই' এর অনুকরণে বাংলায় 'রুবাইয়াৎ' সৃষ্টি বাংলা কাব্যে আর এক নূতন দিকের সন্ধান দিয়াছে। (আলী[৩], ১৯৯৪ : ১৯৩)

নজরুলের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে নজরুল অনুসারী বহু কবির আবির্ভাব ঘটেছে; যাঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মুসলমান কবির সংখ্যাই বেশি। তারাও নিজস্ব রচনায় বহুল পরিমাণে ফারসি-আরবি শব্দাবলি ব্যবহার করলেও নজরুলের ন্যায় সার্থকতা অর্জন সম্ভব হয় নি। তবে নজরুলের উত্তরসূরীদের মধ্যে 'ইসলামি আদর্শ, ঐতিহ্য ও রেনেসাঁর রূপকার এবং মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদই বিষয়ানুসারে আরবি -ফারসি শব্দের ব্যবহারে অসামান্য শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল্য।'(শেলী[১০], ২০০৫ : ২৪)

নজরুল অজস্র কবিতা-গানে আরবি শব্দের পাশাপাশি অসংখ্য ফারসি শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও আরবি-ফারসি শব্দাবলি পাশাপাশি যুগল বন্ধিরূপে ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দিসহ বহু বিদেশি শব্দ এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও অঙ্গীভূত হয়েছে যে, সেসব বাংলা শব্দে পরিণত হয়ে গেছে যা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কোনটি কোন ভাষা তা শনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু নজরুল ফারসি-আরবি ভাষা ও সাহিত্যে

---

[১] 'বাংলা গজলে ফারসি প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ' পর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞ ছিলেন বলেই তাঁকে এ ধরনের বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হয় নি। তিনি ফারসি-আরবি শব্দাবলি সঠিকভাবে শনাক্ত এবং সাহিত্যে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠত্ব।

যে ভাষা বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য থেকে যত বেশি ও বৈচিত্রময় শব্দ-সম্ভার আহরণ ও শোষণ করতে পারে সে ভাষা তত সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যে কবি নিজের মাতৃভাষা এবং অন্যান্য বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য থেকে শব্দাবলি আহরণ এবং নিজের রচনায় দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তিনি তত বড় সৃজনধর্মী ও শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক। বাংলা ভাষা বহু বিদেশি ভাষা থেকে শব্দাবলি আহরণ করে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রমণ্ডিত হয়েছে। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণও বিদেশি ভাষার শব্দ-সম্ভার আহরণ ও রচনায় ব্যবহার করে শিল্প সচেতনতা, শক্তিমত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে রেখেছেন অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। আবদুস সাত্তার বলেছেন, 'নজরুল ইসলাম কেবল শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনো কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি এবং ভাবধারারও অনুকরণ-অনুসরণ করেন নি। এজন্যই বলেছি নজরুল ইসলাম এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। (আবদুস সাত্তার[১], ১৯৯২ : ১২)

কাজী নজরুল ইসলামের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় শব্দ ব্যবহার, স্টাইল, আরবি-ফারসি শব্দের ঝংকার, সমরজাত শব্দের অনুকরণে নতুন আকাঙ্ক্ষায় বাংলা কবিতার স্পন্দন শুরু হয়েছে। রবিকরোজ্জ্বল (রবীন্দ্রনাথ) কাব্য পরিবেশে এ কারণেই কাজী নজরুল ইসলাম উদিত হতে পেরেছিলেন ধূমকেতুর মতো। 'তিনি তাঁর কাব্যগুচ্ছে যেন ধারণ করেছিলেন জীবনাবেগের বোহেমিয়ান ফুলকিচ স্রোত। আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন অনুজ তিরিশি আধুনিক কবি গোষ্ঠীর অনেককে। জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপালক' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থ নজরুলের কবিতাদ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত।' (শেলী[১০], ২০০৫ : ১১৫)

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুল রাজমিস্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। রাজমিস্ত্রীরা প্রাসাদ বা ইমারত তৈরির সময় যেমন হাতুড়ি দিয়ে ইট পরীক্ষা করে ইমারত গাঁথা শুরু করেন। ইট খারাপ মনে হলে প্রথম টোকাতেই বুঝতে পেরে সেটা বাতিল ঘোষণা করে ফেলে দেন। আবার কোন ছোট জায়গায় যেখানে পুরো ইটের প্রয়োজন নেই, সেটা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে বা ছেঁটে-ছেঁটে ছোট করে ঠিক মানানসই মতো বসিয়ে দেন। কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর কাব্য তথা সাহিত্য প্রাসাদ তৈরিতে বাছাই করা শব্দের ইট তো ব্যবহার করেছেনই, তদুপরি ছন্দ, মাত্রা, তাল, লয় ইত্যাদি জনিত কারণে কোনো শব্দ-ইট ভেঙে একটু ছোট করেছেন। অথচ সে শব্দ বুঝতে আমাদের কোনোই কষ্ট হয় না। যেমন- 'অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন রোল'। চার মাত্রার এই 'দহলিজ'-কে মাত্রা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তিন মাত্রায় 'দলিজ' করেছেন এবং উক্ত পংক্তিতে ছন্দেরও কোনো পতন ঘটে নি। অথচ শব্দটির চেহারা দেখে ও অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি ওটা দহলিজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অনুরূপভাবে দরিয়া থেকে 'দরী' যেমন- 'গিরিদরী' (পর্বত-সমুদ্র); দাওয়াত থেকে 'দাওত' যেমন, 'দাওত' এসেছে নয়া জামানার'; 'তাওফিক থেকে 'তৌফিক' যেমন 'তৌফিক দাও খোদা ইসলামে'; 'রওশন' থেকে 'রোশনি' বা 'রোশান' যেমন যুচালে কি অমা রোশনীতে'; 'নওজোয়ান' থেকে নৌজোয়ান' যেমন- 'শুনরে পাতিয়া কান 'নৌজোয়ান', ইত্যাদি । (আবদুস সাত্তার[১], ১৯৯২ : ১৪-১৫)

নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি-উর্দূ শব্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের কাব্য তথা পুঁথি-সাহিত্যে প্রচুর আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মুনসী শেখ মোহাম্মদ, মুনসী ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ দানেশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের শব্দ-প্রয়োগ-কৌশল এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে সুঘ্রাণ থাকলেও 'বসরার গোলাপে'র সুঘ্রাণ ছিল না। কাজী নজরুল এইসব শব্দ ব্যবহারে শুধু রাজমিস্ত্রীর ভূমিকাই পালন করেন নি, তৈরি করেছেন সুদৃশ্য এবং শৌখিন ইমারত-আধুনিক কালের নতুন প্যাটার্ণে। আর এই শৌখিন ইমারতের সম্মুখে বিস্তৃত করেছেন 'বসরার গোলাপে'র মনোমুগ্ধকর বাগান। (আবদুস সাত্তার[১], ১৯৯২ :১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩

নজরুল কাব্যে প্রচুর ফারসি শব্দ রয়েছে তন্মধ্যে নজরুলের ব্যবহারকৃত কিছুসংখ্যক শব্দ উদাহরণসহ নিম্নে তুলে ধরা হলো। নজরুল কিভাবে বাংলা কাব্যে ফারসি শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এর মাধ্যমে তা কিছুটা হলেও ধারণা করা যাবে। এখানে নজরুলের ব্যবহৃত ফারসি শব্দের সাথে আধুনিক মূল ফারসি ফন্টে শব্দাবলি তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে আধুনিক ফারসির সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের উচ্চারণে পাথক্যও লক্ষণীয়। যেমন آواز এর আধুনিক উচ্চারণ হবে 'অভা'য' সেখানে নজরুল বাংলা কাব্যের সাথে মিল করে ব্যবহার করেছেন 'আওয়াজ'। এসব শব্দ ব্যবহারে নজরুলের সৃজনক্ষমতা ও শব্দ সচেতনতা এবং প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু কিছু ফারসি শব্দের সাথে পংক্তি তুলো ধরা হল :

আব (آب- অব) : পানি, জল।

সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও আজো সে কলমা আছে,
আজো উথলায় আব-জমজম কাবা শরীফের কাছে

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৬)

আবে কাওসার (آب کوثر- অবে কাউসার) : বেহেশতের কাওসার নামক প্রস্রবণের পানি। এখানে ফারসি 'অব' আরবি 'কাওসার' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রস্তুত হও-আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে–
আল্লাহ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্তা লয়ে–

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৯)

আতশ(آتش- অতাশ) : (آتش)>আতশী (آتشی) : অগ্নি, আগ্নেয়।

জিবরাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান অন্-চান্।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৬)

আখেরী (آخری - অখেরী) : শেষ (আরবি আখের এর সঙ্গ ফারসি 'ই' যুক্ত)।

উমর ! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৬৬)

আরাম (آرام-অরা'ম) : বিশ্রাম।

জুতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরামসে যার কাটিল দিন।' (জীবনে যাহারা বাচিল না)

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫২৯)

আজাদ (آزاد-অযা'দ) : আজাদী-স্বাধীন, মুক্ত।

পশু কোরবানী দিস্ তখন
আজাদ-মুক্ত ও যখন
জুলুম-মুক্ত হবে ও দ্বীন।–

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫৭)

আফতাব (آفتاب - অফতা'ব) : সূর্য, সুরুজ।

মক্কার হাতে চাঁদ এলো যবে তক্‌দিও আফ্‌তাব
কুল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

আওয়াজ (آواز - অভ'য) : শব্দ, ধ্বনি।

কওে তসলিম হর কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন মুঝ্দা সে উচ্চাওে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৩)

আঁহাজারি (آه زاری- অহজা'রী) : আর্তনাদ।

খালেদ ! খালেদ ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহা-জারি ?
কত 'ওয়েসিস্' রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৫)

আফসোস (افسوس - আফসোস) : দুঃখ, কষ্ট, দীর্ঘশ্বাস।

ওরে সব যায়,
তবু কবজায় তোর শম্শের নাহি কাঁপে 'আফ্সোস' হায়?

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩২)

আঞ্জাম (انجام - আনজ'ম) : আয়োজন।

চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৩)

ইরান (ایران- ইরা'ন) : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দেশ।

জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪৪)

বদনসীব (بد نصيب -বাদ নাসিব) : খারাপ ভাগ্য, দুভাগা (بد ফারসি এবং نصيب আরবি)।

যেদিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোম্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর বদ-নসীব।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৭)

বরাত (برات -বারা'ত) : ভাগ্য।

বদ-নসীবের বরাত খারাপ বরাদ্দ তাই করলে কিনা আল্লায়,
পিশাচগুলো পড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায় !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২১)

বাগিচা (باغچه- বা'গচে) : বাগান।

খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ এই বাগিচার বুলবুল !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪২)

বাদশাহ (بادشاه-পা'দেশা') : সম্রাট, রাজা।

কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ হতে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমিদারী !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

মোরা আস্‌হাবে কাহাফের মত
হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ্
কোন কালে, তারি করি বড়াই

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২১৯-২২০)

বুলন্দ (بلند - বুলান্দ) : উচ্চ, ভাল।

দু'জনার হবে বুলন্দ্- নসীব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব ?
এ নহে বিধান ইসলামের ॥

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫৬)

বুলবুল (بلبل - বুলবুল) : বুলবুল।

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান
বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার রহম মাগে
আমি খোদার ইশ্‌ক চাই।

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২৯)

বুসা (بوس - বুস) : চুমো।

'খালেদ ! খালেদ!' ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়
বলে, 'সত্যিই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে আয়।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৮)

বেঈমান (بی ایمان -বিইমা'ন) : বিশ্বাসঘাতক (بی ফারসি এবং ایمان আরবি)

জানো না কি তুমি, রে বেঈমান !
আল্লাহ সর্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু ?

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫৬)

বে আদব (بی ادب - বি আদাব) : অভদ্র।

যত হুরী পরী অপ্সরীদল--
বেয়াদবি দেখে চটিয়া লাল।

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪৩৩)

বে-খবর (بی خبر - বিখাবার) : অচেতন।

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে
দ্বীন-ই-ইস্‌লামী লাল মশাল
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২১৯)

বেহুঁশ (بی هوش - বিহুশ) : অচেতন।

খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে
বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।
ছেড়ে মস্‌জিদ আমার মুর্শিদ

Dhaka University Institutional Repository

এল যে এই পথ ধরে ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩০)

পয়গম্বও (پیغامبر- পেইগাম্বর) : মহাপুরুষ, নবী।

কোনো অলী কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্মে দেয় নি ক গালি, –কে রাখে তার খবর ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৬২)

পয়গাম (پیغام - পেইগা'ম) : সুখবর।

শুভ বিবাহের পয়গাম তারে পাঠাল-দেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হ'ল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ১১০)

পয়মাল (پیمال - পেইমা'ল) : বিনষ্ট, ক্ষতি।

তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
'দাদা ! তেরি ঘর কিয়া বর্‌বাদ্ পয়মাল্ !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩৯)

পাক (پاک -পা'ক) : পবিত্র।

খালেদ! খালেদ! মিস্‌মার হ'ল তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

পলিদ (پلید- পলিদ) : অপবিত্র।

খালেদ ! খালেদ ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪১)

পিঞ্জর (پینزار- পিন্‌জর) : খাঁচা।

ফিরদৌসীর রণ-দুন্দুভি
শুনে পিঞ্জরে জেগেছে শের !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪৩)

পিরহান(پیراهن- পিরা'হান) : জামা।

পিরানের সব দামন ছিন্ন, কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

পুল-সিরাত (پل صراط - পুলসির'ত) : সাঁকো, পুল।

খাতুনে-জিন্নত আমার মা,
হাসান হোসনে চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কিয়ামত
পুল-সিরাতের কঠিন পুল ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২৯)

Dhaka University Institutional Repository

তুফান (توفان- তুফা'ন) : ঝড়।

নাহি আর চৈতি হাওয়া
বৈশাখী তুফান ॥

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৯২)

তকমা (تکما- তুকমা') : চিহ্ন।

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক উর্ধ্বে, জেনো;
চাপরাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো!

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪১)

তাজী (تیزی-ত্যাজি) : ঘোড়া।

এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন তুর্কী তাজী,

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২১)

জঙ্গ (جنگ-জাং) : যুদ্ধ।

জং ধরে নি ক' কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

জুদা (جدا-জুদা') : পৃথক

হাঁকে ঘন ঘন বীর–
'হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হযরত– যে নেবে তাঁরে গোরে।'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

জোশ (جوش-জুশ) : শক্তি, সাহস, উৎসাহ

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে?
মুয়াজ্জিনের হুঁশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

জাহান (جہان-জাহা'ন) : পৃথিবী।

আজি ইসলামি ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান
নাহি বড় ছোট–সকল মানুষ এক সমান,

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫৬)

জানোয়ার (جانور-জা'নভার) : পশু

আনোয়ার ! আনোয়ার !
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩০)

জল্লাদ (جلاد-জাল্লা'দ) : খুনী।

এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদের প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হ'ল জল্লাদ ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

চরকা (چرخه-চারখে) : সুতো তৈরীর চাকা।

কালের চরকা ঘোর
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড়শত চোর।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৪৪)

চাপরাশি (چاپرشی - চা'পরাশি) : পিয়ন।

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক উর্দ্ধে, জেনো;
চাপরাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো!

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪১)

চেহারা (چهره- চেহরে) : অবয়ব

মর্দের মত চেহারা ওদের স্বাধীনের মত বুলি,
অলস দু'বাজু দু'চোখে সিয়াহ অবিশ্বাসের ঠুলি !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

হাম্মাম (حمام- হাম্মা'ম) : গোসল খানা

খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের 'হাম্মাম!

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৩)

হারামী (حرامی-হারা'মী) : পাঁজি, বদমাস।

এক রাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জীর আর এক হাত খোলা
কী যেন হারামী নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ :৪৪০)

হিসাব (حساب- হেস'ব) : হিসাব।

তেমনি আমি চাহি খোদায়,
চাহি না হিসাব করে ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩১)

হুরপরী (حر و پری- হুর ও পরি) : স্বর্গীয় নারী

হুর-পরী শোকে হায়
জল-ছল ছল চোখে চায়।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

খাক (خاک- খা'ক) : মাটি

খাক বলিল, না, জানিনাত আমি, 'আব' বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনো, তুমি কি দেখেছ মোর বন্ধু কোন্‌খানে ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৩৮)

খাজা খিজির (خاجه خيزير -খা'জা খিজির) : খাজা খিজির।

উর্দ্ধে জাগিয়া রহিলেন 'ঈসা' অমর, মর্ত্যে 'খাজা-খিজির'
- দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর-

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৬০)

Dhaka University Institutional Repository

খাপ (خوف--খওফ) : ঢাকনা।

শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

খাস(خاص-খা'চ) : আসল।

জগতের খাস্ দরবারে চাই–
হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত
তাই প্রাণ ভরে করিব পান।

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪২৯)

খোশ খবর (خوش خبر- খোশ খাবার) : শুভ সংবাদ।

ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপাওে তাঁহারি আসার খোশ্খবর–

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৬০)

খোশ নসীব (خوش نصيب- খোশ নাসিব) : সৌভাগ্য।

দশ দিক ছাপি ওঠে আবাহন, 'ধন্য ধন্য মুত্তালিব!
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আবদুল্লাহ খোশ-নসীব,

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৬০)

খুন (خوب-খুন) : রক্ত।

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,–
'আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া !'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩৮)

খোশরোজ (خوشروز- খোশরোজ) : শুভ দিন।

খুশী লয়ে খোশ্রোজের
আয় খেয়ালী খোশ্-নসীব !
জ্বাল্ দেয়ালী শবেরাতের
জ্বাল্ রে তাজা প্রাণ-প্রদীপ ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২১)

খোশবু (خوشبو- খোশবু) : সুঘ্রাণ।

সাহারাতে ফুট্ল রে
রঙিন গুলে-লালা।
সেই ফুলেরই খোশ্বুতে
আজ দুনিয়া মাতোয়ালা ॥ (জুলফিকার)

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২৫)

খোদ (خود - খুদ) : নিজ

খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

খোদা (خدا - খোদা') : স্রষ্টা

খোদার হাবিব বলিয়া গেছন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না মেহ্দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

খেতাব (خطاب - খেতা'ব) : উপাধি

কায়েস্ যেমন লায়লি লাগি'
লভিল মজ্নুঁ খেতাব,
যেমন ফরহাদ শিরীন প্রেমে
হ'ল দীওয়ানা বেতাব,

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৩০)

দরবার (دربار-বাদবা'র) : সভাস্থল, কোর্ট।

খ্সে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
তাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪০)

দরবেশ(درویش-দারভিশ) : ভিক্ষুক, গরীব, আল্লার পথে দরিদ্র জীবন যাপন।

হায় ঋষি-দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৩৪)

দরাজ দিল (دراز دل- দেরা'জ দেল) : প্রশস্ত হৃদয়

শুক্নো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল্
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দীন দুনিয়ার খিল,–

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

দরিয়া (دریا- দারইয়া') : সমুদ্র।

মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল ঢালে

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৬)

দরুদ (درود- দরূদ) : নবীর প্রশংসা।

আরব আবার হ'ল আরাস্তা,
বান্দারা যতো পড়ে দরুদ।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪২)

দস্ত (دست -দাস্ত) : হাত।

বাজুতে তাহার বাঁধা কোর্-আন, বুকে দুর্মদ বেগ,
আল্বোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারুণ তেগ !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

দানা পানি (دانہ پانی- দানে পানি) : খাদ্য পানীয়।

মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানুষের দানা পানি !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৬২)

দামামা (دمامہ- দামা'মা') : ঢোল।

তবে শোন্, ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪০)

দিল (دل- দেল) : অন্তর।

এ কি বিস্ময়! আজরাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ!
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৬)

দুশমন (دشمن-দুশমন) : শত্রু।

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি,
দুশ্‌মন্- খুনে লাল হ'য়ে ওঠে খালেদী আমামা একি!

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

দোয়া (دعا- দুয়া') : আর্শীবাদ।

হে শহীদ ! বীর! এই দোয়া ক'রো আরশের পায়া ধরি'–
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি' !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৭২)

রওশন (روشن-রওশান) : উজ্জ্বল, সুন্দর।

সূর্য যেন গো দেখিয়াছে–তার পিছনের অমারাতি
রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৬৭)

রওশনী (روشنی - রৌশনি) : উজ্জ্বল্য, আলোকময়তা।

বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশ্‌নীতে ?

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪১)

রাহা (راہ- রা'হ) : রাস্তা, পথ।

অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুত সে দূর তোদের ঘরের 'রাহা',
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৫)

Dhaka University Institutional Repository

রোজ (روز- রোজ) : দিন, দিবস

যেন রোজ-হাসরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

রোজ কেয়ামত (روز قيامت - রোযে কিয়া'মাত) :ধ্বংশ, বিলয়ের দিন।

জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিশরের তরে' 'রোজ-কিয়ামত', ইহার অধিক নয়।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৬০)

রোজা (روزه- রোযে) : উপবাস।

গরীবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় ব'লে আমি মানি তাকে।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২১৩)

জমিদার- زمين دار / যেমিনদ'র : ভুস্বামী, ভুমির মালিক।

এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবীখেতাব পায়।
কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৬২)

জিঞ্জির (زنجير - জাঞ্জির) : শিকল।

আজাদ আত্মা ! আজাদ আত্মা ! সাড়া দাও, দাও সাড়া !
এই গোলামীর জিঞ্জির ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৯)

জিন্দান (زندان - জেন্দা'ন) : জেলখানা।

ছিল জিন্দানে যারা আজকে তা'রা জিন্দা হয়ে
ছোটে ময়দানে দারাজ-দিল্ আজি শমশের লয়ে।

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২৩)

সওদা (سودا- সওদা') : মামগ্রী।

ওরে আছে বেলা, ভাঙেনি ক মেলা, ইহারি মাঝে
প্রাণের সওদা ক'রে নে, বরে নে হৃদয়-রাজে।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ১০৫)

সওয়ার (سوار- সভা'র) : আরোহী।

বোর্‌রাকে তারা হইবে সওয়ার,–
ছুঁটাইবে ঘোড়া! ততঃকিম্!

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪৩০)

সফেদ (سفيد - সেফিদ) : সাদা।

নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ ?

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

সেতারা (ستاره - সেতা'রে) : তারকা।

জোহরা সেতারা উঠেছে কি পূবে? জেগে উঠেছে কি পাখী ?
সুরার সুরাহি ভেঙ্গে ফেল সাকী, আর নিশি নাই বাকী।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৩৯)

সিন্দাবাদ (سندباد - সেন্দবা'দ) : নাবিক।

হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো ?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্দাবাদের বাহন সাজো !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৯)

সিপাহ্ সালার (سپاه سالار - সেফা'হ সা'লা'র) : সেনাপতি।

ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ-সালার কামাল ভাই- এর কালাম !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৭)

শারাব (شراب -শার'ব) : শরবত।

অনুরাগের লাল শারাব্ মোর
চোখে ঝলে ঝল্মল্ ॥

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৮৫)

শমশের (شمشیر- শামশির) : তরবারি

হায়দরী হাঁক হাঁকি' দুল্‌দুল্-আসওয়ার
শম্‌শের চম্‌কায় দুশমনে ত্রাসবার !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ :৪০)

শির (سر- সার): মস্তক, মাথা

আল্লার নামে নিবেদিত 'শির' নোয়ায় সাধ্য কার ?
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২১৪)

শিরনী (شیرنی- শিরনী) : মিষ্টি খাদ্য।

ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শির্‌নী ফুল-কালাম !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫৬)

শিরাজী (سراجی- সিরা'জী) : পানীয়।

শিরাজী পিয়ারে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৩৭)

শেরওয়ানী (شیروانی- শেরভা'নি) : ঢিলা কোট, ঢিলা জামা।

রীশ্-ই বুলন্দ্ শেরওয়ানী, চোগা, তস্‌বি ও টুপি ছাড়া,
পড়ে না ক' কিছু মুসলিম-গাছ ধ'রে যত দাও নাড়া !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

ঈদগাহ (عیدگاہ -ঈদগা'হ) : ঈদের মাঠ।

আজিও তেমনি জমায়েত হয় ঈদগাহে মস্‌জিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিঁদে !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৬)

ফরিয়াদ (فریاد-ফারইয়া'দ) : অভিযোগ

কোথায় তখ্‌ত তাউস,
কোথায় সে বাদ্‌শাহী।
কাঁদিয়া জানায় মুস্‌লিম্‌
ফরিয়াদ য়্যা এলাহী ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২০)

কতলগাহ (قتلگاہ-কাত্‌লগা'হ) : বধ্যভূমি, হত্যার মাঠ।

রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে! দুর্বল নর-নারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কত্‌ল্‌-গাহেতে তারি !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

কবরস্তান (قبرستان- কাবরেস্তা'ন) : সমাধিস্থান।

আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্থানে পেয়েছে তার খবর ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৭)

কমজাত (کمجات-কামজা'ত) : পাঁজী, বদমাশ, নিন্ম মানের।

ধুঁকে ম'লো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাতরা !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪)

কমবক্ত (کمبخت- কামবাখ্‌ত) : অভাগা, দুর্ভাগা।

এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্ব্বনেশে।
তখ্‌তের লোভে এসেছে এজিদ কম্‌বখ্‌তের বেশে !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৬)

কাগজ (کاغذ-কা'গাজ) : লেখার কাগজ।

কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত সাগর-তীরে ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৬)

কুরর্ণিশ/ কুর্ণিশ (کرنیش-কুরনিশ) : অভিবাদন, সালাম।

ক'রে তসলিম হর্‌ কুর্ণিশে শোর্‌ আ-ওয়াজ

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৩)

গম্বুজ (گنبد-গুনবাদ) : মসজিদের উপরি ভাগের অংশ, টাউয়ার।

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

গুলজার (گلزار-গুলজা'র) : ফুলময়, সৌন্দর্যময়।

বাজে কাহারবা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৪)

গুলবাগিচা (گلباغچه- গুলবা'গচে) : ফুলের বাগান

গুল্‌-বাগিচার বুলবুলি আমি
রঙিন প্রেমের গাই গজল !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ২৮৫)

গেরেফতার (گرفتار- গেরেফ্‌তা'র) : বন্দি।

দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার' ক'রে গেরেফ্‌তার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৩)

গোর (گور- গোর) : কবর।

হাঁকে ঘন ঘন বীর–
'হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হযরত– যে নেবে তাঁরে গোরে।'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

গোরস্তান (گورستان- গোরেস্তা'ন) : কবরখানা।

জিন্নাৎ হ'তে দেখিব মোদের গোরস্তানের 'পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর।

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৪৯)

মোবারকবাদ (مبارکباد - মোব'রকব'দ): অভিনন্দন।

হুর পরী সব গায় নাচে আজ
দেয় ' মোবারক-বাদ' আলম্‌,

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২১)

মর্‌দ (مرد -মার্দ) : পুরুষ।

ওরা মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে নড়ে।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪০)

মস্তান (مستان-মাস্তা'ন) : মাতাল।

মস্‌-তান !
ব্যস্‌ থাম্‌ !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

মাতম (معتام-মাতা'ম) : দুঃখ, শোক।

হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে ?
দজলা-ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

মাযার (مزار-মাযা'র) : কবর।

খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম ?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম !—

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩৬)

মশ্‌গুল (مشغول - মাশগুল) : ব্যস্ত

বে-খুদীতে মশ্‌গুল আমি
তেমনি মোর খোদার তরে ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩০)

মাহতাব (مهتاب-মাহতা'ব) : চন্দ্র

কোথায় সে তেজ ঈমান
কোথায় সে শান শওকাত
তক্‌দীরে নাই সে মাহ্‌তাব,
আছে পড়ে শুধু সিয়াহি ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২২০)

মিনার (منار-মিনা'র) : মসজিদের উচ্চ টাওয়ার যেখান থেকে মুয়াজ্জিন আজান দেয়।

ফোরাতের পানি রক্তিম হ'ল, মা গো, বিদ্বেষ-বিষে,
কাঁরা তীর হানে কা'বার শান্তি মিনারের কার্নিশে ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৩৯)

মিছিল (میسیل- মিসিল) : কাফেলা

কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহর্‌রমের চাঁদে,
তাজিয়া মিছিল একি কজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২৩৯)

মুসাফির খানা (مسافر خانه- মুসাফিরখা'নে) : অতিথি শালা।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ৩৭)

নয়া জামানা (نیا زمانه- নয়া' জামা'নেহ) : নতুন কাল, আধুনিক কাল।

ওরে যৌবন-রাজার সেনানী
নয়া জমানার নও জোয়ান,

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৪৩৫)

নামায (نماز- নামা'য) : উপাসনা

নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং
ইয়া উয়া প'রে সেজেছ সং

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫৬)

নিশান (نشان- নিশা'ন) : পতাকা।

বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্মা-উঠিবে জেগে !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২১৫)

Dhaka University Institutional Repository

নুরী (نوری - নুরি) : আলো।

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস্
চিন্‌বি খোদাকে,
তোর রুহানী আয়নাতে দেখ্ রে
সেই নুরী রওশন্ ॥

(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ২৩০)

একদম (یکدم-একদাম) : একেবারে, এক নিঃশ্বাসে।

'সাব্বাস্ ভাই ! সাব্বাস্ দিই, সাব্বাস্ তোর শম্‌শেরে !
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম-ঘর একদম-সে রে!

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৯)

◊ খানা (خانه) : মূল 'খানা' (خانه) এর অর্থ স্থান, বাড়ি, জায়গা ইত্যাদি বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে এরূপ দাঁড়ায়। যেমন: চিড়িয়াখানা, ডাক্তারখানা, জেলখানা, কসবীখানা, দস্তারখানা, তারিখানা, জিন্দানখানা ইত্যাদি।

কশাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদেরই শুধু নাই কি ত্রাণ ?

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪৪)

◊ জুদা (جدا) : পৃথক, বিচ্ছিন্ন।

হাঁকে ঘন ঘন বীর–
'হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হযরত– যে নেবে তাঁরে গোরে।'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৯৭)

নজরুলকাব্যে এ ধরণের বহু ফারসি শব্দ রয়েছে[১] :

পিয়ালা (پیاله) : পাত্র।

চাঁদের পিয়ালা'তে আজি জ্যোছনা-শিরাজী ঝরে। (গীতি শতদল)

পীর (پیر) : জ্ঞান-বৃদ্ধ।

মোর জ্ঞানী 'পীর' আজ খারাবির পথে,
এসো মোর সাথী পথবালা। (নির্ঝর গজল)

পেরেশান (پریشان) : হয়রান।

এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
আলীর সেনারে করেছে সদাই বিব্রত 'পেরেশান'। (উমর ফারুক)

তখ্‌ত (تخت) : সিংহাসন।

'তখ্‌তে' তাহার কালি পড়িয়াছে, অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ার তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে। (ভয় করিও না হে মানবাত্মা)

তখ্‌ত তাউস (تخت طاوس) : ময়ূর সিংহাসন।

কেহ চাহিয়াছে 'তখ্‌ত-ই-তাউস' কোহিনূর কেহ, এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ খুশরোজ হেথা, বন্যার সম এসেছে ঢেউ। (আমানুল্লা)

---

[১] আবদুস সাত্তার এর *নজরুল কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ* থেকে নিচের শব্দাবলি গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চেরাগ (چراغ): বাতি।

'দিনে আর রাতে 'চেরাগ' যাহার চন্দ্র-সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম-প্রেমের অশ্রু ধারা?' (আর কতদিন)

হেরেম (حرم) : আন্দর মহল।

আঁধার হেরেমে বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে,
সেইদিন হতে ইসলাম গেলো গ্লানির কালিতে ছেয়ে। (আমাদের নারী)

খঞ্জর (خنجر) : ছুরি, চাকু।

'অঞ্জলি হতে পানি পড়ে গেল ঝরঝর
লুটে ভূমে মহাবাহু 'খঞ্জর' জর্জর।' (মহররম)

খাব (خواب) : স্বপ্ন।

'খাবে' দেখেছিলেন ইবরাহিম
দাও কুরবানী মহামহিম। (কোরবানী)

খামোশ (خاموش) : চুপ, সাবধান, নীরব।

'ব্যাস! চুপ 'খামোশ' রোদন' (কোরবানী)

খেয়ালী (خیالی) : আনমনা।

'আমি 'খেয়ালী' বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।' (বিদ্রোহী)

খোশআমদেদ (خوش آمدید - খোশামাদিদ) : স্বাগতম, শুভ আগমন

'খোশ আমদেদ আফগান শের! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দু শরমে নোয়ায়ে শির বেতাজ।' (আমানুল্লাহ)

দম (دم) : নিঃশ্বাস।

কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টি 'দম' টুটে। (একি আল্লার কৃপা নয়)

দরগাহ (درگاه): মাযার।

নৈরাশা হইয়ো না রে 'দরগাহে' আল্লার। (গীতি শতদল)

দহলিজ<দলিজ (دلیز) : দরজার পাশের স্থান, বারান্দা

নতুন করিয়া আমিনা জননী কাঁদিলেন হেরি' শূন্য কোল,
অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন রোল !
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৮৪ : ৭৩)

দোজখ (دوزخ) : নরক।

নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে
পরকালে 'দোজখে'র আগুনে জ্বলিবে। (জয় হোক জয় হোক)

দোস্ত (دوست) : বন্ধু।

ঈদ উৎসব আসিলরে যে দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত দুশমনী ছিল যথা নিল 'দোস্ত'ই আসিয়া জিনে।(মরু-ভাস্কর)

রমজান (رمضان) : চান্দ্রমাস, দহন।

মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর
নামিবে তাহার রহমত এই ধুলির পর। (কেন জাগাইলি তোরা)

জমিন (زمین) : মাটি।

জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন
আসমান যার ছত্র ধরেছে পাদুকা যার 'জমিন'। (কৃষকের ঈদ)

জিন্দাবাদ (زنده باد) : দীর্ঘজীবি হোক।

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

আমরা বলিব, সাম্যশান্তি, এক আল্লাহ 'জিন্দাবাদ'। (এক আল্লাহ জিন্দাবাদ)

জিন্দেগী (زندگی) : জীবন।

'জিন্দেগী' ভর তারি মালা প'রবো আমার গলে। (ইসলামি গান)

সওদাগর (سوداگر) : ব্যবসায়ী।

দেখবি কে আয় আজ আমাদের নওল কিশোর 'সওদাগর',
শুক্ল দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের' পর। (মরু ভাস্কর: কৈশোর)

শবে কদর (شب قدر) : পবিত্র, সম্মানীয় রাত্রি।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পূর্ণ 'শবে কদরে',
জানবে কিসে 'শবে কদর' কয় কারে? (কাব্য আমপারা: সুরা কদর)

শরম (شرم) : লজ্জা।

পুন্য পিশাচ! স্বার্থপর।
দেখাস নে মুখ লাগে শরম। (ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম)

ফরমান (فرمان) : আদেশ।

তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার 'ফরমান'। (এ কি আল্লার কৃপা নয়?)

কম (کم) : স্বল্পতা, অল্প৫

'দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ
সব ভরপুর 'কমি' নাই।' (নতুন চাঁদ)

কমজোর (کمزور) : অল্প শক্তি।

'শমশের হাতে 'কমজোর' নয় শিরীন জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছে জয় অসির অজেয় রণভূমি।' (ডুবিবে না আশাতরী)

কাবাব (کباب) : ভাঁজা মাংশ।

'কলিজা 'কাবাব'-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জুর।' (মহর্‌রম)

কিশ্‌তী (کشتی) : নৌকা, জাহাজ।

'ছিল নবীর নূর পেশানিতে,
তাই ডুবলো না 'কিশ্‌তী' নূহের।' (জুলফিকার)

গর্দান (گردان) : ঘাড়।

'পূণ্য তখতে বসিয়া যে করে তখতের অপমান
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দান।'(ভয় করিও না হে মানবাত্মা)

গুলবাগ (گلباغ) : ফুলের বাগান।

'আজও, গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস রে 'গুলবাগে!' (বনগীতি: সংযোজন)

গুল বাহার (گلبهار) : ফুলের বসন্ত (বাহার=বসন্ত)

'উহারা চাহুন অশান্তি, মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
ভুতেরা চাহুন গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুলবাহার।'(এক আল্লাহ জিন্দাবাদ)

গুলাব (گلاب) : গোলাপ ফুল।

'ওরে 'গুলাব' নিরিবিলি/ বুঝি, নবীর কদম ছুঁয়েছিলি/তাই,
তাঁর কদমের খোশবু আজও তোর আতরে জাগে।' (বন গীতি)

গুলমান (گلشان) : বাগান।

'অসম্ভবের সম্ভব করো জাগো নব যৌবন,
ভিক্ষা দাও গো; এ ধরা হউক আল্লার 'গুলশান'।' (আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও)

গুলিস্তান (گلستان) : বাগান, দুলময় বাগান।

'চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এলো ভোরের দরদালানে

Dhaka University Institutional Repository

পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে 'গুলিস্তানে'।' (মরুভাস্কর)

ময়দান (میدان) : মাঠ।

আমি তকবীর-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে 'ময়দানে'। (আজান)

মুর্দা (مُردہ) : লাশ, শবদেহ।

কোথায় ইমাম কোন সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারিদিকে তব মুর্দার লাশ। (কৃষদের ঈদ)

নওজোয়ান (نوجوان) : নব যুবক।

নিত্য সজীব যৌবন যার এস এস সেই 'নওজোয়ান',
সর্বক্লৈব্য করিয়াছে দুর তোমাদেরই চির আত্মদান। (এক আল্লাহ জিন্দাবাদ)

নওরোজ (نوروز) : নতুন দিন, নববর্ষ।

এরাই শহীদ প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নত নব 'নওরোজ' মেলা। (বকরীদ)

নওয়াব (نواب) : রাজা, জমিদার।

ত্যাগ করে না ক ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
'নওয়াব' বাদশা জমিদার হয়ে চায় প্রতিষ্ঠা মদ। (আর কত দিন)

নওশাহ (نوشاہ) : নতুন বর।

রণে যায় কাসেম ঐ দু'ঘড়ির 'নওশা'
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা। (মহররম)

নীল (نیل) : রং।

বিষে 'নীল' হয়ে আসে মনি- সে কি অধিক মূল্য তরে? (মরু ভাস্কর: আলো আঁধারি)

লাজ (لاز) : লজ্জা।

আল্লার আশ্রয় চেয়ে আল্লার শক্তিতে আজ,
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ। (এ কি আল্লার কৃপা নয়)

হররোজ (هرروز) : প্রতিদিন।

জীবনে যাদের 'হররোজ' রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ,
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ? (কৃষকের ঈদ)

হাজার (هزار) : সহস্র।

আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান 'হাজার, মুয়াজ্জিন। (জুলফিকার)

হুশিয়ার (هوشيار) : সাবধান।

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার। (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)
(আবদুস সাত্তার', ১৯৯২ : ৭৭)

নজরুলকাব্যে কিছু আরবি শব্দের সঙ্গে ফারসি শব্দের সমন্বয়ের মাধ্যমে এক নবরূপ লাভ করেছে যেমন: 'আব-ই-হায়াত, আব-ই-কাওসার, আব-ই-জমজম, আমল নামা, কবরস্তান, কোহিনূর, খোশ খবর, খোশ নসীব, খেয়ালী (খেয়াল+ই), গোলাম খানা, তখত তাউস, বদ নসীব ইত্যাদি। এ সকল কারণে 'নজরুল সাহিত্যে আরবি শব্দ শতকরা ৬০ ভাগ, ফারসি শব্দ শতকরা ৩০ ভাগ এবং উর্দু শব্দ শতকরা ১০ ভাগ'। (আবদুস সাত্তার', ১৯৯২ : ৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলকাব্যে ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক ফারসি শব্দ আছে যেগুলো বাংলায় এসে ছোটখাট হয়েছে বা নিজস্ব শরীর থেকে কিছু অংশ প্রত্যাহার করে বাংলায় মিশে গেছে। অথচ ফারসি ভাষায় এগুলো পুরোপুরিই ব্যবহার হয়। যেমন :

◊ আন্দাজ- اندازه / আনদ'জেহ : মূল ফারসি মাসদার 'আনদ'খ্তান' (انداختن)। এর অর্থ নিক্ষেপ করা, মারা, খোলা, গুলি করা ইত্যাদি। বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটির ভিন্নরূপ লক্ষণীয়। যেমন: 'তীরন্দাজ' (تیرانداز), 'গোলান্দাজ' (گلانداز), 'বরকন্দাজ' (برکانداز), 'খোলন্দাজ' (خلانداز) ইত্যাদি। 'আন্দাজ' (انداز) এর আভিধানিক অর্থ নিরূপণ, পরিমাপ, অনুমান ইত্যাদি।

'নাইকো পাইক-বরকন্দাজ', নাই পুলিশের ডর।' (সাম্যবাদ)

মুরুসিংহেরে করিতনা ভয় এই সবশিশু 'তরিন্দাজ' (মরুভাস্কর)

◊ আলু (آلو) : মূল ফারসি মাসদার 'আলুদান' (آلودن)। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা, আয়ত্তে রাখা ইত্যাদি। যেমন দয়ালু, দুধালো, জোরালো, নিঁদালু প্রভৃতিতে 'আলু' যুক্ত হয়ে বিশেষ্যপদ। যেমন দয়া, জোর নিঁদ ইত্যাদি এক নবরূপ ধারণ করেছে এবং 'আলুদান'(آلودن) শব্দটিও লেজ বিহীন হয়ে কেবল 'আলু' হয়েছে। 'আলু' এর সাধারণ অর্থ মিষ্টি আলু, লাল আলু, গোল আলু ইত্যাদি।

'নিদালু সব আখির পাতায় বন্ধুপ্রায় বুলায় চুম'। (মরু ভাস্কর)

◊ কার (کر) : মূল ফারসি ক্রিয়ামূল (مصدر) হলো 'কারদান' (کردن)। এর অর্থ কারক, ধারক ইত্যাদি। নেক, বদ, জেনা, রোজ ইত্যাদি বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপ লাভ করেছে নেককার, বদকার, জেনাকার, রোজকার ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় শব্দটির আদি রূপ নেই।

'রোজ হাশরে নেককার যতো পাইবে সম্মান।' (মরু-ভাস্কর)

◊ খোর (خور) : মূল ফারসি ক্রিয়ামূল (مصدر) 'খোরদান' (خوردن)। এর অর্থ খাওয়া, পানকরা। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে অর্থ দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যে খায় কিংবা পান করে। যেমন: মদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর, আদমখোর, গাঁজাখোর ইত্যাদি এবং মূলশব্দের লেজুরও খসে পড়ে।

'খামখা তুমি মরছ কাজী ব্যস্ত তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে।

মুক্তি পাবে 'মদখোরের' এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে!' (গোঁড়ামী ধর্ম নয়)

◊ গার (گر) : মূল ফারসির পুরো শব্দ 'গার-ই' (گری) । এর অর্থ বৃত্তি-ব্যবসায় ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে শেষের 'ই' বা 'ইয়ে'(ی) ওঠে যায় এবং শব্দগুলো এরূপ দাঁড়ায়; যেমন: যাদুগর, কারিগর ইত্যাদি। আবার এই মূল ফারসি 'গার-ই' বা 'গারি' শব্দের অপভ্রংশ 'গিরি' যার অর্থও বৃত্তি, ব্যবসায় বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'প্রফেশন'। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরূপ দাঁড়ায়, যেমন মুনশীগিরি, বাবুগিরি, কেরানীগিরি, মৌলবীগিরি ইত্যাদি।

◊ গো (گو) : ফারসি ক্রিয়ামূল (مصدر) 'গুফ্তান' (گفتن) এর অর্থ বলা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে শুধু 'গো' অংশটুকু থাকে বাকী অংশ থাকে না। যেমন: 'দেহেগো', 'কানুনগো।' সিলেটে 'গো' অর্থ টি, টা, খানা, খানি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: দুই বন্ধুতে কোন খাবার বস্তু বিনিময়ের সময় বলেন, 'আপনার গো রাখুইন আমার গো খাইন।' নজরুল বলেন:

'জানেন আমার এই সে দেহে এইসে 'দেহে গো'। (পরশ পূজা)

Dhaka University Institutional Repository

◊ গির (گیر) : ফারসি মূল ক্রিয়ামুল (مصدر) 'গেরেফতান' (گرفتن) অর্থ লওয়া, দখল করা, আয়ত্তে আনা ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে শুধু 'গির' টুকু থাকে বাকী অংশ থাকে না। যেমন: 'আলমগীর', 'জাহাঙ্গীর', 'রাহ্‌গীর'।

তোমার মানস পুত্রের রূপে এলো উন্নত শির
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহান শাহীর 'আলমগীর'। (জামাল উদ্দন)

◊ দান (دانه) : ফারসি মূল শব্দ 'দা'নে' (دانه) এর অর্থ শষ্য কণা, খাদ্য কণা। 'দান' শব্দটি মূল ফারসি 'দানিস্‌তান' (دانستن) এর অন্তর্গত। যখন শব্দটি কোনো বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন শুধু 'দান' টুকুই অবশিষ্ট থাকে আর কিছু থাকে না। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় জানা, বোঝা কিংবা কোনো কিছু রাখার পাত্র বা আধার। যেমন : আতরদান, ছাইদান, কদরদান, পানদান, জুজদান ইত্যাদি।

◊ দার (دار) : ফারসি মূল শব্দ বা মাসদার 'দাশতান' (داشتن) এর অর্থ ধারণ করা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'দার' টুকুই থাকে আর বাকী সব উহ্য হয়ে যায়। অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন: থানাদার, হানাদার, অংশীদার, চটকদার ইত্যাদি।

◊ পছন্দ (پسند) : মূল ফারসি মাসদার 'পছন্দদিদান' (پسندیدن) এর অর্থ পছন্দ করা, মনোনীত করা। এই শব্দ কোনো বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে শুধু 'পছন্দ' টুকুই থাকে এর 'দিদান' উহ্য হয়ে যায়। অর্থ ঠিকই থাকে যেমম: 'দিল পছন্দ', বিবি পছন্দ ইত্যাদি।

◊ পরস্ত (پرست) : মূল ফারসি মাসদার 'পরস্তিদান' (پرستیدن) এর অর্থ উপাসনা করা, পূজা করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পরস্তিদান' (پرستیدن) শুধু 'পরস্ত' (پرست) হয় এবং অর্থ দাঁড়ায় 'পূজারী', উপাসক ইত্যাদি। যেমন : পীরপরস্ত, বোতপরস্ত, গোরপরস্ত, বিবিপরস্ত ইত্যাদি।

◊ পাশ (پاش) : মূল ফারসি পুরো শব্দ 'পাশিদান' এর অর্থ ছাড়ান, বিলি করণ, ছিটানো ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পাশিদান' অন্যরূপ ধারণ করে কেবল 'পাশ' হয় এবং অর্থ দাঁড়ায় যে বস্তু দ্বারা ছিটানো হয়। যেমন 'গোলাপ পাশ'।

'সাদা মেঘের 'গোলাব পাশে' ঝরিছে গোলাব পানি।' (গীতি শত দল)

◊ পোশ্‌ (پوش) : মূল ফারসি মাসদার 'পোশিদান' (پوشیدن) অর্থ পরিধান করা, আবৃত করা, ঢাকা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পোশিদানে'র কেবল 'পোশ' থাকে। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে পরিধান করে কিংবা যে বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়। যেমন: 'বালাপোশ', তক্ত পোশ, খাঞ্চাপোশ, 'পা পোশ' ইত্যাদি।

'চোখের পানির ঝালর ঝুলানো হাসির 'খাঞ্চাপোশ। (বার্ষিক সওগাত)

◊ বর (بر) : মূল ফারসি মাসদার 'বরদান' (بردن) অর্থ বহন করা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'দান' উহ্য হয়ে যায় এবং তখন অর্থ দাঁড়ায় 'বহনকারী,' যেমন 'রাহবর'।

◊ বরদান (بردن) : মূল ফারসি মাসদার 'বারদা'স্তান' (برداشتن) অর্থ ধারণ করা, বহন করা ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'বরদার'ই থাকে। বাকী অংশ উহ্য হয়ে যায় এবং অর্থ দাঁড়ায় ধারণকারী, বহনকারী ইত্যাদি। যেমন: 'নিশান বরদার', হুকুমবরদার, তল্পিবরদার ইত্যাদি।

আমরা হুকুম-বর্দার তাঁর, পাইয়াছি ফর্‌মান্‌,
ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ !

(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৮৪ : ২১৫)

Dhaka University Institutional Repository

◊ বাজ (باز) : মূল ফারসি ক্রিয়ামুল (مصدر) 'বাখতান' (باختن) এর অর্থ খেলা, ভান ইত্যাদি। শব্দটি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে 'বাখতান' সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে নতুন শব্দ 'বাজ' (باز) এ পরিণত হয়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় খেলার নায়ক কিম্বা ভাণকারী। যেমন: 'চালবাজ', 'ধরিবাজ', ফাঁকিবাজ ইত্যাদি।

'যে যত ভণ্ড 'ধরিবাজ' আজ সেই তত বলবান। (ফরিয়াদ)

◊ নবীশ (نویس) : মূল ফারসি মাসদার 'নবীশ্‌তান' (نوشتن) অর্থ লেখা, নকল করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল 'নবীশ' থাকে বাকী অংশ লোপ (حذف) হয়ে যায়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় লেখক বা নকলকারী। যেমন খাস নবীশ, নকল নবীশ, মহল নবীশ ইত্যাদি।

এ ধরনের বহু উদাহরণ লক্ষণীয়। এ সকল উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক আরবি-ফারসি শব্দ বাংলার সাথে মিশ্রিত হয়ে সেসব শব্দের মূল বা 'মাদ্দাহ' (ماده) হারিয়ে আলাদাভাবে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম এ সকল শব্দ সম্পর্কে ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং ব্যাকরণরীতি অবলম্বন করেই তিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ, তাঁর কাব্যের উদ্ধৃতিতে রয়েছে।

কিছু কিছু ফারসি শব্দ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদারূপ নিয়ে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাজাত হয়ে আছে। যেমন:

◊ জোতদার-সংস্কৃত: জোএ > জোও > জোতঅ > জোত +(ফারসি)'দার' (دار)=জোতদার।

◊ গোলন্দাজ-সংস্কৃত: গোলকা > গোলঅ > গোল+(ফারসি) আন্দাজ (اندازه)= গোলন্দাজ।

◊ শিক্ষানবিশ-সংস্কৃত: শিক্ষা +(ফারসি) নবীশ (نویس)= শিক্ষানবিশ।

◊ গাঁজাখোর-সংস্কৃত: গঞ্জিকা > গাজা> গাঁজা +(ফারসি) 'খোর' (خور)= গাঁজাখোর।

◊ ফাঁকিবাজ-সংস্কৃত: ফক্কিকা > ফাকিয়া > ফাঁকি −(ফারসি) 'বাজ'(باز)= ফাঁকিবাজ।

এ ধরনের শব্দও নজরুল কাব্যে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন:

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,
আপনারে আর দিস্‌নে লাজ,−
গরু ঘুষ দিয়ে চাস্‌ সওয়াব ?
(নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ১৫৫)

৫

কাজী নজরুল ইসলাম যেসব ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দগুলো ফারসি ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণের মাধ্যমে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল:

◊ খোশবু (خوشبو) : সুঘ্রাণ, সুগন্ধি। নজরুল বলেছেন,

'যে দেশের বাতাসে আছে নবীজির দেহের 'খোশবু', (জুলফিকার)

○ হাফিজ বলেন:

یار اگر یار ندارد یار هرگز یار نیست
گل اگر خوشبو ندارد دیدار قابل نیست
ইয়ারে আগার ইয়ারে নাদারাদ হারগেজ ইয়ার নিস্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুলে আগার 'খোশবু' নাদারাদ দিদারে কাবেল নিস্ত।

বন্ধু যদি বন্ধু সুলভ আচরণ না করে তাহলে সে বন্ধু নয়,

ফুলে যদি সুঘ্রাণ না থাকে তাহলে তা ফুল নয়।

◊ গুল (گل) : ফুল, পুষ্প। নজরুল বলেছেন,

গোপনে চৈতী হাওয়ায় 'গুল' বাগিচায় পাঠালে লিপি,

দেখে তাই ডাকছে ডালে কুহু বলে কোয়েল ননদী।

○ হাফিজ বলেন:

گل بی روخ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

গুল বে রোখ ইয়ারে খোশ্ না বাশাদ,

বি বাদাহ্ বাহারে খোশ্ না বাশাদ।

[গোলাপ ছাড়া প্রিয়ার মুখ ভালো লাগে না

গোলাপ ছাড়া বসন্ত কাল নিরর্থক]

◊ সাকী (ساقی) : শারাব পরিবেশনকারী। নজরুল বহুবার 'সাকীর' পেয়ালায় আমাদেরকে কাব্য-রস পান করিয়েছেন এভাবে:

'বন্ধু গো 'সাকী', আনিয়াছ নাকি রবষের সওগাত'।

○ কবি হাফিজের সাকী (ساقی) এভাবে হাজির:

ساقی بنور باده بر افروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما

সাকি, ব নূরে বাদাহ্ বর আফরোজ জামে মা,

মুতরেব বেগু কেহ্ কার জাহাঁ শদ ব কামে মা

হে সাকী, সুরার ঝলক দিয়ে পাত্র উজ্জ্বল করো,

হে জ্ঞানী, বলো, দুনিয়ার সব আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের পুর্ণ হয়েছে?

○ মাওলানা রুমী 'জুদা'র (جدا) সম্পর্কে লিখেন:

بشنو از نی چون حکایت می کند

واز جدایی ها شکایت می کند

বেশনু আয্ নে'য় চুন হেকায়াত মীকুনাদ

ওয়ায্ জুদাইহা শেকায়েত মীকুনাদ।

শোনো, বাঁশি কি কাহিনী বর্ণনা করছে,

আসলে সে বিচ্ছিন্নতার করুণ অভিযোগের কথা শোনাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের পরিবারে বংশ পরম্পরায় ছিল আরবি-ফারসি-উর্দূর চর্চা। তাঁদের রক্তধারায় যে 'নামে নাদ' প্রবহমান ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নজরুল। নিজস্ব ধর্ম, ঐতিহ্যপ্রীতি স্বাজাত্যবোধ্য ইত্যাদি রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর রচনায় প্রচুর আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের মুক্তা দিয়ে সাহিত্যের মালা তৈরি করেছেন। নজরুল আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে এসব ভাষার কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি এবং তাঁদেরকে অনুসরণও করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছেন নিজেকে, কিন্তু নজরুল চিন্তা-চেতনা ও রচনায় অবশ্যই ইরানি কবিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

নজরুল ইসলাম স্বীয় কাব্যে বিপুল সংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আর এ প্রয়োগে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে দৈনন্দিন ব্যবহার্য আটপৌরে শব্দরাজি; যেমন: বর্তমান তেমনি বাংলার মুসলমান জন সমাজে অপ্রচলিত অভিধান-নির্ভর শব্দসমূহও উপস্থিত। নজরুল তাঁর কবিতায় এই দুই ধরনের শব্দ প্রয়োগেই ঈর্ষনীয় সাফল্যে উন্নীত হয়েছেন। নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত আটপৌরে ফারসি শব্দসমূহের মধ্যে রয়েছে- অন্দর, আওয়াজ, আজাদ, আন্দাজ, কারসাজি, জানোয়ার, জাদু, দুশমন, নাম, পছন্দ, ফরমায়েশ, বাগ, বাজার, বাদশাহ, বাদাম, বালিশ, বাহানা, বিবি, বেচারা, বেশ, বেহেশত, মগজ, মজা, মেকি, মোম, রেশ, রোজ, রোজগার, শরম, শহর, শাগরেদ, শাদী, সওদাগর, সরকার, সস্তা, সাদা ইত্যাদি।

অপ্রচলিত ফারসি শব্দরাজির মধ্যে রয়েছে-আন্দাম, আন্দেশা, আবখোরা, আলুদা, কমি, কোকাফ, খাক, খুবী, খুনিয়ারা, গমী, জাম্বিল, জিগর, জেরবার, তর, দরেগ, দস্ত, দারাজ-দস্ত, দিলীর, পলিদ, ফকর, বাগবা, বাহারিয়া, রিয়াবান, বুলন্দ, বেশক, মুজদা, রওগন, রবাব, রিনদান, রীশ, সাঙ্গদিল, সেব ইত্যাদি। (আরিফ[২], ১৯৯৭ : চল্লিশ)

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবি-ফারসির সাথে হিন্দি-উর্দু বাক্য খণ্ড ব্যবহার করে ভিন্নতর মাত্রা আরোপ করেছেন। যেমন: খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া, এয় খোদা!, এয় আলী!, আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া, দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল ইত্যাদি। উপরিউক্ত বাক্য খণ্ডগুলির মধ্যে 'খুব', 'খোদা', 'খুন', ফারসি শব্দ। (আরিফ[২], ১৯৯৭ : বিয়াল্লিশ)

বাংলা ভাষায় বিদেশি বিভিন্ন ভাষার অজস্র শব্দের সুবিন্যস্ত প্রয়োগের পাশাপাশি নজরুলের আরেকটি বড় অবদান ও কৃতিত্ব হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিদেশি ভাষার দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন শব্দ বা মিশ্র শব্দ (mixed word) তৈরি। এক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং অতুলনীয় সাফল্যের দাবিদার। তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিগুণে এবং অবচেতনে ভাষা তাত্ত্বিকের অনন্য ক্ষমতা নিয়ে কবিতায় ভাবের চাহিদা পূরনের তাগিদে তিনি এ সমস্ত শব্দ সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখযোগ্য এ সকল শব্দসমূহ হচ্ছে- ১) চাঁদবাজার =চাঁদ (বাংলা)+ বাজার (ফারসি), ২) জিয়ারত গাহ =জিয়ারত(আরবি)+গাহ (ফারসি), ৩) জুলফ্ ওয়ালী= জুলফ্ (ফারসি)+ ওয়ালী (হিন্দি), ৪) ঝাড়ু-বরদার= ঝাড়ু (হিন্দি)+ বরদার (ফারসি), ৫) দখলিকার=দখল (আরবি)+ই+কার (ফারসি), ৬) নাওয়াকেফ=না (ফারসি)+ ওয়াকেফ (আরবি), ৭) বদখত= বদ(ফারসি)+ খত (আরবি), ৮) বীরবাচ্ছা=বীর(সংস্কৃতি)+বাচ্চা(ফারসি), ৯) বুলন্দ-নসিব==বুলন্দ (ফারসি)+ নসিব(আরবি), ১০) বেকারার=বে (ফারসি)+কারার(আরবি), ১১) মর্দান লেবাস=মর্দানা(ফারসি)+লেবাস (আরবি), ১২) শহীদান+ শহীদ(আরবি)+আন (ফারসি), ১৩)শিশমহল=শিশ(ফারসি)+মহল(আরবি), ১৪) শের-নর= শের(ফারসি)+ নর(সংস্কৃতি), ১৫) সুতুরবান= সুতুর (ফারসি)+বান 'বতুপ' (সংস্কৃতি), ১৬) গরুরী= গরুর (আরবি)+ঈ (ফারসি) (আরিফ[২], ১৯৯৭ : বিয়াল্লিশ)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. আবদুস সাত্তার : *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, প্রকাশনায়- নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল- ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

২. আরিফ, হাকিম : *নজরুল-শব্দপঞ্জি*, প্রকাশনায়ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকালঃ আষাঢ় ১৪০৪/জুন ১৯৯৭, প্রকাশকঃ রশিদুন্ নবী, ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, বাড়ী নং ৩৩০-বি, রোড নং ২৮ (পূরাতন), ধানমণ্ডি, আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

৩. আলী, মোবাশ্বের : *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

৪. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার : *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জপাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৫. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৬. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়ঃ আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশঃ ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৭. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৮. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায়ঃ আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

৯. রূমী , মাওলানা জালাল উদ্দিন : মসনবী শরীফ, অনুবাদ : মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৮, মহররম ১৪২৯, মাঘ ১৪১৪।

১০. শেলী, রাশেদুল হাসান, মাহবুব বারী সম্পাদিতঃ *নজরুল সাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব*, নজরুল গবেষণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, প্রকাশকালঃ জুন-২০০৫, জৈষ্ঠ-১৪১২,।

১১. শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সংস্কৃরণ, ১৩৬০, প্রিন্টেড এন্ড পাবলিস্ট, শ্রী জগদিস প্রেস, ৪১ গেরিয়াহাট রোড, কলকাতা।

১২. হাসান, মাহবুব : *নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকালঃ আষাঢ় ১৪০৪/জুন ১৯৯৭;

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব : নজরুল প্রসঙ্গ

গজল[১] (غزل) আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ প্রেম-বাণী, প্রণয়-গীতি, প্রেম-সংগীত, গীতিকবিতা। গজল (غزل) এক প্রকার কাব্য-সংগীত। অন্য সকল প্রকার কাব্যগীতির ন্যায় গজলেরও সংগীতাদর্শ হচ্ছে সুরের সাহায্যে গানের বাণীকে ধ্বনিত করা। মানুষের কণ্ঠের কোমল, মধুর ধ্বনি নিঃসরণের নানা রূপ ও ভাব প্রকাশের ওঠা-নামা থেকে সুরের বিকাশ। কণ্ঠের এরূপ ধ্বনি বা সুরের মধ্য দিয়ে যখন মনের নানা ভাব ব্যক্ত হয়ে উঠতে চায় তখনই গজলের সূচনাপর্ব রচিত হয়। বাংলা গজলের মূল শিকড় রয়েছে ফারসি গজলে। ফারসি গজলের ব্যাপ্তি বিশ্বভুবন থেকে বেহেশত, জন্ম থেকে মৃত্যু, পর্বত শিখর থেকে সমুদ্র অতলে প্রবেশ করেছে। মর্মার্থ অনুসন্ধানকারীরাই শুধু এর মূল রহস্য উদ্ধার করতে পারে। কোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতিজাত এই গজল মানবমনে সুন্দর এক শৈল্পিক রূপময় ভাবাবেগ সৃষ্টি করে, যা শুভ চেতনার সহায়ক। নিত্য প্রয়োজনীয় কথার বাইরেও মানুষের অন্তর-সমুদ্রে কিছু কথা থেকে যায়। সে অব্যক্ত কথাগুলো ভাবের জগতে ঘুরে ঘুরে সুরের ঢেউয়ে গজলের আকারে প্রকাশ পায়।

১

গজল মূলত পারস্য সংগীত। ফারসি কবিগণ তাঁদের কবিতার রঙে শ্রোতাপাঠকের মন রাঙিয়ে তুলতে, দার্শনিকতায় তাদের ভাবিয়ে তুলতে গজল রচনা করতেন। বিশেষকরে, রুমী, হাফিজ প্রমুখ বিশ্বনন্দিত মরমী ফারসি কবিগণ হলেন পারস্যের গজল সংগীতের প্রতিভূস্বরূপ। এসব মরমী কবিগণ গীতিকবিতাকে তাঁদের গূঢ় ভাবনার প্রকাশমাধ্যম করে তুলেছিলেন।

গজলের মুখ্য বিষয় হচ্ছে প্রেম। এজন্যই গজলকে প্রেমসংগীতও বলা হয়। নজরুল তাঁর গজলে হৃদয় বেদনার রঙে রাঙা সুরের মালা পরিয়েছেন। তাঁর হৃদয়-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে পারস্যের আধ্যাত্মিক প্রতিকী শব্দাবলি এবং বাংলার প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রতীক দিয়েই তিনি মানব-মনের চিরন্তন বিরহ-বেদনাকে রূপ দিয়েছেন– তাই তা হয়েছে অধিকতর মর্মস্পর্শী। এ গজল বা প্রেমসংগীত বহিরঙ্গে মানবিক, কিন্তু অন্তরঙ্গে এ গান ঐশী প্রেমপ্রার্থী। এ গজলের জন্ম মাটিতে কিন্তু দৃষ্টি আকাশে। এজন্যই পারস্য গজলকাব্য এত গভীর ব্যঞ্জণাময়। বাংলা ও উর্দু গজল রচয়িতাগণ ফারসি গজলের কাব্যিক উচ্চতা রক্ষায় ব্যর্থ হন। মানবিক প্রেমসংগীত রূপে হিন্দুস্থানি গজলের প্রতিষ্ঠা। প্রেম সম্পর্কের বিভিন্ন অনুষঙ্গ, যেমন অনুরাগ, বিরহ, বেদনা, মিলন প্রভৃতিই হিন্দুস্থানি গজলের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায়ও সে গজল স্থান পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফারসি গজলের গভীরতা হিন্দুস্থানি বা উর্দু গজলে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতে মুসলিম আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংগীতরীতির সঙ্গে পারস্য সংগীত রীতির সুদূর প্রসারী যোগাযোগ ঘটলে গজলের ঐতিহ্য হিন্দুস্থানি সংগীত ধারায় আচরণীয় হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তা হিন্দুস্থানি সংগীতের এক জনপ্রিয় ও শক্তিশালী শাখায় পরিণত হয়।

---

[১] আরবি ভাষায় 'গাযাল' শব্দের অর্থ প্রেমের কবিতা, নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন এবং নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের রূপগুণের বর্ণনা। পরিভাষায় গজল হচ্ছে কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট রীতি। তাতে সমছন্দের কয়েকটি পঙক্তি (যার দ্বিপদীর সংখ্যা অন্যূন সাত ও অনুর্ধ পনর) থাকে, পঙক্তিসমূহের সবগুলো দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের অর্থাৎ কলির সাথে একই অন্ত্যমিলের হয়ে থাকে। গজলের শেষ লাইনকে মাকতা বলা হয়। তাতে সাধারণত কবি নিজের সাহিত্য নাম উল্লেখ করে থাকেন। পরিভাষায় একে তাখাল্লুস বলা হয়। এ ধরনের কবিতার পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছে শেখ সা'দী ও হাফিজ শিরাযীর গজল। (উদ্ধৃত, তামীমদারী[৬], ২০০৭: ১৭২)

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি গজলের রহস্যময়তা, দার্শনিকতা, বহুস্তর, অর্থের গভীরতা বাংলা বা উর্দু গজলে অনেক ক্ষেত্রেই সংগীতোপযোগী ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে না। সুরের দিক থেকে রোমান্টিকতাই উর্দু গজলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যে ফারসি গজলের এ নবরূপ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায় বলেন : 'পারস্য গজল ভারতে এসে নিল এক নবরূপ। ইরানি সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের কিছু মিল আছে– কিন্তু খুব বেশি নয়। ভারতীয় সংগীতের ঐশ্বর্য তার নেই– বিচিত্র বিকশিত রাগ সম্পদ তো নেই-ই। তাই ভারতে পার্সি গজল উর্দু গজলে পেয়েছে নব জন্ম-ভারতীয় সংগীতের ভূমিকায়।' (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৮], ১৯৯০: ২৭৪)

ফারসি গজলের ন্যায় সৌরভ ও সরসতা অন্য কোনো গজলে প্রতীয়মান হয় না। পারস্য গজলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলো, গভীরতা ও সৌরভ অন্য গজলে ধার করা চাকচিক্য। বাগান এবং ফুলের কথা অবশ্য বাংলা-উর্দু গজলে ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু সে ফুলগুলো কাগজের ফুল অর্থাৎ প্রাক্তন কাব্যের পাতা থেকে তুলে আনা, ইরান থেকে ঐতিহ্যবাহী সড়কে কবি পরম্পরায় আমদানি করা। তাই লালাহ, গুল, নার্গিস ও ইয়াসমিন অন্যান্য গজলে উল্লেখিত হয়েছে। ফারসি গজল থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেছে উর্দু গজল, আবার উর্দু গজল থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে বাংলা গজল কাব্যগীতি[১] সমৃদ্ধ হয়েছে।

নজরুলের ফারসি প্রভাবিত গজলে তাঁর পারিবারিক অবদান লক্ষণীয়। নজরুল সৌভাগ্যবশত এমন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে একই সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা ছিল। কবির কবিতায় আমরা যে লোক-সংস্কৃতির প্রভাব দেখি এবং তাঁর ভাষায় যে প্রচুর পরিমাণে আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখি সেটি তাঁর পারিবারিক শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ফল বলা চলে। বাল্যকালে কবির উপরে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তাঁর পিতৃব্য কাজী বজলে করিম ও তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদ সিদ্দিকীর। উভয় ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম ধর্ম এবং আরবি-ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। শুধু তাই নয়, তাঁরা দু'জন কাব্য-প্রতিভার অধিকারী এবং গজলগায়কও ছিলেন। নজরুল ইসলাম যে একদা লেটো দলে যোগ দিয়ে কবি গানের আসরে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন বজলে করিম সেই লেটো দলের আদি ওস্তাদ ছিলেন। কাজী বজলে করিমের একটি গজলের অংশবিশেষ এরূপ :

বজলে করিম বলে,
নামের মুসলমান যে হবে
দীন ইসলামের ভেদ
সেজন কি করে পাবে?
(উদ্ধৃত, হায়দার[১০], ১৯৮৪ : ২৪৫)

নজরুল সংগীত-জীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ জিনিষ একেবারেই অভিনব। উর্দুতে এ ধরনের গজল অনেক আছে। উর্দু কবি গালিবের একাধিক গজল বিদ্যমান। নজরুল গজল-গান বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করেন। এক সময় বাংলার আকাশে-বাতাসে নজরুলের গজল-গান ভেসে বেরিয়েছে। নজরুল গেয়েছেন, 'গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি, রঙিন প্রেমের গাই গজল।' আজ অবশ্য সেসব গজল-গান কারও মুখে শোনা যায় না। তবে এক সময়ে মুটে-মুজুর, গাড়োয়ান, রিক্সাচালক প্রভৃতি খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখেও এসব গজল-গানের কলি সর্বদা থাকত।

---

[১] কাব্যগীতি: যে গানে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটে তাকেই বলা হয় কাব্যগীতি। এর উৎপত্তি সাহিত্যের ভূমিতে এবং সুরের আকাশে এর প্রকাশ। ভাষানিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ সংগীতের আদর্শ এই গানের নয়, পদবাহিত ভাবব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট ও তীব্র করে তোলাই কাব্যগীতির উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণির সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি সুর বাক্যকে অতিক্রম করে না।' (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৮], ১৯৯০: ১)

Dhaka University Institutional Repository

গজল রচনার জন্যই নজরুলকে পড়তে হয়েছিল কোরআন, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, সারাবলি, ইসলামি পুঁথিপত্র এবং ফারসি সাহিত্য। ফারসি সাহিত্যের বড় বড় কবিদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ছোট বেলা থেকেই। নজরুলের সৈনিক জীবন ১৯১৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। নজরুলের বয়স তখন ১৮ থেকে ২০। করাচি সেনানিবাসে রচিত তাঁর রচনাসমূহের একটি 'ব্যথার দান'। এই রচনাটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, শিরাজের বুলবুল হাফিয এবং রুমীর গজল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঐ বয়সের একটি গ্রাম্য বাঙালি মুসলমান ছেলে ফারসি সাহিত্যের কবিদের এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হয়েছেন ও ফারসি গজল রচনা করেছেন; এ থেকে তাঁর পরিমার্জিত পরিশীলিত রুচীর শিল্পীমানসের সন্ধান পাওয়া যায়।

২

বাংলা ভাষায় প্রথম গজল রচনা করেন অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। উর্দু ভাষায় তাঁর ভাল দখল ছিল। ফলে উর্দু গজলের মর্মে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায় ইসলামি গজলের সঙ্গেও অতুলপ্রসাদের পরিচয় ঘটে। গজল সুরে তিনি যে কটি বাংলা গান রচনা করেছেন তার তুলনা নেই। কাজী নজরুল ইসলাম গজল সুরে প্রচুর বাংলা গান রচনা করেছেন। তবে বাংলাদেশে গজল সুরের প্রথম প্রবর্তক সম্ভবত অতুলপ্রসাদ। 'কতো গান তো হলো গাওয়া / আর মিছে কেন গাওয়াও' তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল। এ গজলটি ছাড়াও অতুলপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গজল হল :

কেগো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে
এ পোড়া পরান তরে এত ভালবাসিলে।

রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙ্গিনাতে আঁকা।

ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে
বলে দিল কে পথ এ কালো রাতে।

জল বলে, চল মোর সাথে চল
কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
(উদ্ধৃত, গোস্বামী, ১৯৯০ : ২৭৭)

যদিও অতুলপ্রসাদ সেন উর্দু গজলের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় কয়েকটি গজল রচনা করেছেন, কিন্তু তা দ্বারা বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে গজলের স্বতন্ত্র ধারা রচনায় কোনো বিশিষ্ট ভূমিকা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, অতুলপ্রসাদ থাকতেন বাংলা থেকে বহুদূরে লখনৌয়ে। সেজন্যই ঐ সময়ে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা গানের জগতের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং বাঙালি শ্রোতাসমাজের ওপর তাঁর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না। তাছাড়া তাঁর রচিত গজল সংখ্যার স্বল্পতা ও তাঁর দূরে অবস্থানের কারণে শ্রোতাসাধারণ তা এতই কম শুনতে পেয়েছেন যার ফলে বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ফলে তিনি বাংলা ভাষায় গজল রচনার পথিকৃৎ হলেও নবযুগ রচনার গৌরব তাঁর প্রাপ্য হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামই প্রকৃতপক্ষে বাংলা কাব্যগীতির ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষায় যে গজল এত অসামান্যভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে তা শুধু নজরুলের গজলে প্রমাণিত হয়েছে। গজলের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ তাঁর বাল্যকাল থেকেই লক্ষণীয় এবং তখনই তাঁর সংগীতানুরাগের প্রকাশ ঘটে। ১২-১৩ বছর বয়সে যখন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানসোলে একটি রুটির দোকানে মাসিক ৫ টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন, তখন তার সংগীত শুনে আকৃষ্ট হয়ে কাজী রফিজউদ্দিন নামে আসানসোলের এক দারোগা তাঁকে নিজ দেশ ময়মনসিংহ জেলার সিমলা গ্রামে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করান। অবশ্য প্রথম জীবনে নজরুল রবীন্দ্র সংগীতই গাইতেন। 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি' এ গানটি তিনি প্রায়ই গাইতেন। তারপর নিজের গান রচনা করতে আরম্ভ করেন– নিজের দেওয়া সুরে। নজরুল রজনীকান্ত সেন[১] ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়[২] -এর গানও গাইতেন। তাঁর কণ্ঠ খুব সুরেলা ছিলনা, কিন্তু কণ্ঠের দরদ ছিল অপূর্ব। বাঙলা গানে রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের স্থান।

জগতের যত বঞ্চিত, বুভুক্ষিত, মজলুম, অসহায়– তাদেরই বঞ্চনার গান গেয়েছেন নজরুল। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আনন্দ, আলোক ও অমৃতের কবি নন; বরং দুঃখ ও বেদনাকে তাঁর কাব্যে চরম সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নজরুল বাংলা সাহিত্যে তেজতৃপ্ত বিদ্রোহের সুর আর রবীন্দ্রনাথ ভক্তের আকুল সুর আমদানি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতা ও গান সম্পর্কে লিখেছেন :

> অরুগ্ন বলিষ্ঠ, হিংস্র নগ্ন বর্বরতার অনবদ্য ভাব মূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোনো ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করে নি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করে না। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। তাই আবির্ভাব মাত্রই অসামান্য লোক প্রিয়তা অর্জন করেছে তিনি। (উদ্ধৃত, ইসলাম[৩]: ১৯৮৩ : ২৪-২৫)

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমের একটি দিকই প্রধান করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের কথা ও সুরে, সে দিকটি হলো, প্রেমিকের না পাওয়ার বেদনা। দুঃখভারাক্রান্ত এই প্রেম-সংগীতগুলোর সঙ্গে নজরুল যোগ করলেন রক্ত মাংসে গড়া মানুষের মিলনের আনন্দ। এতে নিরক্ত প্রেমের গান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে নজরুলের হাতে। বস্তুত নজরুল ইসলাম সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের উত্তরসূরি হলেও দ্রুত তাঁর নিজস্ব পরিচয় চিহ্নিত করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল বলে খ্যাত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘ ৬৭ বছরে যা লিখেছেন একজন ব্যক্তির সারা জীবন পাঠ ও গবেষণা করেও শেষ করা যাবে না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি ও পরিমাপ করা যায়। জীবনে কতো গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তার একটা হিসেব আছে। কিন্তু নজরুল মাত্র বিশ-একুশ বছরে সাহিত্যচর্চা করে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে যা দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাঁকে নিয়ে যথার্থভাবে গবেষণা হয় নি বলে তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। যদিও তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে, কিন্তু এর সঠিক

---

[১] রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০): বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ঢাকায় মুন্সেফ ও বরিশালে সাবজজ ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও কবি। মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। ১৮৮২ সালে রজনীকান্ত রাজশাহী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখান থেকে এফ.এ পাশ করে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা যান। সেখান থেকে বি.এ.বি.এল. পাশ করে রাজশাহীতেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে আইনব্যবসা শুরু করেন। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি রজনীকান্তের বিশেষ আকর্ষণ প্রকাশ পায়। (গোস্বামী[৪], ১৯৯০: ১১৭)

[২] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩): আধুনিক বাংলা কাব্যগীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশাত্মবোধ, ভক্তি, প্রেম ও হাস্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে প্রধানত গান রচনা করেন। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, যিনি বিখ্যাত গায়ক ও গীতিরচয়িতা ছিলেন। (গোস্বামী[৪], ১৯৯০: ১০২)

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাপ নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। যা রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখা যায়নি। 'নজরুলের গান কেউ বলেছেন ৩৫০০; কেউ বলেছেন, ৪৫০০; কেউ বলেছেন ৫০০০। আবার কেউ বলেছেন, দশ হাজারেরও অধিক।' (আহমেদ[১], ১৯৯৮ : ৪৪৭)

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের আলোচনায় যে মিলটি চোখে পড়ে তা হল এঁরা দুজনই অসংখ্য গানের রচয়িতা এবং অসংখ্য সুরের স্রষ্টা। সুরের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত কিন্তু নজরুল উদার ও পরিবর্তনমুখী। সুরকে তিনি সমন্বিত করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতো কিন্তু সেই সঙ্গে এনেছেন বৈচিত্র্য। এটা নজরুলের সফলতা এবং একই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সুর ছাড়া গান আলো-নেভা প্রদীপের মতো।' (উদ্ধৃত, মাহ্‌ফুজউল্লাহ্[৭], ১৯৯৪ : ৫৮) রবীন্দ্রনাথের এই চমৎকার ও তাৎপর্যবাহী উক্তিতে গান তথা গজলের ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা এবং গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। সুরের শিখায়ই গজলের আলো জ্বলে ওঠে। গজলের ক্ষেত্রে সুরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কত বেশি তা নিছক সুরাশ্রয়ী গান শুনলেও উপলব্ধি করা যায়। গজল সর্বক্ষেত্রে একান্তরূপে বাণী-নির্ভর নয় বলেই এবং গজলে সুরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বেশি বলেই, সুরের মহিমায়ই গজল হৃদয় স্পর্শ করে। সেক্ষেত্রে বাণী বুঝতে না পারলেও গজলের আনন্দ–বলা চলে সুরের আনন্দ, উপলব্ধি ও উপভোগ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তবুও এ কথা সত্য যে, কোনো না কোনো কথা বা বাণীকে অবলম্বন করেই সাধারণত সুর উৎসারিত ও পল্লবিত হয়, তা সে বাণী বা কথা যত সামান্য কিংবা সংক্ষিপ্তই হোক না কেন।

গজলের ক্ষেত্রে সুরের গুরুত্ব মাহাত্ম্য যত বেশিই হোক, বাণী বা কথার গুরুত্বকে অবহেলা কিংবা অস্বীকার করা চলে না। যেখানে বাণী ও সুরের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং সার্থক সমন্বয় ঘটে, সেখানেই গজল অধিকতর উৎকর্ষমণ্ডিত ও আবেদনশীল হয়। নজরুলের গজলে সুরের বৈচিত্র্য, মাহাত্ম্য ও মাধুর্য লক্ষণীয়। নজরুল একাধারে কবি, গীতিকার, সংগীতজ্ঞ ও সুরকার ছিলেন। তাঁর বহুসংখ্যক গজলে নিজে সুর-সংযোজন করার দরুন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে অন্য বিশিষ্ট সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরাও সুর-সংযোজন করার কারণে নজরুল-সংগীতে সুরের বৈচিত্র্যময়তার পথ প্রশস্ততর হয়েছে এবং সুরের স্পর্শে নজরুল-সংগীতের অনুপম বাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদীপের শিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও সংগীত সমালোচক শ্রী নারায়ণ চৌধুরীর ভাষায় : 'নজরুল বাংলা গানের জগতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরকার। একই সঙ্গে মধুর কাব্যগুণ ও ততোধিক উৎকর্ষময় সুরের সমন্বয়ে তাঁর গানগুলি হয়ে উঠেছে রসের এক চিরন্তন উৎস।' (উদ্ধৃত, মাহ্‌ফুজউল্লাহ্[৭], ১৯৯৪ : ৫৯)

সংগীত হিসেবে বাংলা গজলের সাফল্য অনেকখানি কাব্যনির্ভরতার নিরিখে। তাই 'বাংলা গজলে ফারসির প্রভাব' নিয়ে কিছু লিখতে গেলে এর কাব্যের ভাব সম্পদ নিয়ে ভাল-মন্দের বিচার বিশ্লেষণের আলোচনায় যেতে হয়। শাস্ত্রীয় মতে বাংলা গজল বিশুদ্ধ সংগীত নয়। কাব্যের ভাব ও অর্থকে ফুটিয়ে তুলতে সুরকে বাহন করেই এ গজল সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ গজলের বিকাশ হয়েছিল কল্যাণময় সাধনতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক তথা ফারসি সাহিত্যকে ভর করে। ভক্তি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ মানুষের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কিত সাংগীতিক চিন্তার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। হিন্দুস্থানি বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্যতা লাভ করেছে কিন্তু বাংলাদেশে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটেছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি পরিণতি তাহা এ দেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্ত রের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য এদেশে সংগীতের অবতারণা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে বাংলা গজলের ওপর তাঁর অবদান কম নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গজল বলতে গ্রাম্য সংগীতকে (কীর্তন, ভাটিয়ালি ও বাউল) বুঝানো হতো। টপ্পার অনুকরণে তখন কিছু

Dhaka University Institutional Repository

কিছু বাংলা গজলও রচিত হয়েছে। কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। মধুসুধন মজুমদার লিখেছেন : 'নজরুলের গানগুলোর মধ্যে দেখতে পাই হিন্দি, উর্দু ও ফারসি শব্দের ব্যবহার। সেজন্যই গজলের প্রকৃত রূপটা ছিল গানের মধ্যে, তারপর ছিল এর সহজ প্রাণ-মাতানো সুর। সেজন্যই শ্রোতাদের মন এত সহজেই জয় করতে পারত।' (উদ্ধৃত, হায়দার[১০], ১৯৮৪ : ৩৮৯)

করাচি ব্যারাক থেকে কলকাতায় বসবাস শুরুর পর থেকে কৃষ্ণনগরে বুলবুলের জন্ম পর্যন্ত (৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) সংগীতকার রূপে নজরুল জীবনের যে অধ্যায় তাতে তাঁকে প্রধানত দেশাত্মবোধক সংগীতরচয়িতা রূপে আমরা দেখতে পাই। এ বিদ্রোহী কবির সর্বাত্মক বিদ্রোহের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সেসব অগ্নিক্ষরা বীররসের গানে। কিন্তু বুলবুলের জন্মের পর থেকেই নজরুল বসলেন মধুর রসের চর্চা করতে। তখন থেকেই তাঁর গজল রচনার সূত্রপাত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক থেকে নজরুল ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বুলবুলের জন্মের পর থেকে এক নব সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে ওঠেন। তিনি তাঁর পুত্রের নাম দেন বুলবুল আর নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গানের বুলবুল হয়ে ওঠেন এবং শিল্পীজীবনের মধুরতম সৃষ্টি গজল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কৃষ্ণনগরে আসার আগে নজরুল অসুস্থ ছিলেন। তখন তাঁর অর্থকষ্ট ছিল ভয়াবহ। 'বুলবুলের জন্মের পর ব্রজ বিহারী বর্মনকে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি তাঁকে ধার করে হলেও পঁচিশটি টাকা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাতে বলছেন'। (গোস্বামী[৬], ১৯৯০ :২৭৮) এ অবস্থায়ও তিনি মধুর রসের চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :৩৯১) গজলটি শোচনীয় অর্থকষ্টের মধ্যে রচিত। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> তখন সপরিবারে কাজী সাহেব থাকেন কেষ্টনগরে। তাঁর আর্থিক অবস্থা এ সময়ে সচ্ছল ছিল না। একদিন বিকালে, ঝড়ের বেগে, কল্লোল অফিসে ঢুকেই বললেন 'শিগগির গোটা কয়েক টাকা যোগাড় করে দে। হাঁড়ি আজ শিকে থেকে নামেনি। তোরা যদি টাকা যোগাড় করে দিতে পারিস তাহলে নামবে। আমাকে এখনই কেষ্টনগরে ফিরে যেতে হবে। দেরী করলে চলবে না।' টাকা যোগাড় হল। কাজী সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে ফিরে এলেন কাজী সাহেব। হাতে তাঁর একখানি কাগজ। নৃপেন বাবুর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ট্রেনে আসতে আসতে লিখে ফেলেছি।... কাঁপা কাঁপা পেনসিলের লেখা। বুঝতে কষ্ট হয় না যে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে লেখাগুলো কেঁপে গেছে। পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল এটি কাজী সাহেবের সেই বিখ্যাত গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল। (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৬], ১৯৯০ : ২৭৮)

৩

প্রখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দীনের অনুরোধেই নজরুল ইসলামি সংগীত রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম রচিত গান দু'টি– 'ওমন, রমযানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ', (ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :২২৩) ও 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর'(ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :২২৭) – আব্বাস উদ্দিন হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রেকর্ড করেন। এটিই প্রথম বাংলা ইসলামি গানের রেকর্ড। নজরুল হামদ, নাত, মর্সিয়া, মহানবী (সা.) এর আবির্ভাব-তিরোভাব, হজ-যাকাত, নামায-রোযা, ঈদ ইত্যাদি নিয়ে অফুরন্ত গান রচনা করেন। অসি ছেড়ে এই বাঁশি ধরবার জন্য কিছু উগ্রপন্থী তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছিল। রসের সন্ধান পেলে যেভাবে কবি প্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায় নজরুলের ক্ষেত্রে তাই হল। বৈষ্ণব সংগীতে নজরুলের কৃতিত্ব অপরিসীম। তবে অধিকাংশ স্থলে তাঁর রাধা-কৃষ্ণ মানবিক প্রেমেরই প্রতীক। কয়েকটি কীর্তন :

Dhaka University Institutional Repository

'আমি কি সুখে লো গৃহে রব, আমার শ্যাম হল যদি যোগী ওলো সুখি, আমিও যোগিনী হব', (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ :৫৮৪)

'আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম কালারে কালো কালিন্দী কূলে'। (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :১৮৬)

নজরুলের প্রথম রচিত গজল ১৩৩৩ সালের ৮ অগ্রহায়ণে কৃষ্ণনগরে রচিত 'বাগিচায় বুলবুলি তুই দিসনে আজি দোল'। নলিনীকান্ত সরকারের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরান পিয়া' নজরুলের প্রথম গজল রচনা। আব্দুল আজীজ আল আমান নলিনীকান্ত সরকারের বিবরণের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেন : 'নিশি ভোর হল গজলটি সন্দেহাতীতরূপে নজরুলের প্রথম গজল রচনা নয়- কেননা এর আগেই তিনি 'বাগিচায় বুলবুলি', 'বসিয়া বিজনে' প্রভৃতি গজলগুলো রচনা করেন। (গোস্বামী[৯], ১৯৯০ : ২৮০)

গজল রচনায় অনুপ্রাণিত হওয়া সম্পর্কে নজরুল বুলবুলের মৃত্যুশিয়রে বসে অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই--হাফিজ* এর মুখবন্ধে বলেন :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি! সে আজ ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে ফারসি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফারসি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ আরম্ভ করি। অবশ্য তার রুবাইয়াৎ নয়-গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিশ-পয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্য্য কুলোল না এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল। তারপর এস.সি. চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ হল; সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে। আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম। যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম। (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ১৫)

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ এর শেষে সংযোজিত মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হাফিজের গজল প্রসঙ্গে বলেন :

> হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। ফুলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপর যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা, নিম্নে তেমনি অতলগভীর প্রশান্তি, মহিমা।... আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরনীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরনী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারপর মণি-মাণিক্য-খচিত আকাশ পেয়ালার সাকিকে কবি ডাকে, শরাব ভিক্ষা করে আর গান গায়– 'বদেহ সাকি ময়ে বাকী' ওগো সাকি আরো আরো শারাব ঢাল। কিছুই বাকী রাখিও না। পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল। (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ১৫)

গজল রচনায় ব্রতী হবার পর পরই নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে বিশেষ কোনো সাংগীতিক লক্ষকে সামনে রেখে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কোম্পানির চাহিদা এবং গায়ক-গায়িকাদের

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী করে নজরুলকে গান রচনা করতে হতো, সুর যোজনা করতে হতো এবং প্রশিক্ষণ দিতে হতো। ফলে এ নবসৃষ্ট সংগীত ধারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার সময় তিনি পাননি। সুতরাং গজলে যে অসাধারণ সম্ভাবনার ধারাটি তিনি প্রবর্তন করেছিলেন তা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গজল রচনা তিনি পরিত্যাগ করেন নি। বিভিন্ন গানের ভীড়ের মধ্যেও তিনি গজল রচনা করেছেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য গজল সে যুগে রচিত হয়েছে।

ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত বলেন : 'নজরুল সর্বসমেত প্রায় তিন হাজারেরও বেশি সংগীতের রচনাকার। পৃথিবীতে সংগীত রচনার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় রেকর্ড আমার জানা নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা আনুমানিক দু'হাজারের কিছু বেশি গান রচনা করেছিল।' (গুপ্ত[৮], ১৯৯৭ : ৩০৮)

চোখের চাতক (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১০৩০), *সুর-সাকী* (১৯৩১), *বনগীতি* (১৯৩২), *গুলবাগিচা* (১৯৩৩), *গীতিশতদল* (১৯৩৪), *গানের মালা* (১৯৩৪) প্রভৃতি গীতি সংকলনে কিছু কিছু গজল অন্তর্ভুক্ত হয়।

'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', 'যাও যাও তুমি ফিরে', 'ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়' প্রভৃতি গজল *চোখের চাতক* গীতিসংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'রেশমি চুড়ীর শিঞ্জিনীতে', 'বউ কথা কও', 'এ আঁখিজল মোছ পিয়া' প্রভৃতি গজল পূর্বপ্রকাশিত কতিপয় গজলের সঙ্গে *নজরুল গীতিকায়* সংকলিত হয়।

'এল ফুলের মরশুম শরাব ঢালো সাকি', (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :১৬২) 'আনো সাকি শিরাজী আনো আঁখি পিয়ালায়', 'গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়', 'শূন্য আজি গুলবাগিচা যায় কেঁদে দখিন হাওয়া', 'তোমার আঁখির কসম সাকি চাহি না মদ আঙুর পেষা', 'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ', 'ঐ ঘর-ভুলানো সুরে', 'একি সুরে তুমি গান শুনালে ভিনদেশি পাখী' প্রভৃতি গজল *সুর-সাকী* - তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন', 'পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে', 'কোন বন হতে করেছ চুরি হরিণ আঁখি', 'নিশীথ হয়ে আসে ভোর', 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'প্রিয় যাই যাই বলো না' প্রভৃতি গজল *বনগীতি*- তে সংকলিত হয়েছে।

গুল-বাগিচা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'গুল-বাগিচায় বুলবুলি আমি', 'পথ চলিতে যদি চকিতে', 'তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে', 'চোখের নেশার ভালবাসা সে কি কভু থাকে গো', 'একলা ভাসাই গানের কমল সুরের শ্রোতে' প্রভৃতি গজল।

'জাগো জাগো, রে মুসাফির', 'পলাশ ফুলের গেলাস ভরি', 'গোধূলির রঙ ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে' প্রভৃতি গজল *গীতি-শতদল* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'গানের মালা'য় অন্যান্যের মধ্যে 'আধো আধো বোল' গজলটি সংকলিত হয়।

বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ডে 'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে', 'আন গোপাল পানি, আন আতরদানি গুলবাগে' প্রভৃতি গজল অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া আরো কয়েকটি গজল অন্যত্র সংকলিত হয়েছে।

গজল রচনার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতরচয়িতারূপে নজরুলের বিপুল খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলা কাব্যগীতিতে নজরুলের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমী সংগীত সৌন্দর্য বাঙালি সংগীতরসিকদের চিত্ত এত তড়িৎ গতিতে জয় করেছিল যে, গজল রচনার ফলাফল প্রত্যক্ষ করার জন্য নজরুলকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় নি। গজলের উচ্ছল রোমান্টিকতা, ফারসি অনুষঙ্গ, মাতানো সুরভঙ্গি বাঙালি সংগীতামোদী সমাজের সামনে হঠাৎ যেন

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়ভরা আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হল। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশকালে নজরুল যেমন এক ব্যতিক্রমী কবি কণ্ঠরূপে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি ফারসি অনুষঙ্গ মিশ্রিত কয়েকটি গজল প্রকাশের পর পরই তিনি ব্যতিক্রমী সংগীত স্রষ্টারূপে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মকর্তারাও গজল খ্যাতির প্রেক্ষিতেই নজরুলকে তাদের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করতে উৎসাহ বোধ করেন।

নজরুলের গজল রচনাকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ফারসি গজলের অনুবাদ এবং ফারসি গজলের বিষয় ও অনুষঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গজল, দ্বিতীয়ত বাংলা জীবন ও প্রকৃতির পূর্বাপর অনুষঙ্গ রচিত গজল। পর্যালোচনার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে প্রথম ভাগ অর্থাৎ ফারসি অনুবাদ ও ফারসি মিশ্রিত কয়েকটি গজল হল :

১. কানন গিরি সিন্ধু-পার ফিরনু পথিক দেশ-বিদেশ; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :৮২)

২. তরুণ প্রেমিক প্রণয়-বেদন জানাও জানাও বে-দিল প্রিয়ায়; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :৮২)

৩. আসল যখন ফুলের ফাগুন গুলবাগে ফুল চায় বিদায় (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ :৮৬)

৪. করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকি দাও শারাব; (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ :৮৬)

৫. তোমার আঁখির কসল সাকি, চাহি না মদ আঙুর পেষা; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:১৬৯)

৬. গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি, রঙীন প্রেমের গাই গজল; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:২৮৫)

৭. গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:১৬৫)

৮. আনো সাকি শিরাজী আনো আঁখি পিয়ালায়; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:১৬৪)

৯. শূন্য আজি গুল-বাগিচা যায় কেঁদে দখিন হাওয়া; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:১৬৭)

১০. আন্‌তে বল পেয়ালা শারাব, পার্শ্বে বসে পরান বঁধুর ; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:২০)

১১. নাই বা পেল নাগাল শুধু সৌরভেরই পাশে ; (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩:৫০৬)

গজলের রচনাগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্লোকভঙ্গিমা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই চরণে নির্মিত স্তবকক্রমে গজলের পদ গঠিত হয়। দিলীপকুমার রায় যাকে বলেছেন :

শ্লোকে শ্লোকে জোর পায়ে এগিয়ে চলা

দু'টি করে চরণে একটি করে মূল ভাবের ছবি ফুটিয়া তোলা। (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৯], ১৯৯০ :২৮৬)

নজরুলের অধিকাংশ গজল দ্বিচরণ স্তবকে রচিত। কিছু গজলের দ্বিপদীসমূহ গজলের স্তবক বিন্যাসের ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী অনেকটা পৃথক পৃথক বক্তব্য বা বর্ণনা দ্বারা গঠিত। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট রাগতালবদ্ধ কাব্যকাঠামোর মধ্যে এসব দ্বিপদীকে পৃথকভাবে পাঠ করেও উপভোগ করা যায়। ফারসি বা উর্দু স্তবক-এর ন্যায় এসব দ্বিপদী স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও অংশত সম্পূর্ণ। যেমন: 'ফাগুনরাতের ফুলের নেশায়', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'ভুলি কেমনে আজো যেমনে' প্রভৃতি গজলকে এমনি বৈশিষ্ট্যময় স্তবকক্রমে গঠিত বলে মনে হয়।

অতুলপ্রসাদের গজল বাংলা কাব্যগীতির আদর্শে রচিত। একটি অখণ্ড নির্দিষ্ট ভাবকে সেখানে স্তবকক্রমে বিস্তৃত করা হয়েছে। গজলভঙ্গিম সুর যোজনা করা হয়েছে বলেই সেসব গান গজল- বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গজলের প্রকৃত সৌরভ ও হৃদয়গ্রাহী অনুষঙ্গ অতুলপ্রসাদের গানে নেই। একমাত্র নজরুলের রচনাতেই সর্বতোভাবে গজলের রূপ-বৈশিষ্ট্য বাংলা সংগীতের ধারায় প্রথম বিকশিত হয়ে ওঠে। মিলনে, বিরহে, যন্ত্রণায়, বিষাদে, নিসর্গ-বর্ণনায় নজরুলের শব্দ, উপমা, পূর্বোল্লেখ, স্তবকবিন্যাস প্রভৃতির এক প্রকার একান্ত বৈশিষ্ট্য আছে যাকে সহজেই গজল বলে সনাক্ত করা যায়। আর এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ফারসি গজলের সৌরভ পাওয়া যায়, কেননা, নজরুলের বাংলা গজলের এই মনোহর দ্বীপ ফারসি গজলের পলি দিয়েই নির্মিত।

৪

নজরুলের গজল রচনায় ফারসি গজলের প্রভাব বিদ্যমান। যেখানে পারস্যের গুল (گل), গুলিস্তান (گلستان), বুলবুল (بلبل), সুরাহি, শরাব (شراب), সাকি (ساقی) সবই আছে। তবে তাঁর রচনায় ফারসি গজলের দ্ব্যর্থকতা তেমন নেই। প্রেমানুষঙ্গে রূপকাশ্রিত ব্যবহার হয় ফারসি গজলে। এর বাহ্যিক অর্থে থাকে মানবিক প্রেম এবং গভীরে থাকে খোদাপ্রেম (আল্লাহভক্তি)। নজরুলের গজল এরূপ রূপকাচ্ছাদিত নয়; বরং নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের কথাই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর মানবিক প্রেম ও প্রাকৃতিক প্রেম একাকার হয়ে আছে। এক্ষেত্রে নজরুলের গজল উর্দু গজলের কাছাকাছি এবং মানবিক প্রেমগীতিসমৃদ্ধ। প্রেমের অশ্রুকোমল রূপটিই নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। 'দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়', 'তোমার বুকের ফুলদানিতে', 'দাড়ালে দুয়ারে মোর', 'পথ চলিতে যদি চকিতে', 'তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে', 'যাও তুমি ফিরে', 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল', (ইসলাম[২], ১৯৯৩:৪০৬) 'এ আঁখি-জল মোছ পিয়া', (ইসলাম[২], ১৯৯৩:৪০৭) 'কেন আন ফুলডোর', 'কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া', 'চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা', 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' প্রভৃতি গানে নর-নারীর অনুরাগ সম্পর্কের নানা পর্যায়ের কথা ধ্বনিত হয়েছে।

কয়েকটি গজলে ধ্বনিত হয়েছে দার্শনিকতার সুর : 'জাগো জাগো রে মুসাফির হয়ে আসে নিশি ভোর', 'মুসাফির মোছরে আঁখি জল' প্রভৃতি গজলকে এ পর্যায়ে ধরা হয়। আবার তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক গজলের মধ্যে রয়েছে : 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়া বহে অধীর আনন্দে' প্রভৃতি গজল।

নজরুল সার্থকভাবে বাংলায় গজল গানের প্রবর্তন করেন। এইসব গানে আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এমন অপূর্ব ও সার্থক মিলন তিনি ঘটিয়েছিলেন যা তার পূর্বে সবার কাছে অনাস্বাদিত ছিলো এবং অচিরেই যা জনপ্রিয়তায় আর সব গানকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলো এবং আজো তেমনি অম্লান হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শক্তিশালী সাহিত্যিক ধারার যুগে নতুন তেজ, নব-চেতনা ও নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটিয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে একটি যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে কবির নিবিড় আত্মিক বন্ধন ও চর্চা তাঁকে বহুলাংশে সহায়তা করেছে। যদি পারস্য গজলের অভিনবত্ব তাঁর অবলম্বনে না থাকতো তা হলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হত।

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের গান মোটামুটি উত্তর ভারত এবং মার্গ সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কাব্য-সংগীত যদিও এই সময় অনুপস্থিত ছিল না তবুও তা যেন ততখানি আভিজাত্য লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথই বুঝতে পেরেছিলেন কেবল মার্গ সংগীতের গণ্ডিতে বদ্ধ থাকলে বাংলা গান প্রাণ পাবে না। তাই একদিকে কাব্য-সংগীতের দ্বারা এবং অপরদিকে দেশি ও বিদেশি সুরের উদার অভ্যর্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে মেলে ধরলেন। নজরুল এসে সে ধারাকেই আরো অনেক দূরে ও বিচিত্র পথে টেনে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিদেশি সুরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু পারস্যের বিরাট

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতজগৎ যেন তাঁর সুরগীতির অঙ্গনে আমন্ত্রণ পায়নি। নজরুলের সুরগীতির অঙ্গনে সেই অনিমন্ত্রিত অতিথির প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধরে; কিন্তু বাংলা গজলের ক্ষেত্রে তিনি যেন পারস্যের সুরা ও সাকি; খেজুর গাছ, প্রথম রৌদ্র এবং ওয়েসিসের শ্যামলিমা নিয়ে হাজির হলেন। বাঙালির কাছে এর স্বাদ নতুন, সুর নতুনতর। তাঁর প্রেমের গজল গানের কলি অনেক মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল।' (হায়দার[১০], ১৯৮৪: ৫৪২-৫৪৩)

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত যেসব গীতিকারের সঙ্গে নজরুলের সমধর্মিতা ছিল তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতে একদিকে পাশ্চাত্য প্রভাব অপরদিকে হিন্দুস্থানি প্রভাব লক্ষণীয়। অতুলপ্রসাদের গান একদিকে যেমন বাঙলার গ্রাম্যগীতি, তেমনি অন্যদিকে লখনৌর ঠুংরী দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের গীতাবলি, বিশেষ করে ঐশী প্রেমমূলক গীতিসমূহে হিন্দুস্থানী ধ্যান-ধারণার অনুকরণ লক্ষণীয়। তবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করে সংগীত রচনা করেন। ঠাকুর বাড়িতে বহু ভারতবিখ্যাত ওস্তাদের আসর বসত। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই তাদের সুরৈশ্বর্যে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু, চক্রবর্তী, যদুভট্ট ও রাধিকা গোস্বামীর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তবে সংগীত রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ও দিনেন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিলেতে থাকাকালে ইউরোপীয় সংগীত শিক্ষা করেন। তাছাড়া বাউল, ভাটিয়ালি, রাম প্রসাদী প্রভৃতি বাংলার গীতি সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং তার রসায়নে রূপান্তর লাভ করে সৃষ্টি হয়েছে অতুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সুরের এত বৈচিত্র্য সম্পাদনে সক্ষম হয়েছেন। আবার নজরুল সংগীতে রয়েছে বহুমুখী বৈচিত্র্য। নজরুল ধ্রুপদ, ঠুংরী, গজল, বাউল, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি, লাউনি, রামপ্রসাদী, ঝুমুর, মুর্শিদা, তোড়ী ছায়ানট, ভৈরবী, আশাবরী, বেহাগ, সাহানা, পিলু, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগরাগিনীতে গান রচনা করেছেন।

যেহেতু গজল কাব্যগীতি তাই গজল হতে হবে কাব্যগুণসম্পন্ন। সুরের সাহায্যে গানের পদবাহিত ভাবের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এর সাংগীতিক লক্ষ। ফারসি গজল অতি উৎকৃষ্ট কাব্যগীতি। এর আবৃত্তিভঙ্গিম সুর কলা কাব্যবাহিত ব্যঞ্জনা পরিস্ফুটনেরই অনুগামী। ফারসি গজলের ঐতিহ্য যখন সম্প্রসারিত হয় উর্দুতে, হিন্দুস্থানি সংগীতের পটভূমিতে, তখন উর্দুরও শ্রেষ্ঠ কবিরাই এগিয়ে আসেন এই নব সংগীত রচনায়।

নজরুলের গজল উৎকৃষ্ট কাব্যগীতি। একটি সুখ-পাঠ, ভাবময়, ব্যঞ্জনাঘন, অলংকারযুক্ত পদ বলতে যা বুঝায় নজরুলের গজল তাই। গজলের মধ্য দিয়ে নজরুল গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দেশাত্মবোধক গানে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিদ্রোহীরূপে এবং গজলে আত্মপ্রকাশ করেন প্রেম ও প্রকৃতির রোমান্টিক কবি রূপে। দেশাত্মবোধক গানে, ভাষায়, ভাবে ও সুরে তাঁর বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যা শুনামাত্রই নজরুলের রচনা বলে বোঝা যায় তেমনি গজলেও নজরুল কাব্য ও সংগীতপ্রতিভা একান্ত নজরুলরীতি রূপে ব্যক্ত হয়েছে।

নজরুল ছিলেন যৌবনের কবি। যৌবনধর্মের একদিকে বিদ্রোহ অপরদিকে প্রেম। তাঁর বিদ্রোহ রয়েছে দেশাত্মবোধক গানে এবং প্রেমবোধ ছিল গজলে। শব্দ চয়নে, উপমা রচনায়, স্তবক গঠনে এবং আবেগ প্রকাশের প্রেরণায় এমন বিশিষ্টতা লাভ করেছে যেখানে নজরুলকে অনায়াসে সনাক্ত করা যেত। এরই নাম 'নজরুলিয়া'। এ গজল যখন নতুন সুর প্রক্রিয়ায় ধ্বনিত হল তখনই সৃষ্টি হল নজরুল জগৎ।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি সংমিশ্রিয় গজল দ্বারা নজরুল বাঙালি সংগীতপ্রেমী সমাজকে মুগ্ধ করলেন। বিশেষকরে তাঁর নিম্নের ফারসি থেকে অনূদিত গজলগুলো বাঙালি গীতিরশিকদের মুগ্ধ করে :

- কোঁক্‌ড়া অলক মুছেঁছিল ঘাম-ভেজা লাল্ গাল ছুঁয়ে[১]; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:৫১৯)
- দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে[২]; (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩:১০৩)
- শাখ্-ই-নবাত! শাখ্-ই-নবাত! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'[৩]; (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৮৪:৩৪৪)
- তরুণ প্রেমিকা! প্রণয়-বেদন জানাও জাগাও বে-দিল্ প্রিয়ায়[৪]; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:৮২)
- ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে ব'লো গো সেই হরিণীরে[৫]; (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:৮৫)

যদিও ফারসির সঙ্গে বাঙালির সংযোগ দীর্ঘকালের কিন্তু নজরুলের পূর্বে অপর কোনো বাঙালি কবি বা সংগীত রচয়িতা ফারসি সাহিত্য বা কাব্য-সংগীতের প্রেরণায় এরূপ চিত্তাকর্ষক ও গভীর কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি। নজরুলের ফারসিমিশ্রিত গজল রচনা এ ব্যাপারে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেছে। নজরুলের গজল গানগুলো শুধু উর্দু গজলের অনুকৃতি বা বঙ্গীয় সংস্করণ নয়, তাতে শ্রেষ্ঠ ফারসি গজলের প্রতিফলন ঘটেছে। নজরুল পরিশ্রম করে হাফিজকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই চিরকালের শ্রেষ্ঠ পারস্যের মরমী কবি ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ আদর্শ। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' বা 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'– এই ছন্দটি কবি হাফিজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নজরুল শুধু সেই ছন্দ নয়, সেই ধ্বনি এবং ভাষার দোলাকেও বাংলায় প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। সপ্তদশ, অষ্টাদশ, এমনকি উনবিংশ শতকের অনেক ব্যক্তিই ফারসিতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কই? ফারসি সাহিত্যের কোনোও প্রভাবইতো তাঁদের বাংলা সাহিত্যে মহৎ কিছু করতে প্রণোদিত করে নি। কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে বটে তার আয়তন সামান্য এবং সাহিত্যিক মানও যথোপযুক্ত নয়। এত যুগ পরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একমাত্র নজরুলের মধ্যে সেই প্রয়াস লক্ষ করা গেল। সংস্কৃত সাহিত্যকে গাম্ভীর্যে, চিন্তাশীলতায় পূর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া যায়, আবার ফারসি সাহিত্য প্রাণচাঞ্চল্যে, মুখরতায়, ভাবাবেগে যেন গতিশীলতার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। নজরুলের দুর্বার প্রাণশক্তি এই তাজা সজীব আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। তাই অপূর্ব অনুভূতিতে বিহ্বল করে তুলে নজরুলের গজল :

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকি দাও শারাব।
...
আর সহে না দিল্ নিয়ে এই
দিল্ দরদীর দিল্ লগী,
তাইত চালাই নীল পিয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব।
(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩:৩৯৬)

---

[১] গজলটি হাফিজের زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، 'জুলফে আ-শফ্‌তা ও খুয়ে কারদেহ ও খান্দান লাবও মাসত' অবলম্বনে রচিত।(ইসলাম[২], ১৯৯৩:৫১৯)

[২] গজলটি হাফিজের یوسف گم گشت باز آید به کنعان گم مخور، 'যুসোফে গুম গশতা বাজ আয়েদ ব-কিনআন গম মগোর' গজলের ভাব-ছায়া।(ইসলাম[২], ১৯৯৩:১০৩)

[৩] কবিতাটির শুরুতে নজরুল লিখেছেন, 'শাখ্-ই-নবাত' বুলবুল-ই-শরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন। 'শাখ-ই-নবাত'-এর অর্থ আখের শাখা' (ইসলাম[৪], ১৯৮৪:৩৪৪)

[৪] নজরুল ইসলাম তাঁর অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর ৫৭ নং ও ৫৯ নং রুবাই দুটি সংযোজিত করে গানটি রচনা করেন। (শেলী[১১], ২০০৫:৬৩)

[৫] গজলটি হাফিজের صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، 'সাবা বে লুতফ বেগু অন গায'াল রা'না রা' গজলের অবলম্বনে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের গানের ছন্দ, আবেগ, ফারসি শব্দের অনুপ্রাস সকলকেই আকৃষ্ট করে। আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝা যায়, কেন নীল পিয়ালা বলা হয়, ফারসি সাহিত্যে নীলবর্ণ কিসের দ্যোতনা বহন করে এবং নীল পিয়ালায় লাল শিরাজীর কনট্রাস্ট (contrast) কী সুন্দর এবং কতখানি ভাবব্যঞ্জক। হাফিজ তথা পারস্যের কবিদের সুফি মনোভাব নজরুলের এ রকম কয়েকটি গানে যে রকম প্রতিভাত হয়েছে তা বাংলার সংগীত সাহিত্যের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নজরুলের অধিকাংশ গজলেই ফারসি শব্দের ব্যবহার, ফারসি সাহিত্যের সুফি অনুষঙ্গ, পারস্যের ঐতিহ্যবাহী ফুল, পাখী, সুরাহি, সাকি, শরাব প্রভৃতির উল্লেখ বাংলা কাব্যসংগীতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন দ্যোতনা যুক্ত করে। কৃষ্ণনগরে নজরুলের জীবন দারিদ্রের দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ছিল। সেই ক্ষত জর্জরিত হৃদয় থেকে উৎসারিত হত গজলের সৌরভময় পুষ্পাবলি। তাঁরই এক মর্মস্পর্শী গান 'মুসাফির! মোছরে আঁখি জল'। ভাষা ও সুরের বাঁধুনী– এ গান রচনা একমাত্র নজরুল দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

নজরুলের 'মুসাফির' কোনো পৃথক ব্যক্তি নন। তিনি সব মানুষের প্রতীক জীবন পথের পান্থ, কবি নিজেই। জলে যেমন বাসা বাঁধা যায় না, এ সংসারেও তেমনি অমৃতের তৃষ্ণা মেটানো যায় না। নিজেই নিজেকে বলেছেন কবি, মুসাফির যদি ভেবে থাকেন এখানে তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব, তাহলে সেটা দুরাশা। কি আশ্চর্য স্তবক নজরুলের রচনায় :

বরষায় ফুটল না বকুল
পউষে ফুটবে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া।
(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩:৪২৫)

সৌন্দর্য, সৌরভ, বর্ণ, আশা ও প্রেমের প্রতীক উজ্জ্বল পুষ্পরাজি ও সতেজ উদ্যানের প্রচলিত চিত্র নিমিষে ম্লান হয়ে যায় এবং বৃন্তচ্যুত ফুলগুলো বর্ণহীন, গন্ধহীন, হতাশার বস্তুরূপ ধরে টুপটাপ ঝরতে থাকে। কবি জীবনের চাওয়া-পাওয়ার বৈপরীত্য যেভাবে এ গানে প্রকাশ পেয়েছে তা অনেক গানেই পাওয়া যায় না। জীবন পরিক্রমায় মানুষ মাত্রই নিঃসঙ্গ, তাই আপন প্রানের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিরাশার কানন পথেই কবিকে চলতে হচ্ছে। তাই নজরুলের গজলের গভীরতা সম্পর্কে অমলেন্দ দাশ গুপ্ত বলেন: 'মানুষ, রক্তমাংসে সীমাবদ্ধ মানুষ-এই বোধ যখন তার হয়, তখন সে আবিষ্কার করে যে, বিশ্বের এই অস্তিত্বের পিছনে একটা মর্মান্তিক ব্যথার নদী চিরবহমান- সে ধারা নিয়তির মতই অমোঘ-দুর্বার নিষ্ঠুর। সে নদীর ছল ছল গানের সাথেই সব কবি তাল রাখিয়া তাদের বীণার তার বাঁধেন। কাজী নজরুল সে ব্যথা-বারিধির অনন্ত কলধ্বনিকে বুক ভরিয়া আনিয়াছেন।' (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৯], ১৯৯০ :৩০১)

নজরুলের গজলের আবেদন ব্যঞ্জনাময়। বিস্ময়ে, বিষাদে, জিজ্ঞাসায়, মিলনে, বিরহে নজরুল তাঁর গজল পদাবলিকে গভীর বোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর গজলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ছবি, মানুষগুলো অসীম সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নলোকের কিছু বোঝা, কিছু না বোঝা ছবি বা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫

সুর সহযোগে গজল পাঠ করাকে বলা হয় 'শে'র' (شعر)। এ অংশটি সুরযুক্ত তবে তালযুক্ত নয়। সুরেলা আবৃত্তির ঢঙে, আলাপের চালে 'শে'র' (شعر) গাওয়া হয়। এর অব্যবহিত পূর্বের ও পরের অংশ তালে গ্রথিত থাকে। তাই রীতি অনুযায়ী একটি অংশের তালযুক্ত গায়ন শেষ করে 'শে'র' (شعر) ধরা হয় এবং 'শে'র' (شعر) গায়ন সমাপ্ত হলে পুনরায় গানের মূল তালছন্দে ফিরে যাওয়া হয়। যেমন নজরুলের *দিওয়ানে হাফিজ* গীতির ৩য় গীতি :

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৩য় গীতি :

তোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে বলো গো সেই হরিণীরে।
আর কতদিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে ॥
মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে ॥
গোলাব লো ! তোর রূপের গরব দেয় না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে ॥
চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে ॥
বঁধুর পাশে ব'সে তোমার ঢাল্‌বে যেদিন রঙীন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে ॥
শেয়র্ :-
সরল-তুন, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে–
রঙিন প্রেমের লাগল না রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা–
মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা !
হাফেজি এই গজল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু,
গাইবে সে গান 'জোহরা' তারা, নাচবে 'ঈশা' সে সুর-মীড়ে ॥
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৮৫-৮৬)

নজরুল রচিত হাফিজের উপরোক্ত '৩য় গীতি'র মূল গজল :

غزل ۴

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را | که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا | تفقدی نکند طوطی شکرخا را
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل | که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر | به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست | سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
چو با حبیب نشینی و باده پیمایی | به یاد دار محبان بادپیما را

Dhaka University Institutional Repository

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب   که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ   سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

(হাফিজ শিরাজী[১২], গজল নং ৪)

১। সাবা' বে লোত্ফ বেগূ অ'ন্ গাযা'লে রা'না'র'
কে সার্ বে কূহ্ ভ বিঅ'বা'ন্ তো দা'দেয়ী মা'রা'

২। শেকার্ ফোরূশ্ কে ওম্রাশ দেরা'য্ বা'দ চেরা'
তাফাক্কোদী নাকোনাদ্ তুতিয়ে শেকার্ খা'রা'

৩। গোরূরে হোস্নাত্ এজা'যাত্ মাগার নাদা'দ্ এই গোল্
কে পোর্সেশী নাকোনী আন্দালীবে শেইদা'রা'

৪। বেখোল্ক্ ও লোত্ফ তাভা'ন্ কার্দ ছেইদে আহ্লে নাযার্
বেবান্দ ভ দা'ম্ নাগীরান্দ মোর্গে দা'না'রা'

৫। নাদা'নাম্ আয্ চে সাবাব্ রাংগে অ'শনা'য়ী নীস্ত
সাহী ক্বাদ'নে সিয়াহ্ চেশ্মে ম'হে সীম' র'

৬। চো বা' হাবীব্ নেশীনী ভ বা'দে পেইমা'য়ী
বে ইঅ'দ্ দা'র মোহেব্বা'নে বা'দে পেইমা'র'

৭। জোয্ ইন্ ক্বাদার্ নাতাভা'ন্ গোফ্ত দার্ জামা'লে তো এইর
কে ভায্া' এ মেহ্র ভ ভাফা' নীস্ত রূয়ে যীবা'র'

৮। দার অসমা'ন না আযাব গার বে গুপতেহ হা'ফেয
সুরূদ জাহরাহ বে রাক্স অভারস মাসিহা'র'

নজরুলের গজল 'শে'র' (شعر) ব্যবহারের বিশেষ কোনো ছক নেই। কোনো কোনো গজলে তিনি 'শে'র' (شعر) ব্যবহার করেছেন, কোনো কোনো গজলে 'শে'র' (شعر) ব্যবহার করেন নি। আবার যেসব গজলে নজরুল 'শে'র' ব্যবহার করেছেন, সেখানেও তিনি ছক অনুসরণ করেন নি। নজরুলের নিম্নলিখিত গজলগুলোতে 'শে'র'-এর ব্যবহার হয় নি :

- কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি; (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৫৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

- নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল, মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৪০৬)
- কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া, প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৪২৩)
- মুসাফির! মোছ্ এ আঁখি-জল, ফিরে চল আপনারে নিয়া। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৪২৫)
- এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল, (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৪২৫)
- এত জল ও-কাজল- চোখে, পাষাণী, আনলে বল কে। (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৩৯৮)
- বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, (নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩, ৩৯২)
- ওই জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী,
- বাগিচায় বুলবুলি তুই, (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩:৩৯১) ইত্যাদি

কোনো কোনো গজলে একটি মাত্র স্তবক 'শে'র' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে:

- তোমার বুকের ফুলদানিতে
- একি সুরে তুমি গান শোনালে।

(উদ্ধৃত, গোস্বামী[৮], ১৯৯০: ৩০১)

'তোমার বুকের ফুলদানিতে' গজলটিতে 'অঙ্গে তোমার রূপ হব গো ধূপ হব মিলন রাতে/ গহীন ঘুমে স্বপন হব, আমি জল হব নয়ন পাতে' স্তবকটি এবং 'একি সুরে তুমি গান শোনালে' গজলটিতে 'তোর ও সুরে কাঁদছে উষা অস্তচাঁদের গলা ধরে/ ভোগ গগনের কপোল বেয়ে শিশির অশ্রু গড়িয়ে পড়ে' স্তবকটি 'শে'র' হিসাবে গাওয়া হয়।

'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়' গজলটিতে 'শে'র' (شعر) এর ব্যবহার অন্যরকম। এখানে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণটি 'শে'র' (شعر)। স্তবকের প্রথম দুটি চরণ এবং চতুর্থ বা শেষ স্তবকের প্রথম দুই চরণও 'শে'র' (شعر) হিসাবে গাওয়া হয়।

'জাগো জাগো রে মুসাফির' গজলটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণ এবং তৃতীয় বা শেষ স্তবকের প্রথম দুই চরণ ও তৃতীয় স্তবকের প্রথম তিন চরণ 'শে'র' (شعر) রূপে গাওয়া হয়। নজরুলের গজলে 'শে'র' (شعر) এর প্রয়োগ সম্পর্কে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন :

> নজরুল আর একটি জিনিসের প্রবর্তন করেন আমাদের সংগীতে, সেটি হচ্ছে 'শেয়র' বা সুরসহযোগে কাব্য পাঠ। এই সুরের ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কথকতার তঙ্গীর অনেক তফাৎ, কেননা এ হচ্ছে লিরিক বা কাব্যবন্ধেরই একটা অঙ্গ। গানের মতই এর সুরের, সঞ্চরণ এবং প্রকৃতি খানিকটা আলাপ ঘেঁষা। এই শ্লথ ভঙ্গীতে সুর করে আবৃত্তি করার পর তালের প্রয়োগ এবং ছন্দের ঝোঁক একটি অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। (উদ্ধৃত, গোস্বামী[৮], ১৯৯০: ৩০৪)

'শে'র' (شعر) ব্যবহারের উপলব্ধিগত ও সাংগীতিক তাৎপর্য আছে। তাল ছন্দে ছন্দে গানকে চলমান রাখে। গানের অংশবিশেষের ওপর সে সুরকে অচঞ্চলভাবে স্থিত হতে দেয় না। তালযুক্ত অবস্থায় সুরের স্থিতিকে দীর্ঘ করলেও এক ধরনের গতিবেগ তাতে থেকেই যায়। কিন্তু গভীরভাবে ভাববাহী কোনো স্তবকে বা স্তবকাংশে সুরকে

Dhaka University Institutional Repository

গতিমুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করলে তাতে ভাবনার পরিস্ফুটন গভীরতর হয় এবং পদবাহিত ব্যঞ্জনাকে যেন নিঙড়ে বের করে আনা যায়। এ হচ্ছে গজলে 'শে'র' (شعر) ব্যবহারের উপলব্ধিগত দিক।

এর সাংগীতিক দিকটিও উল্লেখযোগ্য। তালের কাঠামোয় বসানো একটি গানের অংশবিশেষ এসে তাল সংগত ছেড়ে সুরাবৃত্তির ঢঙে গাইলে সেই অংশবিশেষের ওপর শ্রোতাচিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং পর পরই তালে ফিরে গেলে গানের গতিও বজায় থাকে, বৈচিত্র্যও সম্পাদিত হয়। এক প্রকার নাটকীয়তার আস্বাদও পাওয়া যায়। এভাবে গতি ও গতিহীনতার বৈপরীত্যে চিত্তাকর্ষক সাংগীতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা কাব্যগীতিতে এ জিনিসটি ছিল না। 'শে'র' (شعر) এর মাধ্যমে গীতমধ্যস্থ সুরাবৃত্তির চালটি যখন নজরুল উপস্থাপিত করলেন, তখন বাঙালি গীতরশিক সমাজ এক নতুন উপলব্ধি ও সাংগীতিক সৌন্দর্যের মুখোমুখি হল।

গজলের কাব্যসাংগীতিক আদর্শের সঙ্গে 'শে'র' (شعر) ব্যবহার যে কত সঙ্গতিপূর্ণ, এবং তাতে গানের সুষমা যে কি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হতে পারে নজরুলের গজল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পারস্য মরমী কাব্যে অনুপ্রাণিত এবং ফারসি সংমিশ্রিত গজলে নজরুল একজন সুস্থ, সমোজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন সুরকার; তাঁর পূর্বে এ ধরনের রচনা হয় নি এবং গজলের এ পরিকল্পনা একমাত্র তাঁরই। তাঁর পূর্বে ও পরে এ স্বার্থকতা অন্য কেউ দাবি করতে পারে না। গজলের এ ধারা আরো উচ্চতর ভাবাদর্শে স্থাপন করতে তিনি সচেষ্ট হন নি। তিনি যেন একটি পর্যায়ে এসে থেমে গেলেন। ফারসি গজল মানিয়ে গেছে সে দেশের জীবন-যাত্রা, আচার ব্যবহার, ভাষার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে। উর্দুতে সে রীতি সমানভাবে প্রযোজ্য হয় নি। তাই উর্দু গজলের সঙ্গে ফারসি গজলের যেমন মিল আছে তেমনি ব্যবধান ব্যাপক। ক্রমে উর্দু সংগীত সাহিত্যে গজলকে গভীরভাবে প্রয়াস চালিয়ে নিজ নিয়মে সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। বাংলার জীবন যাত্রায় সুরা, সাকি, সরাইখানা, বিচিত্র পেয়ালায় পানশালায় বসে একত্রে পানভোজন ইত্যাদি ব্যাপার একেবারেই বিজাতীয়। তাই সে ধারায় গজল রচনা করলে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যাবে, অসীমের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে কিছুটা সে গভীরতার দিকে প্রবাহিত হয়ে থেমে গেল। সুফি-ভাবধারা অবলম্বন করে আমাদের সংগীতে ইসলামি ধারা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক চিন্তা ও প্রয়োগের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে। সে সঙ্গে আমাদের ভাবাদর্শের মিল ছিল। যদিও নজরুলের গতি অবরুদ্ধ হয়েছে তথাপি তাঁর এ বিচিত্র্য সৃষ্টির মূল্যও কম নয়। তাঁর এ প্রচেষ্টা ছিল অসাধারণ সম্ভাবনার পরিচায়ক। বাংলায় যে গজল রচিত হয়েছে এবং তাকে গভীর পর্যায়ে নিয়ে যাবার অবকাশ যে প্রচুর আছে এটা আমরা আজ বলতে পারি নজরুলের প্রয়াসের ওপর ভিত্তিস্থাপন করে।

বাংলার সংগীত সাহিত্যের ইতিহাসে নিধুবাবু[১] ও কালীমীর্জা[২] প্রবর্তিত টপ্পার[৩] একটি শতাধিক বছরের ঐতিহ্য ঐতিহ্য আছে। বাংলায় টপ্পা প্রবর্তনের সঙ্গে নজরুলের গজল প্রবর্তনের ব্যাপারটি তুলনীয় এজন্য যে, নিধুবাবু-কালী মীর্জা যেমন হিন্দুস্থানী টপ্পার আদর্শে বাংলায় একটি নবসংগীত ধারার সূচনা করেছিলেন, নজরুলও তেমনি

---

[১] নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯): হুগলি জেলার চাঁপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম-হরিনারায়ণ গুপ্ত যিনি বাংলা ও ফারসি সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। এঁদের বাসস্থান ছিল কলকাতা শহরের কুমারটুলি অঞ্চলে। ১৭৭৫ সালে ইংরেজদের নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তার এক বছর পরই ১৭৭৬ সালে কালেক্টরেটে কেরানীর চাকরি নিয়ে নিধুবাবু কলকাতা থেকে বিহারের ছাপরা চলে যান। সেই চাকরি সূত্রেই তিনি আঠার বছর সেখানে ছিলেন। টপ্পাকে তিনি তাঁর জীবনের সম্বল করে তোলেন। ১৭৯৪ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ৫৩ বছর বয়সে নিধুবাবু যখন কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি টপ্পায় পারঙ্গম ও গায়করূপে সুপ্রতির্ষ্ঠিত। (গোস্বামী[৯], ১৯৯০: ২৬)

[২] কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০): প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোলাম নবীর সাক্ষাত ধারা থেকে তিনি টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন। (গোস্বামী[৯], ১৯৯০: ৩৫)

[৩] টপ্পা: সংক্ষিপ্ত সংগীত অর্থে টপ্পা কথাটি প্রচলিত হয়। এই গান রূপবন্ধগতভাবে ধ্রুপদ-খেয়াল অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। পাঞ্জাবের উটচালকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক প্রকার গান অবলম্বনে গোলাম নবী (১৭৪২-১৭৯২) টপ্পার প্রবর্তন করেছিলেন। পশ্চিমের টপ্পা প্রধানত দ্রুতলয়ে গঠিত এবং বাংলা টপ্পা দ্রুতলয়ে নয়। তার গঠন-প্রয়াসই মধ্যলয়ে এবং তার জন্য মধ্যমান তাল প্রযুক্ত হত উপযোগী বিবেচনায়। (গোস্বামী[৯], ১৯৯০: ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুস্থানি ও ফারসি গজলের আদর্শে বাংলায় গজল প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে নজরুল প্রবর্তিত গজল সংগীতের টপ্পাতুল্য অনুসরণ হয় নি। তার কারণ যদি বলা হয় যে, নজরুল বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে বেমানান সাকি ও সুরাহি নিয়ে গজল রচনা করেছিলেন বলে নতুনত্বের সাময়িক স্বাদ বিতরণ করেই তার গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, তাহলে তাতে আপত্তি রয়েছে। সাকি, সুরাহি, শরাব, গুল, বুলবুল প্রভৃতি পারস্য গজলের ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ নিয়েই যে কেবল নজরুল গজল রচনা করেছিলেন তা নয়। এ নিয়ে তিনি কয়েকটি গজল রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলা কাব্য-সংগীতের আবহমান অনুষঙ্গে অনেক আকর্ষণীয় গজলও রচনা করেছেন। সেসব ছিল খাটি বাংলা প্রেমের গান।

বাংলা কাব্য-সংগীতের যে পরিস্থিতিতে নজরুল গজল রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে পরিস্থিতির পরবর্তী দিনগুলো গজল রচনার জন্য উপযোগী ছিল না। তাই নজরুল প্রবর্তিত গজলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বাংলা কাব্য-সংগীতের এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলা কাব্য-সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রতিনিধিত্বশীল কবি। তাঁর পর থেকেই প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি কবিগণ গজল রচনার ধারা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করেছেন এবং কবির নিভৃত প্রাণের মর্মবাণীকে সংগীতে ধ্বনিত করার পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় শ্রোতার চিন্তানুযায়ী সংগীত রচনার এক নতুন সুরপ্রধান যুগের সূচনা ঘটল। যেখানে নজরুল নিজেই ছিলেন গীতরচয়িতা ও সুরকার সেখানে গীত-রচয়িতা ও সুরকার রূপে একই গানের দুই নির্মাতার আবির্ভাব ঘটল। বাংলা গান এক ধরনের উৎপাদনী ব্যবস্থার করগত হয়ে পড়ল। তাই এই যুগ গজল রচনার উপযুক্ত নয়। গজলতো বাণীপ্রধান গান, গজল কবির সৃষ্টি। ফারসি অনুষঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যেসকল গজল নজরুল বাংলা গানের জগতে উপহার দিয়েছেন তা বাংলা গানকে কেবল সমৃদ্ধই করে নি; বরং তা বাংলা গানের জগতে চিরকাল অহংকার ও গর্বের বস্তু হয়ে থাকবে। ব্যথা-বেদনায়, দুঃখ-কষ্টে, প্রেম-বিরহে, যুদ্ধে–শান্তিতে, গণজাগরণে এমনকি ধর্মীয় পরিবেশে নজরুলের গানের আপন স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ভুবনের বিকল্প নেই। প্রতিভাবান বাঙালি গজল রচয়িতাগণ যদি শ্রেষ্ঠ ফারসি গজলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় গজল রচনায় ব্রতী হন তাহলে বাংলা সংগীতের ভাণ্ডার গজলের সংযোজনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তাই গজলের পথ অবলম্বনে বাংলা কাব্য-গীতির ধারায় পারস্য মরমী কবিদের প্রেরণায় অসীমত্বের দিকে এগিয়ে এখনও গভীর কিছু সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে আর এ ক্ষেত্রে যাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন তাঁদের সহায় হবেন নজরুল। যাঁরা বৈষ্ণব, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রেমলীলা ও গোষ্ঠলীলার সুর-চিত্র দর্শনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়। যিনি শাক্ত, তিনি শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় নিজের মনটিকে একটি রাঙাজবা করে দিতে পারেন নজরুলের শ্যামা সংগীতের খেয়ায় ভেসে। যিনি মুসলমান, তিনি ঈদ মুবারকের বাঁকা চাঁদ প্রথম দেখার আনন্দে আত্মহারা হবার ভাষা খুঁজে পাবেন এই নজরুল-গীতির ভাণ্ডার থেকেই। যিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমের বিভিন্ন স্তরের সুখের ও শোকের সাড়া পাবেন নজরুলের গানে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীনঃ *ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, প্রকাশকাল, জুলাই, ১৯৯৮।

২. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশঃ ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৫. ইসলাম, মুস্তফা নূরউলঃ *সমকালে নজরুল ইসলাম*, ১৯২০-১৯৫০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ অগ্রহায়ণ/ ১৩৯০, নভেম্বর, ১৯৮৩; প্রকাশনা নং বা.শি.এ. ২৪।

৬. তামীমদারী, ড. আহমাদঃ অনুবাদ, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশকালঃ এসফান্দ-১৩৮৫/ ফেব্রুয়ারি-২০০৭।

৭. মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, মোহাম্মদঃ *জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন*, স্মারক-গ্রন্থ ১৯৯৩, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশঃ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১/১৮ মে, ১৯৯৪।

৮. গুপ্ত, সুশীলকুমারঃ *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণঃ জানুয়ারি ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৯. গোস্বামী, করুণাময়ঃ *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ চৈত্র ১৩৯৬/ মার্চ ১৯৯০, বা/এ-২৩৭৮।

১০. হায়দার, সুফি জুল্‌ফিকারঃ *নজরুল-প্রতিভা-পরিচয়*, সুফি জুল্‌ফিকার হায়দার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশঃ ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৯১/ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

১১. শেলী, রাশেদুল হাসান, মাহবুব বারী সম্পাদিতঃ *নজরুল সাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব*, নজরুল গবেষণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, প্রকাশকাল : জুন-২০০৫, জৈষ্ঠ-১৪১২।

১২. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ : *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসির অনুপ্রেরণায় নজরুলের অনুবাদকর্ম

যেসব কবি অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন, প্রবল প্রতিভায় বাংলার সাহিত্যপাঠককে আপন ভাষায় পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্যের রং-রস-রূপ উপভোগের সহজ এবং অকৃত্রিম সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অন্যতম। তিনি একজন বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তিনি বিদ্রোহ, প্রেম ও ভক্তির একজন মহান কবি। একজন শক্তিশালী উপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক ও প্রাবন্ধিক এবং অত্যুৎকৃষ্ট গীতিকার ও সুরকার। এসব কিছুর উর্ধ্বে তিনি একজন উৎকৃষ্ট অনুবাদক। ফারসি, আরবি এবং ইংরেজি সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ছোট বেলা থেকে। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর পরিচয় স্বল্প থাকলেও ফারসি এবং আরবি সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। ফারসি-আরবি সাহিত্যের অমর ভাণ্ডার থেকে ভাব, শব্দ, ছন্দ, সুর প্রভৃতি সংগ্রহ করে তিনি বাংলা ভাষাকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন। বিশেষকরে এসব ক্ষেত্রে তিনি পারস্য কবিদের অনুসরণ করেছেন। ফারসি সাহিত্যের সুধারসে এক সময় তিনি ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ সাহিত্য থেকে তিনি কখনো আহরণ করেছেন সুর, কখনো ছন্দ, কখনো বা কথা। পারস্য থেকে আমদানিকৃত এ সাহিত্য-সম্পদ তিনি পরিবেশন করেন বাংলার ঘরের জিনিসের রং লাগিয়ে এবং বাঙালি পাঠক তা বিনা দ্বিধায় আপন সম্পদ বলে গ্রহণ করে। বস্তুত: পারস্য থেকে আমদানিকৃত সাহিত্য জগতকে এমনিভাবে আপন বানিয়ে নেয়ার সুযোগ তারা নজরুলের সাহায্যে যতোটা পেয়েছেন, তা আর কোনো কবির মাধ্যমে পান নি। কবি আব্দুল কাদিরের ভাষায়, 'নজরুলের কবি-জীবনের সেই সূচনাতেই দেখা গেছে মৌলিক কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে ফারসী থেকে অনুবাদের দিকেও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ।' (উদ্ধৃত, রহমান[১], ১৯৯৪ : ৯২)

ফারসি থেকে তিনি যেসব সুর, ছন্দ এবং বাগ্‌ভঙ্গি আমদানি করেন, সেগুলো তাঁর সমগ্র মৌলিক রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোর গুণ ও পরিমাণ দুই-ই বিস্ময়কর। যে কোনো পাঠককেই সেগুলো মুহূর্তে সচকিত করে তোলে। এক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন।

১

নজরুলের অনুবাদগ্রন্থ মূলত তিনটি; ১) *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (আষাঢ়, ১৩৩৭/১৯৩০); ২) *কাব্য আমপারা* (১৯৩৩) এবং *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* (১৯৫৯)। তাছাড়া নজরুল ইংরেজি, ফারসি ও আরবি প্রভৃতি কবিতা ও গজলের অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ করেছেন যা বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও তাঁর পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করেছে। নজরুলের *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* ও *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* মূল ফারসি পদ্য এবং *কাব্য আমপারা* -এর ভিত্তি আরবি গদ্য। তিনি সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম এবং বিশেষকরে কাব্য আমপারা'য় তাদের মূলের প্রতি বিশেষ অধীতনার জন্য তাঁর অনুবাদ কোনো কোনো জায়গায় আড়ষ্ট ও শ্লথগতি হয়ে পড়েছে।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ২২৯)

নজরুলের অনুবাদগুলো সবই কাব্য ; যদিও মূল রচনা সকল ক্ষেত্রে কাব্য নয়। *কাব্য-আমপারা* পবিত্র কোরআনুল কারিমের আরবি গদ্যের বাংলা কাব্যরূপ। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* আর *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* কাব্যগ্রন্থেরই অনুবাদ। এ অনুবাদে নজরুল মূল কাব্যের ছন্দ আর আঙ্গিকও মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন। এগুলোর বাইরে তাঁর অনূদিত আর যেসব রচনা অন্যান্য গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে, সংখ্যায় সেগুলোও কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের ইচ্ছা ছিলো, হাফিজের সমগ্র *দিওয়ান* এর অনুবাদ করবেন। ইচ্ছাটি অপূর্ণই থেকে যায়। তিনি সে কাজে আর হাত দেন নি। নজরুল লিখেছেন : 'যদি সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করব!' (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১৫)

এই তিনটি সাহিত্যকর্ম ছাড়াও নজরুল বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমেরিকার কবি ওয়ালট হুইটম্যানের সুপরিচিতি কবিতা পাইওনীয়ার ও পাইওনীয়ার (Pioneer, O Pioneer) এর চিন্তা ও ধারণা অনুবাদ করেছেন তাঁর 'অগ্র-পথিক' কবিতায়।

নজরুল তাঁর সৈনিক জীবনের প্রথম দিকেই ইরানের কাব্যের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলেন। বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলভি ছিলেন যিনি নজরুল ও আরো কয়েকজনের সামনে হাফিজের দিওয়ান থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। নজরুল বিমোহিত হয়ে তাঁর কাছে ফারসি ভাষা শিখতে শুরু করেন। যথা সময়ে তিনি এ ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* -এর মুখবন্ধে নজরুল বলেন :

> আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।
>
> তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়– গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হ'য়ে গেল।
>
> তারপর এস. সি. চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।
>
> (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১৫)

হাফিজ পাঁচশত এর অধিক গজল এবং পঁচাত্তরের অধিক রুবাইয়াত রচনা করেছিলেন। নজরুল হাফিজের ৭৩টি রুবাইয়াত চমৎকার বাংলায় অনুবাদ করেছেন মূল ভাষা ও চিন্তা ঠিক রেখে। হাফিজের জীবনবৃত্তান্তে নজরুল তাঁকে শিরাজের বুলবুল বলেছেন। হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন এবং নজরুল তাঁকে একজন সুফি কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন; যিনি তাঁর কবিতাসহ সকল জাগতিক বিষয়ের প্রতি উদাসীন ছিলেন। নজরুল হাফিজ সম্পর্কে লিখেছেন :

> ইরানিরা হাফিজকে আদর করিয়া 'বুল্‌বুল্‌-ই-' বা শিরাজের বুল্‌বুলি বলিয়া সম্ভাষণ করে। হাফিজকে তাহারা শুধু কবি বলিয়াই ভালোবাসে না। তাহারা হাফিজকে 'লিসান্‌-উল্‌-গায়েব্‌' (অজ্ঞাতের বাণী), 'তর্জমান্‌-উল্‌-আসরার' (রহস্যের মর্মসন্ধানী) বলিয়াই অধিকতর শ্রদ্ধা করে। হাফিজের কবর আর ইরানের শুধু জ্ঞানী-গুণীজনের শ্রদ্ধার স্থান নয়, সর্বসাধারণের কাছে 'দর্গা', পীরের আস্তানা। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪১)

নজরুলের প্রায় সমস্ত অনুবাদই প্রকাশিত হয় তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে। তবে তাঁর যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর কোনোটিতেই মুদ্রণ ইতিহাস বলে কোনো কিছু নেই এবং প্রথম সংস্করণগুলো দুস্প্রাপ্য। অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রকাশকাল উদ্ধার করাও জটিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাই

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্যের কালানুক্রমিক আলোচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। *কাব্য-আমপারা* প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো বাংলা ১৩৪০ সালে এবং *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* ১৩৩৭ সালে। *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* - এর প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৫৯। গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশের আগে *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* - এর দশটি রুবাই মাসিক 'জয়ন্তী'-তে এবং *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* -এর উনষাটটি রুবাই মাসিক 'মোহাম্মদী' তে প্রকাশিত হয়। (রহমান[৭], ১৯৯৪: ৮৪)

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কোনোভাবে ঠেলে দিলেই প্রকৃত অনুবাদ হয় না। যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষার গতিকে অনুবাদের ভাষায় এমনভাবে সঞ্চারিত করতে হয় যাতে মূলের মতোই পাঠকবর্গকে প্রভাবিত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে কান্তি চন্দ্র ঘোষের অনুবাদকৃত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিটজিরাল্ড ও কান্তি চন্দ্রের অনুবাদ সম্পর্কে (২৯ শ্রাবন, ১৩২৬/১৯১৯) লিখেছেন :

> ... এ রকম কবিতা একভাষা থেকে অন্য ভাষায় ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। জেরাল্ডও তাই ঠিকমত তর্জমা করেন নি-মূলের ভাবটা নিয়ে সেটাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। ভাল কবিতা মাত্রকেই তর্জমায় নতুন করে সৃষ্টি করা দরকার। তোমার তর্জমা পড়ে আমার একটা কথা বিশেষ করে মনে উঠেচে। সে হচ্ছে এই যে বাংলা কাব্য-ভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেচে যে, অন্য ভাষার কাব্যের লীলা অংশও এ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। মূল কাব্যের এই রসলীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজে বহমান করতে পেরেচ এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েচে। (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ২২৯)

তাই অনুবাদে এক ভাষার ভাব ও গতি অন্য ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে মূলের সৌন্দর্য ও রহস্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। গ্যাটের মতে 'অনুবাদক পাঠককে কোনো এক অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাকে এ সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্খিত করে তোলেন।' (গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ২৩০) নজরুল তাঁর অধিকাংশ অনুবাদে, বিশেষ করে হাফিজের গজল ও রুবাইয়ের অনুবাদেই মূল কাব্যের ভাব ও গতি বজায় রাখতে এবং সঙ্গে তার সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

হাফিজ এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ফারসি কবির কাব্যের সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে নজরুলের সৈনিক জীবনে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদক জীবনও শুরু হয় এই যুগে। অর্থাৎ অনুবাদকর্মে তিনি আগ্রহী আর উৎসাহী ছিলেন প্রথম জীবন থেকেই। বাংলা ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে 'আশায়' নামে হাফিজের একটি কবিতার আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের তৃতীয় প্রকাশিত এবং প্রথম অনূদিত কবিতা। কবিতাটি:

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই-কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেম্‌নি বিভোর থাক্ রে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোর এ নাসায়।
বরষ- শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অম্‌নি অবুঝ হরষ।

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫০৬)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজ, ওমর খৈয়াম বা কুরআনুল কারিমের প্রথম কিংবা একমাত্র অনুবাদক নন। এক সময় এদেশে ফারসি-আরবি সাহিত্যের সমাদর ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলিম আমলে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানচর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল ফারসি-আরবি ভাষা। কিন্তু মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে ফারসি-আরবির চর্চা মুসলিম সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে যখন বাংলাদেশে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটে এবং হিন্দু সম্প্রদায় ফারসি-আরবির পরিবর্তে ইংরেজি চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন, তখনও তাদের কাছে কুরআনুল কারিমের মর্মবাণীর আকর্ষণ একেবারে শেষ হয় নি। এর প্রমাণ রেনেসাঁ যুগের শেষ দিকে (১৮৮১-৮৫) প্রকাশিত গিরীশচন্দ্র সেন কর্তৃক কুরআনুল কারিমের বঙ্গানুবাদ। 'গিরীশচন্দ্র সেনের অনুবাদের পর ১৮৯১ সালে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন নামে একজন মুসলিম সুধী কোরাণ শরীফের আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনিই এক্ষেত্রে প্রথম মুসলিম অনুবাদক।' (রহমান[৭], ১৯৯৪ : ৮৫)

২

১২০১ সালে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তারপর থেকে ফারসি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পায় এবং জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার উন্নয়নে মুসলমান রাজা বাদশাহগণ পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব দেন। মূলতঃ তখন থেকেই বাংলা ভাষার উন্নয়ন শুরু হয়। এই ধারা পোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল– প্রথমত বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যরীতিতে। দ্বিতীয়ত মুসলমানগণ যে সাহিত্যকীর্তি গড়ে তোলেন তা ছিল মূলত ফারসি-অনুবাদ সাহিত্য থেকে। ফারসি-বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলায় আল্লাহ, রাসূল (সা.), সাহাবীগণের বীরত্বগাঁথা ও ঐশী প্রেম নির্ভর ইসলামি সাহিত্য রচিত হয়।

বাংলায় সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭) ও নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫২২) সময়কাল ছিল বাংলা সাহিত্যের সোনালি যুগ। এই যুগে বাংলা সাহিত্যচর্চার সূত্র ধরে হিন্দু ও মুসলিম সমাজ পরস্পরের ঘনিষ্ট হয়। তখন হিন্দুরাও তাদের কবিতা ও রচনায় ব্যাপকভাবে ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন।

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় ও পরবর্তীতে শাহাদত বরণের পর বাংলা তথা পুরো ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। রাজ্যহারা মুসলমানগণ একদিকে আধিপত্যবাদী ইংরেজদের রোষানলে পড়ে, অন্যদিকে ইংরেজদের আর্শীবাদ পিয়াসী এতদিন ধরে মুসলমানদের শাসিত হিন্দু সমাজ মুসলিম সমাজের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বাংলার মুসলিম সমাজকে সংস্কৃতিক দিক দিয়ে পদানত করার মানসে সুদূর প্রসারী একটি পরিকল্পনা নিয়ে ১০০০ সালে পোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কলেজের বাংলা বিভাগের পন্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে আরবি-ফারসি শব্দমুক্ত তথা মুসলমানি বাংলা থেকে খারিজ করে আনার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাদের প্রতিষ্ঠায় নতুন যে বাংলার প্রচলন ঘটে তার পরিচয় সংস্কৃত বাংলা বা প্রাকৃত বাংলা। এ সময়টি মুসলমানদের জন্য ছিল দুর্দিন কিন্তু বাংলার ওপর ফারসির যে প্রভাব এবং ফারসি সাহিত্যের প্রেম, মানবতা ও বিশ্ব দর্শনের যে আবেদন তা ফারসি থেকে অনুবাদের ধারাকে একেবারে বন্ধ করতে পারে নি ; বরং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পন্ডিতগণ ফারসি মধুভান্ডার হতে অমৃত স্বাধ গ্রহণের চেষ্টা চালায় নানাভাবে। বাংলা সাহিত্যের এ স্তরে রূপকল্প ও গল্প সাহিত্যের চেয়ে প্রেম, জীবন, মননশীলতা ও নৈতিক শিক্ষামূলক সাহিত্য অনুবাদের দিকে কবি-সাহিত্যিকদের মনোযোগ লক্ষ করা যায়। এ সময়ে হাফিজ, মওলানা রুমী, শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, শেখ সা'দী, ওমর খৈয়াম প্রমূখ মহাকবিদের কবিতার অনুবাদ সবচেয়ে বেশি হয়। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল ও রুবাই অনুবাদে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের লেখকগণ সমানভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হচ্ছে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আকবর হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, আযিযুল হাকীম, কুমার ভট্টাচার্য, আব্দুল হাফিয, মনিরুদ্দীণ ইউসুফ, মুহীত চন্দ্র, যতীন্দ্র মোহন বাগচি, শক্তি বন্দোপাধ্যায়, কান্তি চন্দ ঘোষ, কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। ইরানের বুলবুল হাফিজ শিরাজি বাংলার মন ও মানসকে কতটা মুগ্ধ করেছিলেন তার প্রমাণ এসব অনুবাদ। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ হাফিজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন :

> বাঙলার কোনো শাসনকর্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ আসিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরের কূলে আসিয়া যখন তিনি জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সেই সময় ভীষণ ঝড় ওঠে। ইহাতে হাফিজ দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া আবার শিরাজে ফিরিয়া আসেন এবং বাঙলার শাসনকর্তার কাছে যে কবিতাটি পাঠাইয়া দেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ :
>
> আজকে পাঠাই বাঙলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
> এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টমাখা।
> দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
> এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।
> (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪৪-৪৫)

কবি হাফিজ যে বাংলার জন্য প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণই বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কাছে পাঠানো তাঁর সেই বিখ্যাত গজল :

হাফিজের গজল নং ২৩২

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود — وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود
می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت — کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود
شکرشکن شوند همه طوطیان هند — زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود
طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر — کاین طفل یک شبه ره یک ساله می‌رود
آن چشم آهوانه عابدفریب بین — کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود
خوی کرده میخرامد و بر عارض سمن — از شرم روی او عرق ژاله می‌رود
از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز — مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود
باد بهار می‌وزد از گلستان شاه — و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

(হাফিজ সিরাজী[৫], ১৩৬২ ফারসি সন : ১২৯)

Dhaka University Institutional Repository

১। সা'কী হাদীসে সারভ ভ গুল ভ লা'লে মীরাভাদ
ভীন বাহাছ ব্ সুলা'সেয়ে গাস্সা'লে মীরাভাদ
২। মেই দেহ কে নু আরুছে চামান হাদ্দে হুসান ইয়া'ফ্ত
করে ইন যামা'ন যে ছানআতে দাল্লা'লে মীরাভাদ
৩। শেকার শেকান্ শাভান্দ হামে তুতিয়া'নে হিন্দ,
যিন কান্দ পারসী কে বে বাঙ্গা'লে মীরাভাদ
৪। তাইয়ে মাকা'ন বেবীন ভ যামা'ন দার ছুলুকে শে'র
কেইন তিফলে একশাবে রাহে একছা'লে মীরাভাদ
৫। অন চেশমে যা'দুভানেয়ে আ'বেদে ফারিব বীন,
কেশ্ কা'রভানে ছেহের যে দুম্বা'লে মীরাভাদ
৬। আয রাহ মারো বে উশওয়ায়ে দুনিয়া' কে ঈন আজুয,
মাকা'রে মীনাশীনদ ভ মুহতা'লে মীরাভাদ
৭। বাদে বাহা'র মীওয়াযাদ আয গুলিস্ত'নে শা'হ্
ভ আয ঝা'লে বা'দেহ দার কাদহে লা'লে মীরাভাদ
৮। হা'ফেয যে শাওকে মাজলিসে সুলতা'ন গিয়াছে দ্বীন,
গা'ফেল মাশো কে কা'রে তু আয না'লে মীরাভাদ

সমগ্র ভারতবর্ষের কবিতা ও সাহিত্যের তোতাপাখিরা মিষ্টিমুখ হবার জন্য হাফিজ এ গজল পাঠিয়েছিলেন। হাফিজের প্রতি বাংলার সমাজ কতটা প্রলুব্ধ ছিল তার আরেকটি প্রমাণ– কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হতো হাফিজের হাফিজ। পুরো দিওয়ানে হাফিজ তার কণ্ঠস্থ ছিল এবং হাফিজের মধ্যে তিনি মনের সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াতেন বলে তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

৩

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে নজরুল ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। যার ফলে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভাষায়, ভাবে ও অর্থের চেনতায় ইরানি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন নজরুলের অনুবাদকর্মে সাহায্য করেছে। যেমন :

> ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, রুশ, লাতিন, হিন্দী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ছাড়াও আরবি ভাষার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাব' আ মুয়াল্লাকা, হারিরীর 'মাকামাতে হারিরী', বদিউজ্জামান হামদানীর 'মাকামাতে হামদানী', 'কালিলা ওয়া দিমনা', 'ইখওয়ানুস সাফা', 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা', কাব বিন জুহাইর এর 'বানাত সোয়াদ', হাসান বিন সাবিতের 'ক্বাসিদা', ইমাম রুসিরীর 'কাসিদাতুল বোরদা', মারুফ আর রুসাফীর 'দীওয়ান', ইত্যাদিসহ বিখ্যাত আরবি কাব্য সংকলন যেমন 'মূফধধালীয়াত', 'হামাসাহ', জমহুর তুল আল আরি আরব', 'কিতাবুল আবু আল-আল কালী', 'কামিল',

Dhaka University Institutional Repository

খামাসাতুল আদব', 'কিতাবুল আগানী', ইত্যাদির পাঠজনিত জ্ঞান নজরুল রচনাকে করেছে সমৃদ্ধ তদুপরি আছে ফারসী ভাষার কবি ফেরদৌসির 'শাহনামা', ফরীদ উদ্দিন আত্তারের 'পান্দ নামা' ও 'মানাতিকুত তায়ের', শেখ সা'দীর 'বোঁস্তা' ও 'গুলিস্তাঁ', জামীর 'দীওয়ান', আমির খসরু দেহলভীর 'আশেকান', ইত্যাদি পাঠ জনিত জ্ঞান। এমনকি তুর্কী কবি ইউসুফখাস হাজিরীর 'খুদাতু বিলিক', আহমদ ইয়েসাভীর 'হিকমাত', সোলায়মান চালাবীর 'মেভলিদি শরীফ' ছাড়াও উর্দু কবি ওয়ালীর 'মেরাজ শরীফ', হালীর 'মোসাদ্দাস', গালিবের 'দীওয়ান', ইকবালের 'আসরারে খুদী' ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় নজরুলের পাঠ জনিত জ্ঞানে এবং সেই সঙ্গে তার রচনা সম্ভারে। হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদ করে তো নজরুল ইসলাম অমর হয়ে আছেন। যে কারণে কোলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরকে 'হাফিজ-ই-হাফিজ' আখ্যা দেয়া হয়েছিল একই কারণে নজরুল ইসলামকে 'হাফিজ-ই-হাফিজ-২য়' আখ্যা দিলেও অযৌক্তিক হতো না। হাফিজের দিওয়ান শুধু তিনি অনুবাদই করেন নি, হাফিজের সমগ্র রচনাই তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে আত্মস্থ করেছিলেন। (সাত্তার[৮], ১৯৯২ : ৪-৫)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের অনুবাদের ব্যাপক নিদর্শন রয়েছে। আধুনিক কালে ওমর খৈয়ামের প্রথম অনুবাদক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের *সদ্ভাবশতক* - এ সা'দী এবং হাফিজের অনেকগুলো রচনার ভাবানুকরণে রচিত কবিতা সংকলিত হয়। ওই দুইজন ফারসি কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যাপক খ্যাতি পান *সদ্ভাবশতক* -এর মাধ্যমেই। কৃষ্ণচন্দ্রের সংশ্লিষ্ট রচনাগুলো এক সময় এতোটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা কোনো কোনো রচনা তাঁদের পুস্তকে সংকলিত করেন। তাঁর রচনা যুগধর্মের প্রভাবে ঈষৎ গাম্ভীর, কিন্তু শক্তিশালী,-

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে,
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।
(উদ্ধৃত, রহমান[৭], ১৯৯৪: ৮৬)

হাফিজের রচনার প্রথম প্রত্যক্ষ অনুবাদক ছিলেন গিরীশচন্দ্র সেন। তিনি হাফিজের *দিওয়ান* - এর বেশ কিছু রচনার অনুবাদ করেন। এগুলোর গ্রন্থনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে।

বর্তমান শতাব্দীতে কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবির দ্বারা অনূদিত হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের কবিতার খ্যাতিও অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁদের সবার অনুবাদই প্রকাশিত হয় নজরুলের অনুবাদগুলোর পূর্বে। নজরুলের পরেও কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ফারসি কবিতার অনুবাদ করেছেন। তাঁর আগে-পরের অধিকাংশ অনুবাদকই হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের কবিতার বাংলা রূপ দেন ইংরেজি থেকে এবং তাঁরা মূল কবিতার আঙ্গিকও সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন নি। তবু, তাঁদের অনুবাদ যে বাংলায় ফারসি কাব্যের রস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ অনুবাদগুলোর জনপ্রিয়তা।

ছন্দের যাদুকর নামে খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ফারসি কবিতার অনুবাদ-ভাবানুবাদ করেন ইংরেজি থেকে। তাঁর অনুবাদ-ভাবানুবাদের মূলের ছন্দ বা আঙ্গিকও অনুসৃত হয় নি। তা সত্ত্বেও তাঁর সংশ্লিষ্ট কাব্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক কবিতার ন্যায়। এ থেকেই প্রতীয়মাণ হয়, তিনি অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করলেও ফারসি কবিতার মর্মবাণী এবং মাধুর্য অনুধাবনে তাঁর কোনো অসুবিধাই হয় নি। ওমর খৈয়ামের দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ একটি রুবাইয়ের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত ভাবানুবাদ :

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে তাই।'
(উদ্ধৃত, রহমান[৭], ১৯৯৪ : ৮৭)

বর্তমান শতকে ফারসি কবিতার অনুবাদক হিসেবে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এবং খ্যাতি লাভ করেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। তাঁর এই সাফল্য আর খ্যাতির মূলে আছে ছন্দ এবং শব্দের মাধুর্য। আক্ষরিক বিচারে দেখা যাবে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনূদিত তাঁর রুবাইগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই মূলের পুরোপুরি অনুসারী নয়। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'কাব্য কূলবধূর মতো ঘোমটা টেনে থাকে, নিজের বাড়ি থেকে অন্যের বাড়ি গেলে তার ঘোমটা বাড়ে।' (উদ্ধৃত, রহমান[৭], ১৯৯৪ : ৮৭) অন্য এক লেখক ওমর খৈয়ামের বাঙালি অনুবাদকদের মুখ রক্ষা করবার জন্য ইরানি সমালোচকদের প্রসঙ্গ তুলে জানান, 'রুবাইগুলোকে গীতি-রস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি (ওমর) অনুভব করেন নি।' (উদ্ধৃত, রহমান[৭], ১৯৯৪ : ৮৭) তাদের কথা সত্যি হলে প্রশ্ন উঠবে, কবি হিসেবে ওমর খৈয়ামের এতো খ্যাতির কারণ কি ? নিম্নের অনুবাদগুলোর দ্বারা ওমর খৈয়ামের লেখার মান প্রতীয়মান হয় :

ক) কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদকৃত ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই :

রাত পোহালো শুনছ সখি দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক ?
লাজুক তাহা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক !
পূব গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।
(আবু জাফর[১], ১৯৭১ : ৩১)

খ) নরেন্দ্র দেব কর্তৃক অনূদিত উক্ত রুবাই :

জাগো জাগো, রাত ফুরালো,
তরুণ প্রাতের আঁখির আলো,
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে।
চাও গো সখি, চাঁদ-বধুরা লজ্জানত মুখে
ত্রস্ত পদে পলায় যেন ত্রাসে।
পূব আকাশের শিকারী ওই
জ্যোতির জালে জড়িয়ে লো সই
রং মহালের মিনার ঘিরে জয়োল্লাসে হাসে !
(আবু জাফর[১], ১৯৭১ : ৩১-৩২)

গ) নজরুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত উক্ত রুবাই :

রাতের আঁচল দীর্ণ ক'রে আসলো শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী! সকাল বেলায় খোঁয়ারী ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৮৪ : ২৯৩)

ঘ) সিকান্দার আবু জাফর কর্তৃক অনূদিত উক্ত রুবাই :

রাতের ধনুতে প্রভাত ছুঁড়েছে রক্ত-আলোর তীর
আকাশ-বাসরে কৌতুকরত তারকারা অস্থির
কুণ্ঠায় লাজে পলাতক সবে সুদূর দিক্-বিদিকে,
থেমে গেছে তাই সুখ-প্রমত্ত নিশীথের মঞ্জীর।
শাহান শাহের মিনারশীর্ষ ধৌত আলোর নীরে
সূর্যশিকারী মুখর-কণ্ঠ পূব-দিগন্ত তীরে,
পাখী ডেকে বলে : সময় হয়েছে জেগে ওঠো মধুমুখী
আলোর কাজলে দু'চোখে তোমার ঢেকে দাও সুপ্তিরে।
(আবু জাফর[১], ১৯৭১ : ৪৩)

ঙ) ফিট্জেরাল্ড কর্তৃক অনূদিত উক্ত রুবাই :

Awake! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the stone that puts the Stars to Fight;
And Lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's Turret in a Noose of Light.
(উদ্ধৃত, আবু জাফর[১], ১৯৭১ : ৩১)

৪

ফারসি ও আরবি ভাষায় পারদর্শিতা এবং অনুবাদকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নজরুল নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল এ সম্পর্কে এবং পবিত্র কুরআনুল কারিম অনুবাদপ্রয়াস ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে *কাব্য আমপারা*-এর ভূমিকায় বলেছেন :

> আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কোর-আন' শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারি নি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্তত পড়ে বুঝবার মতও আরবি-ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।
>
> কোর-আন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হত না-যদি আরবি ও বাঙলা ভাষায় আমার সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।
>
> ইসলাম ধর্মের মুলমন্ত্র-পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু–কোর-আন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা বাঙালি মুসলমানেরা-তা নিয়ে অন্ধভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন্ মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাষটুকু জানি ! আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগণ এই কোর-আন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন তা হলে বাঙালি মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন।

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৩৫)

যে কারণেই হোক, সমগ্র কোরআনুল কারিম তিনি অনুবাদ করেন নি। আমপারার বাইরে কোরআনুল কারিমের আর কোনো অংশের অনুবাদ তাঁর অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই। নজরুল চেয়েছিলেন, পবিত্র কোরআন শরিফের একটা শব্দও বাদ না দিয়ে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করতে। এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। এ সম্পর্কে নজরুল নিজেই স্বীকার করেছেন :

> আমি যতদুর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে– কেননা কোর-আন-পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৩৫)

এ স্বীকারোক্তির পর তাঁর অনুবাদে সর্বত্র সাবলীলতা খুঁজলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। অবশ্য মুলের প্রতি অত্যধিক আনুগত্য দেখাতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো নিজের অজান্তেই তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্যের পথ থেকে সরে গেছেন। তাঁর আক্ষরিক অনুবাদ কতোখানি সার্থক হয়েছে, তা বলা সম্ভব কেবল ভাষাবিদদের পক্ষে। সূরা আ'দিয়াত-এর নজরুল অনূদিত অংশটুকু যে নিতান্তই অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা যে কোনো পাঠকের কাছেই প্রতীয়মান হবে–

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।
বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর-বাহী উটের শপথ)
যাহার চরণ-আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কিবৎ।
প্রত্যূষে করে ধুলি উৎক্ষেপি'
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ,
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)।
শপথ তাদের-নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালনকর্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়ই, (নহে সে ভুল!)
আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার
কঠিন বিষয়াসক্তি তার,
সে কি তা জানে না, কবর হইতে

Dhaka University Institutional Repository

উঠানো হইবে সবে আবার ?
হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু
প্রকাশ করাব সব সেদিন,
জানিবে তাদের (সকল গোপন)
কথা–'রাব্বুল আলামিন'।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৪৫)

এ ধরনের আক্ষরিক অনুবাদ *কাব্য-আমপারা*-য় বেশি নেই। বরং দেখা যায়, গ্রন্থের ভূমিকায় মূলের প্রতি কঠোর আনুগত্যের অঙ্গীকার থাকলেও সে আনুগত্য প্রায় ক্ষেত্রেই শিথিল হয়ে গেছে এবং তার ফলে সর্বত্র প্রসাদগুণের আধিক্য না ঘটলেও অনুবাদ হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ আর অনুবাদকের লক্ষের অকৃত্রিম অনুসারী। কোরআন শরিফ বিশেষজ্ঞদের মতে, সমগ্র কোরআন শরিফের মর্মবাণী সুরা ফাতেহায় বিধৃত। মূলের প্রতি আনগত্য অটল রেখেও এ সূরাটির উক্ত গুণ যে ভাষান্তরিত করা সম্ভব, নজরুলের অনুবাদ তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ–

সুরা ফাতেহা
(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু !
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৩৩৯)

মূলের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ন রেখেও অনুবাদ যে কতোখানি সাবলীল করা যেতে পারে, তা আরো বোঝা যায় নজরুলের 'বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম'-এর অনুবাদ থেকে। *আমপারায়* সূরা আছে (ফাতেহা ছাড়া) সাঁইত্রিশটি। এ সূরাগুলোর জন্য নজরুল 'বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম'-এর অনুবাদ করেছেন ছত্রিশভাবে। অথচ কথাটির অর্থ এবং উদ্দেশ্য কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নি। অনুবাদ বিষয়ের অর্থের গভীর অনুধাবন ছাড়া যে এ ধরনের অনুবাদ সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কাব্য-আমপারা -য় নজরুল শুধু অনুবাদক নন, কিছুটা টিকাকারের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছেন। তাফসির বা টিকা-ভাষ্য ছাড়া কোরআন শরিফের কোনো অনুবাদই সম্পূর্ণ হতে পারে না। বস্তুত: অনেক অনুবাদেরই পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে কিছু না কিছু টিকা-ভাষ্যের ওপর। কোরআন শরিফের অনুবাদের সমালোচনার অবকাশ নেই, আছে শুধু ব্যাখ্যার। *কাব্য-আমপারা*-র 'শানে নুযুল' অংশে নজরুলের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীয়মাণ হয়, তা শুধু ভক্ত অনুবাদকের নয়, কৌতুহলী বোদ্ধারও। আমপারার সূরাগুলো সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্যাখ্যাই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে সংক্ষেপে সংযোজিত করেছেন। নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আরো বেশি পাওয়া যায় তাঁর প্রথম অনুবাদগ্রন্থ *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*-এ। হাফিজকে তিনি বলেছেন বন্ধু, তাঁর 'প্রিয়তম ইরানি কবি'। হাফিজের নামে প্রচলিত কোনো রচনাই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। নজরুল সত্যসন্ধী গবেষক। বিভিন্ন সুধীর দ্বারা সম্পাদিত *দিওয়ান* -এর পাঠ বিচার করে মোট তিয়াত্তরটি রুবাই গ্রহণ এবং অনুবাদ করেন।

নজরুল *কুরআন শরিফ* এবং *দিওয়ান-ই-হাফিজ*-এর অনুবাদ শুরু করেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু দুটি অনুবাদই অসমাপ্ত থেকে যায়। গজল এবং রুবাই মিলিয়ে হাফিজের মোট রচনার সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। নজরুল প্রথমে অনুবাদ আরম্ভ করেন গজলের। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটির অনুবাদের পর তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে হাত দেন রুবাইয়ের অনুবাদে। তবে *দিওয়ান*-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করার ইচ্ছে তিনি তখনও ছাড়েন নি। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*-এর মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'যদি সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করব! (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৮৪ : ১৫) কিন্তু, তিনি এ সময় আর পান নি।

নজরুল শিরাজের বুলবুল কবিকে শুধু হুবহু অনুবাদের মাধ্যমেই বাঙালি পাঠকদের আসরে উপস্থিত করেন নি। তাঁর বহু কবিতা আর গান হাফিজের অনুসরণে লিখিত রয়েছে। এসব রচনায় তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই হাফিজের প্রথম পঙক্তির ভাবানুবাদ দেন, কিন্তু তাঁর রচনার পরবর্তী অংশে হাফিজের মূল বক্তব্য বা বিষয় আর অনুসৃত হয় নি। *বিষের বাঁশি*-র 'বোধন' শীর্ষক গানটি এ ধরনেরই রচনা। তিনি এই গানটিকে বলেছেন 'হাফিজের

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور

ইউসুফ গুম গাশতে বা'জ অয়াদ বে কেনয়া'ন ক্বাম মাখুর

(হাফিজ সিরাজী[১], ১৩৬২ ফারসি সন : ১৫২)

'যূসোফে গুম গশ্‌তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিনআন্ গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবছায়া।' (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ১০৩)

কিন্তু *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*-এ নজরুল যথাসাধ্য মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলেছেন। হাফিজের অনেক অনুবাদকের মতো তাঁর অনুবাদের রুবাইয়ের আঙ্গিক পুরোপুরি অনূদিত হয় নি। রুবাইয়ের তৃতীয় চরণগুলো একটানা না রেখে তিনি ভেঙে ছোটো ছোটো এক-এক জোড়া পঙক্তিতে পরিণত করেন। এর ফলে তাঁর হাতে রুবাইগুলো অনেকটা বাংলা কবিতার রূপ পায়। তবে, তৃতীয় পঙক্তির সাথে তিনি কোথাও অন্যান্য পঙক্তির মিল দেন নি।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ - এর অনুবাদে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। *কাব্য-আমপারা* - এর অনুবাদে মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধন ই ছিলো তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু হাফিজের অনুবাদক নজরুল এক দিকে ভক্ত পাঠক, অন্যদিকে সুরজ্ঞ রসিক। ইরানের কাব্য লক্ষ্মী তাই আপন দেশের পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেও বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছেন বহু পরিচিতির বেশে। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*- নং-১ এর নজরুলকৃত অনুবাদ :

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা ॥

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১৯)

উপরোক্ত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মূল রুবাই:

جز نـقـش تو در نـظر نیامد ما را　　جز کوی تو رهـگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت　　حـقا کـه بـه چشم در نیامد ما را

(হাফিজ সিরাজী[৯], ১৩৬২ ফারসি সন : ৩৩৬)

জুয নাকশে তু দার নাযার নাইয়'মাদ ম'র'
জুয কুভি তু রাহগুজার নাইয়'মাদ ম'র'
খ'ব আরচেহ খুশ অমাদ হামে র' দার আ'হদাত
হাক্ব' কে বে চাশ্‌ম দার নাইয়'মাদ ম'র'

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নজরুলের সাহিত্যজীবনের ওপর করুণ যবনিকা পাতের পরে। এ গ্রন্থে তিনি ফারসি রুবাইয়ের অনুবাদে সরাসরি আশ্রয় নেন মূল আঙ্গিকের। এর আগে আর কোনো অনুবাদে রুবাইয়ের আঙ্গিক পুরোপুরি অনুসৃত হয় নি। নজরুল *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মখবন্ধে বলেছেন,

> হাফিজকে আমরা– কাব্য-রস-পিপাসুর দল– কবি ব'লেই সম্মান করি, কবি রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফি-দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খৈয়ামের দর্শন প্রায় এক। এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১৬-১৭)

এ ছাড়া ওমর খৈয়াম সম্পর্কে নজরুলের আর কোনো মতামতই জানা যায় না। তবে, তাঁর উক্ত বক্তব্যটি থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, ওমর খৈয়ামের অনুবাদেও তিনি হাত দিয়েছিলেন রসপিপাসু মন নিয়ে। হাফিজ, খৈয়াম এবং তাঁদের গোত্রের অন্যন্য ইরানি কবির রোমান্টিক বিদ্রোহ তাঁর মনে গভীর ছায়া ফেলে। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* - এর মতো খৈয়ামের অনুবাদের এ মন মাঝে মাঝে কাব্যের বিদ্যুৎপ্রভা সৃষ্টি করেছে। ওমর খৈয়াম বলেছেন :

آن قصر که جمشید در او جام گرفت　　آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر　　دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

অন কাস্‌র কে জামশিদ দার উ জা'ম গেরেপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

অহ্ বাচ্চে কার্‌দ ভ রুবেহ্ অরা'ম গেরেপ্ত

বাহরা'ম কে গুর মী গেরেপ্তী হামে উম্‌র

দীদী কে চেগুনেহ গুর বাহরা'ম গেরেপ্ত

(ওমর খৈয়াম[১০], হাকিম, EQBAL, পৃ. ৪০, রুবাই নং-৬)

নজরুল বলেছেন :

এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৮৪ : ৩১১)

হাফেজের ন্যায় ওমর খৈয়ামের কাব্যের মৌলিকতা-প্রক্ষিপ্ততার বিচারেও নজরুল অগ্রসর হয়েছিলেন। ওমর খৈয়ামের নামে বহু রুবাই প্রচলিত আছে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, অনেক রুবাই-ই প্রক্ষিপ্ত। এক সঙ্গে সব রুবাইয়ের অনুবাদ দুই-একটি গ্রন্থে ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। যাঁর অনুবাদের মাধ্যমে ওমর খৈয়ামের রুবাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই ফিট্‌জিরাল্ডের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে আমরা পাই পঁচাত্তরটি রুবাইয়ের অনুবাদ। নয় বৎসর পর, ১৮৬৮ সালে, তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি আরো পঁয়ত্রিশটি রুবাইয়ের অনুবাদ সংযোজিত করেন।

৫

অনুবাদের জন্য রুবাই নির্বাচনের সময় ফিট্‌জিরাল্ডের মাপকাঠি ছিলো নিজের রুচি। নজরুল পল্টনে সৈনিক জীবনে ফারসির প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যই পাঠ করেন। ওমর খৈয়ামের নামে প্রচলিত রুবাইগুলো নিশ্চয়ই তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিলো না। কিন্তু তাঁর অনুবাদে সংকলিত হয়েছে মাত্র একশো সাতানব্বইটি রুবাই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিট্‌জিরাল্ডের ন্যায় তিনিও নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য সময় ও ধৈর্যের অভাবেই যে তিনি ওমর খৈয়ামের নামে প্রচলিত সব রুবাইয়ের অনুবাদ করেন নি, সেটাও ধারণা করা যেতে পারে।

কাব্য-আমপারা, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এবং *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* - এর বাইরেও নজরুলের কিছু অনুবাদকর্ম রয়েছে। এগুলো ঠিক প্রত্যক্ষ অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বা ভাবানুসরণ। উক্ত ভাবানুবাদ বা ভাবানুসরণগুলো নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকের কাজ।

উপরিউক্ত ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণগুলোর সবই অবশ্য ফারসি রচনার নয়। সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি কিছু ইংরেজি রচনারও ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণ করেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'অগ্রপথিক' কবিতাটি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Pioneer, O Pioneer' শীর্ষক কবিতার প্রায় হুবহু ভাবানুবাদ। নজরুলের *অগ্র-পথিক* কবিতাংশ :

অগ্র-পথিক হে সেনাদল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ।
রৌদ্রদগ্ধ মাটি মাখা শোন্ ভাইরা মোর,

Dhaka University Institutional Repository

বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর !
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান্ রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ !
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল ?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪৫০)

পুবের হাওয়া-র অন্তর্ভুক্ত 'বিরহ-বিধুরা' শীর্ষক কবিতাটি যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন নজরুল জানান, 'পুশতো ভাষার খ্যাতনামা কবি খুশহাল খান খটকের হিন্দুস্থানে নির্বাসনকালে তাঁর সহধর্মিনীর লিখিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।' (উদ্ধৃত, রহমান[১], ১৯৯৪ : ৯১) ভাবানুসরণের সময় তাঁর অবলম্বন কোন্ ভাষা ছিলো তা বলা সম্ভব নয়। নজরুলের বিরহ-বিধুরা কবিতার অংশবিশেষ :

কার তরে ? ছাই এ-পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখ্বো না ;
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখ্বো না।
লাল-রঙিলা কর্বো না কর মেহ্দী-হেনার ছাপ্ ঘ'ষে,
গুল্ফ চুমি' কাঁদ্বে গো কেশ চিরুণ-চুমার আফ্সোসে !
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২২৯)

ফারসি রচনার ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণগুলোর মধ্যে ছিলো জালালউদ্দীন রুমীর একটি রচনার ভাব অবলম্বনে লিখিত 'বাঁশির ব্যাথা' এবং হাফিজের কিছু গজলের ভাবানুবাদ আর ভাবানুসরণ। নজরুলের 'বাঁশির ব্যথা' মাওলানা রুমী অবলম্বনে ২৯২০ সালে কার্তিক, ১৩২৭ 'বঙ্গনুরে' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি হল :

শোন্ দেখি মন বাঁশের বুক ব্যেপে কি উঠচে সুর,
সুর ত নয় ও, কাঁদচে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ-বিধুর
কোন্ অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে।
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুম্রে তায়,
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচিন-প্রিয়ায় চুম্তে চায়।
প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
উড়চে সুরের বিচ্ছেদে।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫০৫)

মূল কবি রুমীর কারণেই, উড়চে, কাদ্চে, প্রভৃতি বানান পদ্ধতিও রাবীন্দ্রিক। ইতোপূর্বে কবি এরকম বানান আর লেখেন নি। কিন্তু এরই মধ্যে নজরুলি কৌশলও দেখা দিয়েছে। দেহ বাঁশির মতো যৌগিক শব্দ, রূপক শব্দ নজরুলের নিজস্ব-রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে রূপকের চেয়ে প্রতীকের প্রাধান্য অনেক বেশি। 'বাশের বাশির বুক ব্যেপে'-ও অনুপ্রাস, দেহ বাঁশি ও অচিন-প্রিয়ার মত যৌগিক শব্দ, 'গুমরে তার চুমতে চায়' ও ইচ্ছে যে বিচ্ছেদে-র মতো অভিনব মিল-নজরুলি শিল্পকুশলতার মুদ্রায় চিহ্নিত ও ভরপর।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল হাফিজের অন্ততঃ এগারোটি গজলের ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণ করেন। এগুলোর মধ্যে দুটি হলো 'বোধন' ও 'আশায়'। বাকি নয়টি ক্ষেত্রে নজরুল মূল রচনার ভাব মোটামুটি হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখেন এবং সম্পূর্ণ রচনারই ভাবানুবাদ করেন। দুটি ক্ষেত্রে আমরা মূল রচনার ছন্দের উল্লেখও পাই। নজরুলের একটি গজলের প্রথম ছয় শ্লোক :

জাগো সাকি হাম্‌দরদী, জাম-বাটিতে দাও শরাব,
চুলোয় যাক এই দুঃখ-ব্যথা, ধুলোয় ঢাকুক সব অভাব !–১

ভর্-পিয়ালা দস্তে দে দোস্ত, মস্ত হয়ে বুঁদ সেই নেশায়,
দিই ফেলে এই শির হতে ঐ সুনীল আকাশ-গাঁঠ্‌রিটায় !–২

ভয় কি সখি ? করবে নিন্দা শাস্ত্র-শকুন বন্ধুরা ?
বদ্‌নামে মোর পরোয়া থোড়াই ! চালাও পান্সি, দাও সুরা !–৩

নেশার দারু জরুরি ভাই, খোদ্‌-দেমাকির নাশ্‌তে জাত,
ঢালো শরাব, আত্ম ভোলাও, চেতন আমার হোক নিপাত !–৪

দহন-দারুন দিল্‌ ছেপে মোর উঠ্‌ছে সে শ্বাস বহ্নি-শিশ,
কতই কাঁচা শুষ্ক হৃদয় পুড়ছে তাতে অহর্নিশ !–৫

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফির্‌নু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁরে দিল্‌-দরদী বন্ধু নাই।–৬

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৫৩৬)

খুশহাল খান খটক-পত্নীর রচনার অনুসরণে লিখিত 'বিরহ-বিধুরা' ওপরের ভাবানুবাদের তুলনায় অনেক উন্নত এবং সুখপাঠ্য। হয়তো এ কারণে যে, এতে মূল রচনার প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত শিথিল। চৌদ্দ চরণে সমাপ্ত এই কবিতাটি প্রথমে মোসলেম ভারত এ প্রকাশিত এবং পরে 'পূবের হাওয়া'য় অন্তর্ভূক্ত হয়। কবিতাটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক,-

কপোল-শয়ান অলক-শিশুর উদাস ঘুম আর ভাঙবে না ;
চুম-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না !
কার তরে ফুল-শয্যা বাসর, সজ্জা নিয়েই লজ্জা পায় ;
পীতম্‌ আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা, হায় !

চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেম্‌নি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন্‌-স্মৃতির দাগ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরীন জীবন,– হায় কপাল !
পীতম-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ-সকাল।

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২২৯)

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের জীবন উপভোগের আগ্রহ ও প্রেমতৃষ্ণাই নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষন করেছিল। তিনি হাফিজের কাব্যে বাংলাদেশের যৌবন প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নজরুল লিখেছেন :

> ... পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দুর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদুগন্ধের সন্ধান পেয়েছি সে সবই তো খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙ্গালীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কেতায় আজকের সদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম আমার ভাষায়, আমার আপন জন বাঙালিকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দুর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি-না। তবু বাঙ্গালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[২], ১৯৯৭ : ২৩২)

নজরুল যেসব ইংরেজি রচনার ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণ করেন, সেগুলোর মধ্যে *অগ্রপথিক* ছাড়াও রয়েছে অন্ত তঃ চারটি রচনা। এগুলোর মধ্যে একটি কবিতা এবং তিনটি প্রবন্ধ। কবিতাটি 'ফণি-মনসা'-য় সংকলিত হয়েছে। গদ্য ভাবানুবাদ-ভাবানুসরণগুলোর মধ্যে রয়েছে *জননীদের প্রতি*, *পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব* আর *জীবন-বিজ্ঞান*। *জননীদের প্রতি* ছেলেমেয়েদের হাঁটানো সংক্রান্ত প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন :

> খোকা-খুকিদের হাঁটতে দেখা বাপ-মায়ের বড্ডো বেশি আনন্দদায়ক। তাই তাঁরা যত শিগ্‌গির পারেন খোকা-খুকিদের হাঁটা শেখানোর জন্য যেন উঠে পড়ে লেগে যান ; আমি অনেক ঘরে দেখেছি যে, ছেলের মা তার প্রতিভু স্বরূপ অন্য দুটি ছেলের দ্বারা তাঁর খোকাকে হাঁটা শেখানোর ভার দিয়েছেন ; আর ছেলে দুটিও খোকার দু' ডানায় ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে এক রকম হাওয়ার মতই বেগে চালাতে চেষ্টা করছে ; শিশুর এতে ঘোর কষ্টকর আপত্তি থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য না করে দস্তুরমত নিজেদের কর্তব্য করে যায়। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৫)

পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন :

> ঘোড়ার ভুরু হয় না। (তাই বলে কই তাকে ত বিশ্রী দেখায় না!) রোমন্থনকারী জন্তু মাত্রেরই ক্ষুর বিভক্ত। (কিন্তু সাহিত্য-রোমন্থনকারী প্রাণীগুলির আদতে ক্ষুর হয় না ! এটা বুঝি ব্যতিক্রম !) তিমি মৎস্যের দাঁত বিলকুল নদারদ্ (ছেলেবেলায় কিন্তু শুনেছি যে কাছিমে আর ব্যাংএ একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না!) (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৬)

আর *জীবন-বিজ্ঞান* (দুঃখ-কষ্টের মহত্ব) শীর্ষক প্রবন্ধের শুরুতে নজরুল লিখেছেন :

> আগুন যেমন ধাতুকে পুড়িয়ে খাঁটি করে ; দুঃখও তেমনি আত্মাকে একেবারে আয়নার মত সাফ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে মনের সব কষ্টই দুঃখ নামে অভিহিত হতে পারে না। মোটামুটি দেখতে গেলে দুঃখ দু' রকমের। একটি হচ্ছে নিজের কষ্টের জন্য দুঃখ পাওয়া,–অন্যটি হচ্ছে অন্যের কষ্টে দুঃখ অনুভব করা। এই দুই দুঃখই কষ্ট দেয় ; কিন্তু তারা এক রকমের নয়। (নজরুল ইসলাম[৬], ১৯৯৩ : ৭)

নজরুলের সমগ্র অনুবাদকর্মই কাব্যমুখী, ব্যতিক্রম কেবল এই তিনটি প্রবন্ধ। নজরুলের অনুবাদগুলো প্রকাশিত হয় তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে, ১৯২০ সালে। যখন তিনি অনুবাদক হিসেবে রীতিমত সক্রিয়। আব্দুল কাদির এই প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে লিখেছেন, 'এগুলো যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন বন্ধনীর মধ্যে লেখা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো- 'Englishman Magagine Section হইতে'। এ লেখাগুলির ভাষাসৌকর্য দেখে মনে হয়, ইংরেজি মালমশলা অবলম্বনে লেখা হলেও এগুলি হুবহু অনুবাদ নয়। তবু নজরুলের অনুবাদ-কার্যের খতিয়ান লিখতে গেলে এগুলিরও উল্লেখ আবশ্যক।' (উদ্ধৃত, রহমান[৭], ১৯৯৪ : ৯৪)

যেহেতু নজরুলের প্রায় সব অনুবাদ-ভাবানুবাদই ফারসি-আরবি থেকে, তাই অনুবাদক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন সেগুলোর ওপরই নির্ভর করে এবং সেই মূল্যায়নে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে– তাঁর ফারসি-আরবি জ্ঞান, মূলের প্রতি আনুগত্য, কাব্যিক রসবোধ এবং বিশ্লেষণী আর গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনুবাদক হিসেবে কতোখানি মর্যাদা দিয়েছে ? জনপ্রিয়তা দিয়ে সব সময় কোনো সাহিত্যকর্মের সাফল্য-অসাফল্যের সঠিক পরিমাপ করা চলে না। তবু, নজরুলের অনুবাদগুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, এগুলো কোনো দিনই তাঁর মৌলিক রচনার মতো জনপ্রিয় হয় নি এবং এর মূলে রয়েছে মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদ-ভাবানুবাদের অপকৃষ্টতা। অনুবাদগুলো বাজারে চালু আছে, সত্যি। কিন্তু পাঠক সমাজ এগুলোর প্রতি প্রায় ক্ষেত্রেই উদাসীন। অথচ তাঁর গদ্য রচনাগুলোও যথেষ্ট কৌতুহল সৃষ্টি করে। এমনকি, বহু পাঠকের সেগুলো অতি প্রিয় বস্তু। অন্যদিকে, ফিট্‌জিরাল্ড, কান্তি চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কবিগণের অনুবাদ আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। মূলের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে নজরুলের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই নীরস হয়ে গেছে। আবার, তাঁর অনুবাদগুলোতে তিনি নির্বিচারে এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেন, যার ফলে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। যেমন নজরুল অনূদিত ৫১ নং রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম থেকে একটি উদ্ধৃতি :

একমণী ঐ মদের জালা গিলব, যদি পাই তাকে,
যে জালাতে প্রাণের জ্বালা নেভাবার ওষুধ থাকে !
পুরানো ঐ যুক্তি-তর্কে দিয়ে আমি তিন তালাক,
নতুন ক'রে করব নিকাহ্ আঙুর-লতার কন্যাকে।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৮৪ : ৩০৩)

নজরুল নিজেই তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন,

> ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিট্‌জেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার এ অনুবাদে। যদি না শোনায়, সে আমার শক্তির অভাব-সাধনার অভাব, কেননা কাব্য-লোকের গুলিস্তান থেকে সঙ্গীত-লোকের রাগিণী-দ্বীপে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। সঙ্গীত-লক্ষ্মী কাব্য-লক্ষ্মী দুই বোন ব'লেই বুঝি ওদের মধ্যেই এত রেষারেষি। একজনকে পেয়ে গেলে আরেক জন বাপের বাড়ী চলে' যান। দুই জনকে খুশী ক'রে রাখার মতো শক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই, শক্তিও নেই। কাজেই, আমার অক্ষমতার দরুন কেউ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে' না যান।'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৮৪ : ২৯১)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আবু জাফর, সিকান্‌দার: অনুবাদক, *রুবাইয়াৎ*, ওমর খৈয়াম, বাঙলা একাডেমী বর্ধমান হাউস: ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ: চৈত্র-১৩৭৭/ এপ্রিল-১৯৭১।

২. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার: *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জপাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৫. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৬. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

৭. রহমান, আতোয়ার, *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল: ফালগুন, ১৪০০/ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।

৮. সাত্তার, আবদুস: *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ*, প্রকাশনায়- নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, প্রকাশকাল- ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

৯. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ: *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫,

১০. ওমর খৈয়াম, হাকিম, Rubaiyat of Omar Khayyam, Printed by Eghbal Printing and Publishing Organization 15 Booshehr Street, Dr Shariati Avenue, (EQBAL) Tehran, Iran, Preface by Edward FitzGerald, প্রকাশনার তারিখ উল্লেখ নেই, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ইরানের আধ্যাত্মিক ও প্রেমিক কবি হাফিজ আদর্শছোয়া ব্যাক্তিত্বের মূর্ত প্রতীক, প্রজ্বলিত শিখা, সাহিত্য সংগ্রামী চেতনার সরব অভিব্যক্তি। বিশ্বের বুকে বিশেষকরে বাংলার ভূখণ্ডে এমন কোন সাহিত্য প্রেমিক নেই যিনি নজরুল ও হাফিজকে না জানেন। এ দুই কবির মধ্যে সাহিত্যের আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। এ দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় ফারসি ভাষা প্রচলনের প্রেক্ষিতে হাফিজ ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হিসেবে তাঁর সমকালেই বাংলায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। হাফিজকে বাংলায় ঐশ্বর্য সম্পদে রূপান্তর করেন নজরুল। আধ্যাত্মিক চেতনায় বলিয়ান মহাকবি হাফিজ তাঁর ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিচরিত্র, ব্যতিক্রমধর্মী সাহিত্য রচনায় দুনিয়া জোড়া সমগ্র সাহিত্যিকগণের পরীক্ষিত বন্ধু। নজরুল তাঁর অধিকাংশ রচনায় বিশেষকরে হাফিজের গজল ও রুবাইয়ের অনুবাদে মূলকাব্যের ভাব ও গতি বজায় রাখতে এবং সে সঙ্গে তার সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

নজরুল অষ্টমশ্রেণির ছাত্রাবস্থায় ফারসি সাহিত্যের বড় বড় কবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন-নিবারণ চন্দ্র ঘটক, হাফিজ নূরন্নবী আর কাঞ্জিলাল। নিবারণ চন্দ্র ঘটক নজরুলকে বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী শোনাতেন। নিবারণ ঘটক থেকে নজরুল জানেন, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। হাফিজ নূরন্নবী ফারসির শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে নজরুল শোনেন ইরানের কবি হাফিজ, ওমর খৈয়াম, রুমী, শেখ সা'দী, হাফিজের দীওয়ান, রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে।

১

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন তখন বাঙালি পল্টনের একজন পাঞ্জাবি মৌলবীর মুখে *দিওয়ান-ই-হাফিজ*-এর কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হন। পর্যায়ক্রমে তিনি সে মৌলবীর কাছে ফারসি কবিদের অনেক বিখ্যাত কাব্য পড়ে ফেলেন। ১৯১৭-১৯২০ সময়কালের মধ্যে নজরুলের সৈনিক জীবনের শুরু ও সমাপ্তি। অনেকের ধারণা 'অসির চাইতে মসী শক্তিশালী' জেনেও কবি এ সৈনিক জীবনে কলম ছেড়ে তলোয়ার ধরেছিলেন। অথচ আমরা দেখতে পাই এ সৈনিক জীবনে কবি ফারসি সাহিত্যের এক বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেন। কয়েক বৎসর পর তিনি হাফিজের গজল অনুবাদ আরম্ভ করেন। সে সময়ে তিনি নিজের কবিত্ব শক্তির বিষয়ে যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন না বলে হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ করতে সাহস করেন নি। পরে তিনি তাঁর পুত্র বুলবুলের মৃত্যু শিয়রে বসে ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ শেষ করেন। নজরুল রুবাইয়াতে হাফিজের মুখবন্ধে বলেন :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়– গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না,

Dhaka University Institutional Repository

> এবং ঐখানেই ওর ইতি হ'য়ে গেল। তারপর এস. সি. চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে! (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

প্রথমদিকে হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজলের অনুবাদ করে নজরুল এ কাজ থেকে বিরত হন। এ অনুবাদগুলো *প্রবাসী, মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা, কল্লোল* প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি হাফিজের ভাব ও রূপ অবলম্বনে বহু গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন।

২

কৃষ্ণনগরে অর্থকষ্ট এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্য নজরুল ১৯২৯ সালের গোড়ারদিকে কলকাতায় চলে আসেন। নজরুল প্রথমে ১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রিটের *সওগাত* অফিসের নিচ তলায় ওঠেন। তারপর এন্টালি অঞ্চলে পানবাগান লেনের একটি বাড়িতে ওঠেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে উত্তর কলকাতার কয়েক জায়গায় বাসা বদল করে অবশেষে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের একটি ছোট বাড়িতে ওঠেন। এ বাড়িতে নজরুলের চার বছরের প্রিয় শিশু সন্তান বুলবুল গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। বুলবুলের রোগ শয্যার পাশে বসে কবি নজরুল বিখ্যাত পারস্যের অমর কবি হাফিজের *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* নামক কাব্য গ্রন্থটি *বুলবুল-ই-সিরাজ* নামে অনুবাদ শুরু করেন। বসন্ত রোগি বুলবুলের চিকিৎসার জন্য খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে এক সাধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন নজরুল। এদিকে ১৩৩৭ সালের (১৯৩০ খ্রি.) ২৪ বৈশাখে তাঁর চার বছরের প্রিয় শিশু বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। সাধুকে না পেয়ে খান মঈনুদ্দীন ফিরে আসেন। বুলবুলকে হারিয়ে কবি নজরুল গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর *যুগস্রষ্টা নজরুল* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন:

> ... রাত তখন সাড়ে আট কি নয়টা হবে। আমাদের সাড়া পেয়ে কবি ওপর থেকে ছুটে নিচে নেমে এলেন। আর বুক জড়িয়ে ধরেই হু হু করে কেঁদে ফেললেন। ... সাধু কি এলোনা, সাধু কি মরা দেহে প্রাণ দিতে পারবে, বলে তিনি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর এমন অতর্কিত আক্রমণে, আর এই এলোমেলো কথায় হক চকিয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বার হলোনা! শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলাম। ঘর ভরা গিজ গিজ করছে লোক। কবি বার বার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন আর ঐ কথার পুনরুক্তি করতে লাগলেন।
>
> ঘরে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বোধ হয় আমার বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পারলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন : মিনিট দশেক আগে বুলবুল মারা গেছে। আছাড় খেয়ে কবির বুকের উপর পড়লাম। ... নজরুল বললেন : 'বাবা আমার খালি 'ভো-গাড়ীতে চড়তে চাইতো। ওকে কি মোটরে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না?' ... বহু চেষ্টার পর একজন শিখ ড্রাইভারের গাড়ী পাওয়া গেলো। তবে তাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে। ... কিন্তু টাকা ? আর্য পাবলিশিং হাউস, ডি.এম. লাইব্রেরী অনেক জায়গায়ই লোক পাঠানো হয়েছিল টাকার জন্য। শুধু ট্যাক্সী ভাড়াই তো নয়। কাফন আছে, গোর-খোদাই আছে, তারপর জমি কিনে কবরের স্থান রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে-প্রায় দেড়শো টাকার দরকার। সে যুগে দেড়শো টাকা তো অনেক। ... যে লোক টাকার জন্য গিয়েছিল, ফিরে এসে খবর দিলো, কোথাও টাকা পাওয়া গেলো না। আবার ডি.এম. লাইব্রেরীতে তাকে পাঠানো হলো। এরপর সম্ভবত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়ে ডি.এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী গোপাল দাশ মজুমদার মহাশয় নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। তবু অনেক টাকা বাকী রয়ে গেলো। (মঈনুদ্দীন[১০], ১৯৯৬ : ১২৩-১২৪)

অত্যন্ত দুঃসময়ে বুলবুলের মৃত্যুশয্যায় বসে কবি *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* -এর অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তাই কবি যথার্থই বলেছেন, যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের শবযান চলে গেল, সে পথ দিয়েই এলেন তাঁর প্রিয়তম ইরানি

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিজ। নজরুল বুলবুলের নামেই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৩০ সালেই বইটি আত্মপ্রকাশ করে। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* অনুবাদ কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন :

> বাবা বুল্‌বুল্! তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে 'বুল্‌বুল্-ই-শিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি -আমার কাননের বুল্‌বুলি-উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর ? জানি না তুমি কোথায়! যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ করো। তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুল্‌বুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুলবে। শিরাজি- বুল্‌বুল্-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি,-
>
> সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
> মানাত না বুকে রে যার,
> পাথর চাপা দিল বিধি
> হায়, কবরের শিথানে তার।
> (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৩)

একদিকে বুলবুল-ই-সিরাজ হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ শেষ হল অন্যদিকে নজরুল-কাননের বুলবুলি উড়ে গেল, নজরুল- পুত্র বুলবুল চলে গেল। বুলবুলকে কবর দিয়ে ফিরে এলেন সবাই। বুলবুলের বিছানার পাশে হঠাৎ পাওয়া গেল হাফিজের অনুসরণে লেখা 'সোনার তাবিজ রূপার সেলেট' কবিতাটি।

হাফিজ তাঁর বুলবুল নামক এক সন্তানকে হারিয়ে নিম্নের ১৭ নং 'মুকাত্তা'টি লিখেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর চারবছরের প্রিয় পুত্র বুলবুলকে হারিয়েও উক্ত **مقطع** (মুকাত্তা) টি অনুবাদের মাধ্যমে হাফিজের বেদনাতে নিজের ব্যথা-বেদনা ব্যক্ত করেছেন। 'মুকাত্তা'টির উপরে লেখা ছিল **مرگ فرزند** (মারগে ফারযান্দ)। নজরুলের 'সোনার তাবিজ রূপার সেলেট' কবিতাটির মূল **مقطع** 'মুকাত্তা'টি হাফিজের ভাষায় :

مرگ فرزند

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند	چه دید اندر خم این طاق رنگین
به جای لوح سیمین در کنارش	فلک بر سر نهادش لوح سنگین

মারগে ফারজান্দ

দেলা' দীদী কে অন ফারজা'নে ফারযান্দ	চে দীদ আনদার খামে ইন তা'কে রাঙ্গীন
বে জায়ে লৌহে সীমীন দার কেনা'রেশ	ফালাক বার সার নেহা'দেশ লৌহে সাঙ্গীন

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৩৩১)

নজরুলের ভাষায় :

ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস্-
পুত্র আমার আমার কোলে,
কি পেয়েছে এই সে রঙিন

Dhaka University Institutional Repository

গগন-চন্দ্রাতপের তলে।

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের শিথানে তার!

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩-৪৪)

নজরুল পুত্র বুলবুলের বুকে সোনার তাবিজ ও রূপার সেলেট মানাত না। অথচ সেদিন তার কবরের শিয়রে তার বুকে সৃষ্টিকর্তা পাথর চাপা দিলেন। বুলবুলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন নজরুল। দিশেহারা কবি ঝুঁকে পড়েন যোগ-সাধনা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা, সাস্ত্রীয় ও শ্যামা সংগীতের দিকে। যোগ-সাধনার মাধ্যমে তিনি মৃত বুলবুলকে শুধু একবারের জন্য হলেও সশরীরে দেখতে চেয়েছিলেন। এ অতিরিক্ত যোগ-সাধনাই একযুগ পর তাঁর নীরবতা ও অসুস্থতার পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি দুঃখ করে আরও লিখেছেন :

> আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলায় আমন্ত্রণ ক'রে আনলাম। বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহবান উপেক্ষিত হয় নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা" (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানি কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল...। (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

বুলবুলের স্মরণে নজরুলের গান :

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি
ফুল ফুটিয়ে ভোরবেলা কে গান গেয়ে
নীরব হলো কোন নিষাদের বান খেয়ে
বনের কোলে বিলাপ করে সন্ধ্যা রানী চুল খুলি।

(উদ্ধৃত, রাজীব হুমায়ুন[১২], ২০০১ : ৩৪)

উপরোক্ত কবিতায় নজরুলের গানের বুলবুলি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সে দৃশ্য করুণ চোখে দেখছে সাঁঝের ঝরা ফুলসমূহ, তাঁর এ বুলবুল ভোরবেলায় গান গেয়ে ফুল ফোটাত- কোন শিকারির তীরের আঘাতে সে নীরব হয়ে গেল। বনের কোলে সন্ধ্যা-রানি এখন বিলাপ করছে তার কালো চুল খুলে।

নজরুল স্বীয় পুত্র বুলবুলকে স্মরণ করে *বুলবুল* কাব্যসমগ্রে বহুগান রচনা করেছেন। অন্য একটি গানেও নজরুল নীরব বুলবুলির ইমেজ ব্যবহার করেছিলেন। এ গানেও বিলাপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এ গানটিও বুলবুলের শোকে শোকার্ত পিতার করুণ অনুভূতির শিল্পরূপ বলেই মনে হয় :

বুলবুলি নীরব নার্গিস-বসে
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে ॥
শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ ইরান কবি কাঁদে নিরজনে ॥
উদাসীন আকাশ থির হয়ে আছে
জল-ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে।
সাকীর শারাবের পিয়ালার 'পরে
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে
চেয়ে' আছে ভাঙা চাঁদ মলিন আননে ॥
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৫ : ১২৭)

নজরুল স্বীয় জীবনের ট্র্যাজেডিপূর্ণ সময়ে *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* অনুবাদ শেষ করেন। বুলবুলের বয়স তখন ছিল তিন বছর আট মাস। তাঁর পরবর্তী পুত্র সানি বাসব্যসাচীর বয়স তখন প্রায় এক বছর পাঁচ মাস। বুলবুল তার মিষ্টি গানের গলা, ডাগর চোখ, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও শিশুমাধুর্যে নজরুলের পিতৃহৃদয় পূর্ণ করে রেখেছিল। তিনি এমন সময় এ শিশু বুলবুলের রোগ শয্যার পাশে বসে হাফিজ অনুবাদ করেন যখন লাবণ্যময় শিশুদেহটি তাঁর চোখের সামনেই নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায়। বসন্ত রোগে মৃত শিশুটিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার বাহন সংগ্রহের দুর্ভোগ, কাফনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, কবরস্থানের জমি সংগ্রহের বিড়ম্বনা ইত্যাদি বুকভাঙ্গা পিতৃকৃত্য শেষ করে নজরুল লেখেন *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর ভূমিকা। এই মৃত্যু নজরুলকে ভীষণ শোকার্ত করে তোলে। পুত্র বুলবুলকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে লিখেছেন, 'যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে! যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা' (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানি কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল...।' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

নজরুল দুঃখ করে অপর এক কবিতায় বলেছেন,

তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুলবুলি।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম ॥

ঘুমায়ে পড়েছে সবে, মোর ঘুম নাহি আসে,
তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিনো আমার পাশে,
সাজানো সে গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম ॥
আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা,
রোহিণী গিয়াছে চলি', চাঁদ কাঁদে একা একা,
কোন্ দূর তারালোকে কেমনে রয়েছ ভুলি'।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম ॥
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ১৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩

স্কুল জীবনে নজরুল হাফিজ ও বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজমশাহ সম্পর্কে একটি গল্প শুনেছিলেন যিনি অত্যন্ত হাফিজভক্ত ছিলেন। হাফিজের অনুসরণে সুলতান একটি কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু এক লাইনের বেশি লিখতে না পেরে তিনি ওই লাইনটি কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে হাফিজকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করেন। হাফিজ এতে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু পারস্য উপসাগরের কুলে এসে জাহাজে ওঠার আগেই ভীষণ ঝড় ওঠে। এ প্রসঙ্গে নজরুল হাফিজের একটি গজলের নিম্ন অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন :

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود　　وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود

شکرشکن شوند همه طوطیان هند　　زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

সাকি হাদিসে সার্ভ ভ গুল ভ লা'লে মিরাভাদ
বেইন বাহাস বা' সালা'সে গাচ্ছা'লে মিরাভাদ
শেকার শেকান্দ সাভান্দ হামে তুতিয়া'নে হিন্দ
জিন কান্দ পা'রসি কে বে বাঙ্গা'লে মিরাভাদ
হাফিজ যে সুকে মাজলেসে সুলতান গিয়াসদীন
গাফেল মাশো কে কা'রে তো আয না'লে মিরাভাদ

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ১২৯)

নজরুল লিখেছেন :

> বাঙলার কোনো শাসনকর্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ আসিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরের কূলে আসিয়া যখন তিনি জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সেই সময় ভীষণ ঝড় ওঠে। ইহাতে হাফিজ দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া আবার শিরাজে ফিরিয়া আসেন এবং বাঙলার শাসনকর্তার কাছে যে কবিতাটি পাঠাইয়া দেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ:
>
> 'আজকে পাঠাই বাঙলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
> এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টমাখা।
> দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
> এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।'
>
> (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫)

হাফিজ জীবিতাবস্থায়ও বাঙালির কাছে সম্মান পেয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণে হাফিজ বাংলায় আসার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। ১৮৩৬ সালের পুর্ব পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছর বাংলার রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। ফলে সে সময় সাহিত্য রসিকরা হাফিজের কবিতার রসাস্বাদন করতেন। ইরানে গোঁড়া মুসলমানরা

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজকে সহ্য করতে পারতেন না; হয়তো সে কারণেই 'আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ভারতবর্ষের জন্য হাফিজের কবিতা নিষিদ্ধ ছিল। নজরুল কর্তৃক হাফিজ অনুবাদের পূর্বেও হাফিজ বাংলার প্রিয় কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজের কবিতা উপাসনা সংগীত হিসেবে আস্বাদন করতেন। হাফিজের মর্মস্পর্শী প্রেমসুধাযুক্ত বহু কবিতার চরণ তাঁর মুখস্থ ছিল।

বাংলায় আসার জন্য তিনি প্রথমবার বন্দরে এসে জাহাজে উঠেছিলেন কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে সমুদ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়বার তিনি ঐ সময়ের বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যগত কারণে আসতে পারেন নি। সে বছরই তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা সাহিত্যে তখন কবি ছিলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কবিতাগুলোতে হাফিজের প্রভাব এবং সমচিন্তা লক্ষণীয়। নজরুল বলেছেন, হাফিজ পারস্য ছাড়িয়া আর কখনো কোথাও যান নাই। স্বদেশ এবং স্বপল্লীর প্রতি তাঁহার অণু-পরমাণুতে অপূর্ব মমতা সঞ্চিত ছিল। বহু কবিতায় তাঁহার বাস-পল্লী 'মোসল্লা' এবং 'রোক্‌নাবাদে'র খালের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫)

৪

নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* বাংলা ভাষায় বহুল প্রচারিত ও পঠিত একমাত্র সফল অনুবাদ কাব্য। এর 'মুখবন্ধে' নজরুল হাফিজের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনাসহ ভক্তি-স্তুতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে 'বুলবুল-ই-মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শিরোনামে কবি হাফিজের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করেন। পারস্যের এ মরমী কবি হাফিজকে জানার জন্য বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* একটি সংক্ষিপ্তাকারের পরিপূর্ণ গ্রন্থ। হাফিজের রুবাইয়াত ও তার অনুবাদ সম্পর্কে নজরুল তাঁর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* গ্রন্থের মুখবন্ধে নজরুল হাফিজ সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> সত্যকার হাফিজকে চিন্‌তে হলে তাঁর গজল- গান- প্রায় পঞ্চশতাধিক -পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে! এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হ'লেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মতো রাঙিয়ে তুলছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর। (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

হাফিজের সঙ্গে নজরুলের জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। এ কবিদ্বয় দারিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, পথের আলোতে সাহিত্যচর্চা করেছেন, দোকানে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেছেন, ছোট শিশুসন্তান হারিয়ে একই ব্যাথায় ব্যথিত হয়েছেন এবং পারস্যে হাফিজকে নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং এজন্য বহু দুর্ভোগও সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলায় নজরুলকেও এক সময় কাঠমোল্লার দল কাফের ফতোয়া দিয়েছিলো এবং এজন্য কবিকে নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিলো। এদেশে আজ নজরুলের হামদ, নাত ও গজল ছাড়া কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। হাফিজ ও নজরুলের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হলো, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সাধনার স্তর উত্তীর্ণের ফলেই জীবন দর্শনে বিশেষ অবস্থা তৈরি হওয়া। যা ঘটেছে হাফিজ ও নজরুলের ক্ষেত্রে এবং মূর্খরা না বুঝেই এই অমর কবিদ্বয়কে নাস্তিক ও কাফের আখ্যা দিয়েছে। হাফিজসহ পারস্যের কবিদের জীবন দর্শন পর্যালোচনা করতে গিয়ে নজরুল উল্লেখ করেন :

> হাফিজকে আমরা– কাব্য-রস-পিপাসুর দল– কবি ব'লেই সম্মান করি, কবি রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফি-দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খৈয়ামের দর্শন প্রায় এক। এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়। তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। শারাব বলতে এঁরা বোঝেন– ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। 'স্যাকি' অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করান। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পানশালা– সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন।

ইরানি কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস করতেন। শুধু স্বর্গ, নরক, রোজকিয়ামত (শেষ বিচারের দিন) প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্বদা নিজেদের 'রিন্‌দান্‌' বা স্বাধীনচিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। এর জন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল।

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর–'কায় বেখবর, আজ ফসলে গুল্‌ ও তরকে শারাব।''ওহে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন– আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে বসে আছিস! (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫)

নজরুল শুধু হাফিজই নয় বরং পারস্যের অন্যান্য কবির অমর কাব্য-মহিমা দ্বারাও বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার অপর দৃষ্টান্ত নজরুলের *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*। কবি অসুস্থ হওয়ার ১৬ বছর পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি গ্রন্থাকারে[১] প্রকাশিত হয়। পারস্যের এ দুই মহাকবিই নজরুল ইসলামকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেন। এদের মনন-মেধা, সুর-চেতনা দ্বারা নজরুল এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর অনেক গজল-গানে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীতে এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। *নজরুল-গীতিকা, সুর-সাকি, জুলফিকার, বন-গীতি, গুল-বাগিচা, গীতি-শতদল* ও *গানের মালার* অধিকাংশ কবিতা-গানে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। নজরুল গীতিকাতে *ওমর খৈয়াম-গীতি* ও *দীওয়ান-ই-হাফিজ-গীতি* নামে আটটি করে কবিতা-গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ফারসি সাহিত্য তথা পারস্যের মহাকবি হাফিজ দ্বারা নজরুল কতটা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

ফারসি কবি ও কাব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্রাউন ও মৌলনা শিবলি নোমানীর মতে হাফিজের মোট রুবাইর সংখ্যা ৬৯। কিন্তু নজরুল ৭৩টি রুবাই সরাসরি ফারসি থেকে অনুবাদ করেন। তিনি হাফিজের পচাত্তরটি রুবাইর কথা শ্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে নজরুল বলেন :

> আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সি 'দীওয়ান-ই হাফিজ' আছে তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literature- এ এবং মৌলানা শিব্‌লী নোমেনী তাঁর 'শেয়রুল-আজম'-এ মাত্র উনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন; এবং এই দুইজনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority -বিশেষজ্ঞ।

---

[১] ভূমিকা লেখেন সৈয়দ মুজতবা আলী। প্রকাশক জোহরা খানম। ৯, এন্টনী বাগান লেন, কলকাতা-৯। পরিবেশক: ষ্টান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা-১২ মূল্য-১০ টাকা। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৭০ এ।

Dhaka University Institutional Repository

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি– যদিও আরো তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্তত এই দু'টি রুবাইয়াতের সুরের কোন মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে ব'লে আমি এ দুটির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।

১। জমায় না ভিড় অসৎ এসে
যেন গো সৎলোকের দলে।
পশু এবং দানব যত
যায় যেন গো বনে চ'লে।
আপন উপার্জনের ঘটায়
হয় না উপার্জনের মুগ্ধ কেহ,
আপন জ্ঞানের গর্ব যেন
করে না কেউ কোনো ছলে।

২। কালের মাতা দুনিয়া হ'তে
পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর!
যুক্ত ক'রে দে রে উহার
স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।
হৃদয় রে, তুই হাফিজ সম
হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,
তুইও হবি কথায় কথায়
দোষগ্রাহী, অমনি কঠোর!
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ১৫-১৬)

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে।[১] এর বেশকিছু রুবাই প্রথমে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৩৩৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়ন্তী' পত্রিকায় প্রকাশিত ১০টি (৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ৩২, ৪১, ৪৯, ৫৩, ৫৪ সংখ্যক) রুবাই উল্লেখযোগ্য।

হাফিজের রুবাইগুলির মধ্যে শবার, সাকি, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। হাফিজকে নজরুল সুফি দরবেশ হিসাবে দেখার চেয়ে কবিরূপেই বড় করে দেখেছেন। মূলত: হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের দর্শন প্রায় অনুরূপ। তাঁরা উভয়েই আনন্দ-বিলাসী। তাঁদের কাব্যে শরাব হচ্ছে প্রেমানন্দের প্রতীক। তাঁরা কখনো শরাব পান করেন নি। মুসলমান ধর্মে শরাব পান করা নিষিদ্ধ। তাই গোঁড়া সাম্প্রাচারী মুসলমানদের কাছে তাঁরা কাফের। তারা মনে করেন এঁরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও বেহেস্ত, দোযখ, কিয়ামত প্রভৃতি মানতেন না।

---

[১] প্রকাশক: শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরি লেন, কলিকাতা। মূল্য ২ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজলের গভীরতা সম্পর্কে নজরুল বলেন :

> হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা।...
>
> আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারকার মণি-মানিক্য-খচিত আকাশ কি পেয়ালার সাকিকে কবি ডাকে, শারাব ভিক্ষা করে আর গান গায়-'বদেহ সাকি ময়ে বাকি!' ওগো সাকি, আরো-আরো শারাব ঢাল! কিছুই বাকি রাখিও না! পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল!...(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪২)

কারো কারো ধারণায় হাফিজ যৌবনে শরাব সাকির উপাসক হয়ে পরে সুফি সাধক হিসাবে খ্যাত হন। তাঁর সুফি ভাবাপন্ন কবিতার ভক্ত ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারকবৃন্দ। ইংরেজিতে সুফিগণের সাধারণ নাম মিস্টিক। যেসব সাধক যুক্তিজ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা না করে ভক্তি বা প্রেম সাধনার দ্বারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তাঁদেরই সাধারণভাবে মিস্টিক বলা হয়। সৃষ্টিকর্তা ও জীবের এই মধুর ও নিগূঢ় সম্পর্কই সকল মিস্টিক সাহিত্যের উপজীব্য। এই সম্পর্কের রহস্য ব্যক্ত করার জন্য মিস্টিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব প্রেমের উপমা ব্যবহার করেছেন। সুফিদের পরিভাষায় শরাব বা সুরার অর্থ ভগবানের প্রেমামৃত। সাকির অর্থ প্রেমময় ঈশ্বর বা প্রেমদীক্ষাদাতা গুরু, পেয়ালার অর্থ হৃদয় ও সুরা পানের অর্থ ভগবানের প্রেম আস্বাদন। হাফিজ ছাড়া ফেরদৌসি, আবু সায়েদ, ওমর খৈয়াম, সা'দী প্রমুখ ফারসি কবিগণ বিশেষভাবে সুফি ভাবাপন্ন ছিলেন।

বাংলা ভাষায় হাফিজের কবিতার অনুবাদক হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অজয়কুমার ভট্টাচার্য ও নজরুল ইসলামের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের *সদ্ভাবশতক* অর্থাৎ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলা কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সুফি কবি হাফিজ ও সা'দীর ফারসি কবিতার ভাবানুবাদ। *সদ্ভাবশতক*-এর কবিতার উপাদান মুলত হাফিজের *দিওয়ান* থেকে গৃহীত। যেসব কবিতা প্রধানত হাফিজের মর্মানুবাদ সেগুলোতে তাঁর ভণিতা দেখা যায়। একটি কবিতার অংশবিশেষ :

বিরহ-বারিধি-নীরে জীবনের তরি
ডুবিল ডুবিল আহা! প্রাণে মরি মরি।
কেঁদনা হাফিজ বল কি ফল রোদনে?
কমল কোথায় আছে কণ্টক বিহনে?
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৩], ১৯৯৭ : ২৩১)

নজরুলকে হাফিজের রুবাইয়াতের সত্যিকার প্রথম অনুবাদক বলা যায় না। অজয়কুমার ভট্টাচার্য তাঁর কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* গ্রন্থের নিবেদনে নিজেকে হাফিজের রুবাইয়াতের প্রথম অনুবাদক হিসাবে যে দাবি করেছেন তা সমর্থণযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'আমি যতদূর জানি, তাহাতে মনে হয়, আমার এ অনুবাদই হাফিজের রুবাইয়াতের সর্ব প্রথম অনুবাদ'। (উদ্ধৃত, গুপ্ত[৩], ১৯৯৭ : ২৩১) নিবেদনে অজয়কুমারের গ্রন্থের প্রকাশকাল দেওয়া আছে শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৬ সাল (১৯৩০)। নজরুলের অনূদিত হাফিজের ১০টি রুবাই ১৩৩৭ সালের (১৯৩০) জ্যৈষ্ঠের জয়ন্তী'তে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের (১৯৩০) ১লা আষাঢ় তারিখে। তবে নজরুল যেখানে মূল ফারসি থেকে অনুবাদ করেছেন অজয়কুমারের গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে সৈয়দ আব্দুল মজিদ ও এল ক্রানমার বিঙ এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে মূল ৬৫টি রুবাইয়াতের ভাবানুবাদ। অজয় কুমার তাঁর রুবাইয়াতের মূল অনুবাদে মিল দিয়েছেন ককখখগগ। বস্তুত তৃতীয় পঙক্তিকে ভেঙে দুটি ছোট পঙক্তি করে তাঁদের অন্ত্যমিলের ব্যবস্থা লক্ষণীয়। রুবাইয়াতের অনুবাদে স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় যথেষ্ট গতি অনুভব করা যায়। অনুবাদ সাবলীল হলেও রুবাইয়াতের মূল রূপ এখানে অবিকৃত নেই। যেমন: ১নং রুবাইয়াত :

ঐ যে গোলাপ জাগল সুখে,
ফুটল হাসি গুল্‌বাগের।
ফুল পিয়ালা পূর্ণ হল,-
শুনছি বাঁশি নওরোজের।
তরুণ সাকীর সরাব সুধা
মিটায় যাহার মনের ক্ষুধা-
সুখের নেশায় বিভোর সে যে,-
রইল কোথায় দুঃখ তার?
রক্ত নাচে রুদ্রতালে,-
বন্দী সেকি থাকবে আর?
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৩], ১৯৯৭ : ২৩২)

কান্তিচন্দ্র ঘোষের *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে মোট ৭৫টি রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি অন্ত্যমিল দিয়েছেন ককখখ। রুবাইয়ের ঐতিহ্যগত রূপ না হলেও তাঁর অনুবাদে স্বচ্ছন্দ্য ও গতিশীলতার অভাব নেই। উদাহরণ স্বরূপ ২৬ নং রুবাই :

সাকির সাথে স্বপ্ন রচন নদীর ধারে বসে
খেয়ালটা সেই মিটিয়ে নে গো- স্মৃতিটি যাক খসে।
ফুলের মতই প্রাণের আভাস-দিন কয়েকের নেশা
সেই কটা দিন পেয়ালা ভরে হাসির সঙ্গে মেশা!
(উদ্ধৃত, গুপ্ত[৩], ১৯৯৭ : ২৩২)

৫

'শাখ-ই-নাবাত'[১] শিরোনামের কবিতার বিবৃতি ভাব ও ভাষা কাজি নজরুল ইসলাম হাফিজ থেকে নিয়েছেন। তাঁর কাব্য 'শাখ-ই-নবাত' কোনো ইরানি সুন্দরীর স্তবগানে মুখরিত। অনেকের মতে এই নামটি কবিরই দেওয়া

[১] ২১ বছর বয়সে হাফিজ বাবা কুহীর মাযারে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাফিজের কাব্য চর্চা ও কবি জীবন সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। সেটি এই যে, "সিরাজ থেকে চার মাইল দূরে বাবাকুহি পর্বতে 'পীর-ই-সবজ' নামে একটি জায়গা আছে। প্রবাদ আছে যে, যদি কোন যুবক এই সবুজ উপত্যকায় চল্লিশটি নিদ্রাহীন রজনী যাপন করতে পারে তবে সে একজন মহান কবি হতে পারবে। হাফিজ তাঁর যৌবনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পীর-ই-সবুজ উপত্যকায় তিনি চল্লিশটি রজনী যাপন করবেন। এ সময় হাফিজ শাখ-ই-নাবাত নামক এক যুবতীকে ভালবাসতেন।
প্রতিদিন সকালে পর্বত প্রদেশে যাবার পথে এই রমনীর গৃহের সামনে দিয়ে তিনি যেতেন। দুপুর বেলা বিশ্রাম করতেন এবং রাত্রিতে তন্ময়তায় জেগে থাকতেন। এভাবেই উনচল্লিশ দিন পার হয়। চল্লিশের দিন সকালে হাফিজ যখন শাখ-ই-নবাতের গৃহের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রমণী ইশারায় তাঁকে তার গৃহে আমন্ত্রণ জানায়। হাফিজকে দেখে পরম উচ্ছ্বাসে সে তার প্রেম নিবেদন করে এবং রাত্রি তার সঙ্গে যাপন করতে অনুরোধ করে। কিন্তু হাফিজ আপন

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইনিই তাঁর প্রিয়া ছিলেন। 'কেউ কেউ মনে করেন যে, এর সঙ্গে কবির পরিণয় হয়।' (উদ্ধৃত, গুপ্ত[৩], ১৯৯৭ : ২৩১) 'শাখ-ই-নাবাত' কবি হাফিজেরই মানসী প্রিয়া ছিলেন বলে নজরুল কবিতাটির প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। 'শাখ-ই-নাবাত' এর অর্থ - 'আখের শাখা'। তিনি হাফিজকে তার পথের দিশারি বলে মনে করতেন। নজরুল তাঁর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এ হাফিজের জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে এ 'শাখ-ই-নাবাত' সম্পর্কে বলেন :

> হাফিজের সমস্ত কাব্য 'শাখ-ই-নবাত' নামক কোনো ইরানি সুন্দরীর স্তবগানে মুখরিত। অনেকে বলেন, 'শাখ-ই-নবাত্' হাফিজের দেওয়া আদরের নাম। উহার আসল নাম হাফিজ গোপন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ ভাগ্যবতী এই কবির প্রিয়া ছিলেন, কোথায় ছিল তাঁর কুটির, ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। রহস্য-সন্ধানীদের কাছে এই হরিণ-আঁখি সুন্দরী আজো রহস্যের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন।
>
> কেহ কেহ বলেন, এই শাখ-ই-নবাতের সহিতই হাফিজের বিবাহ হয় এবং হাফিজের জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোনো জীবনী-লেখকই একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই।' (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪)

নজরুল রচিত 'শাখ-ই-নবাত' নামক কবিতার অংশবিশেষ :

বুলবুল-ই-শিরাজ্ হ'ল গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর ক'রে 'শাখ্-ই-নবাত্' নাম দিল তাই তোমার তুতী।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনী,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।

...

কল্পনারই রঙীন পাখায় ইরান দেশে উড়ে' চলি,
অনেক শত বছর পরের আঁকাবাঁকা অনেক গলি-

...

শারাব হাতে সাকীর কোলে শিরাজ কবির রঙীন নেশা
যায় গো টুটে' ক্ষণে ক্ষণে-মদ মনে হয় অশ্রু মেশা।

...

আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি,
শিরাজ-কবির সাকীর শারাব রঙীন হ'ল তাই নিঙাড়ি'।

...

ঘুমায় হাফিজ 'হাফেজিয়া'য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে,
দীওয়ানার সে দীওয়ান-গীতি এক্‌লা জাগে কবর-ধারে।

...

হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজো যেন সন্ধ্যা প্রভাত-
'কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ্-ই-নবাত!'
(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ৩৪৪-৩৪৭)

প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে রমণীর আকর্ষণ ছিন্ন করে সবুজ উপত্যকায় রাত্রি যাপন করতে চলে গেলেন। পরদিন সকাল বেলা সবুজ কাপড়ে আচ্ছাদিত একজন বৃদ্ধকে পীর-ই-সবজ উপত্যকায় দেখা গেল। বৃদ্ধ হাফিজকে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য একটি পানীয় পান করতে দিলেন। বলা হয়ে থাকে যে-এই পানীয় পান করে হাফিজ অনন্ত জীবন লাভ করেছেন এবং চিরকাল বেঁচে আছেন। এই গল্পটি ইরানে বহুল প্রচলিত। (উদ্ধৃত, সিরাজী[১৪], ২০০৪ : ১২৩)

Dhaka University Institutional Repository

৬

১৩৩০ এর বৈশাখে *দীওয়ান-ই-হাফিজ* এর ৮ সংখ্যক গজল প্রকাশিত হয়। এই বই এ হাফিজের ৭৩টি রুবাইর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ১৩৩৭ এর মাসিক সওগাতের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গ্রন্থকীট পুস্তক পরিচয়ে লিখেছেন :

> রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-নজরুল ইসলাম। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। কলিকাতা মুল্য ২ টাকা। ইতঃপূর্বে অন্য দুই জন বাঙ্গালী কবির চেষ্টায় আমরা পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়ামের কাব্য-রস উপভোগ করিতে পারিয়াছি। এবার যুগ কবি নজরুল ইসলামের অনুগ্রহে আমরা আর একজন শেষ্ঠ কবি হাফিজের কাব্যের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইলাম। এজন্য কবিকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ। .. .. একজন মরমী কবি ভিন্ন ভাষাভাষী আর একজন মরমী কবির অন্তরকে নিজের অন্তরে বসাইয়া বাংলা কাব্যে তাহার পরিচয় প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা যে রসিক পাঠকের পক্ষে পরম উপভোগ্য হইয়াছে এ কথা বলিলে তাহার সম্বন্ধে তুচ্ছতম প্রশংসামাত্র করা হয়। কবি মুল পারসী হইতে রুবাইগুলির তর্জমা করিয়াছেন এবং মূল পারসীর যে ছন্দ, অনুবাদে তাহা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। কবির এ কৃতিত্বের মহিমা কেবল সমঝদার পাঠকই সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ কবি নজরুল ইসলামের হাতে যেরূপ মোহন সুন্দররূপে ফুটিয়াছে, বাংলার অন্য কোনো কবির হাতে সেরূপ ফুটিতে পারিত না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ পারসী কবিদের অন্তরের সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয় যেমন নিবিড় তেমন আর কাহারো নহে। মুখবন্ধে হাফিজের সমন্ধে সাধারণভাবে কিছু মন্তব্য করিয়া এবং উপসংহারে হাফিজের জীবনী দিয়া কবি নজরুল অনুবাদ খানিকে আরো মনোরম আরো উপভোগ্য করিয়াছেন। মোটের উপর আমরা এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, রসিক পাঠক এই অনুবাদখানি পড়িয়া অপূর্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইবেন। (মোবাশ্বের আলী[১১], ১৯৯৪ : ৫১)

মোসলেম ভারত দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) বড় আকর্ষণ-নজরুলের *বাধনহারা* উপন্যাসের দ্বিতীয় কিস্তি 'বোধন' শীর্ষক গান এবং 'শাত-ইল-আরব' কবিতা। 'বোধন' হাফিজের গজল অবলম্বনে রচিত। ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৭) বেরোয় 'বাধন হারা'র কিস্তি আর 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ আবির্ভাব কবিতা' এই সংখ্যায় আরো আছে তাঁর *দীওয়ান-ই-হাফিজ* (১ম ও ২য় সংখ্যা), ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৭) আছেঃ 'বাধন হারা, বিরহ বিধুরা (কবিতা) *দীওয়ান-ই-হাফিজ* ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (কবিতা)। 'পূবের হাওয়া' ১৩৩২ গ্রন্থের 'বাদল রাতের শারাব' কবিতা লিখিত হয়েছিল 'হাফিজের ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে।

যে কবির দ্বারা নজরুল সবচেয়ে বেশি উল্লসিত, উদ্বোধিত, উদ্দীপিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন হাফিজ। কাজী নজরুল ইসলামের 'আশায়' শীর্ষক কবিতাটি ১৩২৬ পৌষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল তাঁর কাব্য যাত্রা শুরু করেছিলেন মূলত হাফিজের এ কবিতাটি দিয়েই। তাঁর সাহিত্যে প্রবেশের প্রথম বছরেই (১৩২৬) এটি প্রকাশিত হয়েছিলো। 'আশায়' কবিতাটি কবি পাঠিয়েছিলেন করাচি থেকে, কবি তখন সৈনিক। পাঠিয়েছিলেন 'সবুজ পত্র'-এর উদ্দেশ্যে, কিন্তু সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কবিতাটি পছন্দ না করায় 'সবুজ পত্র'-এর তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশের জন্য দেন। নজরুল-কৃত হাফিজের কবিতার আদি রূপান্তর কি রকম ছিলো তা-ও এ থেকে স্পষ্ট হবে। এ কবিতাটি নিচে লেখা ছিল [হাফেজ]। নজরুলের *আশায়* কবিতা :

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে

Dhaka University Institutional Repository

অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই-কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেম্‌নি বিভোর থাক্ রে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোর এ নাসায়।
বরষ- শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অম্‌নি অঝুঝ হরষ।
(নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ৫০৬)

নজরুল-কৃত হাফিজের পরবর্তী অনুবাদের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই-এটা তৎকালীন প্রচলিত শব্দে-ছন্দে লেখা। কবিতাটি 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হওয়ার পর পবিত্রবাবু করাচিতে নজরুলকে সে খবর জানিয়ে এক পত্র লেখেন। পত্রোত্তরে নজরুল যা লিখেছিলেন, তার কিয়দাংশ পবিত্রবাবু তাঁর 'চলমান জীবন' দ্বিতীয় পর্বে ছাপিয়েছিলেন। নজরুল এ চিঠিতে লেখেছিলেন :

> ... প্রবাসীতে বেরিয়েছে 'সবুজপত্র'-এ পাঠানো কবিতা, এতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্যাদা একটুকুও কম নয়। প্রচার আরও বেশি। তা ছাড়া আমি কবিতা লিখেছি, পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দুর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে-সবই ত খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দ রসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির -ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যু-সমারোহের মধ্যে বসে এই যে, চিরন্তন-প্রেমিক মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায়, আমার আপন জন বাঙ্গালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না, জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দুর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি-না। তবু বাঙ্গালির সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙালির কাছে পৌঁছে দেবার ও যোগ্য বাহনে পরিবেশন করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার।... (নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ৩৬৬)

হাফিজ প্রাসঙ্গিক নজরুলের এ কথাগুলোকে তাঁর হাফিজ অনুবাদেও প্রবেশক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

প্রিয়ার দেওয়া শরাব হাফিজের গজল অবলম্বনে রচিত ('বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৭) 'আশায়' অনুবাদের পরের বছরই নজরুল ব্যাপক-বিশদভাবে অনুবাদ করলেন, এবং সে রূপান্তরেও ফুটে বেরোলো তাঁর স্বকীয়তা। প্রিয়ার দেওয়া শরাব, হাফিজের 'জুলফে আ-শফতা ও খুয়ে কর্দা ও খান্দানে লবে মস্ত' শীর্ষক গজলের ভাব অবলম্বনে রচিত। 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাটির নিচে পত্রিকার প্রকাশকালে লেখা ছিল হাফিজ এর ছন্দ ও ভাব লবলম্বনে। 'পুবের হাওয়া'-য় কবিতাটি কাছাকাছি শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাদ্বয়ের মধ্যেই নজরুলি ভাব-ভাষার পরিপূর্ণ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়সংবেদে, শব্দে, ছন্দে অন্ত্যমিলে কবিতাদ্বয় উজ্জ্বল উচ্ছল। মোহিতলাল যখন 'বাদল প্রাতের শরাব' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন; তখন জানিনা 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতাটি তাঁর চোখে পড়েছিল কিনা? সম্ভবত, না; তা নাহলে এই কবিতাও তাঁর উল্লেখের মর্যাদা পেতো। মোহিতলালকে জাদু করেছিলো 'রিমঝিমিয়ে/শিঞ্জিনী যে অন্ত্যমিল; এ ধরনের দু-তিন শব্দে মিল 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতায় উপর্যুপরি প্রযুক্ত। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতাটি হাফিজের ৭৪ নং গজলের অনুকরণে লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ৭৪

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست | پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان | نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین | گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند | کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر | که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم | اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

১। জুল্‌ফ অশেফ্‌ত ভ খুভে কারদ ভ খানদা'নে লাভ ভ মাস্ত
পিরাহান চা'ক ভ গাযাল খাভা'ন ভ ছেরা'হি দার দাস্ত
২। নারগেসেশ উরবেদেহ জুভে ভ লাবেশ আফসোনে কুনা'ন
নীম শাব দুশ বে বা'লিন মান অমাদ বেনেশাস্ত
৩। সার ফারা' গুশে মান অভা'র বে অভা'য হাযিন
গুপ্ত এই আ'শেক দীরীনেহ মান খভা'বাত হাস্ত
৪। আ'শেকী রা' কে চেনিন বা'দেহ শাবগিন দেহান্দ
কা'ফের এশ্‌ক বুদ গার নাশাভাদ বা'দেহ পারাস্ত
৫। বুরু এই জা'হেদ ভ বার দারদকেশা'ন খুরদে মাগির
কে নাদা'দান্দ জুয ইন তুহফে বে মা' রোযে আলাস্ত
৬। অন চে উ রিখ্‌ত বে পেইমা'নে মা' নুশিদীম
আগার আয খাম্‌র বেহেশ্‌ত আস্ত ভ গার বা'দেহ মাস্ত
৭। খান্দে জা'মে মেই ভ জুলফে গারেহ গীর নেগা'র
এই বাসা' তৌবেহ কে চুন তৌবেহ হা'ফেয বেশেকাস্ত

(হাফিজ সিরাজী[২], : ১৩৬২ : ৪২)

নজরুলের 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতা :

কোঁক্‌ড়া অলক মুছেছিল ঘাম-ভেজা লাল্‌ গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল, সে যায় যেন বায় ঝাউ-এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তার আকুল অধর-পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে,

Dhaka University Institutional Repository

শরাব ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নাম্‌লে সে।
দরদ্-ভিজা মিহ্নি সুরে গাইল গজল আফ্‌সোসের,
চোখ দু'টি নীর-সিক্ত যেন ফাগুন-বুকে ছাপ পোষের।
কোন্‌ বেদনার কণ্টকে গো বুকের বসন দীর্ণতার,
ছিন্ন-তারের সেতার-সম কণ্ঠে বাণী ক্ষিণ্ণতার।
এলিয়ে দিয়ে আমার পাশে ব্যথায় বিবশ ম্লান তনু
কইল ক্লেশে, 'কান্ত আমার আমার চেয়েও ক্লান্ত, উঃ !'
শঙ্কা-আকুল মুখটি শেষে কানের কাছে চুমিয়ে সে
জিজ্ঞাসিল, 'আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক্‌ ঘুমিয়েছে ?'
ঘুমিয়ে সে কে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে,
নিঝুম্‌ ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে-বাক্‌ মিলে ! ...
কম্পিত বাম্‌ হাতটি থুয়ে স্পন্দিত মোর বুক্‌টিতে
শরাব্‌ নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক একনিতে।
বেহেশ্‌তি সে শরাব, না তা' আঙুর-গলা রস ছিল,
জিজ্ঞাসি নাই,-- কানে শুধু মিনতি তার পশ্‌ছিল।
এমনি বেশে মুক্ত কেশে এমনি নিশুত রাত্তিরে
শরাব্‌ নিয়ে এসে প্রিয়া রাখ্‌লে বুকে হাত ধীরে,
প্রেমের এমন বেদিল্‌ কাফের কে আছে গো বিশ্বে সে
শরাব্‌ সোরাই এক নিশেষে পান করে না নিঃশেষে ?
ওগো কাজী, খাম্‌খা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে ?
ভাঙতে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫১৯)

উপরোক্ত 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতাটির সমস্ত অন্ত্যমিলের অসাধারণ বিন্যাস নজরুলের অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক : গাল ছুঁয়ে/ ডাল নুয়ে; সামলে নে'/ নামলে সে; আফসোসের/ছাপ পোষের; দীর্ণতার/ ক্ষিন্নতার; ম্লান তনু/ক্লান্ত উঃ; চুমিয়ে সে/ ঘুমিয়েছে; ডাক দিলে/ বাক্‌ মিলে; বুকটিতে/ একনিতে; রস ছিল/পশ্‌ছিল; রাত্তিরে/হাত ধীরে; বিশ্বে সে/নিঃশেষে; কও কাকে/তৌবাকে। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' হাফিজের নিম্ন গজলের ভাবানুবাদে রচিত :

নজরুলের 'বোধন' ('মোসলেম ভারত', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) কবিতাটির নিচে ছিলো-'হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্‌ গশ্‌তা বাজ্‌ আয়েদ ব- কিনআন্‌ গম মখোর' শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া।' এই কবিতার গ্রন্থবদ্ধ রূপ ও পত্রিকায় প্রকাশিত রূপ কিছুটা আলাদা। সমস্ত কবিতার ধ্রুবপদ বইয়ের 'দুঃখ কি ভাই হারানো য়ূসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে'। পঞ্চম স্তবকে তৃতীয় পঙক্তিতে বইএ আছে: 'কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও আমার আঁধারে পরিত্যক্ত।' পত্রিকায় ছিলো: 'কি ভয় হাফিজ, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত।' নজরুলের বোধন কবিতাটি হাফিজের ২৭৭ নং গজলের অনুকরণে লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ২৭৭

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور — کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن — وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن — چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت — دائما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب — باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم — سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب — جمله می داند خدای حال گردان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است ومقصد بس بعید — هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ১৫২)

১। ইফসুফ গুম গাশতে ব'জ অয়াদ বে কেনআ'ন গাম মাখুর
কালবে আহযা'ব শাভাদ রুজি গুলিস্তা'ন গাম মাখুর।

২। এই দেলে গামদীদে হা'লাত বে শাভাদ দেল বাদ মাকুন
ভেইন সার শুরিদেহ বা'জ অয়াদ বে সামান গাম মাখুর

৩। গার বাহা'র উমর বা'শাদ বা'জ বার তাখতে চামান
চাত্র গুল দার সার কাশী এই মুরগে খুশখা'ন গাম মাখুর

৪। দূর গারদুন গার দু রুজি বার মুরা'দ মা' নারাফ্ত
দ'য়েমা' এক সান নবা'সাদ হলে দৌড়া'নে গাম মাখুর

৫। হা'ন মাশু নুমিদ চুন ভাকেফ না এই আয সার গেইব
বা'শাদ আনদার পারদেহ বা'জী হ'য়ে পেনহা'ন গাম মাখুর

৬। এই দেল আয সেইল ফানা' বুনয়া'দ হাস্তী বারকুনাদ
চুন তু রা' নুহ আস্ত কেশ্তীবা'ন যে তুফা'ন গাম মাখুর

৭। দার বিয়'ব'ন গার বে শুক কা'বে খ'হী যাদ কাদাম
সারযানেশহা' গার কুনাদ খা'রে মাগীলা'ন গাম মাখুর

৮। গার চে মানযেল বাস খাতারনা'ক আস্ত ভ মাকছাদ বাস বাহী'দ

Dhaka University Institutional Repository

হিচ রা'হি নিস্ত কা'ন র' নিস্ত পা'য়া'ন গাম মাখুর
৯। হা'লে মা' দার ফোরকাত জা'না'ন ভ আবরা'ম রাকিব
জুমলে মীদা'নাদ খোদা'য়ে হা'ল গারদা'ন গাম মাখুর
১০। হা'ফেয দার কান্‌জ ফেকর ভ খালভাত শাবহায়ে তা'র
তা' বুভাদ ভরদাত মুআ' ভ দারসে কুরআন গাম মাখুর

নজরুলের বোধন কবিতা :

১

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।

২

হয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যননিকা- আড়ে প্রহেলিকা-মধু,-বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই, ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

৩

দু'দিনে তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ!
পুণ্য- পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে;
কণ্ঠক-ভয়ে ফির্‌বে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পর্‌ওয়া কবি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্‌ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

Dhaka University Institutional Repository

৫
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১০৩-১০৪)

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, সফলতা-বিফলতা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব নিয়ে ফারসি মনীষীগণ অনেক ভেবেছেন। ভাগ্যকে বিশেষভাবে দোষারোপ করেছেন খৈয়াম। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভাগ্যকে অতিক্রম করা সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন খৈয়াম। অবশ্য রুমী তাকদির ও তদ্বির বা প্রচেষ্টাকে সমানভাবে দায়ি করেছেন। মানুষের জীবন যেমন নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত তেমনি তদ্বির বা প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত। হাফিজের 'বোধন' কবিতা, যার অনুবাদক নজরুল ইসলাম, নিরাশাবাদকে প্রশ্রয় দেন নি। এ বিষয়ে 'নজরুল সাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব' শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> তবু হাফিজ নিরাশার সুর শোনান বলে ইকবাল এক সময় হাফিজ পাঠ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন। পাশ্চাত্যের উত্থান দেখে নিটশে পড়ে ইকবাল এই সমাধানে এসেছিলেন জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মশক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন। সেজন্য রুমী তার প্রিয় কবিতে পরিণত হন। কারণ তকদীর নির্ভর হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়া উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন। এমন কি শক্তিশালী সিংহ যে হরিণের পিছনে দুর্বার গতিতে ছোটে সেটাও সে তার নিয়তি সে কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন না। (শেলী[১৩], ২০০৫ : ৬৬)

নজরুলের 'বাদল-প্রাতের শরাব' কবিতাটির ('মোসলেম ভারত', আষাঢ় ১৩২৭) নিচে পত্রিকায় প্রকাশকালে লেখা ছিলো 'হাফিজ'-এর ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে'। 'পূবের হাওয়া'-য় কবিতাটি 'নিকট' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিলো। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ও 'বাদল-প্রাতের শরাব' কবিতাদ্বয়ের মধ্যেই নজরুলি ভাব-ভাষার পরিপূর্ণ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। শব্দে, ছন্দে অন্ত্যমিলে কবিতাদ্বয় উজ্জ্বল। মোহিতলাল নজরুলের যে দুটি কবিতা পড়ে মুগ্ধবিস্মিত হয়েছিলেন তার একটি হাফিজের এই রূপান্তর, 'বাদল প্রাতের শরাব'। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সেই বিখ্যাত পত্রে এই কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন: ''বাদল প্রাতের শরাব'-শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুস্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর ইহয়া উঠিয়াছে। এ কবিতাটিকেও মস্ত হইবার ও মস্ত করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হইক'। (মোবাশ্বের আলী[১১], ১৯৯৪ : ৭০)

'বাদল-প্রাতের শরাব' কবিতা যা নজরুলের 'পূবের হাওয়া'য় 'নিকট' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল:

বাদ্‌লা কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায়জোরেরেই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;

Dhaka University Institutional Repository

জমলো আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজলো কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
দরদম্! হরদম্ দাও মদ, মস্ত করো গজল গেয়ে!
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল-বাগিচায় চলছে হাওয়া,
এই ত রে ভাই ওক্ত খুশির, দ্রাক্ষারসে দিল্‌কে নাওয়া।
কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাস্ বিছিয়েছে আজ ফুলবালারা,
আজ চাই-ই চাই লাল্ শিরাজী স্বচ্ছ সরস খোর্মা-পারা!
মুক্তকেশী ঘোর নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ্ পেতে তাই ভরসা রাখি।
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম্ চাও যদি কওসর্ অমিয়,
গুর বেঁধে বীণ্ সারেঙ্গীতে খুব্‌সে শিরীন্ শরাব পিয়ো!
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব্-হায়াত-কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিল্‌বে আশেক দিল্-পিয়ালার ওষ্ঠ-চুমায়!
খামখা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদ্‌খোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২২৫-২২৬)

হাফিজকে নিয়ে নজরুল 'সালেক' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। নজরুল যে হাফিজকে কী প্রচণ্ড দখল করেছিলেন, তা তাঁর কবিতা-গানের অনুবাদে, তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ (ভূমিকা) ও জীবনী রচনায়, তাঁর গজলের গানে রূপান্তরণে *দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি*, তাঁকে নিয়ে এমনকি গল্প লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। 'সালেক' গল্পটির অংশবিশেষ :

> শহরে এক অচেনা দরবেশ এসেছেন, সবাই তার সমন্ধে উৎসুক। কাজি (বিচারক) দরবেশের সঙ্গে দেখা করার পর দরবেশ তাঁকে বললেন :
>
> 'শুন কাজী সাহেব, আমি যা' বল্‌ব তাই করতে পার্‌বে?'
>
> কাজী সাহেব আস্ফালন ক'রে উঠলেন, 'হাঁ, হুজুর, বান্দা হাজির।'
>
> দরবেশ হাস্‌লে, তারপর বললে, 'দেখ, কাল জুম্মা। মুল্লুকের বাদশা আস্‌ছেন এখানে। নামায পড়্‌বার সময় তোমার 'ইমামতি' কর্‌তে বল্‌বেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ করতে পারবে?' কাজী সাহেব ব'লে উঠলেন, 'আলবৎ! কি করতে হবে?'
>
> দরবেশ বললে, 'তোমার দু'বগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তারপর যেই নামাজে দাঁড়াবে, অম্নি মদের বোতল দুটি দিব্যি 'জায়-নামাজের' উপর ভেঙ্গে দেবে।'
>
> কাজী সাহেবের মুখ হয়ে গেল নীল। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বললেন, 'হুজুর, তা'হলে আপনি আমা হ'তে মুক্তি পাবেন সত্যি, কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধড় হতে আলাদা হয়ে যাবে, -কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?'
>
> দরবেশ বল্‌লেন, 'অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও ত দেখতে হবে।...

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন জুমার নামাযে কাজি সাহেব ইমাম হলেন এবং দরবেশের কথা মতো তিনি জায়নামাজে দুটি মদের বোতল ভেঙে ফেললেন। 'সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মস্জিদ ভরিয়ে তুললে তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলে যে, কাজী সাহেবের মত মাতাল আর বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে হয় নি, হবেও না। যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যা'কে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই, নিস্তারও নেই।'

বিচারে কাজির সমস্ত সম্পত্তি ও পদবী কেড়ে নেওয়া হলো। এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কার স্নিগ্ধ সান্তনা ছুঁয়ে গেল আচম্‌কা এসে, ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মত। কাজী সাহেব বুকের শুক্‌নো হাড়গুলোকে আঁকড়ে ধ'রে কেঁদে উঠলেন, 'খোদা, এম্‌নি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে!'

নিঃস্ব রিক্ত কাজি গেলেন দরবেশের কাছে। তারপর- কাজী সাহেব প্রাণের বাকী সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে ভাঙা গলায় বললেন:

'ওগো দরবেশ, কোথায় তুমি? কোন্ সুদুরের পারে?'

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মত বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে কাজী সাহেব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে পঁহুচ্‌লেন, তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগ ভরা ছোঁওয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আস্‌ছে। তবুও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌লেন, 'দরবেশ, দীক্ষিত কর!- আমি এসেছি, আর যে সময় নাই!' ... কা'র শান্ত-শীতল ক্রোড় তাঁকে জানিয়ে দিলে, 'এই যে বাপ। এস! এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার সব চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে!'

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৭০৪-৭০৫)

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন,

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ২)

বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন্ কুন্ গরৎ পীরে মাগাঁ গোয়েদ!
কে সালেক বে খবর না বুদ্ জে রাহ ব রস্‌মে মঞ্জেল হা।

জায়নামাজে শরাব-রঙীন কর, মুর্শেদ বলেন যদি।
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত আদি।

কাজী সাহেব প্রাণের বাকি সমস্ত শক্তিটুকু একত্রে ক্‌রে ভাঙ্গা গলায় বল্‌লেন, 'কে? ওগো পথের সাথী! তুমি কে ?'

অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেলো না। নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে গেল আর্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, 'তু-মি-কে?'

খেয়াপার হতে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কয়ে গেল, 'মাতাল হাফিজ!'

(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৭০৫)

Dhaka University Institutional Repository

দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি নামে নজরুল হাফিজের আটটি গজলের ভাবানুবাদ রচনা করেন। হাফিজ নজরুলকে বাংলার ভাষা-শক্তির, ভাষা-চরিত্রের এবং ভাষা-মেজাজের কতটা স্টাইল বা ভঙ্গিকে কতটা পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল তা লক্ষ করা যায় নিম্নের নজরুলকৃত হাফিজের ছন্দের হুবহু অনুকরণে অনূদিত কয়েকটি দিওয়ানের অনুবাদ থেকে :

হাঁ, এয়্, সা'কি, শরাব ভর লাও
বোলাও পেয়ালী চালাও হর্দম্ !
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর
শেষের দিক তার ঢালাও কর্দম !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫৩৭-৫৩৮)

বা

মোর্ পাত্র মদ্য- রোশ্নায়ে কর্ রৌশন্ এয়্ সাকি !
গাও বান্দা, 'মোদের পুরবে সব আশ্ দুন্য়া নয় ফাঁকি !'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫৪২-৫৪৩)

কিংবা

যদিই কান্তা শিরাজ্ সজ্নী ফেরত দেয় মোর
চোরাই দিল্ ফের্,
সমরখন্দ আর বোখারায় দিল বদল তার লাল
গালের তিল্টের !

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫৪৪)

৭

যদিও হাফিজ-গীতি রচনাকালে নজরুল তাঁর ভাব-শরীর থেকে ফারসি পোশাকের ভিন্নতর সৌন্দর্যের চুমকিকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার ভাবোদ্বেলতাকে অপসারণ করেন নি বা তার সাংস্কৃতিক কলাকুশলতাকে বর্জন না করে তার ছন্দ-নৃত্যের ভিন্নতাকে বজায় রেখেছেন।

হাফিজ ও খৈয়াম-এর অসংখ্য রুবাই রঙে রঙে রঙিন। সাধারণত উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারে ইরানি কবিরা নানা বর্ণের শরাব, শিরাজি, গোলাপ ও বুলবুলের উদাহরণ বা উপমা আনেন; সে জন্য তাঁদের কবিতা বা কাব্য হয়ে ওঠে বর্ণধর্মী বা চিত্রল। এটা হাফিজ ও খৈয়াম-এর কবিতায় বেশি দেখা যায়। এ দু'জন কবি নজরুলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন।

নজরুল অবশ্য রুমী, খৈয়াম ও হাফিজকে অনুবাদ করলেও ফেরদৌসিকে অনুবাদ করেন নি। তবে নজরুলের সাহিত্যকর্মের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি ফেরদৌসির শাহনামাও পড়েছেন এবং শাহনামার প্রভাব তাঁর মধ্যে রয়েছে। মনির উদ্দিন ইউসুফ শাহনামার ভূমিকায় লিখেছেন :

> ফেরদৌসির 'শাহনামা' ইরানীয় সাহিত্যকে যে-প্রকাশভঙ্গি ও মননশীলতার অধিকারী করে গেলো, তারই ধারা অনুসরণ করে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম রচনা করলেন তাঁর কালজয়ী 'রুবাইয়াৎ', নিজামী

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'সিকান্দরনামা' ও 'য়ুসুফ-জোলেখা', প্রাচ্যের শেক্সপীয়র শেখ সা'দী তাঁর 'গুলিস্তাঁ', 'বুস্তা' ও রুমী তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী'।

ফারসী ভাষা তখন থেকেই এক আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের আমীর খসরু তাঁর গীতি-কবিতার মাধ্যমে ইরানের মহত্তম কবিদের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন; শিরাজের কবি হাফেজের গজলরসে সুদূর বাংলাদেশেও রসের বান ডেকেছিল। বাংলার এক সুলতানের দরবানে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার মর্ম সাধনার দিশারী কবি চণ্ডীদাস হাফেজের গজল-সুধা পান করেছিলেন বলেও জানা যায়।

ফারসি ভাষা ভারতের রাজভাষার মর্যাদা পেয়ে প্রায় চার হাজার মাইলব্যাপী এক বিরাট এলাকার মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে, ইরান থেকে এতদূরে অবস্থিত যে বাংলাদেশ, ইরানের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে ফেরদৌসির 'শাহনামা'ও সেখানে পল্লীর ঘরে ঘরে পঠিত ও আলোচিত হতো। তার প্রভাবে পল্লীর কবিদের দ্বারা 'সোহরাব রুস্তমের' মর্মন্তুদ কাহিনী পরিবেশিত হতে থাকে বাংলার ঘরে ঘরে। মধ্য যুগের বাংলা-সাহিত্যে যে মানবিক রসের উদ্বোধন হয়, তাতেও পড়ে ফারসী সাহিত্যেরই সরাসরি কিংবা অন্যবিধ প্রভাব। বাঙালি-মনে 'শাহনামা'র আবেদন যদি এমনভাবে ঐতিহ্যগত হয়ে না থাকতো, তবে সম্ভবত বর্তমান অনুবাদের তেমন কোন আবশ্যকতা অনুভূত হতো না। ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ শত শত বছর ধরে পরিচিত। (ফেরদৌসী[৮], ২০১২ : ভূমিকা-১৬)

যিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে হাফিজ, খৈয়াম ও রুমীর কবিতা পড়েছেন পরোক্ষে তিনি ফেরদৌসিকেও পড়েছেন। মানুষের জীবনের মূল সমস্যা সুখ ও দুঃখের। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ নির্ণয় করতে ফেরদৌসী কাল-এর উৎক্রমের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। এখানে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় অবিলম্বে লাভবান হওয়ার কোনো উপায় নেই। কালের কারণেই যেমন জোহাকের দীর্ঘ নিপীড়ক রাজত্বের অবসান হয়েছে, তেমনি ফারেদুনের দীর্ঘ সৌভাগ্যময় রাজত্বের সময় ফুরিয়েছে, কালেই হস্তক্ষেপ সুলম ও তুরের দুরভিসন্ধি সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। তাদের মৃত্যু ঘটেছে মনুচেহরের হাতে। কালের কৌতুকে মনুচেহরের সামন্তপুত্র সামের ঔরসে জন্মগ্রহণ করল জাল। অরণ্যে বর্জিত জাল পালিত হল বৃহৎ পক্ষী সীমোরগের বাসায়।

পরবর্তীতে সামের পুত্র হিসেবে সে হলো ইরানের রাজা। এই জালের পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বীর রুস্তম। এখানে এসেই মনে হয় ফেরদৌসি নিয়তির অসীম শক্তির কাছে মাথা নত করেছেন। কারণ রুস্তমের অশ্ব রুখস হারানোর ফলে তাহমিনার সঙ্গে তার পরিচয় ও সোহরাবের জন্ম হয়। শত্রুপক্ষ গ্রহণ করে রুস্তমের সঙ্গে সোহরাবের যুদ্ধ হয় এবং পিতা রুস্তম কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে পুত্র সোহরাবের মৃত্যুর করুণ কাহিনীর পিছনে কালচক্রের চেয়ে নিয়তির অবদান বেশি ছিল। প্রশ্ন হলো কাল ও নিয়তি নিয়ে নজরুলকাব্যে কোন গভীর প্রশ্ন লিখিত হয়েছে কি-না। নজরুলের শ্যামা সঙ্গীতে কালের উল্লেখ রয়েছে। নজরুলের একটা শ্যামা সঙ্গীতের প্রথম পঙক্তি মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী। কিন্তু সেটা হিন্দুতান্ত্রিক দর্শনের চর্চা হতে পারে। তবে ফেরদৌসির শাহনামার বীর ও রৌদ্র রস শক্তিময় অগ্নিবীণার নজরুলকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে রামায়ণ ও মহাভারত এবং মদুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য নজরুলের বীররস যুগ্ম কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা জাগায়েছে। প্রেরণা যে জুগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে নজরুলের বীর ও রৌদ্র রসাত্মক কাব্য তাঁর স্বভাবগত চরিত্রের এবং যুদ্ধের সংস্পর্শে আসার

Dhaka University Institutional Repository

একটা কারণ হতে পারে। অগ্নিবীণার বিদ্রোহ মানুষের প্রতি অনন্য ভালোবাসার একটি প্রতিবাদী বিষ্ফোরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শাহনামাই ফারসি কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র এপিক।

ফারসির অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি খৈয়াম, আনওয়ারী, রুমী, সা'দী ও হাফিজ গীতিকাব্য রচনা করেছেন। এদের কারও কবিতা দীর্ঘ নয়। আয়তনে ক্ষুদ্র এই গীতি কবিতা গভীরতায় জার্মানীর গ্যাটে থেকে পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিভূত করে এবং প্রতীচ্যের মনীষীদের এবং সমালোচকদের মতে ঐ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন হাফিজ।

কবির স্বভাব, প্রকৃতি ও মেজাজ একই উপলব্ধির বা অনুভূতির প্রকাশ ঘটায় ভিন্ন আঙ্গিকে। তাই নজরুলের উপর শুধু রুমী, খৈয়াম ও হাফিজের নয় বরং শেখ সা'দী, জামী ও নিজামীরও প্রভাব পড়েছে। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতার কিছু কিছু জ্ঞানগর্ভ পঙক্তি যেন সা'দীর 'গুলিস্তা' ও 'বোস্তার' ফর্মের পরিবর্তন এবং তিনি এখান থেকে এক নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। সা'দী তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী সংক্ষেপে বলে কবিতার পঙক্তিতে তার সারাংশ দিয়েছেন। শেখ সা'দীর বালাগাল উলা বি কামালিহী নামক বিখ্যাত নাত এর ওপর ভিত্তি করে নজরুল লিখেছেন :

কূল মাখলুক গাহে হজরত বালাগাল উলা বেকামালিহি
আধার ধরায় এলে আফতাব কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি।
রৌশনীতে আজো ধরা মশগুল, তাই তো ওফাতে করি না কবুল
হাসনাতে আজো উজালা জাহান সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।
নাস্তিরে করি নিতি নাজেহাল
জাগে তৌহিদ দীন-ই-কামাল
খুশ্‌বুতে খুশী দুনিয়া বেহেশত্‌
সাল্লু আলায়হি আলিহি।
(উদ্ধৃত, শেলী[১৩], ২০০৫ : ৬০)

সা'দীর নৈতিকতার স্বাক্ষ পাওয়া যায় নজরুলের নিম্নোক্ত কবিতাগুলোতে:

হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা ?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি ?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান্ জাগিছেন দিবারাতি।
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান্ উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৩৫-২৩৬)

বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হ'তে ধ'রে ক্রমে ক্রমে নেমে এস নীচে–
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুণি ঋষি যোগী

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী।
এ দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা
হেথা সবে সম পাপী
আপন পাপের বাট্‌খারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি !
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৩৭)

মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত-সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা ?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনখানে !
তোমারি কামনা-রানী
যুগে যুগে, পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি'।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৩৬)

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশি।
এক জনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা-সকলের অপমান!
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান !
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৪৭)

কোনো কালে একা হয় নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রানী,
রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৪২)

সা'দীর মানব কল্যাণমূলক বাণীর ন্যায় এ ধরনের বক্তব্য তার *শেষ সওগাত* ও *নতুন চাঁদ* গ্রন্থের বেশ কিছু কাব্য পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। যাকে চিরন্তন বাণী বলা যেতে পারে।

নজরুলের *বাঁশির ব্যথা* মাওলানা রুমী অবলম্বনে কার্তিক, ১৩২৭ 'বঙ্গনুরে' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি হল:

শোন দেখি মন বাঁশের বুক ব্যেপে কি উঠচে সুর,
সুর ত নয় ও, কাঁদচে যে রে বাঁশরী বিচ্ছেদ-বিধুর

Dhaka University Institutional Repository

কোন অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুমরে তায়
হায় রে সে যে সুদূর আমার অচীন-প্রিয়ায় চুমতে চায়।
প্রিয়ার পাবার ইচ্ছে যে,
উড়চে সুরের বিচ্ছেদে।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৫০৫)

রুমীর কবিতার ব্যাপক অনুবাদ না করলেও নজরুলের বহু আধ্যাত্মিক কবিতা ও ইসলামি গান বা তাত্ত্বিক কবিতা, বিশেষকরে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় রুমীর বীর, করুণ ও শান্ত রসের বাঁশি প্লে ব্যাকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নজরুলের শেষ অভিভাষণ 'যদি আর বাঁশি না বাজে'-এর ভাব-সত্তা যে রুমীর সত্তারই প্রতিবিম্বন তা অস্বীকার করা যায় না। রুমীর খুদী ও বে-খুদীর দর্শনের প্রভাব ইকবালের ন্যায় নজরুললের ওপরও পরিলক্ষিত হয়। মনোযোগ দিয়ে ইকবাল ও নজরুলকে এবং একই সঙ্গে রুমীকে পড়লে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাবে, উপমহাদেশের দুই ভাষার দুই মহাকবির প্রকৃত গুরু হলেন রুমী। রুমীর বিশ্বজনীন আলোকদীপ্ত প্রতিভার আধুনিক সংস্করণ ইকবাল ও নজরুল। ইকবালের সাহিত্য জীবনের শেষাংশ অবিমিশ্র ইসলামের গুণকীর্তন বলে রুমীর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক আদলের কবি বলতে দ্বিধা; আবার নজরুলের কাব্যে বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণের অতিমাত্রিক মিশ্রণ বলে একইভাবে তাঁর চিন্তা ও চরিত্রের সমগোত্রীয় ভাবতে দ্বিধা হবে। মোহিতলাল অনূদিত রুমীর কবিতা :

নিজেরে নিজেই জানি না যখন জানিব কেমনে কে ভগবান।
নই খ্রিস্টান ইয়াহুদীও নই কাফের কিংবা মুসলমান।
পূর্ব-পশ্চিম, সাগর নগর
কোথাও আমার নাই যে রে ঘর,
কেহ জ্ঞাতি নয় মর কি অমর,
ক্ষিতি হেজ কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমার এ দেহখান।
জন্ম আমার নয় কোনখানে
রুম, মহাচীন, নয় খোরাসানে।
হিন্দুর দেশ সেখানেও নয় সিন্ধু যেখানে প্রবহমান।

ইহলোক কিবা পরলোকে ঠাঁই
স্বর্গ-নরক মোর তরে নাই,
নই সন্তান আদমের তাই
স্বর্গ হইতে করে নাই দূর, করে নি আমারে সে অপমান।

নাই যার চিন নাই নির্দেশ-
লোকাতীত লোক সেই মোর দেশ!
দেশ-বিদেশের ত্যজি দুই বেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি চির যৌবনে জৌতিস্মান!
(উদ্ধৃত, শেলী[১৩], ২০০৫ : ৬২)

Dhaka University Institutional Repository

সামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইসহাক তাঁর *বিশ্বপ্রেমিক রুমী* গ্রন্থের ভূমিকায় এই কবিতার গদ্য অনুবাদ করেছেন এভাবে :

> আফসোস হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটনে আমি নই পরিপূর্ণরূপে সমর্থ। আমি মুসলিমও নই, ইয়াহুদীও নই, নই আমি খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী। প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য নয়, আমার জন্মভূমি, প্রকৃতি গর্ভ কিম্বা মুক্ত গগনও নয় কালবিহীন, অপরূপ মঞ্জিল যে প্রেম-সচেতন মানবাত্মা সেই অদৃশ্য লোকেই আমি গ্রহণ করেছি এক চিরস্থায়ী আসন। (উদ্ধৃত, শেলী[১৩], ২০০৫ : ৬২)

এখানে ১৯২১-এ নজরুলকে দেওয়া সংবর্ধনায় অভিনন্দনের জবাবে নজরুলের ভাষণের কিয়দংশের সঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্য মিলে যায়। নজরুল লিখেছিলেন :

> যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে তাঁদেরকে অনুরোধ আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগস্থহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। (নজরুল ইসলাম[৭], ১৯৯৩ : ৯১)

এখানে রুমীর চিন্তার বিশ্বজনীনতার সঙ্গে নজরুল-চিন্তার বিশ্বজনীনতার অপূর্ব মিল লক্ষ করা যায়। ঔদার্যের যে বিশাল আকাশ আমরা রুমীতে দেখি সেই আকাশের উপমা নিঃসন্দেহে নজরুল। সেজন্য-সাম্যবাদী কবিতায় নজরুল যখন বলেন,

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।
...
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ২৩৩)

এ কাব্যের গান নজরুল কমিউনিজম পড়ে শেখেন নি, শিখেছিলেন রুমী, সা'দী, রুদকী, খৈয়াম ও হাফিজ পড়ে। মহাকবি ফেরদৌসি তাঁর অমর মহাকাব্য *শাহনামা*-য় পূর্ববর্তী কবি দাকিকী'র কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই দাকিকী-র আগেরকার ইরানি কবি রুদকী[২]। কবি রুদকী ছিলেন জন্মান্ধ। গ্রিককবি হোমার ছিলেন জন্মান্ধ

---

[১] দাকিকী (মৃত্যু ৩৬৭ হি./৯৭৭ খ্রি.): দাকিকীই প্রথম শাহনামা (রাজরাজড়াদের কাহিনী) কাব্য রচনা করেন। তিনি এক হাজারটি শ্লোকের মাধ্যমে 'গুশতাসাবনামে' শীর্ষক কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন– ফেরদৌসি যেগুলোকে তাঁর শাহনামায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও তাঁর কাব্যে প্রাচীন ইরানের ধ্যান-ধারণাগুলোর নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কাব্য বীরত্বগাঁথার (হামাসে) সুর ও বাচনভঙ্গি ধারণ করে আছে। কিন্তু তিনি প্রশংসামূলক কবিতার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। তাঁর কাব্যে গজল ও প্রেমবন্দনার প্রতি এক প্রকারের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়, এ ধরনের কল্পনাশক্তি তাঁর অবশিষ্ট সাহিত্যকর্মেও অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে তাঁর অবশিষ্ট 'হামাসে' তথা মহাকাব্যে যে কল্পনা বিদ্যমান রয়েছে তা মহাকবি ফেরদৌসি রচিত শাহনামায় বর্ণিত কল্পনার চেয়ে খুবই দুর্বল। তাঁর সময়ে সাহিত্যাঙ্গনে যে অলঙ্কারশাস্ত্রীয় উপাদানগুলোর প্রচলন ছিল, সেগুলো তাঁর কাব্যে প্রতিভাত হয় নিঃ বিশেষ করে তাঁর হামাসেগুলোতে সেসব উপাদানের অতিরঞ্জন মোটেও পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু ফেরদৌসি তাঁর শৈল্পিক বর্ণনাগুলোতে তা তুলে ধরেছেন। দাকিকী তা তুলে ধরতে অক্ষম ছিলেন এবং বিশেষ করে ফেরদৌসির তুলনায় তাঁর 'হামাসে' তথা বীরত্বগাঁথাগুলো অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু তাঁর গজলগুলো 'হামাসে' রচনার এই দুর্বলতাকে পুষিয়ে দিয়েছে। (আহমাদ তামীমদারী[১], ২০০৭ : ৭৬-৭৭)

[২] রুদকী (মৃত্যু ৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.): রুদকী এমন একজন কবি যাঁর অন্ধত্ব সমকালীন সকল গবেষককে বিস্মিত করেছিল। তিনি এমন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন ঠিক যখন ফেরদৌসি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, তাঁর কবিতায় আরবি শব্দের স্বল্প প্রয়োগ রয়েছে এবং খোরাসানী

Dhaka University Institutional Repository

এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্গত আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার সতের শতকের মধ্যবর্তীকালের কাব্যপ্রণেতা ভবানীদাসও ছিলেন অন্ধকবি। (শেলী[১৩], ২০০৫ :৭৯)

ইরানের অন্ধকবি রুদকীকে এদেশের পাঠকের কাছে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল রুদকী-র ফারসি কবিতাগুলোর প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। এগুলোর কয়েকটি তৎকালীন *নওরোজ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (শেলী[১৩], ২০০৫ :৮০) নজরুল ইসলাম তাঁর অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*-এর ৫৭ নং ও ৫৯নং রুবাই দুটি সংযোজিত করে একটি গান রচনা করেন। গানটি হলো-

তরুণ প্রেমিকা! প্রণয় বেদন জানাও জাগাও বে-দিল্ প্রিয়ায়।
ওগো বিজয়ী! নিখিল-হৃদয় কর কর জয় মোহন মায়ায়।
নহে ঐ এক হিয়ার সমান হাজার কাবা হাজার মস্‌জিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে, আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায়।।
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রৌশন্
যেথায় থাকুক সমান তাহার-
খোদার মস্‌জিদ্, মূরত্- মন্দির
ঈসাই-দেউল, ইহুদ খানায়।।
অমর তার নাম প্রেমের খাতায় জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে, থাকে না সে স্বরগ-আশায়।।
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৮২)

এখানে রুমীরই ন্যায় এক সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে এবং ওমর খৈয়াম ও রুমীর মধ্যে শাস্ত্রের কঠোর নিষেধ অনুশাসনকে ডিঙিয়ে যাওয়ার এক বিদ্রোহী বেপরোয়া ভঙ্গি। ব্যক্তি মানুষ ও সম্প্রদায় গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থ চেতনাকে ডিঙিয়ে গিয়ে প্রেমের আলোকিত ঐশ্বর্য দিয়ে এক মানব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে একাত্ম হওয়ার এই মন্ত্র ফারসি সুফি কবিদের মাধ্যমে নজরুল পেয়েছিলেন এবং তাদের কাব্যের এই অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্যকে নির্যাসের মতো নিংড়ে তার কাব্যের হৃদয়ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন।

৮

হাফিজের সময়টা ছিল খুবই কঠিন। সমগ্র পারস্যে ছিল মারামারি আর হানাহানি। হাফিজ এ সময় প্রেম তথা শান্তিবাদী চিন্তার প্রচার করেন তাঁর রুবাইগুলোর মাধ্যমে। তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞান-দীপ্ততা এবং শান্তি কামনা এই হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা ও অরাজকতার মাঝে মানুষকে স্থিরতা দেয়। তাঁর রুবাইয়াৎ এর চিন্তা প্রচারের মাধ্যমে তিনি সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গঠনের আহ্বান জানান। তবে হাফিজ তাঁর জীবনকালে কোন অজানা কারণে তাঁর কবিতার সংকলন তৈরি করেন নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর মোহাম্মদ গোলান্দাম নামে এক ব্যক্তি ৮১৩ হিজরি মোতাবেক ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দীওয়ানের সংকলন তৈরি করেন। তিনি ঐ সংকলনের একটি ভূমিকাও লিখেন। কাসিমে-আনওয়ার ৫৬৯ টি গজল সংগ্রহ করে তা হাফিজকে নিবেদন করেন। সুতরাং বলা যায় হাফিজের রচনার অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

রচনা পদ্ধতির ব্যাকরণশাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যাবলি অনুসৃত হয়েছে। তিনি 'কালিলা ওয়া দেমনা' গ্রন্থটিকে কাব্যরূপ দান করেন এবং অনুরূপভাবে 'সেন্দবাদনামে' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থটির তিনি অনুলেখক ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মাসনাভী (দ্বিপদী), কেতয়া (খণ্ড কবিতা), কাসিদা (স্তুতিমূলক কবিতা) ও রোবাঈ (চতুষ্পদী কবিতা)-এর আঙ্গিকে কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচনায় যারতুশতদেও সাংস্কৃতিক বহু নিদর্শন এবং আরবি ও ইসলামি উপাদানের তুলনায় অধিকমাত্রায় ইরানের প্রাচীন উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। (আহমাদ তামীমদারী[১], ২০০৭ : ৭৫-৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

পল্টনে পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের কাছে নজরুল হাফিজ ও তৈমুরের গল্পটি শুনেছিলেন। হাফিজ লিখেছিলেন,

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৪)

'আগর্ আঁ তুর্কে শিরাজি বেদস্ত আরদ্ দিলে মারা'
বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ ও বোখারা রা!!'

'যদিই কান্তা শিরাজ-সজনী ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমরকন্দ্ ও বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিল্‌টের!'

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩)

বিশ্ববিজয়ী তৈমুরের সঙ্গে সিরাজে হাফিজের মোকাবেলা সংক্রান্ত কাহিনী সম্পর্কে নজরুল বলেন,

> সেই সময় তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সমরকন্দ্। হাফিজ তাঁহার প্রিয়ার গালের তিলের জন্য তৈমুরের সাম্রাজ্য ও রাজধানী বিলাইয়া দিতে চাহেন শুনিয়া তৈমুর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পারস্য জয়ের সময় হাফিজকে ডাকিয়া পাঠান। উপায়ান্তর না দেখিয়া হাফিজ তৈমুরকে বলেন যে, তিনি ভুল শুনিয়াছেন, শেষের লাইনের 'সমরকন্দ্ ও বোখারা'র পরিবর্তে 'দো মন কন্দ্ ও সি খোর্মারা' হইবে। 'আমি তাহার গালের তিলের বদলে দু'মণ চিনি ও তিন মণ খর্জুর দান করিব!' কেহ কেহ বলেন, হাফিজ এ উত্তর দেন নাই। তিনি নাকি দীর্ঘ কুর্নিশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সম্রাট! আমি আজকাল এই রকমই অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছি!' এই উত্তর শুনিয়া তৈমুর এত আনন্দ লাভ করেন যে, হাফিজকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বহুমুল্য পারিতোষিক প্রদান করেন। হাফিজের নামে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নহে। (নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৩)

হাফিজকে বলা হয় সুফি কবি। মুসলমানদের কারো কারো কাছে তাঁর রুবাইগুলো গ্রহণযোগ্য হলেও গোঁড়া মুসলমানদের অনেকের কাছে তা ছিল অপছন্দনীয়। তাদের কেউ কেউ হাফিজকে ধর্মদ্রোহী এমনকি কাফের পর্যন্ত আখ্যায়িত করেছিলেন যেমনটি আখ্যায়িত করা হয়েছে নজরুলকে। হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর লাশ কবরে দিতে তারা অস্বীকার করেছিলেন। নজরুল হাফিজের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন :

> তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর গল্প শুনা যায়। শিবলি নোমানী, ব্রাউন সাহেব প্রভৃতি পারস্য-সাহিত্যের সকল অভিজ্ঞ সমালোচকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।
>
> হাফিজের মৃত্যুর পর একদল লোক তাঁহার 'জানাজা' পড়িতে (মুসলমানী মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে) ও কবর দিতে অসম্মত হয়। হাফিজের ভক্তদলের সহিত ইহা লইয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি হইলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের মধ্যে এই শর্তে রফা হয় যে, হাফিজের সমস্ত কবিতা একত্র করিয়া একজন লোক তাহার যে কোনো স্থান খুলিয়া দিবে; সেই পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন কবিতা পড়িয়া হাফিজের কি ধর্ম ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা[১] পাওয়া গিয়াছিল।-

---

[১] قدم دریغ مدارا از جنازه حافظ - گرچه غرق گناه است میرود بهشت (হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

'কদমে দরিগ মাদার আয জানাজায়ে হাফিজ
কে গর্‌চে গর্‌ কে গুনাহস্‌ত্‌ মী রওদ্‌ বেহেশ্‌ত।'
'হাফিজের এই শব হ'তে গো তু'লো না কো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশ্‌তে সে যাবে তবু।'

ইহার পরে উভয় দল মিলিয়া মহাসমারোহে হাফিজকে এক আঙুর-বাগানে সমাহিত করেন। সে স্থান আজিও 'হাফিজিয়' নামে প্রসিদ্ধ।

দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া আজও কবির কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৪)

হাফিজের উপরোক্ত কবিতার মর্মার্থ হলো 'হাফিজের লাশ থেকে তোমরা দূরে সরে যেও না, অনেক গুনাহ করলেও সে কিন্তু বেহেশতে যাবে। এই কবিতা আবিষ্কারের পর হাফিজকে 'লেসানুল গায়েব' বা অদৃষ্টের রসনা বলে স্বীকার করে উভয় দল মহাসমারোহ ও সম্মানের সাথে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অনেকের বিশ্বাস এখন পর্যন্ত কেউ তাঁর দেওয়ান খুলে দেওয়ানের যে কবিতার ওপর প্রথম দৃষ্টি পড়ে, সে কবিতায় তাঁর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পারস্য ভ্রমণে হাফিজের মাযারের পাশে গিয়ে এ ফাল গ্রহণ করেছিলেন। সংকীর্ণ, স্বার্থপর, গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় গোড়া ও ঈর্ষাতুর সমালোচকদের অনেকেই হাফিজের ন্যায় নজরুলকেও ইসলাম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই হয়ত নজরুল জানতেন, তাঁর মৃত্যুর পর হাফিজের ন্যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কবর দেয়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে, তাই নজরুল লিখে গিয়েছেন :

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাযীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেবাই।
কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌,
সেই কোরান শুনে' যেন আমি পরান জুড়াই।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই সম্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে;
আমি তাদের সাথে কে'দে' কে'দে'
আল্লার নাম জপিতে চাই।

(নজরুল ইসলাম[৮], ১৯৮৪ : ১০)

হাফিজের ন্যায় পার্থিব জীবনে নজরুল ছিলেন আড়ম্বরহীন ও সাদা-সিধে। নজরুল নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!

Dhaka University Institutional Repository

আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ১০)

ঠিক একই ভাবে হাফিজ নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'রেন্দা' বা মাস্তান হিসেবে। হাফিজ নিজ সম্পর্কে বলেছিলেন :

برسر تربت ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ১১৯)

'বর্ সরে তর্‌বতে মা চুঁগুজরি হিম্মত্ খাহ্,
কে জিয়ারত্‌গহে রিন্দা জাহাঁ খাহেদ্ শোদ্!'

আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশিস্ তুমি,
এ গোর হবে ধর্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি!
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৪৫)

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলো হচ্ছে- *মৃত্যুক্ষুধা*, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*, *নজরুল গীতিকা*, *ঝিলিমিলি*, *প্রলয় শিখা* ও *চন্দ্রবিন্দু*। নজরুল গীতিকায় স্থান পেয়েছে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক *ওমর খৈয়াম গীতি* ও *দীওয়ানে হাফিজ গীতি* :

সৃজন- ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে।
পিও শরাব পিও! তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
কানন গিরি সিন্ধু-পার ফির্‌নু পথিক দেশ-বিদেশ, ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন ভুবন অশেষ
আজ বাদে কাল আস্‌বে কি না; কে জানে ভাই কে জানে।,
ভোল্ রে ব্যথা বেদন-আতুর, লাল শারাব-ভরপূর-প্রাণে।
তরুণ প্রেমিক! প্রণয় - বেদন; জানাও জানাও বে-দিল্ প্রিয়ার
যেদিন ল'ব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়ে! ধুয়ো 'লাশ' আমার লাল পানি দিয়ে
কোন্ মাটিতে আমার কায়া, সৃজিলে হায় প্রভু মোর।
মস্‌জিদে মোর ঠাঁই নাহি পাই, সকল দেউল বন্ধ-দোর।
(নজরুল ইসলাম[৬], ২০০৭ : ১০-১৫)

নজরুলও স্বীয় মৃত শিশুপুত্র বুলবুলের স্মরণে হাফিজের মৃত শিশুপুত্রের দুঃখের অনুকরণে বহু দুঃখ ও শোকের গান করছিলেন। নজরুলের গান- 'ঘুমিয়েছে ফুল পথের ধূলায় জাগিওনা উহারে, ঘুমাইতে দাও' আমাদের প্রিয় ফুল, ফুলের মত প্রিয়জন পথের ধূলায় ঘুমাচ্ছে, হে পথিক চলার পথে একটু সাবধানে যেও, আমার প্রিয় ফুলকে জাগিও না, আমার প্রিয়জনকে ঘুমাইতে দাও। হে বনের পাখি ধীরে গান গাও, হে দখিনা হাওয়া তুমি ধীরে

Dhaka University Institutional Repository

ধীরে বয়ে যাও, আমার প্রিয়জন যার মৃত্যু হয়েছে এখনো তার চোখে অশ্রু। হে প্রভাত রবি, এ অশ্রু যেন না শুকায়। নজরুলের নিজের চোখেই ছিলো অশ্রু, তিনি আপন মনেই গেয়েছেন,

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়
জাগিও না উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখি ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও ॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ছলছল,
প্রভাত-রবি শুকায়ো না তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও ॥
সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ,
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
ভূলিয়া দ'লো না ঝরাপাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও ॥
(নজরুল ইসলাম[৫], ১৯৯৩ : ৩৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমাদ তামীমদারী : *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইরান, ২০০৭ খ্রি.।

২. হাফিজ সিরাজী : খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ: *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫।

৩. গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার : *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জপাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩।

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৫. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৬. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৩, মার্চ ২০০৭, বাএ ৪৫৫৩।

৭. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৬০।

৮. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৯. ফেরদৌসী, আবুল কাশেম : শাহনামা, অনুবাদক- মনিরউদ্দীন ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ-আষাঢ় ১৪১৯, জুন ২০১২।

১০. মঈনুদ্দীন : *যুগ-স্রষ্টা নজরুল*, প্রকাশক: খান মুহাম্মদ শিহাব, আল-হামরা লাইব্রেরী, চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৬।

১১. মোবাশ্বের আলী : *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

১২. রাজীব হুমায়ুন : *নজরুলের লেখার গল্প শেখার গল্প*, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন-১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১, আগামী প্রকাশনী।

১৩. শেলী, রাশেদুল হাসান, মাহবুব বারী সম্পাদিত: *নজরুল সাহিত্যে ফারসী ভাষার প্রভাব*, নজরুল গবেষণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, প্রকাশকাল : জুন-২০০৫, জৈষ্ঠ-১৪১২,।

Dhaka University Institutional Repository

খৈয়াম প্রভাবিত নজরুল সাহিত্য

কালের পরিক্রমায় ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে সকল মহামণীষীগণের সমুন্নত আধ্যাত্মিক শক্তি, সুগভীর চিন্তাধারা ও গবেষণাধর্মী অবদান রয়েছে এবং ফারসি ভাষী নন এরূপ চিন্তাশীল কবি, সাহিত্যিকগণকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছেন–তাঁদের মধ্যে ওমর খৈয়াম[১], মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী[২], ফেরদৌসি, হাফিজ শিরাজী, শেখ সা'দী প্রমুখ মহাপুরুষগণের নাম প্রণিধানযোগ্য যাঁদের যাদুময় ভাষা ও সাহিত্য রস ভাণ্ডারের গভীরে পরিচিত ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ফারসি সাহিত্যের মহান মণীষীগণ বিশেষকরে মিষ্টভাষী কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক ও আরেফ ইরানের নিশাপুরের হাকীম ওমর খৈয়ামের চিন্তার প্রখরতা, ভাষার লালিত্য, বাচনভঙ্গির শুদ্ধতা ও যাদুময় আকর্ষণ নজরুলের মাঝে প্রেমের মণিমাণিক্য ও জ্ঞান-মণীষার রত্নভান্ডার বিতরণ করেছে। খৈয়ামের ভাষায় মানুষের পরিচয়, মানুষের জ্ঞানের কথা, জীবনের গুঢ় রহস্য, জীবন ও জগতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে মানব মনের কৌতুহল ইত্যাদির আগ্রহপ্রবণতা ও চিন্তা-চেতনার সত্যিকার প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীতে বহু গবেষক ও সাহিত্যিক খৈয়াম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। যেমন:

> ওয়েইকে, কার্সন, দোতাসী, নিকলাই, তনুফীল, গ্যাটে, ফিটজিরাল্ড, ইয়ান ফালীদ, অ্যালেন রায়স, ক্রিস্টেন সেন, এডওয়ার্ড ব্রাউন, আর্নেস্ট, রোনান, জর্জ সালিমুন, যুকোফেস্কী, গার্লো, বীর সালভা, মীনুরোস্কী প্রমুখ অসংখ্য ওরিয়েন্টালিস্ট ও পাশ্চাত্য জগতের নামীদামী সাহিত্য বিশারদ তাঁদের মূল্যবান জীবনের পুঁজি বিনিয়োগ করে বছরের পর বছর ওমর খৈয়ামের ভাষা, বর্ণনা এবং তাঁর সময়কার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও রুবাইগুলোকে বহুবার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। (নিউজ লেটার[৬], ২০০২ : ৭)

১

খৈয়াম আর নজরুল সমসাময়িক ছিলেন না। কারণ খৈয়াম জন্মেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে (১০৪৮খ্রি.) আর নজরুল ছিলেন বিশ শতকের মানুষ (১৮৯৯-১৯৭৬)। তবে মানস-রাজ্যে তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক। কারণ খৈয়াম যদিও জন্মেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু চিন্তাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একুশ শতকের আধুনিক মানুষের চেয়েও অগ্রগামী।

জ্যোতির্বিদ, বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ, যুক্তিবাদি ও দার্শনিক খৈয়ামের কবি পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে তাঁর মৃত্যুর বহু পরে। খৈয়াম তাঁর রুবাইয়াতের জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ওমর খৈয়াম অবকাশ যাপনের জন্যই রুবাই[৩]গুলো (চতুষ্পদী কবিতা) রচনা করেছেন। রাজনীতিবিদ চার্চিল যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্কেচ রচনায়

---

[১] ওমর খৈয়াম ইরানের উত্তর খোরাসানের নিশাপুর শহরে আনুমানিক একাদশ শতকের মধ্যভাগে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে খালেকান তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'কিতাব ওয়াফিয়াতুল আইয়ান'-এ ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর তারিখ ৫১৭ হিজরি বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী ১১২৩ থেকে ১১২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওমর খৈয়ামের মৃত্যু হয়েছে। (সিকানদার আবু জাফর, পৃ. ১০)

[২] মাওলানা রুমীর আসল নাম জালালুদ্দীন মুহাম্মদ। পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন খতীবী। পিতার উপাধি বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ যিনি ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত বুজুর্গ আলেম। হিজরি ৬০৪ সনের ৬ রবিউল আউয়াল (১২০৭ খ্রি.) শেখ বাহাউদ্দিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ববিখ্যাত সাধক কবি জালালুদ্দিন মুহাম্মদ। (মাওলানা রুমী[১১], ২০০৮ : ১৯)

[৩] রোবাই শব্দটি রুবা' হতে উদ্ভুত। রুবা' মানে চার সংখ্যা বিশিষ্ট। যে কোন জিনিস চারটি অংশ যুক্ত হলে তাকে রুবা' বলা হয়। পরিভাষায় রোবাঈ বলা হয় সে কবিতাকে যার চারটি অংশ, পঙক্তি থাকে। কখনো কখনো প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনায় একে 'দোবেইতী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। (উদ্ধৃত, আহমাদ তামীমদারী[১], ২০০৭ : ১৪০)

Dhaka University Institutional Repository

হাত দিয়েছিলেন খৈয়ামও তেমনি যখন জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের বিষয়াবলি চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন, কেবল তখনই স্বীয় ক্লান্তি ও অবসাদ দূর এবং আত্মপ্রশান্তির জন্য নিজস্ব চিন্তাধারাকে সরল এবং সাবলীল ভাষায় কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

খৈয়ামের রচনা[১] বহুমুখী ছিল। তাঁর রচনাবলির মধ্যে এ পর্যন্ত ছোট-বাড় মোট আঠার খানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর গণিত ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ এবং দর্শনের দুইটি গ্রন্থ আরবিতে লিখিত, দর্শনের আর একটি গ্রন্থ আবু সীনার রচিত আরবি দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ। *রুবাইয়াত* ও *কুজানামা* (কবিতাগ্রন্থ) ফারসি ভাষায় রচিত। আরবিতে লিখিত *যীচ মালিকশাহী* পুস্তিকা একটি জ্যোতিষী ক্যালেণ্ডার। তাছাড়া তাঁর কিছু আরবি কবিতা ও আরবি রুবাইয়াতও ছিল। কিছু গ্রন্থ তাতারদের আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ওমর খৈয়ামের বিশ্ব জোড়া কবি খ্যাতি ছড়ায় মূলত তার রুবাইর অনুবাদের মাধ্যমে। সে সূত্র ধরে আমরাও খৈয়ামের সাথে পরিচিত হয়েছি। ভারতবাসীকে একদা নবরূপ উপনিষদের মর্মকথা শুনিয়েছিলেন মসিয়েঁ দ্যু পে আর বিশ্ববাসীকে ওমরের কাব্যরস সুধার অপার্থিব সন্ধান দান করেছেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড। ফিট্জেরাল্ডের অনুবাদের সূত্র ধরেই কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সিকানদার আবু জাফর তাঁদের স্বমানসিকতার প্রতিফলনের সূত্রে গ্রথিত রুবাইগুলোকে একত্রিত করে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমূখও আবেগজড়িত হয়ে কয়েকটি রুবাই অনুবাদ করেছেন।

ওমর খৈয়ামের ব্যক্তিজীবন ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিকের মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন সম্পর্কে কিছু খণ্ড-ছিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ওমরের কাব্যজীবনের মূল প্রেরণায় ছিলেন অন্ধ কবি আবুল আ'লা। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ। তাঁর কবিতায় ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের সুরই মুখ্য, কিন্তু এ বিদ্রোহ যদি ওমরের কাব্য রচনার উৎস ও প্রেরণা হয় তাহলে ওমর শুধু অমর করেছেন তাঁর মাতৃভাষা ফারসিকে। এ-বিদ্রোহ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ-বিপ্লব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার বলিষ্ঠ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

খৈয়ামের কাব্য চর্চার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনে উপসমহীন যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এ যন্ত্রণা প্রশমনের কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আত্মিক প্রশান্তির আশ্রয় হিসেবে নির্ভেজাল শান্তির পথ-কবিতার পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। নজরুল অনূদিত খৈয়ামের একটি কবিতায় দেখতে পাই :

শারাব নিয়ে বসো, ইহাই মহমুদেরই সুলতানৎ
'দাউদ' নবীর শিরীন-স্বর ঐ বেণূ-বীণার মধুর গৎ।
লুট ক'রে নে আজের মধু, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩১১)

---

[১] খৈয়ামের আরবি গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে বীজগণিত- মাকালাতু ফি'ল জবরি ওয়াল মুকাবিলাহ (মূলগ্রন্থ), বর্গমূল ও ঘণমূল নিষ্কাশনের ভারতীয় পদ্ধতি এবং ত্রিকোণমিতি সাহায্যে বীজগণিতের সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি; জ্যামিতি- মুসাদিরাতু কিতাব-ই-উকলিদাস। ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলো সম্বন্ধে ইহা আলোচনা গ্রন্থ। গণিত- মুশকিলাতুল হিসাব। গাতিতিক কতিপয় জটিল সমস্যা সংক্রান্ত ইহা অনুশীলনী, মীযান উল হিকম। ইহা আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্র সম্পর্কে পুস্তিকা। ভূগোল- লাওয়াযিমু আমকিনা- ঋতুপরিবর্তনের নৈসর্গিক কারণ সংক্রান্ত পুস্তিকা। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান- আলকেমী বা ধাতব পদার্থেও রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও মিশ্রণের হার সংক্রান্ত একটি পুস্তক। ইহা ভেষজবিজ্ঞানও বটে। দর্শন- কউন ওয়া তকলীফ (সৃষ্টি ও মানুষের নৈতিক দায়িত্ব), উহার পরিশিষ্ট (ঝঢ়ঢ়যবসবহঃ), আর-বিসালাতুল-উলা ফি'ল ওজুদ (ধাতব জগতের অস্তিত্ব ও স্বরূপ), ১ম ও ২য় খণ্ড। ((বরকতুল্লাহ[৬], ১৯৮৯ : ১১২)

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম পাঞ্জাবের মৌলবি সাহেবের কাছেই প্রথমত খৈয়ামের পরিচয় লাভ করেন। তাঁর কাছেই শুনেছেন খৈয়ামের রুবাই সম্পর্কে– হে সাকি, আমার আজকে রাতের খোরাক কি জানো ? আমার খোরাক, তোমার ওই টুকটুকে ঠোঁট। হে সাকি, আমাকে গজল শোনাও। আমাকে লাল শিরাজি দাও-শারাব দাও-তোমার লজ্জা-রাঙা গালের মতো গোলাবি শারাব ইত্যাদি।

মৌলবি সাহেবের কাছে নজরুল খৈয়ামের আরো রুবাই শুনেছেন– আজকের দিনটি তোমার হাতে আছে। আগামীকাল? না আগামীকাল তোমার হাতে নেই। সুতরাং 'কাল' নিয়ে চিন্তা করে তোমার দুঃখ বাড়িও না। এই ক্ষণিক জীবন আর বাজে কাজে ব্যয় করো না। আগামীকাল যে তোমার নিঃশ্বাস থাকবে-তার বিশ্বাস কি? এ ধরনের রুবাই শুনতে শুনতে শারাব, সাকি, নার্গিস, গোলাব ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নজরুলকে চিন্তায় ফেলল। 'সাকি' কে? 'শারাব', 'মদ', 'শিরাজি' শব্দের মূল রহস্য কি! ইত্যাদি বিষয়। এভাবে নজরুল বুঝতে পারলেন, ইরানি কবিগণ শারাবকে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে আনন্দ-ভূমানন্দকে বোঝেন-যে আনন্দরূপিণী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকি বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন।

ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিকী শব্দ ব্যবহারের ফলে অনেকেই হাফিজ, রুমী ও খৈয়ামসহ অনেককেই কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অনুসরণে সাহিত্য রচনার ফলেও অনেকেই তাঁকে কাফের বলেছেন। নজরুল সত্যিই বুঝতে পেরেছেন, ফারসি কবিদের ব্যবহৃত রূপক শব্দ এশ্‌ক (عشق) মানে হচ্ছে আধ্যাত্ম প্রেম, যে প্রেম কারো অন্তরে জাগ্রত হলে ব্যক্তিকে উন্মত্ত ও মাতাল বানিয়ে দেয় এবং তাকে ফানাফিল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার তাগাদা তাঁর অন্তর আত্মাই দিয়ে থাকে। সা'কি (ساقی) অর্থাৎ যিনি শরাব পান করান। কাব্যে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে যিনি সে ঈশ্বরিক প্রেমের দিশারি, গুরু বা সালেক (سالک)। শারা'ব (شراب) দ্বারা এঁরা বোঝান আল্লাহর প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে থাকে। মেইখানে (میخانه) অর্থাৎ বন্দিগীর স্থান তথা ঈশ্বরিক প্রেমের লীলা নিকেতন। সা'লেক (سالک) শব্দটি গুরু বা পীর অর্থে সুফি কবিরা ব্যবহার করে থাকেন। বুত (بت) দ্বারা মনের মাঝে বিরাজমান প্রতিমা বা মূর্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে। নায (ناز) অর্থাৎ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার রাগ-অনুরাগ। বা'দেহ (باده) অর্থাৎ বাসি বা এমন পুরানো পানীয় বা শরাব যা পানে তীব্র মাদকতা সৃষ্টি করে। কবি ও সুফিদের পরিভাষায় বা'দেহ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা আল্লাহর সাহায্য ও প্রেম দ্বারা আল্লাহর পথের প্রেমিককে নিষিক্ত করে থাকে। লাব (لب) অর্থাৎ খোদায়ী নৈকট্য। পীর ও মুরশিদ অর্থ দীক্ষা গুরু অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথে যিনি নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। জুলফ (زلف) অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়ার যোগসূত্র ঘটায় যে জিনিস। খা'ল (خال) শব্দটি খোদায়ী নূরের আকর্ষণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জা'ম (جام) অর্থাৎ অন্তকরণ যা এই খোদায়ী প্রেমকে ধারণ করে থাকে। মেই (می) অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগ। মেইকা'দেহ (میکده) ইহজগতের সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সুমহান খোদায়ী জগত, যেখানে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুগণ তাঁর সাক্ষাতে হাজির হবেন। বুতকাদেহ (بتکده) সুফিদের ভাষায় ঐশ্বরিক জগত বা উর্দ্ধলোককে বুঝানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া একক খোদায়ী সত্তার প্রতিভাসকেও বুঝানো হয়ে থাকে। লা'লে (لال) শব্দটি সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আশ্‌ক (اشک) অর্থাৎ প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের অশ্রুপাত ও বেদনা। মানব আত্মা ও পরম আত্মাকে বুঝানোর জন্য রূপক হিসাবে সুফি কবিরা আ'শেক (عاشق) ও মাশুক (معشوق) শব্দদ্বয় ব্যবহার করে থাকেন। সার্ভ (سرو) এটা পয়গাম্বর ও অলীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (অবলম্বনে, উদ্ধৃত, সিরাজী[১৩], ২০০৪ : ১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

ওমর খৈয়াম একাদশ শতকের কবি হলেও চিন্তা-চেতনায় কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই জুলুম, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের কবিতায় মানবতার মুক্তি ও প্রেমের বাণী ফুটে উঠেছে। তাঁদের সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে নয় বরং ধর্মব্যবসায়িদের বিরুদ্ধে ছিল। খৈয়ামের জীবন দর্শন সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ নেই। বহু যুগের প্রশ্ন, তিনি কি নিছক সুখবিলাসি দার্শনিক ছিলেন ? তিনি কি ইহকালের সুখ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন ? তিনি কি মদ, সাকি, কুমারি পরিচারিকা ও কোলাহলপূর্ণ সরাইখানার অনুরক্ত ছিলেন ? নাকি খৈয়াম প্রতিকী তথা কবিতার প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রশ্নের যোগ্য শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন ? এ ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর আজও অসমাপ্ত রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অনূদিত রুবাইয়াতের ভূমিকায় বলেছেন :

> ওমর সুফি ছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু ঐ পথের পথিক যাঁরা তাঁরা ওমরকে সুফি এবং খুব উঁচুদরের তাপস বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, সুফি জনপ্রিয়তার বা লোকের শ্রদ্ধার জুলুম এড়াবার জন্যই ঘোরতর পাপ পরিহার করেন। তাঁরা নিজেদের মদ্যপ লম্পট ব'লে স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করে নিজেরা গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকেন। তা ছাড়া, ইরানে কবির শারাবকে সকলে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে আনন্দ–ভূমানন্দকে বোঝেন-যে আনন্দ-রূপিণী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে' গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকী বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন। (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৮৯-২৯০)

ওমর খৈয়াম সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, 'ওমরের কাব্যে শারাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা, অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনী, তাঁর জীবনও ছিল তেম্‌নি। (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৮৮)

খৈয়ামের রুবাইয়াতে নেই ইউসুফ-জোলায়খার প্রেমালাপ, নেই লায়লি-মজনুর প্রেমের আত্ম-বিসর্জন এবং এতে নেই প্রাচ্য দেশীয় চিরন্তন রাঁধা-গদে ঈশ্বরের আয়তিও। এতে আছে সেই তথ্য যা যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের চিন্তাকে বিব্রত এবং হৃদয়কে আলোড়িত করে আসছে। এতে আছে সেই তথ্য; যা পৃথিবীর জন্মকাল থেকে অদ্য পর্যন্ত কেউ মীমাংসা করতে পারে নি; এতে আছে শত দর্শন, শত বিজ্ঞান যার গভীরতায় মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। মানুষের পরিণাম, স্বর্গ, নরক, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ন্যায়ের পুরস্কার, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত; এ সকল জটিল সমস্যা সকলেরই জীবনে একবার না একবার উদয় হয়ে মনকে আলোড়িত করে, মানুষ যার সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পরে।

খৈয়ামের রুবাইয়াতের মধ্যে এসব প্রশ্নের প্রতিধ্বনি উঠেছে; একজন মুক্তপ্রাণ সাধকের অন্তরের অন্তস্থল হতে। যখন রুবাইয়াত ইউরোপে প্রচারিত হয়; তখন ইউরোপে এর প্রয়োজন ছিল। মৃত্যুর পর কি হবে ? এ কঠিন সমস্যার একটি সঠিক উত্তরের জন্য মানুষ চিরকাল উদ্বিগ্ন। এ প্রশ্নের যেদিন যথার্থ সমাধান হবে-সেদিন জগতের ধর্ম-বিপ্লবের অবসান ঘটবে। হয় ধর্মের কোন প্রয়োজন থাকবে না, অথবা কোনও একটা নির্দিষ্ট ধর্ম চিরকালের জন্য অবিসংবাদিতভাবে রাজত্ব করতে থাকবে। বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব কিছুকাল মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন প্রচলিত ধর্মের আশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করে ভিতরের শূন্যতা অনুভব করে; তখন দারুণ নিরাশায় স্বীয় প্রাণ আবার হাহাকার করে উঠে। এর ফলেই জগতে বিভিন্ন সময়ে পুরাতন ধর্মে মানুষের মনে বিদ্রোহ জেগেছে! যুগে যুগে নাস্তিকতার উদ্ভব হয়েছে! মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থাও অনেকটা এরূপ হয়েছিল। আঁধার যুগের পুরোহিতদল জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাকে পঙ্গু করে

Dhaka University Institutional Repository

তার পৃষ্ঠে ধর্মাদেশ ও আচার-অনুষ্ঠানের এমন গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছিল যে, তার নিষ্পেষণে সারা ইউরোপের চিন্তাশক্তি ক্ষেপে উঠেছিল।

বিদ্রোহোম্মুখ উন্মত্ততা নিয়ে ইউরোপের চিন্তাশীলগণ যখন বিজ্ঞানের চক্ষু দ্বারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন; তখন তাদের ধারণা হল পাদরিদের বিরাট কলেবর গ্রন্থরাজির অধিকাংশ মনগড়া অলীক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। খ্রিস্টীয় শাস্ত্রের এবং তাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর ওপর এক দারুণ অশ্রদ্ধায় তাদের হৃদয় ভরে উঠল। ঠিক সে সময় ইউরোপে প্রচারিত হল খৈয়ামের গ্রন্থ। যে কথাটা ইউরোপীয়দের মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়েছিল; ওমরের সংগীতে যেন তাই সুস্পষ্ট ভাষায় বেজে উঠল। সুতরাং তারা তা প্রাণে বরণ করে লইল। এশিয়া মহাদেশে রুবাইয়াত খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন :

> আরব, পারস্য বা ভারতবর্ষ, প্রভৃতি দেশের লোক বরাবরই পুরাতন-পন্থী (Conservative); ইহারা যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহারই পক্ষপাতী, যাহা নূতন-যাহা অপরিচিত-তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তেমন প্রস্তুত নহে। তাই এদেশে ওমরের সুরও বোধ হয় শিক্ষিত সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। (বরকতুল্লাহ[৬], ১৯৮৯ : ১২১)

বিশ্ব সাহিত্য সমাজে খৈয়ামের রুবাইয়াত নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কেউ খৈয়ামকে ইসলামপন্থী আবার কেউ ইসলাম বিদ্বেষী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন; যদিও এ ধরনের ধারণা পবিত্র কোরআন পরিপন্থী। কারণ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (حجرات:٤٩،آية ١٢)

'হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্।' (সূরা হুজরাত-৪৯ : আয়াত-১২)

তাঁর চতুস্পদীগুলোর (রুবাইয়াত) মধ্যে কোথাও তিনি আশাবাদে উজ্জ্বল, কোথাও আবার নৈরাশ্যবাদে বিবর্ণ। কখনও তিনি অদৃষ্টবাদে উৎকণ্ঠিত আবার তার পরেই অজ্ঞেয়বাদে বিবৃত। কোথাও তিনি তপস্যাবাদে মন্ত্রণামুখর, কোথাও আবার ভক্তিবাদে গদগদ-কণ্ঠ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিহাসপ্রিয়তায় তিনি লঘুপক্ষ। (সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ১) এ থেকে তাঁর সত্যিকার মতাদর্শ নির্ণয় করা কঠিন। তিনি কি সুফিবাদের মরমীবাদে বিশ্বাসী না এপিকিউরীয় (Epicurean) দর্শন অনুসারে দেহবাদের পক্ষপাতী ? দার্শনিক জেনোর (Zeno) মতানুসারে সুখ-দু:খে নিরাসক্তি সম্বন্ধেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব ? এভাবে তর্কের স্তূপ জমে উঠেছে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নি। কাজী নজরুল ইসলাম খৈয়াম সম্পর্কে বলেন :

> ওমরকে তাঁর কাব্য প'ড়ে যাঁরা Epicurean ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণত ছয়ভাগে বিভক্ত- ১। 'শিকায়াত-ই-রোজগার', অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ; ২। 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ; ৩। 'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া', বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা; ৪। 'বাহরিয়া'-বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, পাখী ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা; ৫। 'কুফরিয়া'-ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এইগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতা-রূপে কবি-সমাজে আদৃত। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ-পুণ্যেও মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত; ৬। 'মুনাজাত'- বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মত প্রার্থনা নয়, সুফির প্রার্থনার মত এ হাস্য-জড়িত। (নজরুল ইসলাম[৮]: ১৯৮৪ : ২৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল 'মদ-সুরা' বেষ্টিত ইরানের কবিদের সম্পর্কে বলেন, এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়। (নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৪১)

২

ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর ৬০০ বছর পর (১৮৬৭ খ্রি.) থেকে ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে খৈয়ামের রুবাই 'চতুস্পদী' কবিতাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ সমাদর লাভ করতে থাকে। অবশ্য এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড ১৮৫৯ সালে তাঁর অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। তবে, সে অনুবাদ ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে দীর্ঘকাল পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু যখন ইউরোপীয় পাঠক মহলে খৈয়াম পরিচিত হতে লাগলেন, গোটা ইউরোপে যখন অসংখ্য 'খৈয়াম' ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর কবিতা চর্চা শুরু হল; তখন জানা গেল যে, বহি:বিশ্বে ওমর খৈয়ামের পরিচয় এড্ওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডই প্রথম তুলে ধরেন নি। এ সম্পর্কে সিকান্‌দার আবু জাফর বলেন, 'ফন হ্যামার ১৮১৮ সালে ওমর খৈয়ামের কবিতা জার্মান পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু জার্মান ভাষা তেমন বহু-প্রচলিত ভাষা না হওয়ায় ইউরোপের সর্বত্র ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে তেমন কৌতুহল জাগে নি।' (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ১)

১৮৫৯ সালে এড্ওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পর পারস্যের ফরাসি দুতাবাসের দোভাষী A.E. Nicholas তেহরানে লিথোগ্রাফ করা একটি পাণ্ডুলিপির আক্ষরিক অনুবাদ ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহা দেখে (প্রথম পর্যায়ে সফলকাম না হলেও) ফিটজেরাল্ড নতুন উৎসাহ লাভ করে ১৮৬৭ সালে ওমর খৈয়ামের অনুবাদ দ্বিতীয় এবং বর্ধিত সংস্করণে প্রকাশ করেন। তখন থেকেই ধীরে ধীরে ওমর খৈয়ামের সম্মান ও পরিচিতি পাঠক মহলে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সম্পর্কে সিকান্‌দার আবু জাফর বলেন :

> ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর ৩৩৮ (মতান্তরে ৩৫০) বছর পর ১৪৬০-৬১ সালে অক্সফোর্ডের বদলীয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত, বাছাই-না-করা স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপির ভেতর থেকে কেমব্রিজের ইতিহাসের অধ্যাপক E.B. Cowell, হঠাৎ ওমর খৈয়ামের ১৫৮ টি চতুস্পদীর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করলেন। সেটি ১৮৫৬ সালের ঘটনা। পাণ্ডুলিপিটি লেখা ছিল হলদে কাগজে বেগুনী রঙের কালিতে, তার উপর দিয়ে সোনালী রঙের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া। (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ২)

অধ্যাপক E.B. Cowell, ওমর খৈয়াম ও উক্ত চতুস্পদী সম্পর্কে ১৮৫৮ সালে Caltutta Revlew পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধ ফিটজেরাল্ডকে অনুবাদের জন্য আরো আগ্রহী করে তোলে। 'জন পেইন যে পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করেছেন সেটা লক্ষৌ লিথোগ্রাফ নামে পরিচিত। তাতে চুতস্পদীর সংখ্যা মোট ৭৬২। অবশ্য জন পেইন আরও ৮৩ টি চতুস্পদী সংগ্রহ করে উক্ত লক্ষৌ লিথোর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোট ৮৪৫টি চতুস্পদীর অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৯৮ সালে।' (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ২)

এভাবে ওমর খৈয়ামের পরিচিতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির পরিচয় প্রকাশ হতে লাগল। খৈয়ামের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সিকান্‌দার আবু জাফর বলেন :

> এ পর্যন্ত যতগুলো পাণ্ডুলিপির পরিচয় পাওয়া গেছে তার ভেতরে E.B. Cowell. এর খুঁজে বার করা পাণ্ডুলিপিটিই সম্ভবত: সবচেয়ে পুরোনো। প্যারিসের Bibillotheque National-এ যে পাণ্ডুলিপিটি আছে তার তারিখ হল ১৫২৭ সাল। তাতে ৩৫৯টি চতুস্পদী লিপিবদ্ধ আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে

Dhaka University Institutional Repository

> ৫৪০টি চতুষ্পদীর আর একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটির তারিখ ১৬২৪ সাল। (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩)

ওমর খৈয়ামের রচিত-তালিকাভূক্ত চতুষ্পদীর সংখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে প্রায় বারো শত। নজরুল বেছে বেছে খৈয়ামের মাত্র ১৯৭টি রুবাই অনুবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন :

> আমি ওমরের রুবাইয়াৎ ব'লে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ রুবাই বেছে' নিয়েছি; এবং তা ফার্সী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গী বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ্ খায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আমার মতো-কবির কবিতার মতো তা একেবারে বাজে। বাকীগুলিতে ওমর খৈয়ামের ভাব নেই, ভাষা নেই, গতি ঋজুতা–এক কথায় স্টাইলের কোনো কিছু নেই। (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯১)

বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই ধারণা এগুলো খৈয়ামের নিজের রচনা নয়। যেভাবেই হোক অন্য কারো রচনা তাঁর নামে চালু হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে সিকান্‌দার আবু জাফর বলেন, 'গবেষকদের বেশির ভাগ লোকের ধারণা ওমরের চতুষ্পদীর সংখ্যা সাত'শ থেকে আট শ'র ভেতরে। ওমরের নামে প্রচলিত বেশ অনেকগুলি চতুষ্পদীই যে তাঁর রচনা নয়, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দলিলপত্র যুক্তিতর্ক দিয়ে তা প্রমাণও করেছেন।' (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩)

এ বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, 'খুব সম্ভব এগুলি অন্য-কোনো পদ্য–লিখিয়ের লেখা। আর, তা যদি ওমরেরই হয়, তবে তা অনুবাদ ক'রে পণ্ডশ্রম করার দরকার নেই। বাগানের গোলাপ তুল্‌ব; তাই ব'লে বাগানের আগাছাও তুলে' আন্‌তে হবে এর কোনো মানে নেই।' (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯১)

সংখ্যা যাই হোক ওমর খৈয়াম আজ বিশ্বনন্দিত কবি ও দার্শনিক। 'বিশ্ব সাহিত্য দরবারে ওমরের এ কবি পরিচিতির পেছনে অবশ্যই এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের চেষ্টা সবচেয়ে বেশি যদিও হেরণ অ্যালেন বা জন পেইনের মত গবেষক পণ্ডিতরা এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডকে ওমরের যোগ্য ও যথার্থ অনুবাদক বলে স্বীকার করেন নি। অনুবাদে যথেষ্ট স্বাধীনতা যে নিয়েছেন, ফিটজেরাল্ড নিজেও তা স্বীকার করেছেন। (সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩)

যারা ফিটজেরাল্ডের কবিতার অনুবাদ করেছেন তাদের সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

> ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিট্‌জেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার এ অনুবাদে। যদি না শোনায়, সে আমার শক্তির অভাব-সাধনার অভাব, কেননা কাব্য-লোকের গুলিস্তান থেকে সঙ্গীত-লোকের রাগিণী-দ্বীপে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। সঙ্গীত-লক্ষ্মী কাব্য-লক্ষ্মী দুই বোন ব'লেই বুঝি ওদের মধ্যেই এত রেষারেষি। একজনকে পেয়ে গেলে আরেক জন বাপের বাড়ী চলে' যান। দুই জনকে খুশী ক'রে রাখার মতো শক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই, শক্তিও নেই। কাজেই, আমার অক্ষমতার দরুন কেউ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে' না যান। (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯১)

Dhaka University Institutional Repository

খৈয়ামের রুবাইয়াতের যে পরিমাণ অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদকর্মে ভাষা বৈচিত্রের যে সমাহার দেখা যায় তা-ই খৈয়াম বিশ্বজয়ী হবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিঃসন্দেহে খৈয়াম এর রুবাইয়াতের এ খ্যাতি ও বিশ্বজয়ী গ্রহণযোগ্যতা ইংরেজ কবি ও লেখক ফিটজিরুল্ডের মুক্ত ও শৈল্পিক অনুবাদের কাছে ঋণী। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছরের ব্যবধানে ফিটজিয়াল্ডকৃত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ ২৫ বার মুদ্রিত হয়। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত রুবাইয়াতে খৈয়াম কেবল ইংরেজি ভাষাতেই ১১০ বার মুদ্রিত হয়। এসব অনুবাদ ও মুদ্রণ রুবাইয়াতে খৈয়ামকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ, বইপুস্তক, সংগীত বিষয়ক রচনা ও থিয়েটার এর হিসাব থেকে আলাদা।

খৈয়ামের রুবাইয়াত এবং তার বিষয়বস্তু ও ভাব-ভঙ্গি ইঙ্গিত ভাবার্থ নিয়ে বহু মতভেদ ও বিতর্ক আছে। একদল গবেষক মনে করেন যে, খৈয়ামের নামে প্রচলিত রুবাইয়াত প্রকৃতপক্ষে খৈয়ামের নয়, বরং অন্য কোনো কবির, যার নামও একই রকম ছিল কিন্তু দার্শনিক ও গাণিতিক ছিলেন না। তবে অপর একদল গবেষক মনে করেন যে, উল্লেখিত রুবাইয়াত মহান গাণিতিক ও দার্শনিক ওমর খৈয়ামের চিন্তা-দর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ। তারা একই নামের অন্য কোনো কবির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন।

সমালোচকরাও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রুবাইয়াতে খৈয়ামের অনুবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। কিছু লোক স্থুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাসাভাসা মূল্যায়ন করেছেন। ফলে তারা শরাব, সুরাহি, পানপাত্র, ভোগ, সুখ ও বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ততা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি। ভাসা ভাসা দৃষ্টিভঙ্গি ঐসব রুবাইর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারে যেগুলো যেকোফেস্কীর বক্তব্য অনুযায়ী উদ্ভ্রান্ত রুবাইর অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোর রচয়িতা অন্য কেউ, যদিও তা ওমর খৈয়ামের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে যারা খৈয়ামের বলে কথিত সব রুবাই ওমর খৈয়ামের বলে স্বীকার করেন না, তারা ১৬, ৩৬ বা সর্বোচ্চ ৬৬ টি রুবাইকে আসল ও মৌলিক বলে মনে করেন। যেগুলো ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও সমুন্নত চিন্তাধারার পরিবাহক।

এসব রুবাই এমন এক প্রাজ্ঞ দার্শনিকের চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলন, যিনি তার অন্তর্জগতের দীপ্তিমান চিন্তাগুলোকে রুবাইর আকারে ব্যক্ত করেছেন। খৈয়ামের চিন্তাধারার উৎসমূল প্রোথিত রয়েছে জগত সম্পর্কে। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এবং মানুষের ভাগ্য ও পরিণতি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে গভীর অন্ধধ্যানের মাঝে। এসব প্রশ্ন অনেক প্রাচীন, মানুষের অস্তিত্ব যখন থেকে আছে তখন থেকেই এর উৎপত্তি। মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে? বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূল দর্শন কি? অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আসা আবার অনস্তিত্বে চলে যাওয়া– কেন এসব জিজ্ঞাসা মানুষের সৃষ্টি থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছে মানব মনে ?

ওমর খৈয়ামের চিন্তার মূল সুর হচ্ছে 'মৃত্যু ও জীবন'। জীবনের চেয়ে মৃত্যু অগ্রগণ্য। কেননা, তার কবিতায় সুখ-সম্ভোগ ও সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করার চিন্তাধারা, মৃত্যু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং জীবনের সৌন্দর্য-শোভা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার হাহুতাশের ফলশ্রুতি রয়েছে। কবি একদিকে ফুলবন, ঝর্ণাধারা, চন্দ্রালোক, হুরপরি প্রভৃতি জগত ও জীবনের যাবতীয় সৌন্দর্যকে অবলোকন করেন, অন্যদিকে এগুলো ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনা তাকে কষ্ট দেয়। তিনি আফসোস করেন জীবন-যৌবনের পূর্ণতায় আলো তার পূর্ণ প্রভায় বিকশিত হবার পর কোন আঁধারী আর মৃত্যুর অমানিশা নেমে আসে। অবশ্য তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। কেননা, কেউ যদি কোনো জিনিষকে ভয় পায় তাহলে তার নাম মুখে আনে না।

তিনি মৃত্যুকে মনে করেন একটি বাস্তবতা। এজন্য তিনি প্রতীক্ষা করেন। কাজেই এমন জীবন তিনি কামনা করেন, যা ভালোবাসার মতো। তাঁরমতে, বিশ্ব জগতের আবর্তন-বিবর্তন, দেহ ও জড়ের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ হলো, মৃত্যু প্রতিক্ষণে উপস্থিত। ফলে তিনি অস্তিত্ব জগৎ ও তার গতি-প্রকৃতির প্রতি প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন ও বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কবিতায় কলসি, আদমের কাদা, কলসি নির্মাতা, পাত্র ও সুরাহি প্রভৃতি হচ্ছে বিশ্বের বুকে নিত্য বিরাজমান আবর্তন-বিবর্তন ও নিঃশেষ হয়ে যাবার রূপক ও প্রতীক।

খৈয়াম বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন জিনিষের আসা ও যাওয়া, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বেরই পুনরাবৃত্তি এবং জীবন ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তী অনন্ত জগৎ কুল-কিনারাহীন। তাঁর আফসোস, হাহুতাশ হল সে সুবর্ণ সুযোগটির সংক্ষিপ্ততার কারণে। এর সমাধানও হচ্ছে জীবন ও জগতের উপকরণগুলো ভোগের মাধ্যমে এ সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

শরাব, পানপাত্র, সুরাহি এবং এর বিভিন্ন অংশ হচ্ছে জীবনের নেয়ামত ও ভোগ্য সামগ্রীর ভোগ ব্যবহারের প্রতীকী শব্দ। এগুলোকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা অন্যায়। যারা এসব শব্দ ও পরিভাষার বাহ্যিক আকৃতির দিকে তাকিয়ে এর গুঢ়রহস্য ও গভীরতায় প্রবেশ করেন নি, তারা খৈয়ামের চিন্তার জগতের সুক্ষ্মতত্ত্ব ও রহস্যগুলো থেকে দূরে ছিটকে পড়েছেন। তারা তাঁকে মনে করেছেন, একজন মদ্যপ ও ভোগপ্রিয় কবি হিসেবে। যেমন হাফিজ-রুমী-নজরুলকেও তারা এভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে খৈয়াম মানুষকে দুশ্চিন্তা, অবসাদ, হতাশা ও বিস্ময় বিমূঢ়তার হাত থেকে রক্ষা করতে চান। তিনি একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক; যিনি জীবন ও জগতের সৌন্দর্য শোভা আর তা ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যে যে সংঘাত, সে সংঘাতের রোগ ও বেদনাকে তার চিন্তার পরশমনি দিয়ে চিকিৎসা করতে চান। তখন জীবন ও জগতের সুখ-ভোগের প্রতীকী শব্দ ছিল মদ ও শরাব সংক্রান্ত বিষয়াদি। তখন মানুষ আজকের দিনের ন্যায় সুখ-সম্ভোগের এরূপ সামগ্রীর সাথে পরিচিত ছিল না।

এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যার আরেকটি কারণ ফারসি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতা এবং এর সুউচ্চ গভীর ভাবধারার সাথে তাদের পরিচয়হীনতা। এর সাথে আরো যুক্ত হয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবধারার বাহক পরিভাষাগুলোর ক্ষেত্রে ভাষা বৈচিত্র্যের সমস্যা। এ ছাড়া মূল ফারসি ভাষা ও কবিতার সাথে পরিচিত না হয়ে অনুবাদ করার কারণে অনেক অনুবাদকের মাধ্যমেও এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ফিটজিরাল্ড ও কাজী নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইরানের প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে হাফিজের খ্যাতি গ্যাটে ও নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টার কাছে ঋণী। খৈয়ামের খ্যাতিও পাশ্চাত্যে ফিটজিরাল্ডের প্রশংসনীয় ও শৈল্পিক প্রচেষ্টা এবং প্রাচ্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদানের কাছে ঋণী। উভয়ে ফারসি ভাষার সাথে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা মূল ফারসি রুবাইয়াত থেকে অনুবাদ করেছেন। নজরুলের অনুবাদ মূল ফারসির কাছাকাছি। রুবাইর ভাব ও বক্তব্যে মৌলিক পরিবর্তন এনে নজরুল নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করেছেন।

৩

খৈয়ামকে যারা সুফি বলে মনে করেন তারা হাফিজের শরাবের ন্যায় খৈয়ামের শরাবকে আধ্যাত্মিক শরাব বলে ধারণা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম খৈয়াম ও হাফিজ-এর ন্যায় ভণ্ডামি ও গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি ইরানি কবিদের ন্যায় প্রায়শই ঐসব সুফিদের সমালোচনা করতেন; যারা নিজেদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কম্বল গায়ে জড়িয়ে এবং নীল রঙা ঢিলেঢালা জামা পরিধান করে সাধুতা জাহির করার জন্য বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতো। এছাড়া তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অর্থহীন প্রলাপকারী কপট ধর্মগুরু, ক্ষমতার ক্ষুধায় অন্ধ মিথ্যুক নেতা ও বিচারক, নিষ্ঠুর শাসক ও তাদের কুটিল পার্শ্বচরদের মুখের ওপর সমালোচনা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম ও সুরা অথবা কপটতা ও প্রতারণা প্রভৃতি সমন্ধে তিনি যা লিখেছেন; তার প্রতিটি ছত্রে তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সময় এবং আজ পর্যন্ত তার লেখনি বহুমানুষের কাছে প্রিয় হওয়ার বহু কারণের মধ্যে একটি হলো ঐ আন্তরিক নিষ্ঠা। তাঁর প্রতিটি কবিতা এসেছে সরাসরি অন্তর থেকে এবং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত গভীর অনুভূতি ও চিন্তার সূক্ষ্ম রহস্য ভেদ করে। নজরুলকে স্বীয় যুগের ধর্মীয় বিরোধ, দ্বন্ধ, অজ্ঞতার গোড়ামি এবং ভণ্ডামি খৈয়াম-হাফিজ-এর ন্যায় ভীষণ পিড়িত করতো। হাফিজ বলেছেন,

بگو بصوفی سالوس خرقه پوش دورو　　　که کرده دست درازی و آستین کوتاه

تو خرقه را ز برای ریا همی پوشی　　　که تا بزرق بری بندگان حق از راه

বেগু বে সুফি সা'লুস খেরকেহ পুশ দুরু　　　কে কারদেহ দাস্ত দেরা'যি ও অসতিন কুতাহ

তু খেরকে রা' যে বারায়ে রিয়া' হামি পুশি　　　কে তা' বেজারক বারি বান্দেগা'ন হাগ্ব আয রা'হ

(হাফিজ সিরাজী[১৪], দিওয়ানে হাফিজ)

[সে ভণ্ড ও কপট সুফিকে বলে দাও যে আলখেল্লা পরিধান করে
সুফি হওয়ার ভান করছে;
হে সুফি ! তুমিতো এই আলখেল্লা পরেছো কপটতার নিমিত্ত
খোদার বান্দাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্য।]

খৈয়াম বলেছেন,

قومی متفکرند در مذهب و دین　　　قومی به گمان فتاده در راه یقین

میترسم از آن که بانگ آید روزی　　　کای بیخبران راه نه آنست و نه این

কাউমি মুতাফাক্কেরান্দ দার মাযহাবো দ্বীন　　　কাউমি বে গুমা'ন ফাতা'দেহ দার রা'হে ইয়াখিন

মীতারসাম আয অন কে বা'ঙ্গে অয়াদ রোযি　　　কেই বীখাবারা'ন রাহে না অনাস্ত ও না ইন

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১৪৩)

[একদল ধর্ম ও ধর্মভেদ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত
একদল বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঘোরে অচেতন
হঠাৎ আওয়াজ এলো
এ অজ্ঞ এ পথ-ঐ পথ কোনটাই সঠিক নয়]

খৈয়াম বাস্তবে মদ পান করতেন কি, না করতেন তার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাঁর কাব্যিক মদে আগামীকালের চিন্তা না করে বর্তমান জীবনের প্রতি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করার আহবান রয়েছে। খৈয়াম কর্মচঞ্চল জীবনের প্রাপ্তির আনন্দকে ভোগ করার আহবান করেছেন। খৈয়াম বলেন,

چون عهده نمی شود کسی فردا را　　　حالی خوش کن تو این دل شیدا را

Dhaka University Institutional Repository

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه   بسیار بتابد و نیابد ما را

হা'লি খুশ কুন তু ইন দেলে সেইদা'রা'   চুঁন উহদে নেমি শাভাদ কাসি ফারদা' রা'

বেসইয়া'র বেতা'বাদ ভ নাইয়া'বাদ মা' রা'   মেই নুশ বে মা'হতা'ব এই মা'হে কে মা'হ

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ২)

খৈয়াম যখন বলেন, আগামীকাল কি হবে কেউ জানে না। তুই তোর জীবনের এই মুহূর্তকে উপভোগ কর। মদ পান কর, তখন তার এই মদের আহবান হলো জীবনের প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর হওয়ার আহবান। কাজী নজরুল ইসলাম খৈয়ামের উপরোক্ত রুবাই অবলম্বনে বলেন :

আজ আছে তোর হাতের কাছে আগামীকাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াস্‌নে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন-করিস্‌নে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি-নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩০৯)

খৈয়ামের প্রতি অভিযোগ হল তিনি ভাল-মন্দের বিচার ছেড়ে জীবনকে ভোগ-বিলাসিতায় বিসর্জন দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। খৈয়াম বলেন,

امروز ترا دسترس فردا نیست   و اندیشه فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم اردلت شیدا نیست   کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

ভআন্দিসেহ ফারদা'ত বে যুজ সুদা' নিস্ত   ইমরুজ তুরা দাস্তরাস ফারদা' নিস্ত

কেইনে বা'গ্বি উমর রা' বাহা' পেইদা' নিস্ত   দা'য়ে' মাকুন ইন দাম আরদেলাত সেইদা' নিস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১০)

[তুমি আজ আগামীকালকে হাতের নাগালে পাবে না
আগামীকালের দুশ্চিন্তায় অস্থির হওয়া বোকামি ব্যতিত কিছু না
যদি বুদ্ধিমান হও, এই মুহূর্তকে বিনষ্ট কর না
কেননা তোমার অবশিষ্ট জীবনের হিসাব কেউ জানে না।]

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

কাল কি হবে কেউ জানে না, দেখছে ত, হায়, বন্ধু মোর !
নগদ মধু লুঠ ক'রে লও, মোছ মোছ অশ্রুলোর।
চাঁদনী-তরল শরাব পিও, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দ্বীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়।

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল্যায়ন ও কর্তব্যপালন ধর্মের কোন মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়। বরং জীবন ও ধর্মকে সক্রিয় ও উজ্জীবিত রাখার মূল চাবিকাঠি। খৈয়ামের রুবাইয়াতে বিদ্যমান রয়েছে মাটি, মাটি থেকে গড়া শরাবের পেয়ালা, সুরাহি ও মাটি থেকে ফোটা ফুল। ওমর খৈয়াম মাটির এই পেয়ালা বা ফুটন্ত ফুলের মধ্যে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া প্রয়াত পূর্বসূরীদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান ও কালের নিষ্ঠুরতার জন্য হাহুতাশ করেন। তাঁর এ ধরনের রুবাই দিয়ে ধারণা করা হয় যে, তিনি জন্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখেন। খৈয়াম বলেন:

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است   در بند سـر زلف نـگاری بـوده است

ایـن دسته کـه بر گردن او می بینی   دستی است که بر گردن یاری بوده است

ইন কুজে চু মান আ'শেকে যারি বুদে আস্ত   দার বান্দ সার জুলফ নেগারে বুদে আস্ত

ইন দাস্তে কে বার গেরদানে উ মেই বিনি   দাস্তী আস্ত কে বার গেরদানে ইয়া'রি বুদে আস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১৫)

খৈয়ামের রুবাইয়াতের সর্বত্র জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। ওমর যদি পূর্ণজন্মে বিশ্বাস করতেন তা হলে জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কে এত প্রশ্ন উপস্থাপন করে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করতেন না। ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরিপূর্ণ সুখি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আহবান পোষণ করতেন না। খৈয়াম এসব উপমা দ্বারা মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপদেশ আমাদেরকে দিতে চান যে, যা কিছু মহান, মহৎ সুন্দর এই জীবনেই তা সাধন করা সম্ভব। এখনই কর্মের প্রাসাদ গড়া যায়। মৃত্যু এক কর্মহীন বীরান। তার আগেই কাজ সাধন করে নাও। খৈয়াম যখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ তখন এ না জানার ক্ষোভ-দুঃখ ও দুর্দশার জন্য নিয়তিকে দায়ি করেন। তিনি পাপ ও পূন্য এর সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে বিপাকে পড়েন এবং নিয়তির পূর্বে মানুষকে চরম অক্ষম ও অসহায় সৃষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। খৈয়াম বলেন,

نیکی و بدی که در نهاد بشر است   شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل   چرخ از تو هزار بار بیچاره تر اس ت

নেকি ভ বাদি দার নেহা'দে বাশার আস্ত   শা'দি ভ গামি কে দার কাযা' ভ কাদার আস্ত

বা' চারখ মাকুন হাভা'লে কেআনদার রেহ আগ্বল   চারখ আয তু হেযা'র বা'র বীচারেহতার আস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৪৮)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে মন্দ ভালোর দুই ধারা,
শুভাশুভ দুঃখ ও সুখ দান নিয়তির-কয় যারা,
তাদের বলি–অপরাধী করছে খামকা কুগ্রহে,
তোমার চেয়ে হাজার গুণ যে অসহায় সে বেচারা !

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩৩০)

Dhaka University Institutional Repository

নিয়তির বেড়াজালে আটক খৈয়াম আবার যখন বর্তমানকে সম্বল করে বাঁচতে চায়, আনন্দ ও ভোগ করতে চায় তখন বর্তমানে বাঁচার প্রেরণা দ্বারা মানুষের ক্ষমতা ও স্বাধীন চিত্তকে আবার নতুন স্বীকৃতি প্রদান করে। খৈয়াম বলেন, যখন কোন কিছু তোমার আয়ত্তে নেই তখন দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাশ হওয়ার কোন অর্থই হয় না। তাই তিনি বর্তমান সময়ে সুখি ও আনন্দিত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

খৈয়ামকে বস্তুবাদী বলা হয়। তিনি একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বস্তুবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি যদি তা না হতেন তা হলেই বিস্ময়কর বিষয় হতো। তিনি জীবন ও জগতকে বিজ্ঞানের আলোকে অধ্যায়ন করেছেন। যুক্তিপ্রমাণ ও জ্ঞান দ্বারা এর রহস্য উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রভুর জ্ঞানের পূর্বে নিজের জ্ঞানকে তুচ্ছ অনুভব করেছেন। অকপটে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন। পর্দার আড়ালের শক্তির সামনে শির নত করেছেন। খৈয়াম বলেন,

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من　　　وین حرف معما نه تو خوانی ونه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو　　　چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

আসরারে আযাল রা' না তু দা'নি ভ নে মান　　　ভীন হারফে মুয়া'ম্মা না তু খা'নি ভ নে মান
হাস্ত আয পাস পারদেয়ে গুপ্তগুয় মান ভ তু　　　চুঁন পারদে বারউফতাদ না তু মা'নি ভ নে মান

(উদ্ধৃত, ফিটজেরাল্ড[৮], ১৩৭৩ : ৩৬)

[শেষমুহুর্তের রহস্য তুমি ও জান না আমিও জানি না
এই গোপন কথাগুলোর গ্রন্থ তুমিও পড় না আমিও না
তোমার আমার কথাগুলো পর্দার আড়ালেই রয়েছে
যখন এই পর্দা ফেটে যাবে তখন তুমিও থাকবে এবং আমিও না।]

৪

ফিটজিরাল্ডের অনুবাদের পর খৈয়ামের রুবাইর অনুবাদ বহু ভাষায় বহুবার হয়েছে। অধিকাংশই ফিটজিরাল্ডের অনুবাদে প্রভাবিত। এ পর্যন্ত খৈয়ামের রুবাই ৩২ বার ইংরেজি ভাষায়, ১৬ বার ফারসি ভাষায়, ১১ বার উর্দু ভাষা, ১২ বার জার্মানী ভাষায়, ৮ বার আরবি ভাষায়, ৫ বার ইতালী ভাষায়, ৪ বার তুর্কী ও রুশ ভাষায়, ২ বার ডেনমার্ক, সুইডিশ ও আরমানী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ৩৯ বার প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায়ও রুবাইয়াতের অনুবাদ একধিকবার হয়েছে। তবে খৈয়ামের কাছে কে কতটুকু পৌছতে সক্ষম হয়েছে সে প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নি। কাব্যিক অনুবাদকের দিক থেকে নজরুল ইসলাম একটি বিরল প্রতিভা। অনুবাদের ভূমিকায় তিনি ওমর খৈয়াম সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ফিটজিরাল্ডের বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে মূল রুবাইর জগতে প্রবেশ করে খৈয়ামকে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রুবাই সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা চতুষ্পদী হ'লেও তার চারটি পদই ছুটছে আরবী ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে, সম-তালে–ভণ্ডামী, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেদের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চূ'র্ণ ক'রে। সেই উচ্চৈঃস্রবা আমার হাতে প'ড়ে হয়ত-বা বজদ্দি মোড়লের ঘোড়া-ই হ'য়ে ওঠেছে।– আমাদের গ্রামের কাছে এক জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম বজদ্দি মোড়ল। তাঁর এক বাগ–না মানা ঘোড়া ছিল, সে জাতে অশ্ব হ'লেও গুণে অশ্বতর ছিল। তিনি যদি মনে করতেন পশ্চিম দিকে যাবেন, ঘোড়া যেত পূর্ব দিকে। ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ্ মানাতে না পেরে শেষে বলতেন–'আচ্ছা চল্, এদিকেও আমার জমিদারী আছে।
>
> ওমরের বোর্রাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি সওয়ার যে বাগ্ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে উক্ত বজদ্দি মোড়লের মতো সে ঘোড়াকে তার উচ্ছামত পথেও যেতে দিই নি। লাগাম কষে' প্রাণপণ বাধা দিয়েছি, যাতে সে অন্যপথে না যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে পড়ুব-পড়ুব অবস্থাও যে হয়েছে, তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। তবে এটুকু জোর ক'রে বলতে পারি, তাঁর ঘোড়া আমার হাতে প'ড়ে চতুষ্পদী ভেড়া-ও হয়ে যায়নি– প্রাণহীন চার-পায়াও হয় নি। আমি ন্যাজ ম'লে ম'লে ওর অন্ততঃ তেজটুকু নষ্ট করিনি। ও'র মত 'ছার্ত্তক' (সার্থক ?) না হ'তে পারলেও অন্ততঃ 'কদমে' চালাবার কিছু চেষ্টা করেছি। (নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯২)

ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ অত্যন্ত স্বাধীন অনুবাদ। অনেক সময় তিনি দুই তিনটি রুবাইকে একত্র করে তাকে ইংরেজি কাব্যের আঙ্গিকে সুসজ্জিত করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম সচেষ্ট হয়েছেন প্রতিটি রুবাইর স্বতন্ত্র চিত্র বজায় রেখে অত্যন্ত স্বছন্দ চিত্তে তাকে রূপান্তরিত করতে। তাই মূল ও অনুবাদকৃত রুবাই চিহ্নিত করা যেমন সহজ তেমনি উভয় কবির নিজস্ব স্বাধীন চিত্ত এখানে প্রকাশ পায়। খৈয়াম বলেছেন,

این کهنه رُباط را که عالم نام است　　آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی است که وامانده صد جمشید است　　قصریست که تکیه گاه صد بهرام است

ইন কুহনে রুবা'ত রা' কে আ'লামে না'ম আস্ত　　অরা'মগে আবলাগে সুবহ ভ শা'ম আস্ত
রাযমি আস্ত কে ভ'মা'নদেহ সাদ জামশিদ আস্ত　　কাসরিস্ত কে তাকিয়ে গা'হ সাদ রাহরা'ম আস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১৭)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস এ পৃথ্বীতল–
রাত্রি-দিবার চিত্রলেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জামশেদ ঐ উৎসবেরই আঙ্গিনায়
লাখ বাহ্‌রাম এই আসনে বসে হ'ল বেদখল।
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩০০)

ফারসি রুবাই বা চতুস্পদী কবিতার বৈশিষ্ট হলো যে এর ১ম, ২য় ও চতুর্থ চরণ অবশ্যই هم قافیه হতে হবে। নজরুল ইসলাম রুবাইর এই বৈশিষ্টকে চমৎকার ও স্বছন্দভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করে বাংলা কবিতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তার অনুবাদিত প্রতিটি রুবাইয়ে এই বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কবিতার অনুবাদে উপমা ও চিত্রকল্পের রূপান্তর কঠিন ও দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ। কেননা এটি কবির ব্যক্তিত্ব শিল্পবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, রুচি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। কবির অন্তরে ভাষা ও ভাষার সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ না করলে অনুবাদে কাব্যিক অলংকার ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষণ্ন হয়। নজরুল তাঁর রুচি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পীবোধসহ খৈয়ামের নিকট পৌছতে সফল হয়েছেন। খৈয়াম বলেন,

ابر آمد و با زیر سبزه گریست　　بی باده ارغوان نمی باید زیست
این سبزه که امروز تماشا گه ماست　　تا سبزه خــاک ما تماشا گه کیست

আব্‌র অমাদ ও বা' যিরে সাবযে গিরিস্ত　　বী বা'দেহ উরগভা'নে নেমি বা'য়াদ যিস্ত
ইন সাবযে কে ইমরুয তামা'শা' গে মা'স্ত　　তা' সাবযে খা'কে মা' তামা'শা' গে কিস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৮)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

নীল আকাশের নয়ন ছেপে' বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভবে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল-কে জানে হায় কার তরে।
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯৬)

নজরুল শিকার, রাজশিকারী ও মৃত্যু শিকারি ইত্যাদি শব্দে একই ধরনের কাব্য অলংকার ব্যবহার করে উভয় ভাষায় নিজের গভীর বিচরণের পরিচয় দিয়েছেন। ওমর খৈয়াম তাঁর রুবাইয়াতে জীবনের পরিপূর্ণ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছেন। খৈয়াম বলেন,

گویند کسان بهشت با حور خوش است　　من میگویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار　　کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

গুয়ান্দ কাসা'ন বেহেশ্‌ত বা' হুর খুশ আস্ত　　মান মিগুয়াম কে অবে আঙ্গুর খুশ আস্ত
ইন নাগদ বেগীর ভা দাস্ত আয অন নেসীয়ে বেদা'র　　কেউ আয দোহোল শেনিদান আয দোর খুশ আস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৪১)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

করছে ওরা প্রচার-পাবি স্বর্গে গিয়ে হূরপরী,

Dhaka University Institutional Repository

আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী।
নগ্‌দা যা পা'স তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিস্‌নে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূণ্য হাওয়ায় সঞ্চরি।

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩১৪)

কেউ বলে অই হুরওয়ালা বেহেশতই চাই
আমি বলি দ্রাক্ষা রস দাও বেহেশতি হুর নাইবা পাই
এইতো নগদ হাত পেতে নাও বাকির খাতা থাক পড়ে
ঢোলের বাদ্য কতই মধুর তাইতো আমি শুনতে যে চাই।

(সবুর খান[১২], ২০০৬ : ১৩১)

খৈয়াম বলেছেন,

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
فانوس خـیال از او مـثالی دانیم
خورشید چراغدان و عالم فانوس
ما چـون صُوریم کاندر او حیرانیم

ইন চারখে ফালাক কে মা' দার উ হেইরা'নীম
ফানুস খিয়া'ল আয উ মেসা'লি দা'নিম
খুরশিদ চেরা'গদা'ন ভ আ'লামে ফানুস
মা' চুঁন সুরিম কেআনদার উ হেইরা'নীম

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১২২)

ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদ :

We are no other than a moving row
Of Magic Shadow-shapes that come and so
Round with the Sun-illumined Lantern held
In Midnight by the Master of the Show;

(ফিটজেরাল্ড[৮], ১৩৭৩ : ২০)

উপরোক্ত রুবাইর এড্‌ওয়ার্ড হের- এ্যালেনের গদ্য অনুবাদঃ

This vault of heaven, beneath which we
stand bewildered,
We know to be a sort of magic-lantern
Know thou that the sun is the lamp-flame and
the universe is the lamp
We are like figures that revolve round it.

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

জন পেইনের গদ্য অনুবাদ :

> This sphere of the firmament, wherein we are amazed, The Chinese lantern I think a likeness of it; the seen the lamp-stand and the world the lantern ; we like the figures are that in it revolve.

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩১)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

ঘূর্ণ্যমান ঐ কুগ্রহ-দল–সদাই যারা ভয় দেখায়–
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ঐ লণ্ঠনেরই ছায়ার প্রায়।
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথ্বী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায়।

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩২৬)

ওমর খৈয়ামের আত্ম-যন্ত্রণার প্রধান কারণ ছিল বিশ্ব ও মানব সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর না পাওয়া। তাঁর জিজ্ঞাসা একটাই, আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের জানায় নি যে আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায়ই বা যাবো। এই জটিল জীবনটাই বা কী ? এবং মানব জীবন এই দুঃখবহুল, গন্তব্যহীন জীবনের পথটাই বা টেনে চলেছে কী উদ্দেশ্যে ? খৈয়ামের ভাষায়-

در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست　　او را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می‌نزند دمی در این معنی راست　　کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

দার দা'য়েরেই কে অমাদ ভ রাফতাতে মা'স্ত　　উ রা' না বেদা'য়াত না নেহা'য়াত পেইদাস্ত
কেস মীনাজানাদ দামী দার ইন মা'নী রা'স্ত　　কেইন অমাদান আয কুযা' ভ রাফতান বে কুযা'স্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৩৪)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতুহল,
তারপর–এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি–
এই যে জীবন আশা যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল !

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ২৯৫)

মানব জীবনবৃক্ষ কেন সুশোভিত হবার আগেই শুকিয়ে মাটিতে ঝরে যায়? এ প্রশ্নও ছিল খৈয়ামের মর্মপীড়ার কারণ: কত দ্রুত সুস্থতা রোগে, তারুণ্য বার্ধক্যে, জীবন মৃত্যুতে পরিবর্তিত হয়ে একমুঠো মাটিতে লীন হয়ে যায়। খৈয়াম এসব কিছুর জন্য অদৃষ্টকেই দায়ি করে বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

ای چرخ فلک خرابی از کینه توست　　　　بیداد گری شیوه دیرینه توست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند　　　　بس گوهر قیمتی که در سینه توست

এই চারখে ফালাক খারা'বি আয কেইনে তুস্ত　　　　বীদা'দগারী শীভে দীরীনেহ তুস্ত
এই খা'ক আগার সীনে তু বেশেকা'ফান্দ　　　　বাস গাওয়ার কেইমাতি কে দার সীনে তুস্ত

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১২)

[এই অদৃষ্টের চাকা ধ্বংসের কারণ বিদ্বেষই তোমার
অত্যাচারই ছিল তোমার আদি আচার
তোমার বক্ষ যদি হয় দুভাগ এই মাটি
মণি-মুক্তার কি দাম আছে তোমার বুকের ভেতর।]

৫

ওমর খৈয়ামের রুবাই থেকে তাঁর মন ও মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে বলেই মনে হয়। কারণ তাঁর রুবাইয়াতে বহুকবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত তাঁদের আত্মসত্তার প্রতিফলন উপলব্ধি করেছেন নিজেদের মতো করে; গল্পের সেই পাখির ডাকের মতো: যার ডাক শুনে ধার্মিক মুসলমান মনে করছে, পাখি বলছে, 'আল্লাহ্ রাসুল খোদা'। ধার্মিক হিন্দু দাবি করছে, পাখি বলছে 'হরে কৃষ্ণ রাধা'। মাটির হাড়ি পাতিল বিক্রেতা দাবি করছে, পাখি বলছে, 'সানকি খোড়া খাদা'। আর পেঁয়াজ-রসুন বিক্রেতা দাবি করছে, পাখি বলছে, 'পেঁয়াজ রসুন আদা'। আরও সুস্পষ্ট করে বললে বলা যায় ওমরের রুবাইয়াত হচ্ছে সেই পুকুরের মতো: কেউ তার পানি পান করছে, কেউ তাতে অবগাহন করছে, কেউ কাপড় ধুচ্ছে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রয়োজনে একে ব্যবহার করছে। সবার চাহিদা মিটছে অথচ পুকুরের পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ওমরের কাব্য-পাঠ-উত্তর বিশ্লেষণেও তেমনি 'বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত'। সবাই নিজের দলে টানছে ওমরকে, ওমরও সবারই হচ্ছে, অথচ কারোরই হচ্ছে না, নিজের মতোই থেকে যাচ্ছে।

সাধারণ হৃদয়সংবাদী পাঠকচিত্ত ওমর সম্পর্কে যে মতটি গ্রহণ ও প্রচার করে তৃপ্তি পান তা হচ্ছে, ওমর দেহভোগী, জীবনসর্বস্ব, জড়বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন তাদের মতোই ওমর জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও না পাওয়ার বেদনায় বিধবস্ত হয়ে দৈহিক সুখ-ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান করেছিলেন। Edward Fitzgerald খৈয়ামের অনুবাদে লিখেছেন :

Here with a loaf of Bread beneath the Bough
A flask of wine a Book of verse and Thou
Beside me singing in the wilderness-
And wilderness is Paradies enow.

(উদ্ধৃত, সিকানদার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩২)

কাজী নজরুল ইসলাম এর অনুবাদ করেছেন এভাবে,

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর,

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়া সাকি, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব না কো তখ্‌ত আমি শাহানশার!
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩০৫)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন এভাবে,

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর...
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর!
(উদ্ধৃত, সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩২)

নরেন্দ্র দেব এর অনুবাদ করেছেন এভাবে,

এইখানে -এই তরুতলে–
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ-জীবনের যে-ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে,
থাকবে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ করবে বিচরন,
গহন-কানন হবে লো সেই
নন্দনেরই বন!
(উদ্ধৃত, সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৩)

সিকান্দার আবু জাফর এর অনুবাদ করেছেন এভাবে,

এখানে কোথাও পল্লঘন নির্জন তরুতলে
বসে থাকি যদি নিরুদ্বিগ্ন দিন কাটাবার ছলে
সাথে থাকে যদি কিছু আহার্য, মদিরা পাত্র-ভরা
একটি কাব্য সুরভিসিক্ত ছন্দের শতদলে ঃ

নব জীবনের সলাজ মধুর বিস্ময়ে সচকিতা
সাথে থাকো যদি লীলায়িত তনু সধুমুখী মধুমিতা
তনুতে মুছায়ে তনুর পিপাসা আর যদি গাহো তুমি
ফিরদৌসের সমারোহে হবে এ-বনানী সুভোভিতা ॥

(সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

এমন কোন বেরসিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে সাকি, সুরা, কাব্যগ্রন্থ ও নির্জন কুঞ্জের প্রতি বিমুখ। ওমরের কবিতায় হতাশা না থাকলেও বেদনা আছে। সে বেদনা যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য। ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য তার মমত্যবোধ আক্ষেপ হয়ে ঝড়েছে খৈয়ামের ভাষায় :

روزی که گذشته است ازاو یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن

রূযি কে গুজাস্তে আস্ত আযো ইয়া'দ মাকুন ফারদা' কে নাইয়া'মাদে আস্ত ফারইয়া'দ মাকুন
বারনা'মেদে ও গুজাস্তে বুনইয়া'দ মাকুন হা'লি খুশ বা'শ ও উমর বারবা'দ মাকুন

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

আজ আছে তোর হাতের কাছে আগামীকাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াস্‌নে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন-করিস্‌নে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি–নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!

(নজরুল ইসলাম[৫] : ১৯৮৪ : ৩০৯)

খৈয়াম বলেছেন,

افسوس که نامه جوانی طی شد و آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب فریاد ندانم که کی آمد کی شد

আফসোস কে না'মে জাভা'নি তেই শুদ ভ অন তা'যে বাহা'র জেন্দেগা'নি দেই শুদ
অন মুরগ্ তারব কে না'মে উ বুদ শাবা'ব ফারইয়া'দ নাদা'নাম কে কেই অমাদ কেই শুদ

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ১২)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুঁথি যৌবনের!
ধুলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম!
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে দেরী ঢের।

(নজরুল ইসলাম[৫] : ১৯৮৪ : ৩০৮)

ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগটি ধুমায়িত হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে, খৈয়াম নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী। তবে এ-অভিযোগ উত্থাপন করা যতো সহজ, প্রতিষ্ঠা করা ততোধিক কঠিন। কারণ ধর্মান্ধতা, প্রথাগত ধর্মাচরণ অনুমোদন ও স্রষ্টা-বিশ্বাস এক নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান-সর্বস্বতাকে ওমর ঘৃণা করতেন, ওমরের অন্তরে ধর্মব্যবসায়ী অত্যাচারীর প্রতি সহজাত অশ্রদ্ধা ছিল। তাই ভণ্ড তপস্বীদের নিয়ে খৈয়াম ব্যাঙ্গও করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

گر می نخوری طعنه مزن مستان را　　بنیاد مکن تو حیله دوستان را

تو غرّه بدان مشو که می می نخوری　　صد لقمه خوری که می غلام است آن را

গার মেই নাখুরি তা'নেহ মাযান মাস্তা'ন রা'　　বুনইয়া'দ মাকুন তু হিলে দুস্তা'ন রা'

তু ক্বার্রে বেদা'ন মাশু মেই মেই নাখুরি　　সাদ লুকমে খুরি কে মেই গোলাম আস্ত অন রা'

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৪)

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত রুবাই :

দোষ দিওনা মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাও না মদ ;
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হ'ত রদ্।
মদ না পিয়েও, হে নীতিবিদ্, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরাও শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ্!
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩০৫)

ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগটি উঠেছে তা হলো তিনি জড়বাদি ও নাস্তিকতার অনুসারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্রষ্টার স্বরূপ অন্বেষনে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ শিখরে আরোহন করে চর্ম চোখে স্রষ্টার রূপদেখতে চেয়েছেন। স্রষ্টার প্রেমে আকৃষ্ট হয়েই তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী পর্দার রহস্য উন্মোচর করতে চেয়েছেন। তাই খৈয়ামের কণ্ঠে ধ্বনিত বেজে উঠেছে :

بت خانه و کعبه خانه بندگی است　　ناقوس زدن، ترانه بندگی است

محراب و کلیسا و صلیب و تسبیح　　حقّا که همه نشانه بندگی است

বোৎ খা'নে ভ কাবে খা'নে বান্দেগীস্ত　　না'গুস যাদান, তারা'নে বান্দেগীস্ত

মেহরাবো কেলীসিয়া'ভ তাসবীভো তাসবীহ　　হাক্বাক্বান কে হামে নেশা'নেয়ে বান্দেগীস্ত

[দেবালয় আর কাবা দুই-ই-এবাদতের জন্য
গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ডাকে সেই এবাদতের জন্য
গির্জা, তাসবীহ আর ক্রুশ
সবই তো সেই এবাদতেরই নিদর্শন।]
(উদ্ধৃত, সবুর খান[১২], ২০০৬ : ১৩২)

মুসলমানদের বিশ্বাস তাদের ধর্মই সত্য অন্যসব মিথ্যা। খ্রিস্টানগণ বলেন, খ্রিস্ট ধর্মই সত্য ধর্ম, অন্য ধর্ম নরকের পথে নিয়ে যায়। আবার যারা পুতুল পূঁজা করে তাদের সাথে পরম প্রভুর সম্পর্ক কতটুকু ? এটাই ছিল ওমরের জিজ্ঞাসা। আর এই স্রষ্টা-জিজ্ঞাসার অপর নামই হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির গুঢ় রহস্য উদঘাটন-প্রচেষ্টা। এ রহস্য সকল যুগে, সকল জাতির, সকল মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ দু'টি প্রশ্ন যেমন একাদশ শতকের মুসলমান কবি ওমরের মনকে সর্বদাই তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তেমনি বিশ শতকের ইংরেজ কবি টেনিসনের মনেও সৃষ্টি হয়েছে সে জিজ্ঞাসা। তাই টেনিসন তাঁর `In momorian'- এ বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

O, life as futile then as frail
O, forthy voice to soothe and bless?
What hope as answer or rederss?
Behind the veil, behind the veil.

টেনিসন এই 'behind the veil' বা পর্দার অন্তরালকে 'Settled fact' বা চূড়ান্ত নিস্পত্তি বলে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখেছেন কিন্তু ওমর এটাকে মেনে নিতে পারেন নি। বরং পর্দার অন্তরালের রহস্য উন্মোচন করতে বার বার এগিয়ে গেছেন রহস্য-পর্দা ভেদ করতে। বার বার ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়েছেন। যার রোদনধ্বনি আজও মানব মনে পৌঁছে হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে।

খৈয়ামের এই প্রকৃত সত্য তথা তুলনামূলক সত্য জানার অদম্য আগ্রহের আর একটা কারণ ছিল তাঁর সমকাল। পারস্যের মুসলমানদের মধ্যে তখন একের পর এক সৃষ্টি হচ্ছে নানা দল-উপদল। শিয়া-সুন্নি দুই দলতো আছেই, এতদ্ব্যতীত রাফেজি ও জিন্দিকও ছিল। ইসমাইলী ও মুতাজেলা সম্প্রদায়ও কম প্রসিদ্ধ নয়। মুতাজেলা সম্প্রদায়ের একদল লোক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বসরায় বিখ্যাত 'ইখওয়ানুস সাফা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগে বিভিন্ন মতবাদের বিচিত্র পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তবে এই যুগে বাস করে ওমর খৈয়ামের পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। (উদ্ধৃত, সবুর খান[১২], ২০০৬ : ১৩২)

তাই আমরা আর যা-ই বলিনা কেন ওমর যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন এ কথা তাঁর শত্রুও অন্তত বলতে পারেন না। এমন কি, 'ওমরকে তাঁর কাব্য পড়ে যাঁরা 'Epicurean' বলে অভিহিত করেন, তাঁরাও পূর্ণ সত্য বলেন না। খৈয়ামকে এসব অভিযোগ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন সুফি সম্প্রদায়। খৈয়াম জড়দেহবাদি, ভোগলালসা পিপাসু, কামুক নন। তিনি প্রেমিক, তাঁর প্রেম ঐশী প্রেম। তাঁর সাকি স্রষ্টার প্রতীক। হাফিজকে সুধীজন যেভাবে বিচার করেছেন ঠিক অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে ওমরকে সুফি সাধকরূপে প্রতিষ্ঠা করা হল। খৈয়াম বলেছেন,

آن قصر که جمشید در او جام گرفت　　　آهو بچه کرد و شیر آرام رفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر　　　دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

(ওমর খৈয়াম[২], সাল উল্লেখ নেই : ৭)

নজরুল ইসলাম কথার শিল্পী, ভাষার যাদুকর ছিলেন। উপরোক্ত রুবাই অনুবাদে এ যাদুর চমক সৃষ্টি হয়েছে। শেষ দুইটি চরণে گور শব্দের ব্যবহার দুইবার এসেছে কিন্তু দুইটির অর্থ ভিন্ন প্রথম گور এর অর্থ گور خر অর্থাৎ বড় হরিণ, দ্বিতীয় گور এর অর্থ কবর। চরণের শাব্দিক অর্থ হলো বাহরাম যে সারা জীবন হরিণ ধরেছে, সেই বাহরামকে কিভাবে ধরেছে।

ফিট্‌জেরাল্ড এর অনুবাদ :

They say the Lion and the lizard keep
The Couris where Jamshyd gloried and drank deep;
And Bahram, the great Hunter- the Wild Ass
Stamps o'er his Head, and he lies fast asleep.

(উদ্ধৃত, সিকান্‌দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

কান্তিচন্দ্র ঘোষ-এর অনুবাদ :

জামশিয়েদের সুরায় পিছল খাস্-দেওয়ানের খিলান মাঝ
বাস বেঁধেছে আজকে সেথায় টিকটিকি আর সিংহরাজ !
রাজার সেরা রাজ-শিকারী বহ্রাম কোথায় ঘুমিয়ে রয়
আজকে তো তার মাথার পরে চাট্ মেরে যায় বন্য হয়।

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৪)

নরেন্দ্র দেব-এর অনুবাদ :

জামশিয়েদের জাঁকের প্রাসাদ,
মজলিশি-পান, আমোদ-আসাদ,
অফুরন্ত চলতো যেথা
বলছে লোকে এখন সেথা
পশুরাজের বসছে আসর,
টিকটিকিরা জাগছে বাসর!
বার্হামও যে ভীম-শিকারী
দঃসাহসী জোয়ান ভারি,
সেও বেঁধেছে আজকে খাসা,
মাটির তলে শীতল বাসা,
বনের গাধা মাড়িয়ে যায়
নাইক তবু খেয়াল তায় !

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৪)

সিকান্দার আবু জাফর-এর অনুবাদ :

শাহী দরবারে একদা যেখানে সম্রাট জামশীদ
দ্রাক্ষা-নেশায় দ্বিধা-ভীরুতাকে করেছে না-উম্মীদ,
সেখানে এখন প্রতি প্রত্যুষে প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা
সরীসৃপ আর সিংহেরা ভাঙ্গে কবরখানার নিদ।

একদা যে ছিল শ্রেষ্ঠ শিকারী দুর্জয় বাহরাম
কবরের ঘুমে ঢাকা পড়ে গেছে যত কিছু তার নাম।
পদাঘাত করে রাসভেরা আর কবরে অবহেলায়
তবু তার চোখে নিস্তরঙ্গ নিদ্রার বিশ্রাম ॥

(সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের অনুবাদ,

এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের।
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩১১)

৬

খৈয়ামের ন্যায় নজরুলকেও আমরা আজন্ম ভণ্ডামী ও মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখি। তাঁর সাহস কোথও কোথাও ওমরের সাহসকেও হার মানায়। ওমর যেখানে স্রষ্টার স্বরূপ সচক্ষে দেখতে চায়, নজরুল তার চেয়েও আরও অগ্রসর হয়ে চান, ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে। নজরুলের ভাষায় :

- আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
- আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
- আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
- আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
- আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৭-১০)

তাই ওমরের মতো নজরুল সম্পর্কেও বিক্ষিপ্ত বহুমুখী সমালোচনামূলক মন্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। কারণ নজরুল শুধু বিদ্রোহীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজদ্রোহী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছেন। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লিখেছেন, লিখেছেন সকল বিপ্লবের সারসত্তা নিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা। অত্যাচারের বিষধর সাপের বিরুদ্ধে বাজিয়েছেন 'অগ্নিবীণা'। তবে ব্রিটিশের বেনিয়া সরকার একে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বললেও ভারতবাসীর কাছে তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাঁর এই রাজদ্রোহিতা আত্মজাগৃতি ও মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিকামনার বহিঃপ্রকাশ।

ওমরের মতো নজরুল সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয় তিনি 'নাস্তিক', নিজ ধর্মে আস্থাহীন, হিন্দু পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম তাঁর কণ্ঠস্থ। অতএব তাঁকে কাফের অপবাদ দিতেও সমকালীন জ্ঞান পাপীরা ইতস্তত করে নি। অথচ নজরুল ইসলাম রচিত হাম্‌দ, নাত্‌ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের আত্মিক সম্পদ; এমন প্রাণঢালা গভীর খোদাপ্রেম, রাসূলপ্রেমের তুলনা নেই। আর সে কারণেই হয়তো হিন্দু মৌলবাদীদের কাছেও নজরুল ছিল অবাঞ্ছিত। তাই নজরুলকে আফসোস করে বলতে হয়েছে-

গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'

...

Dhaka University Institutional Repository

সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা।'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে',
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে।
ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও!
'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!'
হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত- নেড়ে'
...
নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!
'বিলেত ফেরনি? 'প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদ্যে ছি!'
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি'!-
যুগের না হই হুজুগের কবি

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২৯৩)

বিদ্রোহ, বিপ্লব, ধর্মদ্রোহিতা, সংশয়-সঙ্কোচের বিচার রেখে বলা যায়, নজরুল ইসলাম ওমর-কাব্যে ইরানি বালার প্রেমমুগ্ধ তন্ময় এক প্রেমিক সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। নজরুলের জীবনে প্রেম বহুবার এসেছে– বহু রূপ ও রং নিয়ে। হয়ত ওমরের সাকিকেই নজরুল সারা জীবনের তৃষ্ণা, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খুঁজে ফিরেছেন। সম্ভবত ওমরের সেই সাকিতে মজে গিয়েই তাঁর রুবাই অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন নজরুল। আর তা অনুবাদ করতে গিয়ে ওমরে লীন হয়ে গেছেন তিনি। তাই আমরা নজরুলকে খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদের পাশাপাশি তাঁর রুবাই অবলম্বনে নবসৃষ্টিতেও মগ্ন হতে দেখি। খৈয়ামের পৃথক দুটি রুবাইর সমন্বয়ে সৃষ্ট নজরুলের নিম্নোক্ত গানটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি, প্রিয়ে !
ধুয়ো 'লাশ'' আমার লাল পানি দিয়ে ॥
শেয়র্ :– শারাবি জম্শেদি গজল 'জানাযা''য়
গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারারি ঐ শারাব-খানার !
'রোজ-কিয়ামতে'' তাজা উঠ্‌বো জিয়ে ॥
শেয়র্:– এম্নি পিইব শারাব,
ভেসে যাব তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশ্‌বু শারাবের আমার ঐ গোরের পার হ'তে ;
টলি' পড়্‌বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে ॥
(নজরুল ইসলাম[৪], ১৯৯৩ : ৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

এই গানটির মূল রুবাই দু'টি হচ্ছে-

چون درگذرم بباده شویید مرا　　تلقین ز شراب ناب گویید مرا

خواهید بروز حشر یابید مرا　　از خاک در میکده جویید مرا

চোন দারগুজারাম বেবা'দে শূয়িদ মারা'　　তালখীন যে শারা'বো না'ব গুয়ীদ মারা'

খা'হীদ বেরোযে হাশার ইয়া'বিদ মারা'　　আয খা'কে দারে মেইকাদে জুঈদ মারা'।

খৈয়ামের উপরোক্ত রুবাইটিতে কোথাও কোথাও 'দার গুজারাম' এর স্থলে 'ফাওত শাভাম' উল্লেখ রয়েছে।

(ফিটজেরাল্ড[৮], ১৩৭৩ : ৪২)

যখন আমার মরণ হবে শারাব দিয়েই গোসল দিও
শারাব আর পান-পাত্রেরই কুলখানীটাও সেওে নিও।
চাও যদি গো রোজ হাশরে আমার সাথে হোক দেখা
পানশালারই এই মাটিতে আমায় তুমি খুঁজে নিও।

(সবুর খান[১২], ২০০৬ : ১৩০)

এবং

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب　　آید ز تراب چون روم زیر تراب

گر بر سر خاک من رسد مخموری　　از بوی شراب من شود مست و خراب

চানদা'ন বেখুরাম শারা'ব কেইন বুয়ে শারা'ব　　অয়াদ যে তুরা'ব চুন রাভাম যীরে তুরা'ব

গার বার সার খা'কে মান রাসাদ মাখমুরি　　আয বুয়ে শারা'বে মান শাভাদ মাস্ত ভ খারা'ব

(ফিটজেরাল্ড[৮], ১৩৭৩ : ২৫)

ইরানি সাকির গলায় কবি বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। তার কারণ, সে তরুণী মুসলমান বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের সহচরী বলে- ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুরূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকির কল্পনায়। নজরুল ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি, বিদ্রোহ করেছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। তাই ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্রতি ওমরের মনোভাব আর নজরুলের মনোভাবে কোন ব্যবধান নেই। এখানে উভয়ে একে অপরের দ্বিতীয় আত্মা। নজরুলও খৈয়ামের ন্যায় যুক্তিতর্কের আবরণ টেনে বলেছেন :

পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরা-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ, -
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি? - পথে ফোটে তাজা ফুল !

Dhaka University Institutional Repository

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ !
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২৩৩)

নজরুল খৈয়ামের অনুকরণে বলেছেন :

'তব মজজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !
কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা !

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২৩৫)

শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে খৈয়ামের ন্যায় নজরুলের বক্তব্য স্পষ্ট। আঙুরের রস খাওয়া যদি অপরাধ হয় তাহলে যারা মানুষের রক্ত খায় তাদের অপরাধের পরিমাপ করবে কে? সেই সমমর্মিতা সম্পর্কে নজরুল বলেছেন :

মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত-সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু ? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা ?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনখানে !
তোমারি কামনা-রানী
যুগে যুগে, পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২৩৬)

খৈয়ামের ন্যায় মানবাত্মার মুক্তিসাধনাই নজরুলের সাহিত্যকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষের অবচেতনসত্তায় তিনি জ্বেলে দিতে চেয়েছেন মানবিকতার আলো। ধর্মীয় কুসংস্কারকে তিনি অতিক্রম করেছেন মানবিকতার শক্তি দিয়ে। তাঁর কাছে ধর্মের জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষের জন্যই ধর্ম। তাই হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে তিনি বলেন:

> হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৮৮৩)

তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তাঁর মতে:

> অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি- আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ-খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৮৮৪)

ওমরের সাথে নজরুলের কালগত ব্যবধান সাত-আট শতাব্দী। এতদিনে মানবতাবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ধনবন্টনের তত্ত্ব ও তথ্যে মানবসভ্যতা আরও অধিকতর অগ্রগামী। কিন্তু বকধার্মিকতা, কুসংস্কার, আর অত্যাচারের বঞ্চনা থেকে মানবতা এখনো মুক্তি পায় নি। তাই সাম্যবাদ ও মানবতার পক্ষের যুদ্ধটা এখনো শেষ হয় নি। নজরুলের সাম্যবাদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার সমাবেশ ঘটেছিল ওমরের তা ছিল সহজাত অনুভূতি। তাই মানবের প্রতি প্রীতি, প্রেম, দরদ ও সহানুভূতি উভয়ের থাকলেও প্রকাশভঙ্গীতে দুস্তর ব্যবধান উপলব্ধি করা যায়। তবে দ্বিধাহীন স্বরে এ কথা বলা যায় যে, সকল প্রকার ধর্মীয় ভণ্ডামীকে উভয়ই ঘৃণা করেছেন। সত্য উচ্চারণে উভয়ই সমান সাহসী থেকেছেন।

কিন্তু মহৎ ব্যক্তিত্ব, কবি, শিল্পী, দার্শনিক সকলেই সাধারণত সমকালীন সমাজে সমাদৃত হন না। কারণ গণমানসের তুলনায় তাঁদের মেধা, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, জীবন উপলব্ধির রীতি-পদ্ধতি প্রায় কয়েক শতাব্দীকালের অগ্রবর্তী থাকে। ওমর খৈয়ামের বেলায়ও তেমনটি ঘটেছিল। যদিও খৈয়াম জন্মেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু মানসগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দা। সে কারণেই তিনি সমকালের মানুষের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নি। তাই 'হাফ্‌ত ইকলিম', 'আতশক্বাদে', 'রিয়াজুশ্‌শুয়ারা', 'মাজমাউল ফুসাহা', 'হোজ্জাতুল হক্ব', এমনকি 'খোরাসানের ইমাম' উপাধিতে ভূষিত খৈয়ামকে 'ধর্মত্যাগী' অপবাদও সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, যাঁরা সমসাময়িক সবাইকে পেছনে ফেলে দূর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হন তাঁদের সমসাময়িকেরা হয় তাঁদের পেছন থেকে টেনে ধরে রাখে, না হয় তাঁদেরকে দল ছাড়া একঘরে ঘোষণা করে নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখে। ওমরের বেলায় তাই-ই ঘটেছিল। এই নিষ্ঠুর জীবনবাস্তবতা আমরা নজরুলেও পাই। খৈয়ামের ন্যায় নজরুলের প্রতিও কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানা অভিযোগের অঙ্গুলি তুলেছে। তাদের সব অভিযোগের শেষ উত্তরে নজরুল বলেছেন :

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত -লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু,বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ২৯৫)

৭

খৈয়ামের একটি রুবাইয়াতে ফিটজেরাল্ড এর অনুবাদ :

And when thyself with shining foot shall pass
Among the Guest Star-scatter'd on the Grass,
And in Thy joyous Errand reach the spot

Dhaka University Institutional Repository

Where I made one- turn down an empty Glass

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৫)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ এর অনুবাদ :

বিভোর প্রাণে আসবে যেদিন আকুল মিলন প্রতীক্ষায়,
তৃণাসনে অতিথ্-সভা ছাড়িয়ে কোথা তারার প্রায়,
উজ্জ্বল পায়ে আসবে যখন আমার সেথায় ছিল স্থান,
উপুড় করে রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান।

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৫)

নরেন্দ্র দেব এর অনুবাদ :

তারপরে, একদা যেদিন
ফেলি তব চরণ-রঙীন
লীলাভরে আসিবে চপল,
যেথা নব অভ্যাগত দল
তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষায়
বসে আছে তৃণাসনে তারকার প্রায়,
তারই মাঝে হেসে যবে
আনন্দ বিতরি যাবে তুমি-
এস, যেথা ছির মোর
হৃদয়ের সুখ-তীর্থ-ভূমি।
করুণায় ভরি' তব প্রাণ,
ঢেলে দিও সেথা প্রিয়
নিঃশোষিত শূন্য পাত্রখান।

(উদ্ধৃত, সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৫-৩৬)

কাজী নজরুল ইসলাম-এর অনুবাদ :

আবার যখন মিলবে হেথায় শারাব সাকীর আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল, একটি ফোটা অশ্রু ফেলো মোর নামে !
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকীর পাশ,
পেয়ালা একটি উল্টে দিয়ো স্মরণ ক'রে খৈয়ামে !

(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩৩১)

সিকান্দার আবু জাফর-এর অনুবাদ :

কোনো ফাল্গুন-সন্ধ্যা লগনে হয়ত অন্যমনে
আগের মতন অনুরাগ-রাঙা নিমেষ অন্বেষণে
নূতন তারার অতিথি-সভায় মখমল তৃণ দলে
মধুমুখী প্রিয়া আসবে আবার নিভৃত কুঞ্জবনে ;

আসবে, যেখানে জীবনের লোভে আমিও এসেছিলাম

Dhaka University Institutional Repository

তোমার শান্ত সুরভিতে আমি ক্লান্তি ঢেকেছিলাম,
সেই পরিচিত তুমি পরে তুমি দিও গো উপুড় ক'রে
একটি শূন্য মদিরা পাত্র জড়ায়ে আমার নাম ॥

(সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ১১৭)

অনুবাদের ভিন্নতার কারণে খৈয়ামের রুবাইয়াতের রূপ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন,

> কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ মাত্র কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং সৈয়দ মুজতবা আলী ভূকিায় বলেছেন, 'কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী'। সৈয়দ সাহেবের ভূমিকার কেরামতীতে তাঁর উপরোক্ত 'ভারডিক্ট' প্রায় মেনেই নিয়েছিলাম। কিন্তু অনুবাদ গ্রন্থখানি পড়বার পর মনে হল সৈয়দ সাহেবের উক্তি একেবারে ফতুয়ার আব্রু-না-রাখা ফতোয়া। (সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৭)

কাজী নজরুল ইসলাম রুবাইয়াতের সাধারণ ছন্দ-মিলের নিয়ম মেনে অর্থাৎ ক ক খ ক মিলে অনুবাদ করেছেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষ কক খখ মিল অনুসরণ করেছেন-রুবাই এর নিয়ম যা নয়। নরেন্দ্র দেব অবশ্য কোনো নিয়ম-কানুনের বালাই রাখেন নি। তিনি ওমর খৈয়ামের কথা অবলম্বন করে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ওমরের কথার প্রশ্রয় ছাড়াই ও-সব কবিতা রচনায় তাঁর কোনো বাধা ছিলো না। সিকান্দার আবু জাফর রুবাই এর মিল-পদ্ধতি অনুসরণ করেই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছন্দের নির্ধারিত সীমানার ভেতরে একটি রুবাইয়ের ভাব প্রকাশের ভাষা গোছাতে না পেরে সেটাকে বাড়িয়ে দু'টো করতে দেখা যায়। সিকান্দার আবু জাফর রুবাইয়াতে ওমর খৈয়ামের ভূমিকায় বলেছেন :

> ব্যাখ্যার ঢেঁকিতে ওমর-মানসের ছাতু তৈরী করিনি আমি। কারণ তাতে পাঠক-পাঠিকাদের চর্তুবর্গ লাভ হবার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া আমার পূর্ববর্তীরা সে সুযোগের এত বেশি সদ্ব্যবহার করেছেন যে, সমস্যার সব দরজা-বুলবুলির অন্ধকারও আমার চোখে পড়ল না। তা' ছাড়া আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এবং সেগুলো নিজের পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়ে যে ব্যাখার কাঠামোটি তৈরী করা হয় তাতে কবির আদত মানুষটি ধরা নাও পড়তে পারে। তেমন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারীর মানস অথবা তাঁর মতলবই তবু অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবার সম্ভাবনা। ওমর-মানসের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টায় ওমর খৈয়ামের যতগুলি অনুবাদক এবং সমালোচকের রচনা এ পর্যন্ত আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে, বলা বাহুল্য, তার প্রায় কোনোটিই এ দোষমুক্ত নয়। (সিকান্দার আবু জাফর[৭], ১৯৭১ : ৩৮)

ফারসি ভাষার কবিদের মধ্যে আত্তার, মাওলানা, সা'দী, হাফিজ ও জামী বাংলাদেশের সাহিত্যপ্রেমিক লোকদের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছেন। এদেশের জনগণ বিশ্বাস করেন যে, এসব কবিগণ ইসলামের অনুসারী ও আধ্যাত্মিক ছিলেন। এ সকল কবি-সাহিত্যিকগণের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করেছে। সা'দী, হাফিজ ও খৈয়ামের অভ্যন্তরীন অর্থ একই, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি খৈয়ামকে ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে গিয়ে তিনি বলেন:

اللهم تعرّف انی عرفتک علی مبلغ امکانی فاغفرلی فانّ معرفتی ایاک وسیلتی الیک –

হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি সারা জীবন তোমাকে আমার মতো চিনতে চেষ্টা করেছি যদি। যদি এখানে ভুল হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা কর। আমার সব কিছুই তোমাতে পৌছার জন্য। (ক্বান্দে ফারসি[২৬], ১৩৮৩ : ৭২)

Dhaka University Institutional Repository

সব যুক্তি-তর্ককে পণ্ডিত-দার্শনিকদের হাতে সোপর্দ করে একটি মন্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চারণ করা যায়, তা হচ্ছে, ওমর প্রেমিক ছিলেন, ছিলেন সৌন্দর্যের মগ্ন পূজারি।

মানুষ হিসেবে এ রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীতে এসে ওমর ধন্য। সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। এ আনন্দ মেলায় কাঁটার মতো একটি বেদনা তাঁকে অহরহ বিদ্ধ করেছে, জীবন ক্ষণস্থায়ী, যেতে না চাইলেও এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। এ জীবনের সমাপ্তি মৃত্যু। পরজন্মে বিশ্বাসী নন খৈয়াম। এ কারণেই ওমর জীবনবাদী; তাই ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য কাঁদতে দেখা যায় তাঁকে। তাই আপন স্রষ্টায় সমর্পিত মানবতাবাদী এই বিশ্বপ্রেমিক আত্মাকে যখন প্রেমহীন শুস্কহৃদয় চিন্তকেরা নাস্তিক, স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বলে, তখন খৈয়ামের হৃদয় নিসৃত আকুতি ঝরে পড়ে। নজরুলের ভাষায় খৈয়ামের রুবাই :

পৌঁছে দিও হযরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম–
'বাদ্‌শা নবী! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর-পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?'
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩৩২)

ওমরের এই আত্মজিজ্ঞাসার জবাব নজরুল নিজেই খুঁজে পেয়েছেন :

তত্ত্ব-গুরু-খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্‌
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হাদিস !
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ!
(নজরুল ইসলাম[৫]: ১৯৮৪ : ৩৩২)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমাদ তামীমদারী : *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (সিরাজী, তারিক জিয়াউর রহমান ও ঈসা শাহেদী, মুহাম্মদ কর্তক বাংলা ভাষায় অনূদিত), আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইরান, ২০০৭খ্রি.।

২. ওমর খৈয়াম : রুবাইয়াতে হাকিম ওমর খৈয়াম, উস্তাদ আব্বাস জামালপুর, এনতেশারাতে আয়াতুল্লাহ হুনার, তেহরান, ইরান, সাল উল্লেখ নেই।

৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৪. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৫. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

৬. নিউজ লেটার, মে-জুন : ২০০২, ২৪তম বর্ষ : ৫-৬ সংখ্যা। কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস থেকে প্রকাশিত।

৭. সিকান্দার আবু জাফর : অনুবাদক, *রুবাইয়াৎ* ওমর খৈয়াম, বাঙলা একাডেমী বর্ধমান হাউস: ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ: চৈত্র-১৩৭৭/ এপ্রিল-১৯৭১।

৮. ফিটজেরাল্ড, এডওয়ার্ড : Rubaiyat of Omar Khayyam, Printed by Eghbal (EQBAL) Printing and Publishing Organisation 15 Booshehr Street, Dr Shariati Avenue, Tehran, Iran, 1373

৯. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনায় : মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, প্রকাশক : বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৬, মে ১৯৮৯, বা/এ ২২৪২।

১০. মনসুর উদ্দীন, মুহাম্মদ : *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৭৬।

১১. মাওলানা রুমী (র.), মসনবী শরীফ, অনুবাদ : মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল :ফেব্রুয়ারি ২০০৮, মহররম ১৪২৯, মাঘ ১৪১৪।

১২. সবুর খান, মুহাম্মদ আব্দুস : মো. কামাল হোসাইন, দর্শন ও প্রগতি, ২৩শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৬, ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতে বিধৃত চিন্তাধারার আলোকে তাঁর বিশ্বাসগত অবস্থান বিশ্লেষণ।

১৩. সিরাজী, ড. তারিক জিয়াউর রহমান, *দর্শন ও প্রগতি*, ২১শ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৪, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র।

১৪. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ: *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫।

১৫. ক্বান্দে ফারসি, মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি, ইরান কালচারাল সেন্টার, নয়া দিল্লি, সংখ্যা ২৭, পয়িজ ১৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ক. হাফিজের মূল গজল ও নজরুলের অনুবাদ অংশ

খ. নজরুল অনূদিত *দিওয়ান-ই-হাফিজ* এর ৮টি গজল

গ. নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মুখবন্ধ

ঘ. নজরুল রচিত হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঙ *দিওয়ান-ই-হাফিজ* অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা

চ. নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*

ছ. নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* এর ভূমিকা

জ. ওমর খৈয়াম অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা

ঝ. নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : হাফিজের মূল গজল ও নজরুলের অনুবাদ অংশ

হাফিজের গজল নং ৫২৫

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

دل که آیینه شاهیست غباری دارد
از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی

کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی

جوی‌ها بسته‌ام از دیده به دامان که مگر
در کنارم بنشانند سهی بالایی

کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش
که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی

نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج
نروند اهل نظر از پی نابینایی

شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان
ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی

سخن غیر مگو با من معشوقه پرست
کز وی و جام می‌ام نیست به کس پروایی

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت
بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی

(হাফিজ সিরাজী[৬], ১৩৬২ : ২৯১)

উচ্চারণ :

দার হামে দীর মুগান নীস্ত চু মান সীদা'য়ী
খারকে জা'য়ী গুরুবা'দেহ ভ দাফতার জা'য়ী

দেল কে অয়ীনেহ সা'হীস্ত গাবা'রী দা'রাদ
আয খোদা' মীতালাবাম সোহবাত রওশান রা'য়ী

কারদেআম তওবে বে দাস্ত সানাম বা'দে ফুরুশ
কে দেগার মীনাখোরাম বী রুখ বেজাম অরা'য়ী

নারগেছ আরলা'ফ যাদ আজ সীভে চাশমে তু মারাঞ্জ
নারাভান্দ আহলে নাজার আয পেই না'বীনা'য়ী

শারহে ইন কেচ্চে মাগার শাময়ে' বার অরাদ বে জাবা'ন
ভর না পারভানেহ নাদা'রাদ বে সুখান পারভা'য়ী

সুখান গাইর মাগো বা' মান মা'শুকেহ পারাস্ত
কেয ভেই ভ জা'ম মেইআম নীস্ত বে কেস্ পারভা'য়ী

ইন হাদীসাম চে খোশ অমাদ কে সাহারগাহ মীগুপ্ত
বার দার মেইকাদেহ ঈ বা' দাফ ভ নেই তারসা'য়ী

গার মুসলমানী আয ইন আস্ত কে হ'ফেয দা'রাদ
অহ আগার আয পেই ইমরুজ বুদ ফারদা'য়ী

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের উপরিউক্ত গজলে নজরুলের অনূদিত অংশ :

“গর্ মুসলমানী আজ্ আনস্ত্ কে হাফিজ দারদ্
ওয়ায় আগর আজ্ পেয় ইমরোজ বুয়দ্ ফরদায়ে।”

“হাফিজের যে ধর্ম, ইহাই যদি মুসলমান ধর্ম হয়, হায়, তাহা হাইলে কবে আজকার দিন শেষ হইয়া কল্য আসিবে !”

হাফিজের উপরিউক্ত গজলে নজরুলের অনূদিত অংশ :

“ই হদিসম্ চে খোশ্ আমদ্ কে সহরগাহ্মি গোফ্ত্
বর্ দরে ময়কদয়ে বা দফ ও নেয় তর্সায়ে।”

“একজন খ্রীষ্টধর্মী যখন এক সরাই-এর দ্বারে বসিয়া তাম্বুরা এবং বাঁশি লইয়া এই গান গাহিতেছিল, তখন সেই প্রাতঃকালে আমার কাছে সে গান কেমন মজার শুনাইতেছিল!” (নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪২)

হাফিজের গজল নং ৬

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را — به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت — کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب — چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است — به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم — که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم — جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند — جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو — که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریّا را

(হাফিজ সিরাজী[৬], ১৩৬২ : 8)

উচ্চারণ :

১। আগার্ অ'ন্ তোর্কে শীরা'যী বেদাস্ত অ'রাদ্ দেলে মা'রা'
বে খা'লে হেন্ দুইয়াশ্ বাখ্শাম্ সামারক্বান্দ ও বোখা'রা'রা'

২। বেদে সা'ক্বী মেইএ বা'ক্বী কে দার্ জান্নাত্ নাখা'হী ইঅ'ফ্ত
কেনা'রে অ'বে রোক্না'বা'দ্ ও গোল্ গাশ্তে মোসাল্লা'রা'

৩। ফাগা'ন্ কীন্ লূলিইঅ'নে শূখে শীরীন্ কা'রে শাহ্রে অ'শূব্
চোনা'ন্ বোর্দান্দ সাবার্ আয্ দেল্ কে তোর্কা'ন্ খা'নে ইয়াগ্ মা'রা'

Dhaka University Institutional Repository

৪। যে এশক্বে না'তামা'মে জামা'লে ইঅ'রে মোস্তাগ্নীস্ত্
বে অ'ব্ ও রাংগ্ ও খা'ল্ ও খাত্ চে হা'যাত্ রূয়ে যীবা' রা'?

৫। মান্ আয্ অ'ন্ হোস্নে রূয্ আফ্যূন্ কে দা'শ্ত দা'নেস্তাম
কে এশ্ক্ব আয্ পার্ দেয়ে এস্মাত্ বোরূন্ অ'রাদ্ জোলেইখা'রা'

৬। আগার্ দোশ্না'ম্ ফারমা'য়ী ও গার নেফরীন্, দো'অ গূইয়াম্
জাভা'বে তাল্খ মীযীবাদ্ লাবে লা-লে শোক্র খা'রা'

৭। নাসীহাত্ গূশ্ কোন্ জা'না' কে আয্ জা'ন্ দুস্ততার্ দা'রান্দ
জাভা'না'নে সাঅ'দাত্ মান্দ পান্দে পীরে দা'না'রা'

৮। হাদীস্ আয মাতরাব ও মীগু ও রা'য দেহার কামতার জু
কেহ্ কেস নাগশাভাদ ও নাগুশাইয়াদ বে হেকমাত ইন মুআম্মা'রা'

৯। গাযাল গুপতি ও দার সাকতী বিঅ ও খুশ বেখা'ন হাফিজ
কেহ বার নাজাম তু আফশা'নাদ ফালাক আকদে সুরাইয়া'রা'

ভাবানুবাদ :

১. যদি ওই শীরাজের রূপসী তুর্কি-তন্বি আমার হৃদয়কে (জয় করে) তার হাতে নিয়ে আসে তাহলে সমরকন্দ ও বোখারা তার কালো তিলের বিনিময়ে উৎসর্গ করবো।

২. হে সাকি, পেয়ালার অবশিষ্ট শরাব টুকুও আমাকে পান করতে দাও কেননা পরিচ্ছন্ন ও ফুলে ভরা রোকনাবাদের ঝরনার কিনারা ও মোসাল্লার উদ্যান বেহেশতেও পাবে না।

৩. হায় ! এ সুদর্শন, আমুদে, সাহসী, মনোমুগ্ধকর ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী গায়কেরা এমনভাবে হৃদয় থেকে ধৈর্য কেড়ে নিয়েছে যেমন করে তুর্কি মেহমান দস্তরখান লুণ্ঠন করে।

৪. বন্ধুর সৌন্দর্য আমাদের অস্পূর্ণ এশকের (প্রেমের) মুখাপেক্ষী নয়। হাঁ, সুন্দর চেহারার জন্য পানি, রং, তিল ও সিন্দুরের কিসের প্রয়োজন ?

৫. আমি জানতাম, ইউসুফের অপরিসীম রূপ: জুলেখার সতীত্ব ও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিবে।

৬. যদি আমাকে মন্দ বলো এবং ঘৃণাও কর, তবুও তোমায় দোয়া করবো (তোমার কল্যাণ কামনা করব), কারণ, ওই মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী লাল মিষ্টি ঠোঁটের তিক্ত জবাবও মনকে আনন্দিত করে (মিষ্টি ঠোঁটে তিক্ত জবাব খুবই সোভা পায়)।

৭. হে আমার প্রাণ, উপদেশ কান পেতে শোনো ! কেননা সৌভাগ্যবান যুবকেরা জ্ঞানী পীরের উপদেশকে প্রাণের চেয়েও ভালো বাসে।

৮. (উপদেশ এই যে) কেবল বাদক ও শরাব নিয়ে কথা বলো। জীবনের রহস্যে ব্যস্ত থেক না। কেননা কেউ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে নি এবং পারবেও না।

৯. হে হাফিয ! তোমার এ সুন্দর গজল দিয়ে যেন মুক্তার মালা গেথেছো। তা তুমি আবৃত্তি করে বেড়াও। যাতে তা আকাশ তার নক্ষত্র রাজীকে রূপের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে তোমার কবিতার ওপর উৎসর্গ করে।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের উপরিউক্ত গজলে নজরুলের অনূদিত অংশ :

'আগর্ আঁ তুর্কে শিরাজি বেদস্ত আরদ্ দিলে মারা'
বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্‌শম্ সমরকন্দ ও বোখারা রা!!'
"যদিই কান্তা শিরাজ-সজনী ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমরকন্দ্ ও বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিল্‌টের!"
(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪৩)

হাফিজ তাঁর এক সন্তান কে হারিয়ে নিম্নের ১৭ নং 'মুকাত্তা'টি লিখেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম চার বছরের প্রিয় পুত্র বুলবুলকে হারিয়ে উক্ত مقطع (মুকাত্তা) টি অনুবাদের মাধ্যমে হাফিজের বেদনাতে নিজের ব্যথা-বেদনা ব্যক্ত করেছেন। 'মুকাত্তা'টির উপরে লেখা ছিল مرگ فرزند (মারগে ফারজান্দ)। হাফিজের উপরিউক্ত মূল مقطع 'মুকাত্তা'টি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

مرگ فرزند

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند   چه دید اندر خم این طاق رنگین
به جای لوح سیمین در کنارش   فلک بر سر نهادش لوح سنگین

(হাফিজ সিরাজী[৩], ১৩৬২ : ৩৩১)

উচ্চারণ :

মারগে ফারজান্দ

দেলা' দীদী কে অন ফারজা'নে ফারজান্দ   চে দীদ আনদার ধাম ইন তা'ক রাঙ্গীন
বে জায়ে লৌহে সীমীন দার কেনা'রেশ   ফালাক বার সার নেহাদেশ লৌহে সাঙ্গীন

নজরুলকৃত উচ্চারণ ও অনুবাদ :

"দিলা দীদী কে আঁ ফর্‌জানা ফর্‌জন্দ্
চে দিদ্ আন্দর খমে ইঁ তাকে রঙ্গিন্
বজায়ে লওহে সিমিন দর্ কিনারশ্
ফলকে বর শের নেহাদশ লওহে সঙ্গীন।"

"ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস্-
পুত্র আমার আমার কোলে,
কি পেয়েছে এই সে রঙিন
গগন-চন্দ্রাতপের তলে।
সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের শিথানে তার!"

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪৩-৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ৬৪

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت   من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
بمن حکایت اردیبهشت می گوید   نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
به می عمارت جان کن که این جهان خراب   بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز   که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد   چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
مکن به نامه سیاهی ملامت من مست   که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

(হাফিজ সিরাজী[৬], ১৩৬২ : ৩৬)

উচ্চারণ :

কানুন কে মীদামাদ আয বুসতা'নে নাসিমে বেবেশ্ত   মান ভ শারা'ব ফারাহ বাখশ ভ ইয়া'রে হুরসারাশত
গেদা' চের' নাযানাদ লা'ফে সালতানাত ইমরুজ   কে খীমেহ সা'য়েহ আব্রাস্ত ভ বুজ মাগে লাবে কাশ্ত
চামান হেকা'য়াত উর্দিবেহেশত মী গুইয়াদ   না আ'কেল আস্ত কে নাসীহ খারীদ ভ নাকদে বেহেশ্ত
বে মেই ইমা'রাত দেল কুন কে ইন জাহা'ন খারা'ব   বার অন সারাস্ত কে আয খা'কে মা' বেসা'যাদ খাশ্ত
ভফা' মাজুয়ে যে দুশমান কে পুরতুভী নাদাহাদ   জু শামে' সুমেয়ে' আফরুজী আয চেরা'গে কানাশ্ত
মাকান বে না'মে সিয়া'হী মালা'মাত মান মাস্ত   কে অগাহে আস্ত কে তাকদীরে বার সারাশ চে নুশ্ত
কাদামে দারীগ মাদা'র আয জানা'যে হা'ফেয   কে গার চেহ গারাক গুনা'হাস্ত মীরাভাদ বে বেহেশ্ত

নজরুলকৃত উচ্চারণ ও অনুবাদ অংশ :

"কদমে দরিগ মাদার আয জানাজায়ে হাফিজ
কে গর্চে গর্ কে গুনাহস্ত্ মী রওদ্ বেহেশ্ত।"
"হাফিজের এই শব হ'তে গো তু'লো না কো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশ্তে সে যাবে তবু।"

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ২৩২

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود — وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود

می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت — کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود

شکرشکن شوند همه طوطیان هند — زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر — کاین طفل یک شبه ره یک ساله می‌رود

آن چشم آهوانه عابدفریب بین — کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود

خوی کرده میخرامد و بر عارض سمن — از شرم روی او عرق ژاله می‌رود

از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز — مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود

باد بهار می‌وزد از گلستان شاه — و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

(হাফিজ সিরাজী[৬], ১৩৬২ : ১২৯)

উচ্চারণ :

১। সা'কী হাদীসে সারভ ভ গুল ভ লা'লে মীরাভাদ
ভীন বাহাছ ব্ সুলা'সেয়ে গাস্‌সা'লে মীরাভাদ

২। মেই দেহ কে নু আরুছে চামান হাদ্দে হুসান ইয়া'ফ্‌ত
করে ইন যামা'ন যে ছানআতে দাল্লা'লে মীরাভাদ

৩। শেকার শেকান্‌ শাভান্দ হামে তুতিয়া'নে হিন্দ,
যিন কান্দ পারসী কে বে বাঙ্গা'লে মীরাভাদ

৪। তাইয়ে মাকা'ন বেবীন ভ যামা'ন দার ছুলুকে শে'র
কেইন তিফলে একশাবে রাহে একছা'লে মীরাভাদ

৫। অন চেশমে যা'দুভানেয়ে আ'বেদে ফারিব বীন,
কেশ্‌ কা'রভানে ছেহের যে দুম্বা'লে মীরাভাদ

৬। আয রাহ মারো বে উশওয়ায়ে দুনিয়া' কে ঈন আজুয,
মাকা'রে মীনাশীনদ ভ মুহতা'লে মীরাভাদ

৭। বাদে বাহা'র মীওয়াযাদ আয গুলিস্তা'নে শা'হ্‌
ভ আয ঝা'লে বা'দেহ দার কাদহে লা'লে মীরাভাদ

৮। হা'ফেয যে শাওকে মাজলিসে সুলতা'ন গিয়াছে দ্বীন,
গা'ফেল মাশো কে কা'রে তু আয না'লে মীরাভাদ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবানুবাদ :

১। সাকি ! সার্ভ, গুল ও লালার আলোচনা চলছে, তিন ধৌতকারী (পান পেয়ালা)- এসব নিয়ে আলোচনা চলছে।

২। মদিরার পেয়ালা দাও আমার হাতে। বাগানের নতুন বধু রূপ লাবণ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বউ সাজাবে এমন কারো প্রয়োজন নেই এখন।

৩। ফারসির এ মিছরি খণ্ড (গজলগীতি) যা বাংলায় যাচ্ছে তা নিয়ে ভারতের সব তোতারা (কবিরা) সবাই মিষ্টিমুখ হবে।

৪। কবিতার রীতিতে স্থান ও সময়ের অতিক্রম দেখো। এক রাতের এই শিশু যে এক বছরের পথ অতিক্রম করছে। (এক রাতে বসে লেখা কবিতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক বছরের রাস্তা অতিক্রম করছে)

৫। তাপসের মন ভোলানো যাদুময় ঐ চক্ষু দেখ, তার পেছনে যাদুর কাফেলা ছুটে চলেছে।

৬। পথ ভুলে যেয়োনা দুনিয়ার মোহে, এ যে প্রতারক বুড়ি। সর্বক্ষণ তোমার জন্যে প্রতারণার ফাঁদ পেতে রেখেছে।

৭। বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের বাগান হতে বসন্ত-মলয় প্রবাহিত হচ্ছে। লালাফুলের পানপাত্রে শিশিরের মদিরা জমা হচ্ছে।

৮। হাফিজ ! সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মজলিসের উদ্দীপনা নিয়ে উদাসীন বসে থেকো না। কারণ ক্রন্দন দিয়েই তোমার কার্য সিদ্ধ হবে। (আভারসাজী, আলী, সম্পাদিত, *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান*, মার্চ, ১৯৯৮, ভূমিকা)

(শাহেদী[৪], ১৯৯০ : ৭৩)

নজরুলকৃত অনুবাদ অংশ :

"আজকে পাঠাই বাঙ্‌লায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।"

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪-৪৫)

হাফিজের গজল নং ২১৪

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود — سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است — بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
بر سر تربت ما چون گذری همت‌خواه — که زیارتگه رندان جهان خواهد بو د
ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز — تا دگر خون که از دیده روان خواهد بو د
چشمم آن دم که ز شوق تو نهم سر به لحد — تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
بر زمینی که نشان کف پای تو بود — سال‌ها سجده صاحب نظران خواهد بود

Dhaka University Institutional Repository

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو　　راز این پرده نهان است و نهان خواهد بو د

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کر د

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

(হাফিজ সিরাজী[৩],:১৩৬২ : ১১৯)

উচ্চারণ :

১। তা' যে মেইখা'নে ভ মেই না'ম ভ নেশা'ন খা'হাদ বুদ
সারে মা' গা'ক রেহ পীর মুগান খা'হাদ বুদ

২। হালকে পীর মুগা'ন আয আযলাম দার গুশ আস্ত
বার হামা'নিম কে বুদিম ভ হমা'ন খা'হাদ বুদ

৩। বার সার তুরবাত মা' চুন গুজারী হিম্মত খা'হ
কে যিয়া'রাতগে রেন্দা'ন জাহা'ন খা'হাদ বুদ

৪। বুরু এই যা'হেদ খুদবিন কে যে চাশমে মান ভ তু
যে আয ইন পারদে নেহা'ন আস্ত ভ নেহা'ন খা'হাদ বুদ

৫। তুরকে আ'শেক কেশ মান মাস্ত বিরুন রাফ্ত ইমরুয
তা' দেগার খুন কে আয দীদে রাভা'ন খা'হাদ বুদ

৬। চাশমাম অন দাম কে যে শুকে তু নেহাদ সার ব লাহাদ
তা' দাম সুবহে কিয়া'মাত নেগারা'ন খা'হাদ বুদ

৭। বাখতে হা'ফেয গার আয ইন গুনে মাদাদ খা'হাদ কারদ
জুলফে মা'শুকেহ বে দাস্ত দিগারা'ন খা'হাদ বুদ

নজরুলকৃত উচ্ছারণ ও অনুবাদ অংশ :

"বর্ সরে তর্বতে মা চুঁগুজরি হিম্মত্ খাহ্,
কে জিয়ারত্গহে রিন্দা জাহাঁ খাহেদ্ শোদ্!"
"আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশিস্ তুমি,
এ গোর হবে ধর্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি!"

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ৩৯৫

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم — من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم

مُطرب کجاست تا همه محصول زُهد و علم — در کار بانگ و بربط و آواز نی کنم

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت — یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

کی بوده در زمانه وفا جام می بیار — تا من حکایت جم و کاووس کی کنم

خاک مرا چو در ازل از می سرشته‌اند — با مدعی بگو که چرا ترک وی کنم

از نامه‌ی سیاه نترسم که روز حشر — با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم

کو پیـک صُبـح تا گله‌های شب فراق — با آن خجسته طالع فرخُنده پی کنم

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رُخَش ببینم و تسلیم وی کنم

(হাফিজ সিরাজী[৬], দিওয়ানে হাফিজ, :১৩৬২ পৃ. ২১৭)

উচ্চারণ :

১। হা'শা' কেহ মান বে মৌসুমে গুল তার্ক মীকুনাম
মান লফে আকল মীজানাম, ইন কা' কেউ কুনাম।

২। মুতরেব কুজাস্ত? তা' হামে মাহসুল জুহ্‌দ ভ ইলম
দার কনে চাং ভ বার বাতে ভ অভা'য নেই কুনাম।

৩। আয কেইল ভ কা'লে মাদ্‌রাসে হা'লী দেলাম গেরেফ্‌ত
এক চান্দ নিজ খেদমাতে মা'শুক ভ মীকুনাম।

৪। কেউ বুভাদ দার যামা'নে ভফা? জামে মেই বিয়া'র!
তা' মান হেকা'য়াত জাম ভ কাউস কেউ কুনাম

৫। আয নমে সিয়া'হ নাতারসাম কে রুজে হাশর
বা' ফেইয মুতফ আও সাদ আযইন না'মেহ তেই কুনাম।

৬। কু পেইকে সুব্‌হ ? তা' গুল্লেহ হা'য়ে শাব ফারা'ক্ব
বা' অন খাজাস্‌তে ত্বা'লে' ফারখুনদে পেই কুনাম।

৭। ইন জা'ন আ'রিত কে বেহ হা'ফেয সেপার্‌দ দুস্ত
রুজি রুখাশ বেবিনাম ভ তাসলিম ভেই কুনাম।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবানুবাদঃ

১। অসম্ভব, এমন বসন্তের মৌসুমে আমি শরাব পান থেকে দূরে থাকব!
আমার জ্ঞান থাকতে আমি এ কাজ কখনোই করবো না।

২। গায়ক কোথায় ? যাতে যাহেদ ও জ্ঞানীর বিদ্যার দ্বারা
কিছুক্ষনের জন্য বাঁশি বাজিয়ে আওয়ায শুনি।

৩। আমি মাদ্রাসার কথোপকথনে ক্লান্ত হয়েছি,
তাই কিছুক্ষনের জন্য প্রেমাস্পদ ও শারাবের সান্নিধ্য প্রয়োজন।

৪। কখনোই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় নি, শারাবের পিয়ালা আন,
যাতে আমি জামশিদ ও কেইকাউসের ঘটনা বর্ণনা করতে পারি।

৫। আমি আমার অফুরন্ত গুনাহের জন্য দুস্তিন্তাগ্রস্ত নইঃ
কারণ, কেয়ামতের দিন এই গুনাহের শতগুন (মহান আল্লাহর) করুণার দ্বারা গুনাগুলোকে ঢেকে দিব।

৬। (প্রেমাস্পদের নিকট থেকে আগত) ভোরের বাতাস কোথায়?
সেই সৌভাগ্য ও সুভাগতকে আমি রাতের বিচ্ছেদের ঘটনা বলব।

৭। জীবনের শেষ মুহূর্তে বন্ধুর (আল্লাহর) সুন্দর চেহারা দেখব,
এই জীবন যা আমার কাছে আমানত ছিল তা সপর্দ করব।

নজরুল লিখেছেন :

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর–

"কায় বেখবর, আজ ফসলে গুল্ ও তরকে শারাব।"

"ওহে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন– আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে বসে আছিস!

হাফিজ লিখেছেন :

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
من لاف عقل می‌زنم ، این کار کی کنم ؟!

উচ্চারণ :

হা'শা' কেহ মান বে মৌসুমে গুল তারক মীকুনাম
মান লফে আকল মীজানাম, ইন কা' কেউ কুনাম।

[অসম্ভব , এমন বসন্তের মৌসুমে আমি শরাব পান থেকে দূরে থাকব!
আমার জ্ঞান থাকেতে আমি এ কাজ কখনোই করবো না।]

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের গজল নং ২৭৭

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخو ر

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یک سان نباشد حال دوران غم مخو ر

هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخو ر

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قد م
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله می داند خدای حال گردان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است ومقصد بس بعید
هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تا ر
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

(হাফিজ সিরাজী[৬], দিওয়ানে হাফিজ, :১৩৬২ পৃ. ১৫২)

উচ্চারণ :

১। ইফসুফ গুম গাশতে বা'জ অয়াদ বে কেনআ'ন গাম মাখুর
কালবে আহযা'ব শাভাদ রুজি গুলিস্তা'ন গাম মাখুর।

২। এই দেলে গামদীদে হা'লাত বে শাভাদ দেল বাদ মাকুন
ভেইন সার শুরিদেহ বা'জ অয়াদ বে সামান গাম মাখুর

৩। গার বাহা'র উমর বা'শাদ বা'জ বার তাখতে চামান
চাতর গুল দার সার কাশী এই মুরগে খুশখা'ন গাম মাখুর

৪। দূর গারদুন গার দু রুজি বার মুরা'দ মা' নারাফত
দা'য়েমা' এক সান নবা'সাদ হলে দৌড়া'নে গাম মাখুর

৫। হা'ন মাশু নুমিদ চুন ভাকেফ না এই আয সার গেইব
বা'শাদ আনদার পারদেহ বা'জী হা'য়ে পেনহা'ন গাম মাখুর

৬। এই দেল আয সেইল ফান' বুনয়া'দ হাস্তী বারকুনাদ
চুন তু রা' নুহ আস্ত কেশ্তীবা'ন যে তুফা'ন গাম মাখুর

৭। দার বিয়া'বা'ন গার বে শুক কা'বে খা'হী যাদ কাদাম
সারযানেশহ' গার কুনাদ খা'রে মাগীলা'ন গাম মাখুর

৮। গার চে মানযেল বাস খাতারনা'ক আস্ত ভ মাকছাদ বাস বাই'দ

Dhaka University Institutional Repository

হিচ রা'হি নিস্ত কা'ন রা' নিস্ত পা'য়া'ন গাম মাখুর
৯। হা'লে মা' দার ফোরকাত জা'না'ন ভ আবরা'ম রাকিব
জুমলে মীদা'নাদ খোদা'য়ে হা'ল গারদা'ন গাম মাখুর
১০। হা'ফেয দার কানূজ ফেকর ভ খালভাত শাবহায়ে তা'র
তা' বুভাদ ভরদাত মুআ' ভ দারসে কুরআন গাম মাখুর

নজরুলের 'বোধন' ('মোসলেম ভারত', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) কবিতাটির নিচে ছিলোঃ 'হাফিজের "য়ুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ্ আয়েদ ব- কিনআন্ গম মখোর" শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া।' বোধন কবিতাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।

২

হয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা- আড়ে প্রহেলিকা-মধু,-বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই, ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

৩

দু'দিনে তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ!
পুণ্য- পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে;
কণ্ঠক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পরওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৭৫ : ১০৩-১০৪)

হাফিজের গজল নং ৭৪

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست — پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان — نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین — گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند — کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر — که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم — اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

(হাফিজ সিরাজী[৩], ১৩৬২ : ৪২)

উচ্চারণ :

১। জুল্‌ফ অশেফ্‌ত ভ খুভে কারদ ভ খানদা'নে লাভ ভ মাস্ত
পিরাহান চা'ক ভ গাযাল খাভা'ন ভ ছেরা'হি দার দাস্ত
২। নারগেসেশ উরবেদেহ জুভে ভ লাবেশ আফসোনে কুনা'ন
নীম শাব দুশ বে বা'লিন মান অমাদ বেনেশাস্ত
৩। সার ফারা' গুশে মান অভা'র বে অভা'য হাযিন
গুপ্ত এই আ'শেক দীরীনেহ মান খভা'বাত হাস্ত
৪। আ'শেকী রা' কে চেনিন বা'দেহ শাবগিন দেহান্দ

Dhaka University Institutional Repository

কা'ফের এশ্‌ক বুদ গার নাশাভাদ বা'দেহ পারাস্ত

৫। বুরু এই জা'হেদ ভ বার দারদকেশা'ন খুরদে মাগির
কে নাদা'দান্দ জুয ইন তুহফে বে মা' রোযে আলাস্ত

৬। অন চে উ রিখ্‌ত বে পেইমা'নে মা' নুশিদীম
আগার আয খাম্‌র বেহেশ্‌ত আস্ত ভ গার বা'দেহ মাস্ত

৭। খান্দে জা'মে মেই ত জুলফে গারেহ গীর নেগা'র
এই বাসা' তৌবেহ কে চুন তৌবেহ হা'ফেয বেশেকাস্ত

ভাবানুবাদ :

১. অলক গুচ্ছ উদাম ও ঘামে ডুবিয়া গিয়াছে, হাস্য স্ফুরিত ওষ্ঠ ও মত্ত, জামা ছিন্ন ভিন্ন, সঙ্গীত সুখর, হাতে সোরাহী।

২. নার্গিস অক্ষি সংগ্রামেচ্ছু ওষ্ঠে আফসোস বাণী, বলিতে বলিতে অর্ধরাতে মত্ত হালে আসিল এবং আমার সেজের পাশে বসিল

৩. তাহার মস্তক আমার কানের কাছে আনিয়া বেদনাময় মৃদু স্বরে বলিল, হে আমার পাগল প্রেমিক, কী ঘুম তোমার পাইয়াছে।

৪. যে প্রেমিক এমনই মদের নেশায় বিভোর রজনী কাটায়, যদি শরাবের উপাসনা না করি, তবেত সে প্রেমের দিক হইতে কাফির।

৫. যাও হে বহিরঙ্গ ধর্ম পুজারী, শরাবের তলানী-পায়ীদের দোষ খুজিও না, সৃষ্টির প্রথম দিনে এই তোহ্‌ফা ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেওয়া হয় নাই।

৬. সে আমার পেয়ালায় যাহা কিছু ভরিয়া দিয়াছে, তাহাই আমি পান করিয়াছি, তাহা চাই বেহেস্তের শরাব হউক বা দুনিয়ার শরাব হউক।

৭. হাস্যোজ্জ্বল মদের পেয়ালা অলক দামের বিনুনীর পর বিনুনীতে হাফিজের অনুশোচার মত বহুলোকের অনুশোচনা ভঙ্গ করিয়াছ।

(মনসুরউদ্দীন[৪], ১৯৭৮: ৪১ নং গজল)

কাজী নজরুল ইসলাম 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতাটি *দিওয়ানে হাফিজ*-এর উপরোক্ত ৭৪ নং গজল অবলম্বনে রচনা করেন। নজরুলের 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' কবিতা :

কোঁক্‌ড়া অলক মূর্ছেছিল ঘাম-ভেজা লাল্ গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল, সে যায় যেন বায় ঝাউ-এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তার আকুল অধর-পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে,
শরাব ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নাম্‌লে সে।
দরদ্-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল আফ্‌সোসের,
চোখ দু'টি নীর-সিক্ত যেন ফাগুন-বুকে ছাপ পোষের।
কোন্ বেদনার কণ্টকে গো বুকের বসন দীর্ণতার,
ছিন্ন-তারের সেতার-সম কণ্ঠে বাণী ক্ষিণ্নতার।
এলিয়ে দিয়ে আমার পাশে ব্যথায় বিবশ ম্লান তনু

Dhaka University Institutional Repository

কইল ক্লেশে, 'কান্ত আমার আমার চেয়েও ক্লান্ত, উঃ !"
শঙ্কা-আকুল মুখটি শেষে কানের কাছে চুমিয়ে সে
জিজ্ঞাসিল, "আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক্ ঘুমিয়েছে ?"
ঘুমিয়ে সে কে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে,
নিঝুম্ ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে-বাক্ মিলে ! ...
কম্পিত বাম্ হাতটি থুয়ে স্পন্দিত মোর বুক্‌টিতে
শরাব্ নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক একনিতে।
বেহেশ্‌তি সে শরাব, না তা' আঙুর-গলা রস ছিল,
জিজ্ঞাসি নাই,-- কানে শুধু মিনতি তার পশ্‌ছিল।
এমনি বেশে মুক্ত কেশে এমনি নিশুত রাত্তিরে
শরাব্ নিয়ে এসে প্রিয়া রাখ্‌লে বুকে হাত ধীরে,
প্রেমের এমন বেদিল্ কাফের কে আছে গো বিশ্বে সে
শরাব্ সোরাই এক নিশেষে পান করে না নিঃশেষে ?
ওগো কাজী, খাম্‌খা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে ?
ভাঙ্‌তে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে !

(নজরুল ইসলাম[৩], ১৯৯৩ : ৫১৯)

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আভারসাজী, আলী, সম্পাদিত, *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৯৮।

২. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পাদনায়ঃ আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ ফাল্গুন ১৩৮১/ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৭।

৩. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায় : আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ : ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৪. মনসুরউদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ : *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৩৮৪/ জানুয়ারী, ১৯৭৮।

৫. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা : *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী*, ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রকাশকাল : বৈশাখ- ১৩৯৭/ মে- ১৯৯০।

৬. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ : *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ. নজরুল অনূদিত *দিওয়ান-ই-হাফিজ* এর ৮টি গজল

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল - ১

জাগো সাকি হাম্‌দরদী, জাম-বাটিতে দাও শরাব,
চুলোয় যাক এই দুঃখ-ব্যথা, ধুলোয় ঢাকুক সব অভাব !-১

ভর্‌-পিয়ালা দস্তে দে দোস্ত, মস্ত হয়ে বুঁদ সেই নেশায়,
দিই ফেলে এই শির হতে ঐ সুনীল আকাশ-গাঁঠ্‌রিটায় !-২

ভয় কি সখি ? করবে নিন্দা শাস্ত্র-শকুন বক্কুরা ?
বদ্‌নামে মোর পরোয়া থোড়াই ! চালাও পান্সি, দাও সুরা !-৩

নেশার দারু জরুরি ভাই, খোদ্‌-দেমাকির নাশ্‌তে জাত,
ঢালো শরাব, আত্ম ভোলাও, চেতন আমার হোক নিপাত !-৪

দহন-দারুন দিল্‌ ছেপে মোর উঠ্‌ছে সে শ্বাস বহ্নি-শিশ,
কতই কাঁচা শুষ্ক হৃদয় পুড়্‌ছে তাতে অহর্নিশ !-৫

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফির্‌নু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখ্‌নু ঢুঁরে দিল্‌-দরদী বন্ধু নাই।-৬

তারি তবে জান্‌ কাঁদে মোর, সেই জানি মোর দিল্‌-আরাম,
করলো যে মোর এই জীবনের সকলে সোয়াদ-মুখ হারাম !-৭

গুলবাগে আর দেবদারুকে দেখ্‌তে কারুর রয় না সাধ,
দেখলে প্রিয়ার সরল ছাঁদ আর চাঁদ্‌নী-সফেদ বদন-চাঁদ !-৮

মাটির ভাঁটির রস ছিল যা, সব পিয়েছিস্‌, কিসের দুখ ?
খাও পিও আর স্ফূর্তি চালাও, চালাও-মৌজে দিন কাটুক।-৯

দিবানিশি পাস্‌ যে ব্যথা, ওরে হাফিজ, দু'দিন থাম্‌ !
আসবে প্রিয়া দিল্‌-জানিয়া, পূর্ণ হবে মনস্কাম !-১০

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল - ২

বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন বাজিয়েছিল কাল রাতে
বন্‌শীওয়ালা-আল্লাতা'লা রাখুন তারে আহ্লাদে !

করলে আমায় ক্লান্ত এতই তার সে মুর্‌জ মুরঝা সুর-
বোধ হলো মোর বিশ্ব-নিখিল কেবল কান্না-বেদ্‌নাতুর !

পার্শ্বে ছিল ছুক্‌রি সাকি ঠোঁট-কুপে যার 'আব-হায়াত',
মুখ আলো আর কেশ কালো যার খেলায় সদাই দিন ও রাত।

বিহ্বল আমার তৃষ্ণা দেখে পাত্রে আরো ঢালল মদ্‌,
মদ্‌ মদালস কইনু আমি চুম্বি' সাকির পুণ্য পদ-

"মুক্তি দিলে আমার 'অহম্‌'-দুঃখ থেকে আজ তুমি,
মদ ঢেলে যেই করলে অধর নাচ-পেয়ালার নাচ-ভূমি।

আল্লা তোমায় আগ্‌লে রাখুন আলাই-বালাই আপনি নে,
সাকি ! তোমার সর্বলোকে কল্যাণ হোক সব দিনে।"

হাফিজ যখন আপন-হারা কোথায় বা তোর 'কায়্‌কাউস্‌',
কায়কোবাদের কুলমুলুক ?-এক তিল বরাবর তখ্‌তাউস্‌।"

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৩৬-৫৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল -৩

হাঁ, এয়্, সা'কি, শরাব ভর লাও
বোলাও পেয়ালী চালাও হর্‌দম্ !
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর
শেষের দিক তার ঢালাও কর্দম !
কসম তার ভাই ভোরের বায় ভায়
অলক-গুচ্ছের যে বাস্ কান্তার্,
বহুৎ দিল্ খুন্ করলে কুন্তল
কপোল-চুম্বী চপল ফাঁদ্‌দার।
যদিই ক'ন তোর সাগ্নিক ঐ পীর্
মুসল্লায় কর্ শরাব্-রঙ্গিন্,
পথেই রথ্ যার অচিন্ নয় তার
কোথায় পথ্ ঘাট্ খাবার সঙ্গিন্।
আরাম সুখ্ মোর হারাম্ বিল্‌কুল্
পথের মঞ্জিল্ পিয়ার মুল্‌কের,
নকিব হরদম্ হাঁকায় হাম্‌দম্–
পথিক! দূরপথ্ গাঁঠরি তুল্ ফের !
অন্ধকার রাত, উর্মি-সংঘাত,
ঘুর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে,
বেলায় বাস্ যার বুঝবে ছাই তার
পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে !
তামাম্ মোর কাম্ শুধুই বদ্‌নাম্,
নিজের দোষ্ ভাই নিজের দোষ্ সে,
গোপন্ দূর্ ছাই রয় কি নাম্ তার
রাজ-সভায় যার চর্চা জোর্-সে।
প্রসাদ চাস্ ? বাস্, গাফিল্ হোস্‌নে
হাফিজ হর্‌দম্ হাজির-মজ্‌লিস !
এ-সব তঞ্চট্ ঝক্কি-ঝঞ্চট্
ছোড়্ দে, তারপর পিয়ার খোঁজ্ নিস্।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৩৭-৫৩৮)

এ গজলটির নিচে নজরুল লিখেছেন: গজলটির ধর্‌তা এই :

"আলাইয়্যা আইয়োহাস্ সা'কি আদির্ কা-সা ওয়ানা বিল্‌হা !"

হাঁ, এয়্, সা'কি শরাব্ ভর লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হর্‌দম্ !

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৩ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর ১ নং গজল :

হাফিজের গজল নং ১

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها — که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید — ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم — جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید — که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل — کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر — نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ১)

উচ্চারণ :

১। আলা এয়া' আইয়ুহাস্ সা'কি আদির কা'সাও ওয়া না'বিলহা'
কে এ'শক্ অসা'ন নেমুল আউভাল ভয়ালি উফতা'দ্ মুশকিলহা'।

২। বে বুয়ে না'ফেহ এই কা'খের সাবা যা'ন্ তুর্রে বুগশা'য়াদ,
যে তা'বে যা'দে মিশ্কীনাশ চে খুন উফতা'দ দার দেলহা'।

৩। মোরা' দার মানযিলে জা'না'ন্ চে আমনে এইশ চুন হারদাম,
জারাছ্ ফারয়া'দ মী-দা'রাদ কে বার বান্দীদ মাহমিলহা'।

৪। বে মেই সাজ্জা'দেহ রাঙ্গীন কুন গারাত পীরে মোগা'ন গুইয়াদ,
কে ছালেক বি খবর না বুয়াদ যে ও'হ ভ রাসমে মানযিলহা'।

৫। শাবে তা'-রীক ও বীমে মৌজ ভ গেরদা'বী চুনীন হা'য়েল,
কুজা' দা'-নান্দ হা'লে মা' সাবুকবা'রা'নে সা'হেল হা'।

৬। হামে কা'রাম যে খোদ্‌কা'মী বে বাদনা'মী কেশীদ অ-খের,
নেহা'ন কেই মা'নাদ অন রা'যী কেজু সা'জান্দ মাহফিলহা'।

৭। হুজুরি গার হামি খা'হি আজু গা'য়েব মাশু হা'ফেয
মাতামা' তালকা মান্ তাহওয়া দারি'দ্দুনইয়' ভ আহমিল্হা।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল-৪

হে মোর সুন্দর ! চাঁদের চাঁদমুখ
তোমার রৌশন রূপ্ মেখেই,
রূপের জৌলুস্ তোমার টোল্দার্
চিবুক্-গণ্ডের কূপ্ থেকেই ।
ওষ্ঠে প্রাণ ! হায় দেখ্তে চাও তায়
গোল্-বদন্ ঐ ঘোম্টা-হীন,
জানাও ফর্মান্ জ্বল্বে আর না
নিব্বে জান্টার মোম্টা ক্ষীণ !
তোমার কেশপাশ্, আমার দিল্, বাস,-
জমবে জোট্ সেই এক জা'গায়,-
আরজ এই ক্ষীণ্ মিট্বে কোন্ দিন ?
আর না বিচ্ছেদ,-দেক্ লাগায় !
নার্গিস-অক্ষি ! হর্লে সব সুখ্
তোমার নয়নার অত্যাচার,
মস্ত্ চাউনির হস্তে তাই কই
যাক্ সতীত্বও হত্যা ছার !
খুল্বে এইবার নয়ন-পাত্ তার
বদ-নসিব্ মোর নিঁদ্-আঁতুর,
আজ যে প্যারীর উজ্লি স্মিরতি'য়
আন্লে নির্ঝর ক্ষীণ্ আঁসুর !
পাঠিয়ো ভোর বায় ফুল্ল ফুল্ তুল্
তোমার গণ্ডের ফুল্ তোড়া !
যদিই পাই তায় তোমার বোঁস্তার
খোশ্বুদার খাক ধুল থোড়া !
দে খবর দিল্- দার্ পিয়ায় সই
বক্ষে আজ মোর জোর ব্যথা,
মাথার দিব্যি রইলো সই লো,
জরুর ক'স তায় মোর কথা !
জামশেদের দর- বারের সা'কি !
বাড়ুক্ পর্মাই মদ্য-পিও্ !
তোমার হস্তে এ মদের ভাঁড়্ মোর
পুর্লো নাই ভাই যদ্যপিও !
'য়্যাজদ' মুল্কের বাসিন্দায় সব্
বলবে, বন্ধু ভোর-সমীর !

Dhaka University Institutional Repository

(ভরুক্ ময়দান্ লুটাক্ পায়-পায়
অকৃতজ্ঞের খন্ড শির !)
"বহুৎ দূর পথ্ বহুৎ বিচ্ছেদ্
স্মৃতির ভুল্ হায় হয়নি তায়,
তাদের বাদশার্ গোলাম্ আজ্‌কেও
তাদের খোশ্‌নাম্ কয় সদাই।"
চল্‌তে মোর পথ্ সাম্‌লো প্যারী,
আঁচর, খাক্ আর খুন্ হতে ;
তোমার এশ্‌কের নিরাশ্ খুন-দিল্
লোহু'য় পথ্ এ পূর্ণ যে !
এয়্ শাহানশাহ্ ! ওয়াস্তে আল্লার
শক্তি দাও এই, অহর্নিশ্-
আস্‌মানের ন্যায় চুম্বি অম্‌নি
তোমার খাস্ রঙ-মহল শীষ্ !
আশিস্ চায় এই 'হাফিজ্' হর্‌দম্,
কও 'আমিন' সব খুব মনে–
"লাল শিরিন ঠোঁট পিয়ার রোজ পাই
ভরাই লাখ্ লাখ্ চুম্বনে !"

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৩৮-৫৪০)

এ গজলটির নিচে নজরুল লিখেছেন: ছন্দসূত্র :–

'এয়্ ফরোগে মাহে হোস্‌ন্ আজ্ রূয়ে রোখ্‌শা নে শুমা
আবরূয়ে খুবি আজ্ চা– হো জনখ্‌দা নে শুমা।

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৪ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর ২ নং গজল :

হাফিজের গজল নং ২

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما — آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده — بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند — خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
کس به دور نرگ‌ست طرفی نبست از عافیت — به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر — زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای — بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم — گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید — زینهار ای دوستان جان من و جان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری — کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما

Dhaka University Institutional Repository

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو   کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو   روزی ما باد لعل شکرافشان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست   بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی   تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکر افشان شما

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ২)

উচ্চারণ :

১। এই ফোরূপে মা'হে হোস্ন আয্ রূয়ে রোখ্শা'নে শোমা'
আ'ৰে রূয়ে খূবী আয্ চা'হে যেনাখ্দা'নে শোমা'

২। আয্মে দীদা'রে তো দরাদ্ জা'নে বার্ লাব্ অ'মাদে
বা'স্ গার্দাদ্ হা'অ' বার্ অ'ইয়াদ্ চীস্ত ফারমা'নে শোমা'?

৩। কাস্ বে দৌরে নার্ গোমাত্ তারফী নাবাস্ত আয্ আ'ফিইয়াত্
বেহ্ কে নাফোরূশান্দ মাস্তুরী বে মাস্তা'নে শোমা'

৪। বাখ্ তে খা'ব্ অ'লূদ মা'বীদা'র্ খা'হাদ্ শোদ্ মাগার্
যা'ন্ কে খাদ্ বার্ দীদে অ'বী রূয়ে রোখ্শা'নে শোমা'

৫। বা' সাবা' হামা্'রা'হ্ বেফেরেস্ত আয্ রোখাত্ গোল্দাস্তেয়ী
বূকে বূয়ী বেশ্নাভীম্ আয্ খা'কে বোস্তা'নে শোমা'

৬। ওম্রে তা'ন্ বা'দ্ ও মোরা'দ্ এই সা'ক্বিঅ'নে বাখ্মে জাম্
গার্ চে জা'মে মা' নাশোদ্ পোর্মেই বে দৌরা'নে শোমা'

৭। দেল্ খারা'বী মীকোনাদ্ দেল্দা'র্ রা' অ'গাহ্ কোনীদ্
যীন্হা'র্ এই দূস্তা'ন্ জা'নে মান্ ও জা'নে শোমা'

৮। কেই দাহাদ্ দাস্ত ইন্ গারায্ ইঅ' রাব্ কে হাম্দাস্তা'ন্ শাভান্দ
খা'তেরে মাজ্মূএ মা' যোল্ ফে পারীশা'নে শোমা'

৯। দূর্ দা'র্ আয্ খা'ক্ ও খূন্ দা'মান্ চু রার্ মা' বেগ্যার
কা'ন্দারীন্ রাহ্ কোশ্তে বেসইঅ'রান্দ ক্বোরবা'নে শোমা'

১০। মীকোনাদ্ হা'ফেয্ দোঅ'য়ী বেশনো অ'মীনী বেগূ
রূমীয়ে মা'বা'দ্ লা-লে শেকার্ আফ্শা'নে শোমা'

১১। এই সাবা' বা' সা'কেনা'নে শাহ্রে ইয়ায্দ আয্ মা' বেগূ
ক'ই সারে হাক্ব না'শেনা'সা'ন্ গূয়ে চূগা'নে শোমা'

১২। গার্ চে দূরীম্ আয্ বেসা'তে ক্বোরব হেম্মাত্ দূর্ নীস্ত
বান্ দেয়ে শা'হে শোমা'য়ীম্ ও ছানা'খা'নে শোমা'

১৩। এই শাহানশা'হে বোলান্দ আখ্তার খোদা'র' হেম্মাতী
বেবূসাম্ হাম্চু আখ্তার্ খা'কে এইভা'নে শোমা'

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ :

১. ওহে অপরূপ, তোমার উজ্জ্বল চেহারা থেকে চাঁদ আলো গ্রহণ করে এবং তোমার কপোলের টোল থেকেও তার সতেজতা বেরিয়ে আসে।

২. আমার প্রাণ তোমার দিদারের আগ্রহে ওষ্ঠাগত– তা কি বেরিয়ে যাবে নাকি ভেতরে থাকবে; তোমার ফরমান কী?

৩. কেউই তোমার মদ্যপ চোখের সামনে নিরাপত্তা অনুভব করে না সুতরাং উত্তম যে, তোমার মত্ত চোখের সামনে কেউ পরহেজগারির দাবি না করে।

৪. আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাগ্য নিঃসন্দেহে জাগ্রত হবে যদিও তোমার চেহারার আলো আমাদের চোখের আগ্রহের অশ্রু ঝরিয়েছে।

৫. ভোরের সমীরের সাথে তোমার সুন্দর চেহারার এক তোড়া ফুল পাঠিয়ো হয়তো তোমার বাগান থেকে ঘ্রাণ আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছবে।

৬. বন্ধুর আসরের হে সাকিগণ, দীর্ঘজীবি হও, কামনা হোক পূর্ণ যদিও আমাদের পেয়ালা হয় নি পূর্ণ, তোমাদের সময়কালে।

৭. (হে বন্ধু) আমার হৃদয় ভালো নেই, হৃদয়বানকে তা জানিয়ে দিয়ো। হে বন্ধু, আমার প্রাণ দেখে রেখো, আমার প্রাণই তো তোমার প্রাণ।

৮. হে রব, এ উদ্দেশ্য কখন হাসিল হবে, আমাদের এশকে তৃপ্ত হৃদয় তোমার পেরেশান চূর্ণকুন্তলের সাথে একীভূত হবে।

৯. যখন তুমি আমাদের কাছ দিয়ে যাও নিজ আঁচলকে মাটি ও রক্ত থেকে দূরে রেখো কেন না তোমার এশকের পথে বহু আশেক কোরবান হয়েছে, ঝরেছে রক্ত জমিনে।

১০. হাফিয দোয়া করছে, শোন এবং বলো তুমি 'আমিন' হোক আমাদের রুজি তোমার মিষ্টি ও লাল টুকটুকে ঠোঁট।

১১. হে ভোরের সমীর, আমাদের পক্ষ থেকে ইয়াযদ শহরের বাসিন্দাদের বলো সাহসী জনগণ, তোমাদের অকৃজ্ঞরা যেন পোলো বলের মতো হতবুদ্ধি।

১২. যদিও আমরা শাহের দরগা থেকে দূরে এবং তার নৈকট্য থেকে বঞ্চিত (কিন্তু) আমরা তোমার শাহের বান্দা এবং তোমার গুণকীর্তনকারী।

১৩. হে উঁচু ক্ষেত্রতুল্য বাদশা ও সৌভাগ্যবান তোমাকে খোদার কসম ! দোয়া কর যেন আসতে পারি তোমার দরগায় এবং নক্ষত্ররাজির মতো চুমু দিতে পারি বারবার।

* কবি এখানে রূপ ও সৌন্দর্যকে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন যা মাশুকের চেহারার আলোকবর্তিকার প্রতিফলন। ২য় মেস্রাতে সৌন্দর্যকে ফুলের অথবা কোন ব্যক্তির চেহারার সাথে তুলনা করা হয়েছে যার সতেজতা তরতাজা ভাব মাশুকের চিবুকের টোল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওষ্ঠাগত প্রাণের ভেতরে যাবার সম্ভাবন আছে কি ? যদি তা বেরিয়ে যায় তবে সইবার ক্ষমতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল - ৫

হাত্ হতে মোর হৃদয় যায়
দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান্ !
আফ্সোস্ ! আমার গোপন্ সব্
ফস্কে যে দেয় নিদয় প্রাণ।
দশ দিনের এই দুনিয়া ভাই,
স্বপ্ন-কুহক কল্প-লোক ;
কর্তে ভালোই বন্ধুদের,
বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক্ !
বও অনুকূল বায়, এ নাও
ভগ্ন, মনেও শ্রান্তি হায় !
হয় তো দু'বার দেখ্ব ফের্
সে হারা মোর প্রাণ-পিয়ায়।
শরাব্-সভায় কুঞ্জে আজ
বুলবুলি বাঃ বোল্ বিলায় –
লাও্ প্রভাতের মদের ভাঁড়,
মস্তানা সব্ জল্দি আয় !
হাজার লাখ্ হে মহান্-প্রাণ
সালাম সালাম ধন্যবাদ !
দরবেশ্ এ দীন একটি দিন
প্রসাদ চায়, নাই অন্য সাধ।
দুই দুনিয়ার আরাম্ সব
ব্যাখ্যা ভাই এই এক কথায়,–
দোস্তে মধুর স্নিগ্ধ ভাষ,
শত্রু যে–দাও বক্ষ তায়।
সুনাম সুযশ লাভের পথ্
করলে হারাম, হে দুর্বোধ !
মন্দ বোধ হয় কু-নাম আজ ?
বদ্লে দাও, বাস্ এ দূর পথ্।
জম্শেদের এই মদের গ্লাস
সিকান্দারের আয়না ভাই ;
দারার দেশের সকল হাল
ঐ হের বাঃ, ভায় না তায় ?
শির ঝোঁকা, নয় মোমের ন্যায়
জ্বাল্বে – সে কি শরম কম ?–

Dhaka University Institutional Repository

এ পিয়া যার	পরশ ঘা'য়	
	কঠিন শিলাও	নরম মোম্।
বন্ধুদে' সব	বৈতালিক্	
	গায় যদি এই	ফার্সি গীত্
সন্ন্যাসী পীর	ভাব-মোহিত্	
	নাচ্‌বে ; এ-গান	সার্-নিহিত্।
ঐ খাঁটি মদ্-	সুফীর দল্	
	পাপের মা কয় ?-	আ-দুত্তোর !
আইবুড়ো সব	ছুকরিদের	
	ঠোঁট-চুমোরও	মধুরতর্ !
হাতখালি ? বাস্,	আয়াস্ কর্,	
	আয়েস করার,	শেখ সুখেও ;
পরশ-পাথর	মত্ততার	
	'কারুণ' বানায়	ভিক্ষুকেও।
পর্‌মায়ু দেয়	মুমূর্ষুরে	
	ফারেস্ দেশের	দিল্-পিয়ায়,
এয় সাকি, এই	খোশখবর	
	জ্ঞান-বুড়োদের	বল্‌বি ভাই !
খাম্‌খা হাফিজ	দেয় নি গা'য়	
	শবার-রঙিন	কুর্তি এই,
আলখেলা পাক্	গা'য় হে শেখ !	
	লাচার, সব এই	ফুর্তিতেই !

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৪০-৫৪)

এ গজলটির নিচে নজরুল লিখেছেন: ছন্দ :

"দিল্ মি রওদ যে দস্তম সাহিব্ দিলাঁ খোদারা"
হাত্ হতে মোর হৃদয় যায় দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান্ !

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৫ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর ৩ নং গজল :

হাফিজের গজল নং ৩

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائث خواند
اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
ساقی بشارتی ده رندان پارسا را
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود
ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ২-৩)

উচ্চারণ :

১। দেল্ মীরাভাদ্ মে দাস্তাম্ সা'হেব্ দেলা'ন্ খোদা'র'
দার্দা কে রা'যে পেন্হা'ন্ খা'হাদ্ শোদ্ অ'শ্‌ক'র

২। কাশ্ তিয়ে শেকাস্তে গা'নীম্ এই বা'দে শোর্তেবার্খীয্
ব'শাদ্ কে বা'য্ বীনাম্ দীদা'রে অ'শেন' রা'

৩। দাহ্ রূমে সেহ্রে গার্দূন্ আফ্সা'নে আস্ত ও আফ্সূন
নীকী বেজা'য়ে ইঅ'র'ন্ ফোর্সাত্ শোমা'র্ ইঅ'রা'

৪। দার্ হাল্ ক্বেয়ে গোল্ ও মোল্ খোশ্ খা'ন্দ দুশ্ বোল্ বোল্
হ'তেস্ সাবূহ' হোব্বূ ইঅ' আইউহাস্ সোকা'রা'

৫। এই সা'হেবে কেরা'মাত্ শোক্রা'নেয়ে সালা'মাত
রূমী তাফাক্কোদী কোন্ দার্ ভীশে বীনাভা'রা'

৬। অ'সা'য়েশে দো গীতী তাফ্সীরে ইন্ দো হার্ফাস্ত
বা'দূস্তা'ন্ মোবোভ্ ভাত্ বা' দোশ্মানা'ন্ মোদা'রা'

৭। দার্ কূয়ে নীক্না'মী মা'র' গোযার্ নাদা'দান্দ
গার্ তো নেমী পাসান্দী তাগীর্ কোন্ ক্বাযা' রা'

Dhaka University Institutional Repository

৮। অ'ন্ তাল্খ ভাশ্ কে সূফী ওস্ সোল্ খাবা'য়েশ্ খা'ন্দ
আশ্হ' লানা' ভাআহ্লা' মেন্ ক্বোব্লাতেল আযা'রা'

৯। হেংগা'মে তাংগ্তাস্তী দার্ এইশে কূশ্ ও মাস্তী
কীন্ কীম্ ইঅ'য়ে হাস্তী ক্বা'রূন্ কোনাদ্ গাদা' রা'

১০। সার্ কেশ্ মাশো কে চুন্ শাম্ আয্ গেইরাতাত্ বেসূযাদ্
দেল্বার্ কে দার্ কাফে উ সূমাস্ত সাংগ খা'রা'

১১। অ'য়ীনেয়ে সেকান্দার্ জা'মে মেইয়াস্ত বেন্গার্
তা' বার্ তো আর্মে দা'রাদ্ আহ্ ভা'লে মোল্ কে দা'রা'

১২। খুবা'নে পা'র্সী বাখ্শান্ দেগা'নে ওম্রান্দ
সা'ক্বী বেদেহ্ বেশা'রাত্ রেন্দা'নে পা'র্সা'রা'

১৩। ফেয্ বেখোদ্ নাপূশীদ্ ইন্ খেরক্বেয়ে সেই অ'লূদ
এই শেইখে পা'ক্ দা'মান্ মা-মূর্দা'র্ মা'রা'

অনুবাদ :

১. হে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, হৃদয় আমার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, খোদার জন্য কতই আরেফ বেদনাদায়ক যে, আমার গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

২. আমরা ভাঙ্গা নৌকার মুসাফির। হে অনুকূল বাতাস, প্রবাহিত হও হয়তো আবার পরিচিত জনের দিদার পাব।

৩. দশ দিনের মেহেরবানি ও ক্ষণকাল অসারকাহিনী ও (এতক্ষণ সময়) বন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রতারণা ভিন্ন কিছু নয়। নেকি করার এ সুযোগ মূল্যবান মনে কর।

৪. গতরাতে যে মজলিস ছিল ফুল ও শরাবে সজ্জিত, বুলবুলি কী সুন্দর গান গেয়েছে, হে মস্তান, ওঠ, প্রাতের শরাব নিয়ে আসো।

৫. হে মহান, শান্তি ও নিরাপদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একদিন সান্ত্বনা দাও এ নিঃস্ব ও অসহায় দরবেশকে।

৬. দু জগতের প্রশান্তি এ দু কথারই ব্যাখ্যা–বন্ধুদের সাথে সহানুভবতা আর দুশমনের সাথে সদ্ভাব।

৭. আমাদেরকে সুখ্যাতির আবাস অতিক্রম করতে দেয় না যদি তুমি এটা অপছন্দ কর পরিবর্তন কর ভাগ্য।

৮. ওই তিক্ত শরাব যেটাকে সুফি সকল খারাপ কাজের মূল বলে জানে। (এটি) কুমারী মেয়ের চুম্বনের চাইতেও মজাদার, উত্তেজক ও মিষ্টি।

৯. নিঃস্ব অবস্থায় ও সত্ততায় থাকো কেননা আহলাদ ও মত্ততা পরশ পাথর যা ভিক্ষুককে সম্পদশালী করে।

১০. উদ্ধত ও নাফরমান হয়ো না, কেননা কঠিন পাহারধারী হৃদয়ধারিণী তোমাকে আত্ম মর্যাদার আগুনে মোমের মতো গলিয়ে ফেলবে।

১১. সেকান্দারের আয়না, সে তো শরাবের পেয়ালা- যদি তুমি সূক্ষ্মভাবে তাকিয়ে দেখ (দেখবে) সম্রাট দারা ও তার পরাজয় রাজ্যের অবস্থা তোমার সামনে প্রদর্শন করে।

১২. হে সাকি, পারস্য ভূমির মদ্যপায়ীদেরকে সুসংবাদ দাও যে (শিরাজের) সুন্দর ফারসিভাষিরা আশেকদেরকে আবার জীবন উপহার দেয়।

১৩. হে পবিত্র দামানের শায়েখ, হাফিজ শরাব সিক্ত এ খেলকাকে নিজের ইচ্ছায় পরে নি, তাই মাফ করে দাও আমাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল - ৬

মোর্ পাত্র মদ্য- রোশ্‌নায়ে কর্ রৌশন্ এয়্ সাকি !
গাও বান্দা, "মোদেও পুরবে সব আশ্ দুন্‌য়া নয় ফাঁকি !"
মদ্- পাত্রে মোর আজ বিম্বিত ছবি পিয়ার চাঁদ মুখের,
শোন্ বঞ্চিত যত হর্দমই মদ্- টানার স্বাদ সুখের !
ঝাউ- ছিপ্‌ছিপে তন্- নাঙ্গীদে' 'নাজ্ নখরা' সব ফুরোয়
ক্ষীণ দেবদারু-তনু মরালী পিয়ার্ যেই হয় অভ্যুদয়।
সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত চির- জাগ্রত প্রেম যার ;
অবি- নশ্বর মম নাম তাই দোলে কাল-বুকে হেম-হার।
মোর "দিল্‌রুবা" পিয়ার আঁখিয়ার বড় মিঠি দিঠি আধ-ঘোর,
তাই চাউনির ওরই হাতে সঁপা মোর বাসনার বাগ-ডোর।
রোজ কিয়ামতে ভাই, জিতবে না, -আহা দুঃখে গাল খুঁটি !
মোর হারাম মদকে ভাণ্ড শেখের হালাল দাল-রুটি।
কভু বন্ধুদের সে ফুলবাগে যদি যাও দক্ষিন্ হাওয়া ;
মোর কান্তারও কাছে এই কথাটুকু জরুর চাই যাওয়া ;
বলো প্রিয়তম !স্মৃতি জোর করে ছি ছি ভোলা কি কখনো যায় ?
ওগো আপনি সেদিনও আসিবে, আর না দেখিবে স্বপনো তায় !
ওই পাত্‌লা ছুঁড়িরই প্রেম দাগ বুকে 'লালা' ফুল সম চিন্ ;
মম জালে ধরা দেবে মিলন-বিহগ- বাকি আর কতদিন ?
ওই সব্‌জা দরিয়া আস্‌মানের, আর চাঁদের নৌকা সেই,
সব্ ডুব গিয়া ভায়া 'কওয়াম হাজি'র মাল এ মদ্ গ্লাসেই !
ফেল্ অশ্রুবিন্দু- শস্য-কণিকা হাফিজ কাঁদ্ রে কাঁদ্,
ওরে মিলন্ পক্ষী হয়ত লক্ষ্য করবে তা হলে ফাঁদ !

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৫৪২-৫৪৩)

এ গজলটির নিচে নজরুল লিখেছেনঃ ছন্দ :

সা কী ব-নুরে বা-দা বর-অফ্ রোজে জা-ম এমা'
মোর্ পাত্র মদ্য- রোশ্‌নায়ে কর্ রৌশন্ এয়্ সা-কী !

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৬ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর 8 নং গজল :

হাফিজের গজল নং 8

ساقی بـه نور باده برافروز جام ما
مـطرب بـگو کـه کار جهان شد به کام ما

ما در پیالـه عـکـس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خـبر ز لذّت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثـبـت اسـت بر جریده عالـم دوام ما

چـندان بود کرشمـه و ناز سـهی قدان
کاید بـه جـلوه سرو صـنوبرخرام ما

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سـپرده‌اند بـه مـسـتی زمام ما

ترسـم کـه صرفـه‌ای نبرد روز بازخواست
نان حـلال شیخ ز آب حرام ما

ای باد اگر بـه گلشـن احـباب بـگذری
زنـهار عرضـه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد بـه عـمدا چـه می‌بری
خود آید آن کـه یاد نیاری ز نام ما

بگرفت همچو لاله در هوای سرو
ای مرغ بخت کی شوی آخر تو رام را

دریای اخـضر فـلـک و کشـتی هـلال
هسـتـند غرق نعـمـت حاجی قوام ما

حافـظ ز دیده دانه اشکی هـمی‌فـشان
باشد کـه مرغ وصـل کـند قـصد دام ما

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৩)

উচ্চারণ :

১। সা'ক্বী! বে নূরে বা'দে বার্ আফ্রূয্ জা'মে মা'
মোত্ রেব্ বেগূ কে কা'রে জাহা'ন্ শোদ্ বে কা'মে মা'

২। মা' দার্ পিঅ'লে আক্সে রোখে ইঅ'র্ দীদে য়ীম
এই বী খাবার্ যে লায্যাতে শোর্ বে মোদা'মে মা'

৩। হার্ গেয্ নামীরাদ্ অ'ন্ কে দেলাশ্ যেন্ দে শোদ্ বে এশ্ক্ব
ছাব্‌ত আস্‌ত বার্ জারী দেয়ে অ'লাম্ দাভা'মে মা'

৪। চান্দা'ন্ বুভাদ্ কেরেশ্মে ও না'যে সাহী ক্বাদা'ন্
ক'ইয়াদ্ বে জেল্ভে সার্ ভে সানাভ্ বার্ খারা'মে মা'

৫। এই বা'দ্ আগার্ বে গোল্শানে আহ্বা'ব্ বেগ্যারী
যেন্হা'র্ আর্ যে দেহ্ বারে জা'না'ন্ পাইঅ'মে মা'

৬। গূ না'মে মা' মে ইঅ'দ্ বে ওম্দান্ চে মীবারী?
খোদ্ অ'ইয়াদ্ অ'ন্ কে ইঅ'দ্ নাইঅ'রী যেনা'মেমা'

৭। মাস্তী বে চেশ্মে শা'হেদে দেল্বান্দে মা' খোশাস্ক
যা'নরো সেপোর্ দে আন্দ বে মাস্তী মেমা'মেমা'

৮। তার্ সাম্ কে মোর্ ফেয়ে নাবার্দ রূমে বা'য্ খা'স্ত
না'নে হালা'ল্ শেইখ্ মে অ'বে হার'মে মা'

Dhaka University Institutional Repository

৯। হা'ফেয্ যে দীদে দা'নেয়ে আশ্‌কী হামী ফেশা'ন্
বা'শাদ্ কে মোর্ গে ভাস্‌ল কোনাদ্ ক্বাস্ দে দা'মেমা'

১০। দার্ ইঅ'য়ে আখ্‌যারে ফালাক্ ও কাশইতয়ে হেলা'ল্
হাস্‌তান্দ গার্ ক্বে নে-মাতে হা'জী ক্বাভা'মে মা'

অনুবাদ :

১. সাকি! আমাদের পেয়ালা শরাবের নুরে আলোকিত কর, হে বাদক! বলো, পৃথিবীর কাজ হয়েছে আমাদের আশা ও বাসনার অনুকূল।

২. আমরা পেয়ালায় বন্ধুর চেহারার ছবি দেখেছি। ওহে, তুমি আমাদের অনবরত শরাব পানের স্বাদ সম্পর্কে বেখবর।

৩. যার হৃদয় প্রেমে জীবিত হয়েছে তার মৃত্যু নেই। এ কারণেই কালের পাতায় আমাদের অমরত্ব লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৪. সুন্দর চেহারা ও দেহের সোহাগ ও প্রণয়াকুলতা থাকে না যখন দেবদারুসম সাইপ্রাস আমাদের জলোয়া দেখায়।

৫. হে সমীর, যদি বন্ধুর পুষ্পোদ্যান দিয়ে বয়ে যাও অনুগ্রহ করে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিয়ো আমাদের বাণী।

৬. তাকে বলো, কেন আমাদের নাম ইচ্ছা করে তুমি ভুলে থাকো, তোমার স্মরণে আনবে না।

৭. মত্ত অবস্থা আমাদের মাশুকের দৃষ্টিতে আনন্দদায়ক এ কারণে যে, আমাদের ইচ্ছাকে সোপর্দ করেছে মত্ততায়।

৮. বিশ্বাস করি যে, কেয়ামত দিবসে শায়েখের হালুয়ার রুটির ওপর সে-ই হারাম পানিকে (শরাব) গুরুত্ব দেয়া হবে।

৯. হাফিয, আঁখি থেকে বন্ধুর (বিরহের) অশ্রু দানা ফেল। এ আশায় যে, আশার ফাঁদে মিলনের পাখি ধরা দেবে।

১০. আসমান তার সকল বিশালতা ও নব চাঁদ নিয়ে আমাদের হাজি কাওয়ামের নেয়ামত ও অনুগ্রহে ডুবে আছে।

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল - ৭

কোথায় সুবোধ্ সংযমী, তা'রতুল্ এ-মাতাল অপাত্রে ছাই !
তাদের পথ্ আর আমার্ এ-পথ্ বহুৎ বহুৎ তফাত যে ভাই !
ধরম্ শরম্ ? চুলোয় সে যাক্ ! প্রেম্-শিরাজীর প্রেমিক্ এ-জন,
নীতির নীরস ঠোঁট চেপে শোন্ রোবাব্-বীণের ঝিঁঝিট-বেদন ?
মসজিদে গ্যে' শিখ্‌নু পরা ফেরেব-বাজীর কুর্তি কালো ;
ভাইরে, আমার আতশ্-পূজা শরাব্-শিরীর্ ফূর্তি ভালো।
মিলন-চুমুর শিরিন্ স্মৃতি আবছায়া-তাও হয় না মনে !
হায় কোথা সেই যাদুর মায়া, মান্ করে জল নয়না-কোণে ?
দোস্তের্ সরূপ রূপ-দরিয়ায় দুশমনে ছাই পায় না রতন,
রবির শিখায় স্তিমিত প্রদীপ্ জ্বাল্‌তে সে ছাই খাম্‌খা যতন্ !
সেবের মতন্ স-টোল চিবুক-কূপটি প্রিয়ার রাস্তাতে না ?
আশেক পথিক, সামলে চলিস্ ! আস্তে ! পড়েই
যাস্ তাতে বা !
সুর্মা, আখির অঞ্জন আমার, পীতম, তোমার চরণ-রেণু !
এই মদিনা-মক্কা, হেথাই বাজবে আমার মরণ-বেণু !
আশ্ করো না বন্ধু আমার, হাফিজ হতে চুম-ভরা ঘুম,
শান্তি কী চিজ্ ? আরাম কোথায় ? কল্‌জেতে মোর
জ্বলছে আগুন।

(নজরুল ইসলাম[২], ১৯৯৩ : ৫৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৭ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর ৫ নং গজল :

হাফিজের গজল নং ৫

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ — سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا؟
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را — ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا؟
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس؟ — کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد — چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست — کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است — کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا؟
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال — خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৪)

উচ্চারণ :

১। সালা'হে কা'র্ কোজা' ও মানে খারা'ব্ কোজা'?
বেবীন্ তাফা'ভোতে রাহ্কায্ কোজা'স্ত বে কোজা'?

২। দেলাম্ যে সূমেএ বেগেরফ্ত ও খের্কেয়ে সা'লূস
কোজা'স্ত দেইরে মোগা'ন্ ও শারা'বে না'ব্ কোজা'?

৩। চে নেস্বাতাত্ বেরেন্দী মালা'হ্ ও তাক্বভা'রা'
সামা'এ ভায্ কোজা' নাগ্মেয়ে রাবা'ব্ কোজ'?

৪। যে রূয়ে দূস্ত্ দেলে দোশ্মানা'ন্ চে দার্ ইঅ'বাদ্
চেরা'গে মোর্দে কোজা' শাম্ এ অ'ফ্তা'ব্ কোজা'?

৫। চো কোহ্লে বীনেশেমা' খা'কে অ'স্ত'নে সোমা'স্ত
কোজা' রাভীম্ বেফার্মা' আমীন্ জানা'ব্ কোজা'?

৬। মাবীন্ বে সীবে যানাখ্দা'ন্ কে চা'হ্ দার্ রা'হা'স্ত
কোজা' হাম্মী রাভী এই দেল্ বেদীন্ শেতা'ব্ কোজা'?

৭। বেশোদ্ কে ইঅ'দে খোশাশ্ বা'দ্ রূযেগা'রে ভেসা'ল্
খোদ্ অ'ন্ কেরেশ্মে কোজা' রাফ্ত ও অ'ন্ এতা'ব্ কোজা'?

৮। ক্বারা'র্ ও খা'ব্ হা'ফেয্ তাম-মাদা'র্ এই দূস্ত
ক্বারা'র্ চীস্ত, সাবূরী কোদা'ম্ ও খা'ব্ কোজা'?

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ :

১. কর্মের কল্যাণ কোথায় এবং আমার আত্মহারা মত্ততা কোথায় ? দেখো, পথের ব্যবধান একটা থেকে আরেকটার কতদূর ?

২. সন্ন্যাসীর আশ্রম ও কপটতাভরা খেরকায় আমার হৃদয় ব্যথিত কোথায় সে-ই খানকা আর কোথায় সেই খাঁটি শরাব ?

৩. বেপরোয়া মদ্যপায়ীর সাথে কল্যাণ ও তাকওয়ার কী সম্পর্ক ? কোথায় ওয়াজ শোনা আর কোথায় বীনার সুরে বিগলিত হওয়া ?

৪. দুশমনদের হৃদয় বন্ধুর সুন্দর চেহারা থেকে কী লাভ করে ? কোথায় মিটমিটে চেরাগ আর কোথায় প্রদীপ্ত সূর্য ?

৫. যখন তোমার দরবারের মাটি আমাদের চোখের সুরমা, বলো ! কোথায় যেতে পারি আমরা এ দরগাহ্ থেকে ?

৬. তাকিয়ো না আপেলের মতো কপোলের টোলের দিকে, কেননা রাস্তায় রয়েছে কূপ। হে হৃদয়, কোথায় যাচ্ছো, যাচ্ছো এত দ্রুত ?

৭. মিলনের সময়ের স্মরণ মধুর হোক যা হয়েছে অতীত সত্যি বন্ধুর সে অভিমান, চাহনি ও সোহাগ কোথায় ?

৮. হে বন্ধু, হাফিজ থেকে আরাম-আয়েশ ও শান্তির প্রত্যাশা করো না। কেননা যে অবস্থায় আমি আছি, শান্তি, ধৈর্য ও নিদ্রা কোথায় ?

নজরুল অনূদিত হাফিজের গজল– ৮

যদিই কান্তা শিরাজ্ সজ্নী ফেরত দেয় মোর
চোরাই দিল্ ফের্,
সমরখন্দ আর বোখারায় দিল বদল তার লাল
গালের তিল্‌টের !
লে আও সাকি, শরাব্ শেষটুক্ ! কোথাও নাই
তাই, বেহেশ্‌তেও সে,
নহর, 'রোকনা-আবাদ্'–তীর আর এমন্ ঈদগাহ,
এদেশ সেও সে।
বাঁচাও বন্ধু ! নিলাজ্ চঞ্চল্ চটুল্ চুলবুল্
প্রিয়ার মুখচোখ্,
তুর্কি সৈন্যের "লুটের খাঞ্চা'র মতই বিল্‌কুল
লুট্‌লে সুখ-লোক !
অপূর্ণই মোর এশ্‌ক্-গুল্‌বাগ্ তাতেই মশ্‌গুল
ভোমর্ চঞ্চল্,
হুর যে চায় না স–টোল লাল গাল, হরিণ চোখ্,
মুখ্ কোমল্ ঢল্‌ঢল্।
আগেই জানতাম, ব্যাকুল-দিন-দিন আকুল-
যৌবন হাসিন্ 'ইউসফ'–
প্রেমের টান তার নাশ্‌বে হ'র্‌বে 'জুলায়খা'র
সব্ নারীর গৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

চলুক সেহ্‌লির শরাব-সঙ্গীত, কালের কুঞ্জি
নাই তলাস্‌ তার,
না-হক কসরত্‌ গ্রন্থি খুলবার রহস্যের এই রশির ফাঁসটার !
নীতির গীত্‌ শোন্‌ পীতম চঞ্চল ! শান্ত সুন্দর
তারই ঠিক প্রাণ,
জ্ঞানের বৃদ্ধের নীতির বশ্‌ যে, সৎ কথায় যার
প্রাণ্‌-অধিক্‌ জ্ঞান।
মন্দ কত ? আহ্‌, তাতেই জান্‌ তর্‌র্‌ ! আবার
গাল্‌ দাও হে মোর লক্ষ্মী ;
গাল্‌ তো নয় ও, মিষ্টি শর্বত্‌ ঢাল্‌ছে পান্নার শিরিন ঠোঁটটি !
গজ্‌ল-গীত নয়, মুক্তো গাঁথ্‌ছিস, হাফিজ আয়,
ফের মধুর তান্‌ ধর্‌ !
তারার লাখ্‌ হার ছুঁড়বে বার্‌বার অধীর আসমান্‌
শুন্‌লে গান্‌ তোর্‌ !

(নজরুল ইসলাম[1], ১৯৯৩ : ৫৪৪)

নজরুল উপরোক্ত ৮ নং গজলটির উপরে লিখেছেন : ছন্দ :

আগর আঁ তর্‌ কে শিরাজি বদস্ত্‌ আ-রদ্‌ দিলে মারা।
যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্‌ ফের্‌।

নজরুল অনূদিত উপরোক্ত ৮ নং গজলটি *দেওয়ানে হাফিজ* এর ৬ নং গজল :

হাফিজের গজল নং ৬

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را — به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت — کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب — چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است — به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم — که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم — جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند — جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو — که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

(হাফিজ সিরাজী[2], ১৩৬২ : ৪)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ

১। আগার্ অ'ন্ তোর্কে শীরা'যী বেদাস্ত অ'রাদ্ দেলে মা'রা'
বে খা'লে হেন্ দুইয়াশ্ বাখ্শাম্ সামারকান্দ ও বোখা'রা'রা'

২। বেদে সা'ক্বী মেইএ বা'ক্বী কে দার্ জান্নাত্ নাখা'হী ইঅ'ফ্ত
কেনা'রে অ'বে রোক্না'বা'দ্ ও গোল্ গাশ্তে মোসাল্লা'রা'

৩। ফাগা'ন্ কীন্ লূলিইঅ'নে শূখে শীরীন্ কা'রে শাহ্রে অ'শূব্
চোনা'ন্ বোর্দানদ সাবার্ আয্ দেল্ কে তোর্কা'ন্ খা'নে ইয়াগ্ মা'রা'

৪। যে এশ্কে না'তামা'মে জামা'লে ইঅ'রে মোস্তাগ্নীস্ত্
বে অ'ব্ ও রাংগ্ ও খা'ল্ ও খাত্ চে হা'যাত্ রূয়ে যীবা' রা'?

৫। মান্ আয্ অ'ন্ হোস্নে রূয্ আফ্যূন্ কে দা'শ্ত দা'নেস্তাম
কে এশ্ক্ব আয্ পার্ দেয়ে এস্মাত্ বোরূন্ অ'রাদ্ জোলেইখা'রা'

৬। আগার্ দোশ্না'ম্ ফারমা'য়ী ও গার নেফরীন্, দো'অ গূইয়াম্
জাভা'বে তাল্খ মীযীবাদ্ লাবে লা-লে শোক্র খা'রা'

৭। নাসীহাত্ গূশ্ কোন্ জা'না' কে আয্ জা'ন্ দুস্ততার্ দা'রান্দ
জাভা'না'নে সাঅ'দাত্ মান্দ পান্দে পীরে দা'না'রা'

৮। হাদীস্ আয মাতরাব ভ মীগু ভ রা'য দেহার কামতার জু
কেহ্ কেস নাগশাভাদ ভ নাগুশাইয়াদ বে হেকমাত ইন মুআম্মা'রা'

৯। গাযাল গুপতি ভ দার সাকতী বিঅ ভ খুশ বেখা'ন হাফিজ
কেহ বার নাজাম তু আফশা'নাদ ফালাক আকদে সুরাইয়া'রা'

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ : ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

২. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ : *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫, http://mozhgankarimi.persianblog.ir/, http://rira.ir/rira/php/

Dhaka University Institutional Repository

গ. নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* এর মুখবন্ধ

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'

বাবা বুল্‌বুল্‌!

তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে "বুল্‌বুল্‌-ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি -আমার কাননের বুল্‌বুলি-উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?

জানি না তুমি কোথায়! যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ করো।

তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুল্‌বুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুলবে।

শিরাজি- বুল্‌বুল্‌-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি,-

"সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।"

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়।

আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।

তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়– গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হ'য়ে গেল।

তারপর এস. সি. চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে!

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলায় আমন্ত্রণ ক'রে আনলাম।

বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহবান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের "জানাজা" (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অতিষিক্ত হ'ল...।

অন্যত্র হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম। যদি সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ "দীওয়ান-ই-হাফিজ" অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করব!

সত্যকার হাফিজকে চিনতে হলে তাঁর গজল- গান- প্রায় পঞ্চশতাধিক -পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে!

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হ'লেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মতো রাঙিয়ে তুলছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সি 'দীওয়ান-ই হাফিজ' আছে তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literature- এ এবং মৌলানা শিবলী নোমেনী তাঁর "শেয়রুল-আজম"-এ মাত্র ঊনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন; এবং এই দুইজনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority -বিশেষজ্ঞ।

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি– যদিও আরো তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্তত এই দু'টি রুবাইয়াতের সুরের কোন মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে ব'লে আমি এ দুটির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।

১। জমায় না ভিড় অসৎ এসে
যেন গো সৎলোকের দলে।
পশু এবং দানব যত
যায় যেন গো বনে চ'লে।
আপন উপার্জনের ঘটায়
হয় না উপার্জনের মুগ্ধ কেহ,
আপন জ্ঞানের গর্ব যেন
করে না কেউ কোনো ছলে।

২। কালের মাতা দুনিয়া হ'তে
পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর!
যুক্ত ক'রে দে রে উহার
স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।
হৃদয় রে, তুই হাফিজ সম
হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,
তুইও হবি কথায় কথায়
দোষগ্রাহী, অমনি কঠোর!

রুবাইয়াতের আগাগোড়া শারাব, সাকি, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের বদ-সুর কানে রীতিমত বেখাপ্পা ঠেকে।

তাছাড়া কালের বা সময়ের মাতাই বা কে, পিতাই বা কে, কিছু বুঝতে পারা যায় না।

আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোনো মিল নেই, এবং ওর কোনো মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর যিনি লিখুন– হাফিজ লিখতে পারেন না।

এজন্যই ব্রাউন সাহেব বলেছেন, ফার্সি কবিতার সবচেয়ে শুদ্ধ সংস্করণ হচ্ছে তুরস্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি। তাঁর মতে– তুর্কি নাকি হিন্দুস্থানী বা ইরানীর মত ভাবপ্রবণ নয়। কাজেই তা'রা নিজেদের দু'দশ লাইন রচনা অন্য বড় কবিদের রচনার সাথে জুড়ে দিতে সাহস করেনি বা পারেনি। অথচ ভারতের ও ইরানের সংগ্রাহকেরা নাকি ঐরূপ দুঃসাহসের কাজ করতে পশ্চাৎপদ নন এবং কাজেও তা করেছেন।

এ অনুযোগ হয়ত সত্যই। কেননা আমি দেখেছি, ফার্সি কাব্যের (ভারতবর্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংস্করণের কবিতায় বিভিন্ন রূপ। লাইন, কবিতা উল্টোপাল্টা তো আছেই, তার ওপর কোনটাতে সংখ্যায় বেশি কোনটায় কম কবিতা। অথচ তুরস্ক- সংস্করণ বই সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য।...

হাফিজকে আমরা– কাব্য-রস-পিপাসুর দল– কবি ব'লেই সম্মান করি, কবি রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফি-দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খাইয়ামের দর্শন প্রায় এক।

এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়।

তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

শারাব বলতে এঁরা বোঝেন– ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, য়া মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। 'সাকি' অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করান। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পানশালা– সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন।

ইরানী কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস করতেন। শুধু স্বর্গ, নরক, রোজকিয়ামত (শেষ বিচারের দিন) প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্বদা নিজেদের "রিন্‌দান্" বা স্বাধীনচিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। এর জন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল।

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর–

"কায় বেখবর, আজ ফসলে গুল্ ও তরকে শারাব।"

"ওহে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন– আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে বসে আছিস!

***

আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়্যাৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু গীত-রসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার অন্যতম। তাঁরই অনুরোধে ও উপদেশে এর বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হ'য়ে উঠেছে। যদি এ অনুবাদে কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে তার সকল প্রশংসা তাঁরই।

বিনয়াবনত

নজরুল ইসলাম

কলিকাতা

১লা আষাঢ়

১৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নজরুল রচিত হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বুলবুল্-ই-শিরাজ

মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী◊

শিরাজ ইরানের মদিনা, পারস্যের তীর্থভূমি। শিরাজেরই মোসল্লা নামক স্থানে বিশ্ববিশ্রুত কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইরানের এক নীশাপুর (ওমর খাইয়াম-এর জন্মভূমি) ছাড়া আর কোনো নগরই শিরাজের মত বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করে নাই। ইরানের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিরই লীলা নিকেতন এই শিরাজ।

ইরানীরা হাফিজকে আদর করিয়া "বুল্বুল্-ই-শিরাজ" বা শিরাজের বুল্বুলি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

হাফিজকে তাহারা শুধু কবি বলিয়াই ভালোবাসে না। তাহারা হাফিজকে "লিসান্-উল্-গায়েব্" (অজ্ঞাতের বাণী), "তর্জমান্-উল্-আস্রার" (রহস্যের মর্মসন্ধানী) বলিয়াই অধিকতর শ্রদ্ধা করে। হাফিজের কবর আর ইরানের শুধু জ্ঞানী-গুণীজনের শ্রদ্ধার স্থান নয়, সর্বসাধারণের কাছে "দর্গা", পীরের আস্তানা।

হাফিজের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোনো জীবনী রচিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই অন্ধকারের নীল মঞ্জুষায় চির-আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর দিন লইয়া ইরানেও তাই নানা মুনির নানা মত। হাফিজের বন্ধু ও তাঁহার কবিতাসমূহের (দীওয়ানের) মালাকর গুল্-আন্দামের মতে হাফিজের মৃত্যু-সাল ৭৯১ হিজরি বা ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু তিনিও কবির সঠিক জন্ম-সাল দিতে পারেন নাই।

হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন ইস্পাহান নগরী হইতে ব্যবসা উপলক্ষে শিরাজে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধিও লাভ করেন, কিন্তু মৃত্যু সময়ে সমস্ত ব্যবসা এমন গোলমালে জড়িত করিয়া রাখিয়া যান যে, শিশু হাফিজ ও তাঁহার মাতা ঐশ্বর্যের কোল হইতে একেবারে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে আসিয়া পতিত হন। বাধ্য হইয়া তখন হাফিজকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জন করিতে হয়। কোনো কোনো জীবনী-লেখক বলেন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হাফিজকে তাঁহার মাতা অন্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন। সেখানে থাকিয়াই হাফিজ পড়াশুনা করিবার অবকাশ পান।

যে প্রকারেই হউক, হাফিজ যে কবি-খ্যাতি লাভ করিবার পূর্বে বিশেষরূপে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়াই বুঝা যায়।

হাফিজের আসল নাম শাম্সুদ্দিন মোহাম্মদ। "হাফিজ" তাঁহার "তখল্লুস", অর্থাৎ কবিতার ভণিতায় ব্যবহৃত উপ-নাম। যাঁহারা সম্পূর্ণ কোরান কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মুসলমানেরা "হাফিজ" বলেন। তাঁহার জীবনী-লেখকগণও বলেন, হাফিজ তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় কোরান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বভাবদত্ত শক্তিবলে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা তেমন আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে "বাবা-কুহী" নামক শিরাজের উত্তরে পর্বতোপরিস্থ এক দর্গায়

◊ নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

(মন্দিরে) ইমাম আলি নামক এক দরবেশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন "বাবা-কুহী"তে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ধর্মোৎসব চলিতেছিল। হাফিজও ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ইমাম আলি হাফিজকে রহস্যময় কোনো স্বর্গীয় খাদ্য খাইতে দেন এবং বলেন, ইহার পরেই হাফিজ কাব্যলক্ষ্মীর রহস্যপুরীর সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে। ইহা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু হাফিজের সমস্ত জীবনী-লেখকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু উল্লেখ নয়, বিশ্বাসও করিয়াছেন।

হাফিজ তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার কবিতাসমূহ (দীওয়ান) সংগ্রহ করিয়া যান নাই। তাঁহার বন্ধু গুল্-আন্দামই সর্বপ্রথম তাঁহার মৃত্যুর পর "দীওয়ান" আকারে হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন। কাজেই-মনে হয়, হাফিজের পঞ্চশতাধিক যে কবিতা আমরা এখন পাইয়াছি, তাহা ছাড়াও অনেক কবিতা হারাইয়া গিয়াছে, বা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

হাফিজ ছিলেন উদাসীন সুফী। তাঁহার নিজের কবিতার প্রতি তাঁহার মমতাও তেমন ছিল না। তাই কবিতা লিখিবার পরই তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ সংগ্রহ না করিয়া রাখিলে তাহা হারাইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার কবিতার অধিকাংশই গজল-গান বলিয়া, লেখা হইবামাত্র মুখে মুখে গীত হইত। ধর্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পানশালা পর্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার গান আদরের সহিত গীত হইত।

হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা।...

আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারকার মণি-মানিক্য-খচিত আকাশ কি পেয়ালার সাকিকে কবি ডাকে, শারাব ভিক্ষা করে আর গান গায়-"বদেহ সাকি ময়ে বাকি!" ওগো সাকি, আরো-আরো শারাব ঢাল! কিছুই বাকি রাখিও না! পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল!...

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ অভিমান করিয়াই তাঁহার জীবিতকালে বহু বন্ধু-বান্ধবের শত সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিয়া যান নাই। হাফিজের সময়ে শিরাজের শানকর্তা ছিলেন শাহ আবু ইস্হাক ইঞ্জু। তিনি নিজেও একজন কবি ও সমঝদার ছিলেন। তিনি হাফিজের অন্যতম ভক্ত এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহ্সুজা শিরাজের শাসনকর্তা হন। সুজা ইমাদ কিরমানী নামক একজন কবির অতিশয় ভক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি হাফিজকে বড় কবি বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। শাহ্ সুজাও নিজে কবি ছিলেন, এবং তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাফিজের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়াই ইমাদকে বড় কবি বলিয়া হাফিজকে হেয় করিবার প্রয়াস পাইতেন। একবার শাহ্ সুজা হাফিজের কবিতার নিন্দাবাদ করায়, হাফিজ উত্তর দেন, "তবুও আমার এই কবিতা সারা দেশের লোকে কণ্ঠস্থ, প্রশংসা এবং আবৃত্তি করে, কিন্তু এই নগরে এমন অনেক কবি আছে, যাহাদের কবিতা এই শহরের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।"

এই উত্তর শুনিয়া শাহ্ সুজার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যতই ক্রোধান্বিত হন, কিছু করিতেও পারিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই হাফিজের দুই লাইন কবিতা তাঁহার হস্তগত হয়।-

"গর্ মুসলমানী আজ্ আনস্ত্ কে হাফিজ দারদ্
ওয়ায় আগর আজ্ পেয় ইমরোজ বুয়দ্ ফরদায়ে।"

Dhaka University Institutional Repository

"হাফিজের যে ধর্ম, ইহাই যদি মুসলমান ধর্ম হয়, হায়, তাহা হাইলে কবে আজকার দিন শেষ হইয়া কল্য আসিবে!"

এই কবিতার সুবিধা লইয়া শাহ্ সুজা মনস্থ করেন, হাফিজের বিধর্মী বলিয়া বিচার হইবে। এই সংবাদ পাইয়া হাফিজ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে শিরাজে মৌলানা জায়নুদ্দিন আবু বকর তায়াবাদি উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ গিয়া তাঁহার পরামর্শ ভিক্ষা করেন। তিনি হাফিজকে উহার সহিত আরও এমন দুই লাইন কবিতা জুড়িয়া দিতে বলেন, যাহার দ্বারা পূর্বের দুই লাইন কবিতার অর্থ একেবারে উল্টো হইয়া যায়।

"ই হদিসম্ চে খোশ্ আমদ্ কে সহরগাহ্মি গোফ্ত্

বর্ দরে ময়কদয়ে বা দফ ও নেয় তর্সায়ে।"

"একজন খ্রীষ্টধর্মী যখন এক সরাই-এর দ্বারে বসিয়া তাম্বুরা এবং বাঁশি লইয়া এই গান গাহিতেছিল, তখন সেই প্রাতঃকালে আমার কাছে সে গান কেমন মজার শুনাইতেছিল!"

ইহার পরে নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া তিনি শেষের দুই লাইন কবিতা দেখাইয়া বলেন যে, পরিপূর্ণ কবিতাটি এই। সুতরাং বিচারে তিনি মুক্তি পান।...

হাফিজ সম্বন্ধে বিশ্ববিজয়ী বীর তৈমুরকে লইয়া একটি গল্প প্রচলিত আছে। হাফিজের নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে:-

'আগর্ আঁ তুর্কে শিরাজি বেদস্ত আরদ্ দিলে মারা'

বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ ও বোখারা রা!!'

"যদিই কান্তা শিরাজ-সজ্নী ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,

সমরকন্দ্ ও বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিল্টের!"

সেই সময় তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সমরকন্দ্। হাফিজ তাঁহার প্রিয়ার গালের তিলের জন্য তৈমুরের সাম্রাজ্য ও রাজধানী বিলাইয়া দিতে চাহেন শুনিয়া তৈমুর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পারস্য জয়ের সময় হাফিজকে ডাকিয়া পাঠান। উপায়ান্তর না দেখিয়া হাফিজ তৈমুরকে বলেন যে, তিনি ভুল শুনিয়াছেন, শেষের লাইনের "সমরকন্দ্ ও বোখারা"র পরিবর্তে "দো মন কন্দ্ ও সি খোর্মারা" হইবে।

"আমি তাহার গালের তিলের বদলে দু'মণ চিনি ও তিন মণ খর্জুর দান করিব!"

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ এ উত্তর দেন নাই। তিনি নাকি দীর্ঘ কুর্নিশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সম্রাট! আমি আজকাল এই রকমই অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছি!" এই উত্তর শুনিয়া তৈমুর এত আনন্দ লাভ করেন যে, হাফিজকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বহুমুল্য পারিতোষিক প্রদান করেন।

হাফিজের নামে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

হাফিজের কবিতা পড়িয়া একবার মনে হয়, তিনি উদাসীন সূফী ছিলেন। আবার দুই একটি কবিতা পড়িয়া মনে হয়, তিনি বুঝি সংসারীও ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার কোনো প্রিয় পুত্রের অকালমৃত্যুকে উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছিল।-

"দিলা দীদী কে আঁ ফর্জানা ফর্জন্দ্

চে দিদ্ আন্দর খমে ইঁ তাকে রঙ্গিন

Dhaka University Institutional Repository

বজায়ে লওহে সিমিন দর্ কিনারশ্
ফলকে বর শের নেহাদশ লওহে সঙ্গীন।"
"ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস্-
পুত্র আমার আমার কোলে,
কি পেয়েছে এই সে রঙিন
গগন-চন্দ্রাতপের তলে।
সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের শিথানে তার!"

১৩৬২ খ্রীষ্টাবেদর ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার আর একটি পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ইহাও তাঁহার অন্য এক কবিতা পড়িয়া জানা যায়।

হাফিজের সমস্ত কাব্য "শাখ-ই-নবাত" নামক কোনো ইরানী সুন্দরীর স্তবগানে মুখরিত। অনেকে বলেন, "শাখ-ই-নবাত্‌" হাফিজের দেওয়া আদরের নাম। উহার আসল নাম হাফিজ গোপন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ ভাগ্যবতী এই কবির প্রিয়া ছিলেন, কোথায় ছিল তাঁর কুটির, ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। রহস্য-সন্ধানীদের কাছে এই হরিণ-আঁখি সুন্দরী আজো রহস্যের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, এই শাখ-ই-নবাতের সহিতই হাফিজের বিবাহ হয় এবং হাফিজের জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোনো জীবনী-লেখকই একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই।'

হাফিজ যৌবনে হয়ত শারাব-সাকির উপাসক ছিলেন, পরে যে সুফী সাধকরূপে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক ইরানীই বিশ্বাস করে।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিস্ময়রয়কর গল্প শুনা যায়। শিবলি নোমানী, ব্রাউন সাহেব প্রভৃতি পারস্য-সাহিত্যের সকল অভিজ্ঞ সমালোচকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

হাফিজের মৃত্যুর পর একদল লোক তাঁহার 'জানাজা' পড়িতে (মুসলমানী মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে) ও কবর দিতে অসম্মত হয়। হাফিজের ভক্তদলের সহিত ইহা লইয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি হইলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের মধ্যে এই শর্তে রফা হয় যে, হাফিজের সমস্ত কবিতা একত্র করিয়া একজন লোক তাহার যে কোনো স্থান খুলিয়া দিবে; সেই পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন কবিতা পড়িয়া হাফিজের কি ধর্ম ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা পাওয়া গিয়াছিল।-

"কদমে দরিগ মাদার আয জানাজায়ে হাফিজ
কে গর্‌চে গর্ কে গুনাহস্‌ত্ মী রওদ্ বেহেশ্‌ত।"
"হাফিজের এই শব হ'তে গো তু'লো না কো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশ্‌তে সে যাবে তবু।"

Dhaka University Institutional Repository

ইহার পরে উভয় দল মিলিয়া মহাসমারোহে হাফিজকে এক আঙুর-বাগানে সমাহিত করেন। সে স্থান আজিও "হাফিজিয়" নামে প্রসিদ্ধ।

দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া আজও কবির কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

কথিত আছে, বাঙলার কোনো শাসনকর্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ আসিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরের কূলে আসিয়া যখন তিনি জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সেই সময় ভীষণ ঝড় ওঠে। ইহাতে হাফিজ দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া আবার শিরাজে ফিরিয়া আসেন এবং বাঙ্লার শাসনকর্তার কাছে যে কবিতাটি পাঠাইয়া দেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ:

"আজকে পাঠাই বাঙ্লায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।"

হাফিজ পারস্য ছাড়িয়া আর কখনো কোথাও যান নাই। স্বদেশ এবং স্বপল্লীর প্রতি তাঁহার অণু-পরমাণুতে অপূর্ব মমতা সঞ্চিত ছিল। বহু কবিতায় তাঁহার বাস-পল্লী "মোসল্লা" এবং "রোক্নাবাদে"র খালের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

হাফিজ নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন-

"বর্ সরে তর্বতে মা চুঁগুজরি হিম্মত্ খাহ্,
কে জিয়ারত্গহে রিন্দা জাহাঁ খাহেদ্ শোদ্!"
"আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশিস্ তুমি,
এ গোর হবে ধর্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি!"

আজ সত্য সত্যই হাফিজের কবর নিখিলের প্রেমিকের তীর্থভূমি হইয়া উঠিয়াছে!◊

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

◊ নজরুল রচনাবলী থেকে সংকলিত নিবন্ধ দু'টিতে উদ্ধৃত ফারসি কবিতাসমূহের উচ্চারণ ও অনুবাদ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিজস্ব। এই উচ্চারণ ও অনূবাদে গবেষকের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ *দিওয়ান-ই-হাফিজ* অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ১ম গীতি :

আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা ॥

অকুণ্ঠিত চিতে বস নিরালা ভোর্-হাওয়ার সাথে,
পুরাও আশা পিয়ে সুধা নিতুই নূতন অধর-ঢালা ॥

কর ত্বরা, এ আর-খোরা ভরাও নূতন শারাব দিয়ে,
নাহি গো মোর সাকির হাতে চাঁদির গেলাস, চাঁদের থালা ॥

কি স্বাদ পেলে জীবন-মধু'র শারাব যদি না হয় সাথী,
স্মরণে তার আরো তাজা আনো শারাব ভর-পিয়ালা ॥

আরো নূতন রঙে রেখায় গন্ধে রূপে, দিল্-পিয়ারা
আমার প্রিয়া ! আমার তরে কর এ নিখিল উজালা ॥

প্রিয়ার ছায়া-বীথির পথে যাবে যখন, ভোরের হাওয়া,
নূতন করে শুনায়ো তায় হাফিজের এ গান নিরালা ॥

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৪)

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'মান্দ্-কাহার্‌বা'। উক্ত গীতির নিচে নজরুল লিখেছেন : "মোতরেবে খোশনওয়া বগো তাজা ব-তাজা নৌ বনৌ" শীর্ষক বিখ্যাত গজলের ভাব-অনুবাদ। গজলটি দেওয়ানে হাফিজের ৪৮৩ নং গজল।

হাফিজের গজল নং ৪৮৩

مطرب خوشنوا بگو تازه بتازه بو بنو   باده دلگشا بجو تازه بتازه نو بنو
با صنمی چو لعبتی خوش بنشین و ساعتی   بوسه ستان ز زلت او تازه بتازه نو بنو
گرنه مدام می‌خوری بر ز حیات کی خوری   گر بودت دل نکو تازه بتازه نو بنو
ساقی ماهروی من مشک بهاربوی من   زودکه پر کنم سبو تازه بتازه نو بنو
شاهد دلربای من می‌کند از برای من   نقش و نگار و رنگ و بو تازه بتازه نو بنو

باد صبا چو بگذری بر سر کوی آن پری
قصه حافظش بگو تازه بتازه نو بنو

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ২৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ২য় গীতি :

আমরা পানের নেশায় পাগল, লাল শারাবে ভর্ গেলাস।
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকির বিলোল্ আঁখির পাশ ॥
চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ
ঢালার মত শারাব ঢাল,
ছায় না যেন দিনের আনন
কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁস্ ॥
শারাবখানার সদর-ঘরে
বসো খানিক ধর্মাধিপ
এই আনন্দ-ধারায় নেয়ে
নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ ॥
মোমের বাতির মত, সুফী,
কেঁদে গলাও আপনাকে !
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে
দাও আনন্দ ভর্-আকাশ ॥
নূতন দিনের বধু যদি আসে তোমায়, খোশ-নসীব !
যৌতুক তায় দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'যাগেশ্রী কাফি-কাহার্ বা' ।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৫)

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৩য় গীতি :

"ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে বলো গো সেই হরিণীরে।
আর কতদিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে ॥
মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে ॥
গোলাব লো ! তোর রূপের গরব দেয় না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে ॥
চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে ॥
বঁধুর পাশে ব'সে তোমার ঢাল্‌বে যেদিন রঙীন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে ॥
শেয়র্ :-
সরল-তুন, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে–
রঙিন প্রেমের লাগল না রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা–

Dhaka University Institutional Repository

মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা !
হাফেজি এই গজল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু,
গাইবে সে গান "জোহরা" তারা, নাচবে "ঈশা" সে সুর-মীড়ে ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'পিলুঁ-কাওয়ালী'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৫-৮৬)

নজরুল রচিত হাফিজের '৩য় গীতি'টি দেওয়ানে হাফিজের ১১ নং গজল।

হাফিজের গজল নং ১১

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را — که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا — تفقدی نکند طوطی شکرخا را
غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل — که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر — به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست — سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
چو با حبیب نشینی و باده پیمایی — به یاد آر محبان باده پیما را
(جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب — که خال مهر و وفا نیست روی زیبا را

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ
سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

(হাফিজ সিরাজী[২], ১৩৬২ : ৭)

উচ্চারণ :

১। সাব' বে লোত্‌ফ বেগূ অ'ন্ গায'লে রা'ন'র'
কে সার্ বে কূহ্ ভ বিঅ'ব'ন্ তো দ'দেয়ী ম'র'

২। শেকার্ ফোরূশ্ কে ওম্‌রাশ দের'য্ ব'দ চের'
তাফাক্কোদী নাকোনাদ্ তুতিয়ে শেকার্ খ'র'

৩। গোরূরে হোস্‌নাত্ এজ'যাত্ মাগার নাদ'দ্ এই গোল্
কে পোর্‌সেশী নাকোনী আন্‌দালীবে শেইদ'র'

৪। বেখোল্‌ক্ব ও লোত্‌ফ তাভ'ন্ কার্‌দ ছেইদে আহ্‌লে নাযার্
বেবান্‌দ ভ দ'ম্ নাগীরান্‌দ মোর্‌গে দ'ন'র'

৫। নাদ'নাম্ আয্ চে সাবাব্ রাংগে অ'শন'য়ী নীস্‌ত
সাহী ক্বাদ'নে সিয়াহ্ চেশ্‌মে ম'হে সীম' র'

৬। চো ব' হাবীব্ নেশীনী ভ ব'দে পেইম'য়ী
বে ইঅ'দ্ দ'র মোহেব্‌ব'নে ব'দে পেইম'র'

Dhaka University Institutional Repository

৭। জোয় ইন্ ক্বাদার্ নাতাভ'ন্ গোফ্ত দার্ জাম'লে তো এইর
কে ভায়' এ মেহ্র ভ ভাফ' নীস্ত রূয়ে যীব'র'

৮। দার অসম'ন না আযাব গার বে গুপতেহ্ হ'ফেয
সুরুদ জাহরাহ বে রাক্স অভারস মাসিহ'র'

অনুবাদ :

১. হে ভোরের সমীর ! দয়া করে ওই মনোহরী হরিণীর কথা বলো যে, তুমি আমাদেরকে মরুভূমির ও পাহাড়ের যাযাবর বানিয়েছ।

২. ওই হৃদয়হারিণী ! যার অস্তিত্বের আপদমস্তক মিষ্টিতে ভরা কেন আপন মিষ্টিভাষি তোতাকে সমবেদনা জানাও না।

৩. হে ফুল, নিশ্চিত তোমার রূপের অহঙ্কার তোমাকে অনুভূতি দেয় না ব্যাকুল ও অস্থির আন্দালিবের অবস্থা জানতে।

৪. মরুর স্বভাব ও দয়া দিয়ে দৃষ্টিবানদেরকে আকৃষ্ট ও শিকার করা যায়, হাঁ চালাক ও চতুর পাখিকে ফাঁদ ফেলে বেঁধে রাখা যায় না।

৫. জানি না কী কারণে (ভালবাসা ও দয়ার) পরিচয় ও রঙ নেই সুউচ্চ বদন, কালো আঁখি ও চন্দ্রমুখীর অস্তিত্বে।

৬. যখন বন্ধুর পাশে বসো শরাব পান করো (এ সময়) আশেকগণকে স্মরণ কর যারা তাদের বন্ধুর দিদার থেকে বঞ্চিত।

৭. তোমার সৌন্দর্যের দোষ এর চাইতে কিছু বলা যায় না। তোমার সুন্দর চেহারায় দয়া ও ত্যাগের কোন নিশানা দেখা যায় না।

৮. আসমানে আশ্চর্যের কিছু হবে না যদি হাফিযের কথা জহুরা তারকা আবৃত্তি করে আর তা ঈসাকে আনন্দে নাচিয়ে তোলে।

টিকা :

১. গায'লে রা-ন' -রূপক ভাবে হৃদয় হারিণীকে বুঝানো হয়েছে।

২. শেকার ফোরূশ্ মা চিনি বা মিষ্টি যে বিক্রি করে বা মিষ্টি অর্থাৎ হাফিয তার মিষ্টি কথা প্রকাশ করেন বা মিষ্টিভাষি তোতা।

৩. গোল অর্থ ফুল-এখানে রূপকভাবে মাশুক এবং আন্দলিকে সেইদ' বলতে আশেককে বুঝিয়েছে যা কবি নিজে।

৪. ব'দে পেইম' -এ শব্দটি ব'দ পেইমূদা'ন থেকে এসেছে অর্থ- বেহুদা কাজ, নিষ্ফল পরিশ্রম। এখানে 'দিদার থেকে বঞ্চিত' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে কবির উদ্দেশ্য মোহেব ব'নে ব'দ পোইমা - এমন আশেকগণ যাদের বন্ধুর দিদারের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে এবং তারা বন্ধুর দিদার থেকে রয়েছে বঞ্চিত।

৫. ভাথ্ - অর্থ অবস্থা বা অবস্থান। এ অনুযায়ী এখানে রাখা এবং স্থির করা অর্থ ভাবের অনুকূলে অর্থাৎ তোমার সুন্দর চেহারায় দয়া ও ত্যাগের উপকরণ রাখা হয় নি অথচ কবি তা রাখার প্রত্যাশি ছিল।

৬. হাফিযের কবিতা এতই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর যে আকাশের গায়ক শিল্পী ও অর্থাৎ জহুরা তারকা সুর দিয়ে গায় এবং চতুর্থ আসমানে ঈসা তা শুনে নেচে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৪র্থ গীতি :

আজ সুদিনের আস্‌ল উষা, নাই অভাব নাই অভাব।
তরুণ রবির মতন রাঙা পেয়ালা ভরি' আন্‌ শারার ॥
উষার করে পেয়ালা রবির, উপ্‌চে পড়ে কিরণ-মদ,
মধুর উজল সময় এমন, আজ ক'রো না দিল্‌ খারাব ॥
শান্ত কুটির, বন্ধু সাকি, মধুর-কণ্ঠ গায় গজল,
আয়েশ-সুখের আরাম গো তায় নৌ-জোয়ানি বে-হিসাব ॥
নাচ্‌ছে প্রিয়া সাকির সাথে, সুর-পিয়াসী দেয় তালি,
সাকির আঁখির মদির লীলা টুটায় মদের বদ-খোয়াব ॥
মদের নেশার মিঠার লোভে, সাবাস্‌ চতুর ফুল-মালী–
লুকিয়ে রাখ সবুজ পাতায় শারাব-মধুর লাল গোলাব ॥
পর্‌ল প্রিয়া যেদিন কানে গানের মোতি হাফিজের,
সেদিন হ'তে উর্বশী মোর শুনছে গানের বীণ্‌-রবাব্‌ ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'ভৈরবী–কাওয়ালি'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৬)

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৫ম গীতি :

আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন, গুল্‌-বাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায় ॥
মালঞ্চে আজ ভোর না হ'তে বিরহী বুলবুল্‌ কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝর্‌ল গোলাব হিম-হাওয়ায় ॥
পুরানো গুল্‌-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালি আয়ুর শাখা হ'তে তায় ॥
এই ধূলিতে হ'ল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নূতন বধূ ঝর্‌ল জীবন-ভোর-বেলায় ॥
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁঝ না হতেই যায় ঝরে
হাজার আফ্‌সোস্‌, নূতন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায় ॥
সাম্‌লে চরণ ফেলো পথিক, পায়ের নিচে মরা ফুল
আছে মিশে এই সে ধরার গোরস্থানে এই ধূলায় ॥
হ'ল সময়–লোভের ক্ষুধা মোহন মায়া ছাড় হাফিজ,
বিদায় নে তোর ঘরের কাছে, দূরের বঁধু ডাকছে আয় ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'দুর্গা-মান্দ্‌-কাওয়ালী'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৬-৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৬ষ্ঠ গীতি :

ঐ লুকায় রবি লাজে মুখ হেরি মম প্রিয়ার।
ঐ এল রূপের রবি তোর আঁধার থাকে কি আর ॥
মোর অকলঙ্ক শশী খোলে ঘোম্‌টা যবে মুখের,
হেরি, দুলে রবি শশী কানে দুল্‌ হয়ে যেন তার ॥
যবে অধীর মাতাল হিয়া, রয় পর্দানশীন্‌ প্রিয়া,
মদে বেহুঁশ হয়ে দর্‌বেশ যবে জল্‌সা হল গুলজার ॥
মোর শরম ভরম সবি হায় দিলাম শারাব লাগি
হেরি নয়ন-জলে ভেসে এ সুরা শোণিত হিয়ার ॥
বয় যাহার অশ্রু-চোখে ঐ বাদল-রাতের ধারা,
বয় বর্ষা সম তাহার নীল অঞ্চলে ফুল-বাহার ॥
মালা গাঁথিস্‌নে তুই হাফিজ্‌ ঐ শুস্ক উপদেশের,
ফেলে অপরাধের কাঁটা তুই গাঁথ্‌ মালা ফুল-হিয়ার ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'খাম্বাজ-পিলু-পোস্তা'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৭)

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৭ম গীতি :

দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি খারাব শারাব-খোর।
তাহার যে পাপ তারি একার, হয় না লেখা নামে তোর ॥
মন্দ ভালো যা হই আমি, তুই করে যা কাজ আপন,
কাট্‌ব তাহাই–যে ফসলের বীজ বুনেছি ক্ষেত্রে মোর ॥
হউক মস্‌জিদ হউক মন্দির– প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি কেউ সজাগ কেউ নেশায় টোর ॥
জন্মদিনের ললাট-লেখা হবেই হবে পূর্ণ মোর,
কেউ জানে না পর্দা-আড়ে আলোক না সে আঁধার ঘোর ॥
শেয়র্‌ :-
ভেঙেছি দ্বার, ফির্‌ব না আর পুণ্যশালার জেল-খানায়,
আদিম পিতা আদমও ত স্বর্গ পেয়ে ছাড়্‌ল তায়।
পূণ্যফলের ভরসা করে কাটিয়ো না কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট-লেখার, বন্ধু, তুমিই নহ ওয়াকিফ্‌-হাল।
বেহেশ্‌তের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর, তবু হুশিয়ার !
ঝাউ-এর ছায়া, তরীর কিনার–তাই নিয়ে থাক্‌ সুখ-বিভোর ॥
মরণ-ক্ষণে যদি, হাফিজ, রয় হাতে তোর শারাব-জাম,
মলিন ধরা হ'তে তোরে তুরন্ত নেবে বেহেশ্‌ত্‌-দোর ॥

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'গারা-ভৈরবী-আদ্ধা-কাওয়ালি'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৮)

দীওয়ান-ই-হাফিজ 'গীতি'র ৮ম গীতি :

চাঁদের মতন রূপ পেল রূপ তোমার রৌশন্ রূপ-বিভায়।
অপরূপ সে হ'ল তোমার চিবুক গালের টোল খাওয়ায় ॥
তোমার রূপের পিয়াসী প্রাণ এল হের অধর-তীর,
জানাও আদেশ, ফিরুক সে প্রাণ, নয় বুঝি সে ছেড়ে যায় ॥
শেয়্র:-
কখন মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জি পেশ্।
কোন্ মোহনায় এক হবে মোর হৃদয় ও তার আকুল কেশ।
নাই গো তাহার শান্তি ও সুখ হের্ল যারে ঐ আঁখি,
তাহার চেয়ে চটুল ও-চোখ পর্দাতেই রাখ্ ঢাকি।
রক্ত-রাঙা পথ হ'তে মোর বাঁচিয়ে চ'লো নীল আঁচল,
তোমার প্রেমের শহীদ্ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল।
ফুল্লমুখী ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিও ভোর-বায়ে,
তোমার দেশের ফুল-কাননের গন্ধ পাব সেই হাওয়ায় ॥
প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ্-শুন্নেওয়ালা কও, "আমীন !"
প্রিয়া আমায় মৌ-মিঠে তার চুনির ঠোঁটের চুম বিলায় ॥

কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত গীতিটির নাম দিয়েছেন, 'ইমন-মিশ্র-কাওয়ালি'।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৮)

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮, পৃ. ৮৪-৮৮।

২. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ: *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫, http://mozhgankarimi.persianblog.ir/, http://rira.ir/rira/php/

Dhaka University Institutional Repository

চ. নজরুল অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

১

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা ॥

২

আমার সুখের শত্রু হ'তে
লুকিয়ে চ'লে আয় লো ত্বরা।
আয়েশ্-সুখের আমন্ত্রণ আজ,
শারাব দিয়ে পাত্র ভরা।
ঈর্ষাতুরের কুমন্ত্রণায়
কোথায় যাবে, হে মোর ভীরু ?
আমার প্রিয়া ! শোনো শুধু
আমার কথা দুখ-পাসরা ॥

৩

কর্‌ল আড়াল তোমার থেকে
যেদিন আমার ভাগ্য-লেখা,
সেদিন হ'তে ফোটেনি আর
আমার ঠোঁটে হাসির রেখা।
কী নিদারুণ সেই বিরহের
বাজল ব্যথা আমার হিয়ায় ;-
আমি জানি, আর সে জানে
অন্তর-বিহারি একা ॥

Dhaka University Institutional Repository

৪

আমার সকল ধ্যানে জ্ঞানে
বিচিত্র সে সুরে সুরে
গাহি তোমার বন্দনা-গান,
রাজাধিরাজ, নিখিল জুড়ে' !
কী বলেছে তোমার কাছে
মিথ্যা ক'রে আমার নামে
হিংসুকেরা, –ডাক্‌লে না আজ
তাইতে আমায় তোমার পুরে ॥

৫

আন্‌তে বল পেয়ালা শারাব
পার্শ্বে ব'সে পরান-বঁধুর।
নিঙাড়ি' লও পুষ্প-তনু
অন্বঙ্গীর অধর-আঙুর।
আহত– যে ক্ষত–ব্যথায়
সোয়াস্তি চায়, চায় সে আরাম ;
বিষম তোমার হৃদয়–ক্ষত,
ডাকো হাকিম কপট চতুর ॥

৬

ভাব্‌নু, যখন করছে মানা
বন্ধুরা সব আগ্‌লে ভাঁটি–
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলের
মর্‌শুমে ভাই শারাব খাঁটি।
ফুল-বাগিচায় বুলবুলিরা
উঠল গেয়ে,- হায় রে বেকুব,
এমন ফাগুন, ফুলের ফসল,
নাই কো শারাব ? –সকল মাটি ॥

৭

বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক
তোমার পথের কুঞ্জ- গলির।
ছুটছে নিখিল মক্ষি হ'য়ে
তোমার আনন- আনার-কলির।
আজ্‌কে যদি তোমার থেকে
মুখ ফিরিয়ে রয় গো কেহ,
কোন্ চোখে কা'ল দেখ্‌বে তোমায়
হায় রে বে-দিল্ সেই মুসাফির !

Dhaka University Institutional Repository

৮

তোমার আকুল অলক–হানে
গভীর ছায়া রবির করে।
শুক্লা চতুর্দশীর শশী
তোমার মুকুট, আঁধার হরে।
ও-কস্তুরী-কালো কেশের
নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারানী,
হেরে ও-মুখ, –উদয়-ঊষা–
পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে মরে ॥

৯

ভিন্ন থাকার দিন গো আমার
আজ্‌কে পরান-প্রিয়ার সাথে।
বন্ধু নিয়ে খুশীর মউজ–
নেই গো সময় আজ্‌কে রাতে।
কি ফল র'য়ে সাবধানে আজ,
কাছে যখন নেইকো শারাব ?
না, না, – কাছে শারাব আছে,
নেইকো প্রিয়াই মন ভোলাতে ॥

১০

আমার পরান নিতে যে চায়
ঐ নিঠুরা রূপের পরী,
পরীর মতই রূপেরে সে
রাখে আঁখির আড়াল করি'।
কইনু তা'রে, "তুমি যে কও,
এই ত এ-মুখ, কী আর এমন ?"
জবাব দিল, "তাই ত বলি
লোভ করো না এ মুখ স্মরি'।"

১১

রক্ত-রাঙা হ'ল হৃদয়
তোমার প্রেমের পাষাণ-ব্যথায়।
তোমার ও-রূপ জ্ঞান–অগোচর,
পৌঁছে নাকো দৃষ্টি সেথায়।
জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়
তোমার আকুল অলক-দামে,
সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা
দেখ্‌ছি ওরে ছাড়ানো দায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

১২

রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব
বান্দা তোমার, জ্যোতির্মতি !
যেদিন হ'তে বান্দা হ'ল–
পেল আঁধার-হরা জ্যোতি।
রাগে-অনুরাগে মেশা
তোমার রূপের রৌশনীতে
চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ–কিরণ,
সূর্য হ'ল দীপ্ত অতি ॥

১৩

যেদিন হ'তে হৃদয়-বিহগ
ব্যথার জালে পড়ুল ধরা,
সেই হ'তে তার মাথার 'পরে
ঝুলছে ছুরি রক্ত-ঝরা।
ত্যক্ত আমি হাতের কাছের
পেয়ালা-ভরা শরবতে, তাই
ক'রতেছি পান–পাত্রে ব্যথার
রক্ত আমার হৃদয়-ক্ষরা ॥

১৪

আমার করে তোমার অলক
জড়িয়ে বীণার তারের মত।
এ হৃদি-ভার আমার–শুধু
তোমার ঠোঁটে হয় আনত।
চিকন তোমার ও-মুখখানি
ভুখা হিয়ার সান্ত্বনা মোর
সব-গ্রাসী মোর ক্ষুধার খোরাক
ঐ দেহটুক ? হায় বিধাতঃ !!

১৫

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ
সর্বহারা নাইকো, প্রিয় !
আমার চেয়ে তোমার কাছে
নাই সখি, কেউ অনাত্মীয়।
তোমার বেণীর শৃঙ্খলে গো
নিত্য আমি বন্দী কেন ?–
মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল
পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

১৬

দল্‌তে হৃদয় হুল্‌তে পরান
                    দক্ষ সদা আমার প্রিয়া।
তারি মিলন মাগি' ঝুরে
                    ভাগ্য-হত আমার হিয়া।
গোলাব-ফুলী গাল গো তাহার,
রূপালি মুখ, চিকন অধর ;
ফুলকে ভোলায় ফুল্লমুখী
                    মিঠে হাসির ছিটেন্‌ দিয়া॥

১৭

পরান ভরে পিয়ো শারাব,
                    জীবন যাহা চিরকালের।
মৃত্যু-জরা-ভরা জগৎ,
                    ফিরে কেহ আস্‌বে না ফের।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল,
গেলাস-সাথী মস্ত্‌ ইয়ার,
এক লহমার খুশীর তুফান,
                    এই ত জীবন !–ভাব্‌না কিসের॥

১৮

আয়না তোমার আত্মার গো–
                    তরল তোমার ঐ লাবণী।
সাধ জাগে ঐ ধ্যানের চরণ
                    করি আমার নয়ন-মণি।
না, না, আমার ভয় করে গো,
নয়ন-পাতার কাঁটায় পাছে
কমল-পায়ে বাজে ব্যথা !
                    ধেয়ানে থাক সারাক্ষণই॥

১৯

রঙীন মিলন-পাত্র প্রথম
                    পান করালে ইমান্‌দারী।
নেশায় যখন বুঁদ হয়েছি-
                    জাল বিছালে অত্যাচারী।
আঁখির সলিল-ধারা গো, আর
বুকের আগুন-জ্বালা নিয়ে
ভেজাই পোড়াই আপনারে
                    পথের ধূলি হয়ে তারি॥

Dhaka University Institutional Repository

২০

তোমার মুখের মিল আছে, ফুল,
সাথে সে এক কমল-মুখীর।
যে-ফুল হে'রে দিল্ দেওয়ানা,
গন্ধ যথা সদাই খুশীর।
সাধ জাগে-এক ফুলদানীতে
রাখি তোরে আর তাহারে,
ফুলেল্ ঠোঁটে চুম্ব নিতে
লাগ্‌বে সুবাস পুষ্পে-মদির ॥

২১

আপন ক'রে বাঁধতে বুকে
পারেনি কেউ তনু প্রিয়ার–
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিত্ত মাঝে
বদ্ধ থাকে চিত্ত যাহার।
আমার কথা ঠাঁই পেল না
চপল-আঁখি প্রিয়ার কানে–
রত্ন-দুল্ সে রইল প'ড়ে
কর্ণে কভু উঠ্‌ল না আর !

২২

সোরাই-ভরা রঙীন্ শারাব
নিয়ে চল নদীর তটে।
নিরভিমান প্রাণে ব'সো–
অনুরাগের ছায়া-বটে।
সবারই এই জীবন যখন
সেরেফ্ দুটো দিনের রে ভাই,
লুট ক'রে নাও হাসির মধু,
খুশীর শারাব ভরো ঘটে ॥

২৩

তোমার হাতের সকল কাজে
হবে শুভ নিরবধি–
প্রিয়, তোমার ভাগ্যবশে
নিয়তির এই নির্দেশ যদি ;
দাও তা'হলে পান ক'রে নিই
তোমার-দেওয়া শিরীন্ শারাব,
হ'লেও হব চির-অমর,
হয়ত ও-মদ সুধা-নদী ॥

Dhaka University Institutional Repository

২৪

কুঁড়িরা আজ কার্বা-বাহী
বসন্তের এই ফুল্-জলসায়।
নার্গিসেরা দল নিয়ে তার
পাত্র রচে সুরার আশায়।
ধন্য গো সে-হৃদয়, যে আজ
বিম্ব হ'য়ে মদের ফেনায়
উপ্‌চে পড়ে শারাব-খানার
তোরণ-দ্বারের পথের ধুলায় ॥

২৫

কুন্তলেরি প্যাঁকে প্রিয়ার
আশয় খোঁজে আমার পরান।
অভিশপ্ত এই জীবনের
কারার থেকে চায় যেন ত্রাণ।
"কী দেবে দাম" শুধায় তাহার
দেহের গেহের রূপ-দুয়ারী,
প্রিয়ার ভুরুর তোরণ-তলে
পরান দিলাম নজ্‌রানা দান ॥

২৬

চাঁদের মত রূপ গো তোমার
ভর্‌ছে কলঙ্কেরি দাগে।
অহঙ্কারের সোনার বাজার
ডুব্‌ছে ক্রমে ক্রান্তি-কাগে।
লজ্জা অনেক দেছ আমায়,
প্রেম নাকি মোর মিথ্যা-ভাষণ !
আজ ত এখন পড়্‌ল ধরা
কলঙ্ক কোন্ মুখে জাগে ॥

২৭

রূপসীরা শিকার করে
হৃদয়-বনের শিকারীকে
দেহে তাহার রূপের অধিক
অলঙ্কারের চমক লিখে।
নার্গিস- যার শিরে হের
ফুলের রানীর মুকুট-পরা,
নিরাভরণ-তবু তারই
রটে খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ॥

Dhaka University Institutional Repository

২৮

তোমার ডাকার ও-পথ আছে
ব্যথার কাঁটায় ভ'রে খালি।
এমন কোনো নেই মুসাফির
ও-পথ বেয়ে চল্‌বে, আলি !
জ্ঞানের রবি ভাস্বর যার,
তুমি জান কে সে সুজন–
প্রাণের রূপের পিল্‌সুজে যে
দেয় গো ব্যথার প্রদীপ জ্বালি' ॥

২৯

যেদিন আমায় কর্‌বে সুদূর
তোমার থেকে কাল-বিরহ,
পড়বে যতই মনে, ততই
দিন হবে মোর দুর্বিষহ।
ভুলেই যদি এ চোখ পড়ে
আর-কোনো রূপসীর রূপে,
অন্ধ আমি বইব তোমার
রূপের দাবী অহরহ ॥

৩০

দাও মোরে ঐ গেঁয়ো মেয়ের
তৈরী খাঁটি মদ পুরানা।
তাই পিয়ে আজ গুটিয়ে ফেলি
জীবনের এই গাল্‌চে'খানা।
যদি ধরার মন্দ ভালো
দাও ভুলিয়ে মস্ত ক'রে,
জানিয়ে দেবো এই সৃষ্টির
রহস্যময় সব অজানা ॥

৩১

পূর্ণ কভু করে নাকো
সুন্দর-মুখ দিয়ে আশা।
প্রেমের লাগি' যে বিবাগী–
ভাগ্য তাহার সর্বনাশা।
প্রিয়া তব লক্ষ্মী সতী
তোমার মনের মূর্তিমতী ?
প্রেমিক-দলের নও তুমি কেউ,
পাওনি প্রিয়া-ভালোবাসা ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩২

মদ্-লোভীরে মৌলোভী কন,-
পান করে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি ক'রে
গোরের পারে উঠ্‌বে তারা।
তাই ত আমি সর্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠ্‌ব-নিয়ে
এই শারাব, এই দিল্-পিয়ারা ॥

৩৩

তারি আমি বান্দা গোলাম,
সৌখিন যে রস্-পিয়াসী।
গলায় যাহার দোলায় বিধি
পাগল প্রেমের শিক্‌লি ফাঁসি।
প্রেমের এবং প্রেম জানানোর
স্বাদ অ-রসিক বুঝ্‌বে কিসে ?
পান করে এ সুরার ধারা
সুর-লোকের রূপ-বিলাসী ॥

৩৪

হয় না ধরার বিভবরাশি
জোর জুলুমে হস্তগত,
আনন্দের এই জীবন-সুধার
পায় নাকো স্বাদ বিষাদ-হত।
খুঁজ্‌ছ তুমি পাঁচটা দিনের
দুঃখ ভোগের পরিশ্রমে,
সাত শ' হাজার বছর ধ'রে
জম্‌ল ধরায় খুশী যত!!

৩৫

আনন্দ আর হাসি-গানের
প্রমত্ততার সময় হলো,
পেয়ালা, শারাব, দিল্-দরদী,
দিল্‌রুবা নাও, বেরিয়ে চলো !
একটি ফুঁয়ের এই ত জীবন !
তাই ত বলি, ক্ষণেক তরে
কুঁজোর আঙুর-রক্ত-ঢেলে
গেলাস বাটী রঙিয়ে তোলো !

Dhaka University Institutional Repository

৩৬

দর্‌বেশ-আমার সামনে এল
ফিরে তোমার সেই বিরহ,
বুকের কাটা ঘায়ে যেন
নুনের ছিটে দুর্বিষহ।
ভয় ছিল যে, তোমার থেকে
আর কিছুদিন রইব দূরে,
দেখছি শেষে আস্‌ল আবার
সেই অশুভ দিন অ-বহ ॥

৩৭

বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর
থাকে যেন তোমার নজর,
তৃণ কুটোর পরেও ত গো
পড়ে রবির প্রভাতী কর !
যদি তোমার পথের ধূলি
হই গো প্রিয়,– নারাজ হ'য়ে
গা'ল দিও না ! পাছে শোনে
পথের ধূলি তোমার সে স্বর ॥

৩৮[১]

বিশ্বাসেরে মে'রে–হ'ল
প্রাণের বন্ধু শত্রু শেষে,
কত পথিক পথ হারাল
অবিশ্বাসের গহন দেশে।
পুরুষ-"দিবা"র ঔরসে গো
'রাত্রি' নাকি গর্ভযুতা,
দেখ্‌ল না যে পুরুষ–হ'ল
ধৃতগর্ভা কেমনে সে ॥

---

[১] উপরিউক্ত ৩৮ নং রুবাইটি হাফিজের বলে সন্দেহ পোষণ করে নজরুল বলেছেন: 'আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোনো মিল নেই, এবং ওর কোনো মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর যিনি লিখুন– হাফিজ লিখতে পারেন না।' (নজরুল ইসলাম, কাজী, *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪. নতুন সংস্করণঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮। পৃ. ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

৩৯

ক্ষত হৃদয় যেমন চাহে,
হয় যদি গো, তেম্‌নিটি হোক।
নয় উ'ড়ে যাক্ হৃদয়-বিহগ
অলখ-বিহার আত্মার লোক।
আজও খোদার দর্‌গাতে গো
এতটুকু ভরসা রাখি,
সকল দুয়ার খুলবে গো তার
ভাগ্যদেবীর স্বর্গ অ-শোক ॥

৪০

কি লাভ, যখন দুষ্ট ভাগ্য
হাস্‌ল নাকো মুখ ফিরিয়ে,
পেল না দিল্ সুখের সোয়াদ,
দিন কাটাল ব্যথাই নিয়ে !
যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি,
পুত্‌লা আঁখির, গেছে চ'লে !
নয়ন-মণিই গেল যদি,
কি হবে এ নয়ন দিয়ে ॥

৪১

সকল-কিছুর চেয়ে ভাল
সুরাই-যখন কাঁচা বয়েস,
প্রণয়-বেদন, মত্ততা, পাপ-
যৌবনেরি একার আয়েশ।
এই সে তামাম দুনিয়াটা-ই
বর্‌বাদ আর খারাব রে ভাই,
মন্দ ধরায় মন্দ যা-তার
প্রমত্ততাই মানায় যে বেশ ॥

৪২

আয়ুর মরু বেয়ে এলো
ক্ষ্যাপা প্লাবন আকুর ধারায়,
এই ত জীবন-পান-পিয়ালা
ভরার সময় কানায় কানায়।
হুঁশিয়ার হও সাহেব ! যেন
খুশী হয়ে কালের কুলি
তোমার জীবন- গেহ থেকে
আস্‌বাব সব উঠিয়ে নে' যায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

৪৩

আল্‌তো ক'রে আঙুল রেখে
প্রিয়ার কালো পশ্‌মী কেশে,
কইনু তা'রে "দাও গো জীবন,
এসেছি অমৃতের দেশে।"
কইল প্রিয়া, "অলক ছাড়,
তার চেয়ে এই অধর ধর !
খুঁজো নাকো দীর্ঘজীবন–
ফুর্তি মউজ্‌ ওড়াও হেসে" ॥

৪৪

বিনিদ্র কা'ল কাট্‌ল নিশি
এক্‌লা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রু-মণির হার গেঁথেছি
নয়ন-পাতার ঝালর-সূতায়।
তোমার তরে প্রাণ পোড়ানি
কইতে নারি কারুর কাছে,
আপন মনে তাই সারাদিন
আপন ব্যথা কই আপনায় ॥

৪৫

বীরত্ব শেখ "খয়বরী"-দ্বার
ভগ্ন-কারী "অলি"র কাছে,
দান কারে কয় শিখ্‌তে হ'লে
"কুন্‌বরের" ঐ বাদ্‌শা আছে।
ওরে হাফিজ, পিয়াসী কি
তুই করুণা-বারির তরে ?
শারাব-সূধার সাকি জানে
উৎস তাহার কোন্‌ কানাচে ॥

৪৬

প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা ?
বন্ধু, পীড়ন সহ্য কর !
আমার পরামর্শ শোন,
সকল ভু'লে শারাব ধর।
মত্‌লব্‌ হাসিল কর তোমার
খুবসুরতী রতির সাথে,
অন্তর দিও না তা'রে
যে তব অযোগ্যতর ॥

Dhaka University Institutional Repository

৪৭

"বাবিলনের" যাদু বুঝি
গুরু তব টচুল চোখের,
হার মানে ও চোখের কাছে,
যাদুকরী সকল লোকের !
দুল্‌ছে যে ঐ অলক-গুছি
রূপকুমারীর কর্ণমূলে
দুলে যেন হাফিজের এই
কাব্য-মোতির চারপাশে ফের ॥

৪৮

দেখ্ রে বিকচ ফুলকুমারীর
রূপ-সুষমার আনন-শোভা,
দেখ্ বাদলের কাঁদন সাথে
ফুলের হাসি মনোলোভা !
কিসের এত ঠমক দেখায়
দেবদারু আজ দ'খ্‌নে হাওয়ায়,
ফুলরানীরে করবে বীজন
দোল দিল এই আনন্দ বা !

৪৯

বুক হ'তে তার পিরান খোলে
শ্যামাঙ্গী ঐ তন্বী যখন,
ঠিক উপমা পাইনে খুঁজে
সে মাধুরী দেখায় কেমন !
এম্‌নি তরল রূপ গো তাহার–
বুকের তলে হৃদয় দেখায়,
স্বচ্ছ দীঘির কালো জলে
সুডোল্ পাষাণ-নুড়ি যেমন ॥

৫০

মোমের বাতি ! পতঙ্গে এ
ভু'লেও কি গো স্মরণ কর ?
আমার কাছে-ভালোবেসে
ভুলে যাওয়া কেমনতর !
তোমার তরে যে বেদনার
ফল্গুধারা বয় এ হৃদে,
জানে শুধু জীবন-মরুর
বালুর চর এ রৌদ্র-খর ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫১

কে দেখেছে সরল মনের
প্রিয়া গো– যে দেখব আমি !
আমার মত অনেকে ঐ
প্রাণ পীড়নের মুক্তিকামী।
করব কী আর–পরান-প্রিয়,
তুমিই যদি কপট এত !
আমার মত ভাগ্য সবার
দেখনু সমান বিপথ-গামী ॥

৫২

সেই ভালো মোর-এই শারাবের
পিয়ালা দিয়ে তর্ করি দিল্,
সে সাধ আমার পুরল্ না তা
ভুলব গো আজ করব বাতিল্।
ধার-করা এ জীবন আমার
বন্দী নিতি বুদ্ধি-কারায়,
আজ নিমেষের মুক্তি দেবো
তারে ভেঙে কারার পাঁচিল ॥

৫৩

আনন্দের ঐ বিহগ-পাখার
শব্দ শুনি অদুর নভে,
কিংবা গো ও নম্র-চিতের
ফুলবাগানের খোশ্‌বু হবে।
অথবা ওই মৃদুল হাওয়া
তোমার শিরীন ঠোঁটের ভাষা,
কি এ যেন, এক অপরূপ
রূপকথা কি শুন্‌ছি তবে ?

৫৪

কাঁদি তোমার বিরহে গো
বেশি মোমের বাতির চেয়ে,
আরক্ত-ধার অশ্রু ঝরে
মদের সোরাই সম বেয়ে।
আমি গো পান-পেয়ালা যেন,
হৃদয় যখন কৃপণ হেরি–
দূর বাঁশরী-বিলাপ শুনি'
রক্ত-ধারায় উঠি ছেয়ে ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫৫

পরান-পিয়া ! কাটাই যদি
তোমার সাথে একটি সে রাত,
বসন সম জড়িয়ে র'ব
নিমেষ পলক করব না পাত।
ভয় কি আমার, যদিই সখি
তার পরদিন মৃত্যু আসে,
পান করেছি অমর-করা
তোমার ঠোঁটের "আব-ই-হায়াত" ॥

৫৬

আলিঙ্গন ও চুম্বন হায়
মর্‌ল তোমার ধেয়ান ক'রে,
তোমার ঠোঁটের চুম না পেয়ে
পান্না-চুনি গেল ম'রে।
কহিনী আর বাড়াব না
অল্পে সারি কল্পকথা,–
মর্‌ল কেহ ফিরে এসে
প্রতীক্ষাতে জীবন ধ'রে ॥

৫৭

দয়িত মোর ! অল্পে এত
ছাড়ব তোমায় কেমন করি',
মরকত্‌-নীল ও-কেশ-ফাঁসে
যতক্ষণ না প্রাণ বিসরি'।
লোহিত চুনির ঠোঁট গো তোমার
মোর জীবনী-শক্তি সে যে,
লক্ষ প্রবাল বিনিময়েও
পার্‌ব না তা দিতে, গোরি !

৫৮

দুঃখ ছাড়া এ-জীবনে
হ'ল না আর কিছুই হাসিল্‌,
বিষাদ হ'ল সাথের সাথী
তোমায় দিয়ে আমার এ দিল্‌।
গোপন মনের স্বপন-সাথী
পেলাম না গো বন্ধু কোনো,
ব্যথাই আমার ব্যথার ব্যথী,
তোমার মতই নিঠুর নিখিল ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫৯

আমার প্রবোধ দেওয়ার তরে,
ভোরের হাওয়া, ব'লো তা'রে–
যে পাষাণীর মত গলে না
আমার শত অশ্রু-ধারে,–
"সুখে তুমি ঘুমাও নিতি
দ'ুলে দু'লে আরাম-দোলায়,
কার নয়নে ঘুম নাহি আর–
উদয় কি হয় স্মরণ-পারে ?"

৬০

আর কতদিন করবে, প্রিয়,
এ উৎপীড়ন আমায় নিয়ে,
বিনা কারণ বিশ্ব-নিখিল
জ্বালাবে ও-হৃদয় দিয়ে ?
আশীর্বাদের সম অসি
দুঃসাহসীর কঠোর হাতে,
তোমার হাতে পড়লে তাহা
করবে তা খুন তোমায় প্রিয়ে ॥

৬১

কোরান হাদিস্ সবাই বলে–
পবিত্র সে বেহেশ্ত নাকি,
মিলবে সেথাই আসল শারাব
তন্বী হুরী ডাগর-আঁখি !
শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে
দিন কাটে মোর, দোষ কি তাতে ?
বেহেশ্তে যা হারাম নহে–
মর্ত্যে হবে হারাম তা কি ?

৬২

চন্দ্র সূর্য রাত্রি দিবা
বিচিত্র সে আবেগ ভরে,
ওগো প্রিয়, দেখি–তোমার
ধূলির 'পরে প্রণাম করে !
হৃদয় আঁখির সাধ হ'তে মোর
ক'রো না গো নিরাশ মোরে
রইবে দূরে-বসিয়ে আমায়
প্রতীক্ষার ঐ অগ্নি 'পরে ?

Dhaka University Institutional Repository

৬৩

মদের মত কি আর আছে
ভুল্‌তে ব্যথা, তাতিয়ে তোলার ?
যুদ্ধ করার সাধ জাগে কি
সেনার সাথে এই বেদনার ?
এই ত তোমার কাঁচা মাথা,
এরির মাঝে বাতিল্ শারাব ?
কাঁচা সবুজ বয়েসই ত
খুশীর, গানের, পান-পিয়ালার ॥

৬৪

পাতার পর্দানশীন মুকুল,
ফুটেই হেরে তোমায় পাছে !
মাতোয়ালা 'নার্গিস' শরমে
তোমায় হেরি' মরণ যাচে।
তোমার কাছে রূপের বড়াই
কেমন ক'রে করবে গো ফুল ?
ফুল পেল রূপ চাঁদ চোঁয়ায়ে,
চাঁদ পেল রূপ তোমার কাছে ॥

৬৫

আশ্বাসেরই বাণী তোমার
প্রতীক্ষার ঐ দূর সাহারায়
ফিরছে আজো, আর কতদিন
ঢাক্‌বে রবি মরুর ধূলায় ?
বাঘের মুখে যাও গো যদি
লালসা আর লোভের বশে,
আখেরে যে শিকার হবে
গোরের হাতে মাটির তলায় ॥

৬৬

তোমার আঁখি-জানে যাহা
বঞ্চনা আর ছল-চাতুরী,
চম্‌কে বেড়ায় অসি যেন
রণাঙ্গনে ঘুরি' ঘুরি'।
তড়িৎ-জ্বালার ও-চোখ ত্বরিত্
গোল বাধাবে বঁধুর সাথে,
যে হিয়াতে শিলা ঝরে,
হায় গো তারি তরে ঝুরি ॥

Dhaka University Institutional Repository

৬৭

দাও এ হাতে ফুর্তি শিকার
করে সদা যে বাজপাখি,
প্রিয়ার মত প্রিয়ম্বদা
মদ-পিয়ালা দাও গো সাকি !
কুঞ্চিত ঐ কুন্তল-যা
পাক খেয়েছে শিক্‌লি সম-
আন গো তায় দোস্ত, কর
এই দিওয়ানার হস্ত-রাখী !

৬৮

হায় রে, আমার এ বদ্‌নসিব
হ'ত যদি মনের মত !
কিম্বা গ্রহের চক্র ঘু'রে
আবার আমার বন্ধু হ'ত !
পালিয়ে যেত যৌবন মোর
যখন হাতের মুঠি হ'তে,
রেকাব সম রাখ্‌ত ধ'রে
এই জরারে সমুন্নত ॥

৬৯

ফুল্লমুখী দিল্‌-পিয়ারী,
বীণা, বেণু, একটু আড়াল,
এক রেকাবী কাবাব, সাথে
এক পেয়ালি শিরাজী লাল-
ধমনীতে উঠ্‌বে জ্ব'লে
লক্‌লকিয়ে অগ্নিশিখা,-
'হাতেম-তাই'-এর অনুগ্রহও
চাই না তখন মুহূর্ত কাল !

৭০

শাহী তখ্‌তে বসেছে ফুল-
দেখ্‌নু সেদিন গুল-বাগিচায়,
কইনু,-শোনো, সত্য যদি
দীপ্ত তুমি রাজ-মহিমায়,
নিষ্পাপ এক কিশোর আমি
জ্বালাও তারেই রাত্রি দিবা,
তবু তোমার স্পর্শে না পাপ,
চিরন্তনী, আফ্‌সোস্‌, হায় !

Dhaka University Institutional Repository

৭১

বন্দী বোঁটায় কইল কুসুম,
থাক্‌ত যদি শক্তি আমার
পালিয়ে যাবার রাস্তা পেলে
পালিয়ে যেতাম দূর বন-পার।
বিনা অপরাধেই মোরে
এমন ক'রে জ্বালায় যদি,
সত্যিকারের দোষী হ'লে
না জানি সে কর্‌ত কি আর ॥

৭২

সেও এ মন্দ-ভাগ্য সম
এম্‌নি জালে ফাঁস্‌ত যদি,
হ'ত লাখো খারাবী তার
শারাব নিয়ে নিরবধি।
আমি মাতাল, প্রেম-বিলাসী,
পাগল্‌, ভুবন-দাহন-কারী,–
বস্‌লে কাছে রট্‌বে কুযশ
তাই ত থাকি দুয়ার রোধি' ॥

৭৩

ওরে হাফিজ্‌, শেষ কর্‌ তোর
কৃত্রিম এই কলম্‌বাজি !
হ'ল সময়–খোলা পাতা
ঝোলায় তু'লে রাখার আজি।
নীরব হয়ে বসার পালা
এবার রে তোর, আজ্‌কে শুধু
শূন্য গেলাস টইটুম্বুর,
কর্‌ রে ঢেলে শেষ শিরাজী।

-তামাম শোদ্‌–

Dhaka University Institutional Repository

**

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা "জয়ন্তীতে ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রুবাইয়াতে হাফিজের ১০ টি রুবাই (৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ৩২, ৪১, ৪৯, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক রুবাই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশকালে ৩২, ৪১, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক রুবাইগুলো কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। ৫৪ সংখ্যক রুবাইটি 'জয়ন্তীতে আছে নিম্নরূপঃ

৫৪

তোমার বিরহে গো আমি
কাঁদি মোমের বাতির চেয়ে
আরক্তধার অশ্রু ঝরে
মদের কুঁজোর মতো বেয়ে'
পান-পেয়ালার মতো আমি,
হৃদয় যখন কৃপণ হেরি
দূর বাঁশরীর বিলাপ শুনে,'
রক্ত ধারায় উঠি ছেয়ে।"

(আলী°, ১৯৯৪ : ৩৮০)

নজরুলের ১ নং রুবাইর ফারসি যা হাফিজের ২ নং মুল রুবাই :

جز نقش تو در نظر نیامد ما را　　جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت　　حقا که به چشم در نیامد ما را

(হাফিজ সিরাজী°, ১৩৬২ : ৩৩৬)

নজরুলের ২ নং রুবাইর ফারসি যা হাফিজের ১ নং মুল রুবাই :

بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا　　پنهان ز رقیب سفله بگریز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو　　بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا

(হাফিজ সিরাজী°, ১৩৬২ : ৩৩৬)

নজরুলের ৩৪ নং রুবাইর ফারসি যা হাফিজের ১৭ নং মুল রুবাই :

نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد　　نی راحت هستیش الم می ارزد
نه هفت هزار ساله شادی جهان　　این محنت هفت روزه غم می‌ارزد

(হাফিজ সিরাজী°, ১৩৬২ : ৩৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের ৬৯ নং রুবাইর ফারসি যা হাফিজের ৪৩ নং মুল রুবাই :

با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی　　　کنجی و فراغتی و یک شیشه‌ی می

چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی　　　منت نبریم یک جو از حاتم طی

(হাফিজ সিরাজী[৩], ১৩৬২ : ৩৪২)

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আলী, মোবাশ্বের : *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪/ মাঘ ১৪০০।

২. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়: আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ : ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮।

৩. হাফিজ সিরাজী, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ : *দিওয়ানে হাফিজ*, ইনতিশারাতে নেভীন, তেহরান, ইরান, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২ ফারসি সন, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী গ্রন্থ নং- ৮০০/১৫, http://mozhgankarimi.persianblog.ir/, http://rira.ir/rira/php/

Dhaka University Institutional Repository

ছ. নজরুল রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* এর ভূমিকা

ভূমিকা

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

ওমরকে তাঁর কাব্য প'ড়ে যাঁরা Epicurean ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত ঃ-

১। 'শিকায়াত্-ই-রোজগার', অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।

২। 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।

৩। 'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া', বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা।

৪। 'বাহরিয়া'-বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, পাখী ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা।

৫। 'কুফরিয়া'- ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এইগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতা-রূপে কবি-সমাজে আদৃত। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।

৬। 'মুনাজাত'- বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মত প্রার্থনা নয়, সূফীর প্রার্থনার মত এ হাস্য-জড়িত।

ওমরকে Epicurean কতকটা বলা যায় শুধু তাঁর 'কুফরিয়া'- শ্রেণীর কবিতার জন্য। এ ছাড়া ওমর যা, তা ওমর আর কারুর সঙ্গেই তুলনা হয় না।

ওমরের কাব্যে শারাব-সাকীর ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা, অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনী, তাঁর জীবনও ছিল তেম্‌নি।

ফিট্‌জেরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই ব'লে থাকেন, ওমর যে-শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষাসব, তাঁর সাকীও রক্ত-মাংসের। ফিট্‌জেরাল্ড তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ওমর তাঁর 'রুবা-ই'তে অবশ্য শারাব বলতে আঙ্গুরের ক্বাথ-এর উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু ওটা পারস্যের সকল কবিরই অন্ততঃ "বলার জন্য বলা"-র বিলাস। শারাব, সাকী, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা যেন ভাবতেই পারেন না।

ওমর হয়ত শারাব পান করতেন কিম্বা করতেনও না। এর কোনোটাই প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। ওমরের রুবাইয়াতের মতবাদের জন্য তাঁর দেশের তৎকালীন ধর্মগোঁড়াদের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, তবু তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে সম্রাট থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত ভক্তির চোখে দেখত। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ওমরের ছাত্র ছিলেন ; কাজেই মনে হয়, তিনি মদ্যপ লম্পটের জীবন (ইচ্ছা থাকলেও)

Dhaka University Institutional Repository

যাপন করতে পারেন নি। তা ছাড়া, ও-ভাবে জীবন যাপন করলে গোঁড়ার দল তা লিখে রাখতেও ভুলে' যেতেন না। অথচ, তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুও তা লিখে যান নি। সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছিল হয়ত এই ভাবেই যে, তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত জীবন যাপন করতে পারেন নি। শারাব-সাকীর স্বপ্নই দেখেছেন, - তাদের ভোগ ক'রে যেতে পারেন নি। ভোগ-তৃপ্ত মনে এমন আগুন জ্বলে না। এ যে মরুভূমি– নিম্নে হয়ত বহু নিম্নে কান্নার কাল্পধারা, উর্ধ্বে রৌদ্র-দগ্ধ বালুকার জ্বালা, তীব্র দাহন। ওমর যেন মরুভূমির বুকের খর্জুর তরু, মরুভূমির খেজুর-গাছকে দেখলে যেমন অবাক হতে হয়-ওমরকে দেখেও তেমনি বিস্মিত হই। সারা দেহে কন্টকের জ্বালা, উর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত আকাশ, নিম্নে আতপ তপ্ত বালুকা– তারি মাঝে এত রস সে পায় কেমন ক'রে ?

খেজুর-গাছের মতই ওমর এ-রস দান করেছেন নিজের হৃৎপিণ্ডকে বিদারণ ক'রে। এ রস মিষ্ট হ'লেও এ ত অশ্রুজলের লবণ মেশা। খেজুর-গাছের রস যেমন তার মাথা চেঁছে বের করতে হয়, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতেও তেমনি বেরিয়েছে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে। প্রায় হাজার বছর আগে এত বড় জ্ঞানমার্গী কবি কি ক'রে জন্মাল, বিশেষ ক'রে ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে–তা ভেবে অবাক্ হতে হয়। ওমরকে দেখে মনে হয়, কোনো বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি এত মডার্ন হতে পারেন না। ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ঐ হাজার বছর আগে জন্মাবার জন্যই। আজকাল পৃথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-প্রবুদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না। ওমর আজ জগতে অপরিমাণ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন–তবু মনে হয়, আরো চার পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি আরো বেশী শ্রদ্ধা পাবেন–যা পেয়েছেন তার বহু সহস্র গুণ।

ওমর তাঁর অসময়ে আসা সম্বন্ধে যে অত বেশী সচেতন ছিলেন, তা তাঁর লেখার দুঃসাহসিকতা, পৌরুষ ও গভীর আত্মবিশ্বাস দেখেই বুঝা যায়। তিনি যেন তাঁর কাছে আর-সব মানুষকে অতি ক্ষুদ্র pigmy ক'রে দেখতেন।

তিনি নিজেকে এই সব ক্ষুদ্র-জ্ঞান মানুষের, এমন-কি সে-যুগের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণেরও–বহু বহু উর্ধ্বে মনে করতেন। তিনি যেন জানতেন–তাঁর জীবনে তাঁর লেখা বুঝবার মতো লোক কেউ জন্মায়নি, তিনি যা লিখেছেন তা অনাগত দিনের নতুন পৃথিবীর জন্য।

ওমর সূফী ছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু ঐ পথের পথিক যাঁরা তাঁরা ওমরকে সূফী এবং খুব উঁচুদরের তাপস ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন, সূফী জনপ্রিয়তার বা লোকের শ্রদ্ধার জুলুম এড়াবার জন্যই ঘোরতর পাপ পরিহার করেন। তাঁরা নিজেদের মদ্যপ লম্পট ব'লে স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করে নিজেরা গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকেন। তা ছাড়া, ইরানে কবির শারাবকে সকলে সত্যিকার মদ ব'লে ধ'রে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে আনন্দ–ভূমানন্দকে বোঝেন–যে আনন্দ-রূপিণী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে' গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকী বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন। যাক্, ও-সব তত্ত্বকথা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, আমরা রস-পিপাসু। ওমর কবিতা লিখেছেন, এবং তা চমৎকার কবিতা হয়েছে, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমরা তা প'ড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাই, আমাদের এতেই আনন্দ।

আমাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-পুষ্ট কারণ-জিজ্ঞাসু মনের কাছে, ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি-করি ক'রেও যেন সাহস ও প্রকাশ-ক্ষমতার দৈন্যবশতঃ তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতই আমাদের আজকের জীবন-মহাযুদ্ধ-ক্লান্ত

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই, শক্তিও নেই। কাজেই, আমার অক্ষমতার দরুন কেউ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে' না যান।"

ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা চতুষ্পদী হ'লেও তার চারটি পদই ছুটছে আরবী ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে, সম-তালে–ভণ্ডামী, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেদের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চুর্ণ ক'রে। সেই উচ্চৈঃস্রবা আমার হাতে প'ড়ে হয়ত-বা বজদ্দি মোড়লের ঘোড়া-ই হ'য়ে ওঠেছে।– আমাদের গ্রামের কাছে এক জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম বজদ্দি মোড়ল। তাঁর এক বাগ–না মানা ঘোড়া ছিল, সে জাতে অশ্ব হ'লেও গুণে অশ্বতর ছিল। তিনি যদি মনে কর্‌তেন পশ্চিম দিকে যাবেন, ঘোড়া যেত পূর্ব দিকে। ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ্ মানাতে না পেরে শেষে বল্‌তেন–"আচ্ছা চল্, এদিকেও আমার জমিদারী আছে।"

ওমরের বোর্‌রাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি সওয়ার যে বাগ্ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে উক্ত বজদ্দি মোড়লের মতো সে ঘোড়াকে তার উচ্ছামত পথেও যেতে দিই নি। লাগাম কষে' প্রাণপণ বাধা দিয়েছি, যাতে সে অন্যপথে না যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে পড়ুব-পড়ুব অবস্থাও যে হয়েছে, তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। তবে এটুকু জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তাঁর ঘোড়া আমার হাতে প'ড়ে চতুষ্পদী ভেড়া-ও হয়ে যায়নি– প্রাণহীন চার-পায়াও হয় নি। আমি ন্যাজ ম'লে ম'লে ওর অন্ততঃ তেজটুকু নষ্ট করিনি। ও'র মত "ছার্ত্তক" (সার্থক ?) না হ'তে পারলেও অন্ততঃ 'কদমে' চালাবার কিছু চেষ্টা করেছি।

যাক্, অনেক বকা গেল ; এর জন্য যাঁরা আমাকে দোষ দেবেন– তাঁরা যেন আমার দোষ দেবার আগে খৈয়ামের শারাবকে দোষ দেন। এর নামেই এত নেশা, পান করলে না জানি কি হয়, হয়তো- বা ওমর খৈয়ামই হয়। অবশ্য আমরা খেলে' এই রকম বখামি করি, ওমর খেলে' রুবাইয়াৎ লেখেন।

এইবার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের পালা। খাওয়ানোর শেষে, বিনয় প্রকাশের মতো। না করলেও হয়, তবু দেশের রেওয়াজ মেনে চল্‌তেই হবে।

আমার বহুকালের পুরানো বন্ধু মৌলভী মঈনউদ্দীন হোসয়ন সাহেব এর সমস্ত কিছু সরবরাহ না কর্‌লে হয়ত আমি কোনোদিনই এ শেষ কর্‌তে পারতাম না। তাঁর কাছে আমি এজন্য চির-ঋনী। শ্রীমান আবদুল মজিদ সাহিত্য-রত্নও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমায় প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্য। এ'দের দু'জনারই নাম আছে সাহিত্যে, কাজেই কেবল আমার বই-এ নাম থাকার জন্য এ'রা পরিচিত হবেন না। আমার সাহায্য করার মতি এ'দের অটল থাক্, এই-ই প্রার্থনা।

কাজী নজরুল ইসলাম

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮। পৃ. ২৮৮-২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

জ. ওমর খৈয়াম অনুসৃত নজরুলের গীতি কবিতা

ওমর খৈয়াম-গীতি

১

সিন্ধু-কাফি-কাওয়ালি

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে ॥
তোমারি সে নিদেশ প্রভু
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি সবে ॥
করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে "আদমে"রে করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি করুণাময় কইব তবে ॥

(নজরুল ইসলাম১, ১৯৯৩ : ৮১)

২

ভৈরোঁ-কাওয়ালি

পিও শরাব পিও !
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবে না সাথে ॥
পিও নিমেষ- মধু !
পুন গাহিব না কা'ল আজি সে গীত গাহি।
শোনো শোনো মোর গান–
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবে না সে প্রাতে ॥
ওরা কহিছে সদাই–
'পাবি মোহনী হুরী', শোনো আমার বাণী –
'ওরে মধুরতর
এই আঙুর-পানি এই পান্‌শালাতে ॥
ধর্ নগদা যা পাস্,
মিছে রস্‌নে বসে বাকী পাওনা-আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে ॥

(নজরুল ইসলাম১, ১৯৯৩ : ৮১)

Dhaka University Institutional Repository

৩

ভীমপলশ্রী-দাদ্‌রা

কানন গিরি সিন্ধু-পার ফির্‌নু পথিক দেশ-বিদেশ।
ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন ভুবন অশেষ ॥
তীর্থ-পথিক এই পথের ফিরিয়া এল না কেউ,
আজ এ পথে যাত্রা যার, কাল নাহি তার চিহ্ন লেশ ॥
রাত্রি দিবার রংমহল চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ,
দু'দিনের এ পান্থবাস এই ভুবন–এ সুখ-আবেশ ॥
ভোগ-বিলাসী "জমশেদের" জল্‌সা ছিল এই সে দেশ,
আজ শ্মশান, ছিল যথায় "বহ্‌রামের" আরাম আয়েশ ॥

* জমশেদ, বহরাম–ইরানের ভোগ-বিলাসী সম্রাট। জমশেদ প্রথম শারাব-সাকীর প্রবর্তন করেন।

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮২)

৪

ভূপালী মিশ্র–কাহার্‌বা

আজ বাদে কাল আস্‌বে কি না
কে জানে ভাই কে জানে।
ভোল্‌ রে ব্যথা বেদন-আতুর,
লাল শারাব-ভরপূর-প্রাণে ॥
ঝর্‌ছে শারাব জ্যোৎস্না-উজল,
হাস্‌তেছে চাঁদ ঝলমল,
কাল্‌কে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাব কোন্‌খানে ॥
প্রেমিক যত আমার মত
মদের রঙে হোক রঙীন্‌,
হোক দীওয়ানা মস্‌ত্‌ নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে ॥
এম্‌নি চোখে হেরি ধরায়
দুঃখ্‌ ব্যাথার অন্ত নাই,
কালের কথা আজ ভুলে যাই
দুখ-ভুলানো মদ পানে ॥

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮২)

Dhaka University Institutional Repository

৫

ভৈরবী-কাওয়ালি

তরুণ প্রেমিক ! প্রণয়-বেদন
জানাও জানাও বে-দিল্ প্রিয়ার।
ওগো বিজয়ী। নিখিল-হৃদয়
কর কর জয় মোহন মায়ায় ॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মস্‌জিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায় ॥
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রৌশন্
যেথায় থাকুক সমান তাহার-
খোদার মস্‌জিদ, মূরত-মন্দির
ঈসাই-দেউল, ইহুদ-খানায় ॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায় ॥
(নজরুল ইসলাম১, ১৯৯৩ : ৮২-৮৩)

৬

পিলু-কাহারবা

যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি, প্রিয়ে !
ধুয়ো "লাশ" আমার লাল পানি দিয়ে ॥
শেয়র্ :- শারাবি জম্‌শেদি গজল "জানাযা"য়
গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারারি ঐ শারাব-খানার !
"রোজ-কিয়ামতে" তাজা উঠ্‌বো জিয়ে ॥
শেয়র্:- এমনি পিইব শারাব,
ভেসে যাব তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশ্‌বু শারাবের আমার ঐ গোরের পার হ'তে ;
টলি' পড়্‌বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে ॥
(নজরুল ইসলাম১, ১৯৯৩ : ৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

৭

'কালাংড়া – আদ্ধাকাওয়ালি

কোন্ মাটিতে আমার কায়া
সৃজিলে হায় প্রভু মোর
মস্‌জিদে মোরা ঠাঁই নাহি পাই,
সকল দেউল বন্ধ-দোর ॥
ফিরি নগর-নারীর মত
কাফের দর্‌বেশ বদ্-নসিব,
নাই বেহেশ্‌তের আশা আমার,
দীন ও দুনিয়া শত্রু ঘোর ॥
বেড়াই শ্রীহীন, দেয় অভিশাপ
যে হেরে সেই আমারে,
রূপ-পূজারী ভুলতে নারি
মোর প্রতিমার মুখ কিশোর ॥
চাইব শারাব, প্রিয়ার অধর,
মরব যেদিন পান্‌শালায়,
কোথায় নরক, কোথায় স্বরগ,
শারাব-নেশায় রইব ভোর ॥
(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৩-৮৫)

৮

বেহাগ – দাদ্‌রা

রে অবোধ !	শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটি ধরা।
শূন্য ঐ	অসীম আকাশ রং-বেরং-এর খিলান-করা ॥
হাওয়াতে	শূন্য নিমেষ নিমেষে যায় হ'য়ে শেষ।
এসেছি	পথিক এ পর্ – দেশ জীবন-মৃত্যু-ভরা ॥
হুরি আর	গানের প্রিয়া, সাথে তার শারাব নিয়া
চল ঐ	সবুজ-বিথার ঝর্না-কিনার গোলাব-ঝরা ॥
এর অধিক	সুখের বিলাস স্বরগে করিস্‌নে আশ,
সে স্বরগ	নাই রে কোথাও এমন উধাও দুখ-পাসরা ॥

(নজরুল ইসলাম[১], ১৯৯৩ : ৮৪)

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নজরুল ইসলাম, কাজী : *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনায়ঃ আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: ১ পৌষ ১৩৯১/১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, নতুন সংস্করণঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/ ২৫ মে ১৯৯৩, বাএ ২৭৫৮, পৃ. ৮১-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. নজরুল অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

১

রাতের আঁচল দীর্ণ ক'রে আসলো শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী! সকাল বেলায় খোঁয়ারী ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।

২

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পাড় প্রভাত,
পাখীর বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ!
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে–
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত।

৩

ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস্ ? কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
আনন্দ গুল্ প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর ?
ঘুম মৃত্যুর যমজ ভ্রাতা, তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কররে তোর জনম ভোর।

৪

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোঁট,
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ।
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপী রং শারাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর খোঁপায় যেমন তোন চুনোট।

৫

প্রভাত হ'ল। শারাব দিয়ে করব সতেজ হৃদয়-পুর,
যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখনাচুর।
অনেক দিনের সাধ ও আশা এক নিমিষে করব ত্যাগ,
পরম প্রিয়ার বেণী বাঁধন, ধরব বেণুর বিধুর সুর।

৬

ওঠো, নচো ! আমরা প্রচুর করব তারিফ' মদ-অলস
ঐ নার্গিস-আঁখির তোমার, ঢালবে তুমি আঙ্গুর-রস !
এমন কী আর– যদিই তাহা পান করি দশ বিশ গেলাস,
ছয় দশে ষাট পাত্র পড়লে খানিক্‌টা হয় দিল্ সরস!

৭

তোমার রাঙা ঠোঁটে আছে অমৃত-কূপ প্রাণ-সুধার,
ঐ পিয়ালার ঠোঁট যেন গো ছোঁয় না, প্রিয়া, ঠোঁট তোমার।
ঐ পিয়ালার রক্ত যদি পান না করি, শাপ দিও;
তোমার অধর স্পর্শ করে এত স্পর্ধা তার!

৮

আজকে তোমার গোলাপ বাগে ফুটল যখন রঙীন গুল্
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।
পান করে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়ত এমন ফুল মাখানো দিন পাবি না আজের তুল !

Dhaka University Institutional Repository

৯

শারাব আনো ! বক্ষে আমার খুশীর তুফান দেয় যে দোল।
স্বপ্ন চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম-বিভোল !
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদ সম ব্যস্ত পায়
যৌবনের এই বহ্নি নিভে খোঁজে নদীর শীতল কোল !

১০

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন্,
লাভের অঙ্ক হিসাব ক'রে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খু'জতে গিয়ে এই জীবনের রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবই মৃত্যুর অঙ্কলীন।

১১

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতুহল,
তারপর–এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি–
এই যে জীবন আশা যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল !

১২

রহস্য শোন্ সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব ! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেব্তা দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

১৩

স্রষ্টা যদি মত্ নিত মোর–আসতাম না প্রাণান্তেও
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার, সেও শূন্য শূন্য এও!

১৪

আত্মা আমার ! খুলতে যদি পারতিস্ এই অস্থিমাস
মুক্ত পাখার দেব্তা সম পালিয়ে যেতিস্ দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হ'ল না রে, ছেড়ে তোর ঐ জ্যোতির্লোক
ভিন্-দেশী প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস ?

১৫

সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ার
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না ? নিত্য ভয়ের হও শিকার ?
জানি স্বাধীন ইচছামত যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।

১৬

ব্যথার শান্তি লাভের তরে থাকত যদি কোথাও স্থান
শ্রান্ত পথের পথিক মোরা সেথায় জুড়াতাম এ প্রাণ।
শীত-জর্জর হাজার বছর পরে নবীন বসন্তে
ফুলের মতো উঠত ফুটে মোদের জীবন-মুকুল-ম্লান।

Dhaka University Institutional Repository

১৭

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।
আনন্দে সে উঠল গাহি', "মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ!"

১৮

রূপ-মাধুরীর মায়ায় তোমার য'দিন পার, লো প্রিয়া,
তোমার প্রেমিক বঁধুর ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া!
রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

১৯

সাকী ! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও !
প্রিয়ার মতন ও মদ-মদির সুরত-ওয়ালী বরতে দাও !
জ্ঞাণী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা দেয় গাঁট-ছড়ায়,
সেই শারাবের শিকল, সাকী, আমায় খালি পরতে দাও !

২০

নীল আকাশের নয়ন ছেপে' বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভরে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল-কে জানে হায় কার তরে।

২১

করব এতই শীরাজী পান পাত্র এবং পরান ভোর
তীব্র মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।
থম্‌কে যাবে চলতে পথিক আমার গোরের পাশ দিয়ে,
ঝিমিয়ে শেষে পড়বে নেশায় মাতাল-করা গন্ধে ওর।

২২

দেখতে পাবে যেথায় তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশা'র রুধির।
নার্গিস আর গুল-বনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায়–গালে তিল ছিল যে সুন্দরীর।

২৩

নিদ্রা যেতে হবে গোরে অনন্তকাল, মদ পিও।
থাকবে না কো সাথী সেথায় বন্ধু প্রিয় আত্মীয়।
আবার বলতে আসব না ভাই, বলছি যা তা রাখ্‌ শুনে–
ঝরেছে যে ফুলের মুকুল, ফুটতে পারে আর কি ও?

২৪

বিদায় নিয়ে আগে যারা গেছে চলে, হে সাকী !
চির ঘুমে ঘুমায় তা'রা মাটির তলে, হে সাকী !
শারাব আনো, আসল সত্য আমার কাছে যাও শুনে,
তাদের যত তথ্য গেল হাওয়ায় গলে', হে সাকী !

Dhaka University Institutional Repository

২৫

তুমি আমি জন্মিনি কো-যখন শুধু বিরামহীন
নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরতো হেথায় উজল দিন,–
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো ! কাজল-আঁখি সুন্দরীর
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়ত ধূলির অঙ্কলীন !

২৬

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,
তাঁর সে কলম দিয়ে-যিনি দুঃখে সুখে নির্বিকার।
স্রেফ্ বোকামি কান্নাকাটি, লড়তে যাওয়া তার সাথে,
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর !

২৭

ভালো ক'রেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক, কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারবো না–
থাকি সে কোন্ গোপন-লোকে, দেখতে যাহা পায় না চোখ।

২৮

চলবে না কো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি !
মোদের আবাস সাফ ক'রে নেয় শেয়ান-ঝাড়ুর কারসাজি।
বেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হে'কে বৃদ্ধ পীর–
"অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কাল, পান ক'রে নে মদ আজি !"

২৯

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের,
মুহূর্তে তা দিল ছিঁ'ড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ !

৩০

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিঠুর করে
বে'চে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে !
হেথায় কিছু যোগাড় ক'রে নে রে, হোথায় কেউ সে নাই
তাদের তরে–শূন্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

৩১

বলতে পারো, অসার শূন্য ভবের হাটের এই ঘরে
জ্ঞান-বিলাসী সুধীজনের হৃদয় কেন রয় পড়ে' ?
যেই তাহারা শ্রান্ত হয়ে এই সে ঘরের শান্তি চায়,
"সময় হ'ল, চল্ ওরে," কয় অমনি মরণ হাত ধ'রে !

৩২

খাজা ! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই–
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩

কাল কি হবে কেউ জানে না, দেখছে ত, হায়, বন্ধু মোর !
নগদ মধু লুঠ ক'রে লও, মোছ মোছ অশ্রুলোর।
চাঁদনী-তরল শরাব পিও, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দ্বীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়।

৩৪

প্রেমিকরা সব আমার মতো মাতুক প্রেমের মত্ততায়,
দ্রাক্ষা-রসের দীক্ষা নিয়ে আচার-নীতি দলুক পা'য়।
থাকি যখন শাদা চোখে, সব কথাতে রুষ্ট হই ;
কারাব পিয়ে দিল্-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয়-ভাবনায়।

৩৫

মানব-দেহ–রঙে-রূপে এই অপরূপ ঘরখানি–
স্বর্গের সে শিল্পী কেন করলো সৃজন কী জানি,
এই 'লালা-রুখ' বল্লী-তনু ফুল্ল-কপোল তন্বীদের
সাজাতে হায় ভঙ্গুর এই মাটির ধরার ফুলদানি।

৩৬

তিন ভাগ জল এক ভাগ থল, এই পৃথিবীর এও মায়া,
এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,
এই যে তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলরব মায়া।
গোপন প্রকাশ সত্য মিথ্যা এ সব অবাস্তব মায়া।

৩৭

দোষ দেয় আর ভর্ৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া,
আমার দেবী প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া।
মরতে যদি হয় গো আমার শারাব পানের মজলিশে–
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শারাব আর প্রিয়া।

৩৮

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস এ পৃথ্বীতল–
রাত্রি-দিবার চিত্রলেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জামশেদ ঐ উৎসবেরই আঙ্গিনায়
লাখ বাহ্‌রাম এই আসনে বসে হ'ল বেদখল।

৩৯

কারুর প্রাণে দুখ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িও না তার মনস্তাপ।
অমর আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

৪০

ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন শাস্ত্রপাঠ,
তার চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণীর ঠাট্ ;
ঐ সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল্,
কে জানে তোর রুধির পি'য়ে কখন মৃত্যু হয় লোপাট।

Dhaka University Institutional Repository

৪১

অজ্ঞানেরই তিমির তলের মানুষ ওরে বে-খবর !
শূন্য তোরা, বুনিয়াদ তোর গাঁধা শূন্য হাওয়ার পর।
ঘুরিস্ অতল অগাধ খাদে, শূন্য মায়ার শূন্যতায়,
পশ্চাতে তোর অতল শূন্য, অগ্রে শূন্য অসীম চর।

৪২

লয়ে শারার-পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত হয়ে
জ্ঞানহারা হই সেই পুলকের তীব্র ঘোর বেদন সয়ে,
কি যেন এক মন্ত্র-বলে যায় ঘটে কি অলৌকিক,
প্রোজ্জ্বল মোর জ্ঞান গ'লে যায় ঝর্ণা সম গান বয়ে।

৪৩

"শারাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মদ্যপায়ীর নেই কো ত্রাণ।"
ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান–
সত্য কথাই ! যে আঙুরে, নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত–নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্তপান।

৪৪

আমার কাছে শোন্ উপদেশ–কাউকে কভু বলিস্‌নে–
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মনে চলিস্‌নে।
দুঃখ ব্যথায় টলিস্‌নে তুই, খু'জিস্‌নে তার প্রতিষেধ,
চাস্‌নে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ্ ঢলিস্‌নে।

৪৫

মউজ চলুক। লেখার যা তা লিখল ভাগ্য কালকে তোর,
ভুলেও কেহ পু'ছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর।
অদ্রতারও অনুমতি কেউ নিল না অমনি ব্যস
ঠিক ঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর।

৪৬

সেই সাথে চাই–সৃষ্টি–খাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,
আমি চাহি, স্রষ্টা আবার সুজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন, এই এখনই এই সে আমার আঁখির পর ;
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

৪৭

নাস্তিক আর কাফের বলো তোমরা লয়ে আমার নাম,
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল করে যাই, কিন্তু ভাই
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম ?

৪৮

বদখশানী রক্ত চূণীর মতন সুরা চু'ইয়ে আন্
তপ্ত হিয়ার আনন্দ যা, শান্ত যাহে দগ্ধ প্রাণ।
মুসলমানের তরে শারাব হারাম না কি, সবাই কয়,
বলতে পারে তাদের কেহ–আছে কি আর মুসলমান ?

Dhaka University Institutional Repository

৪৯

মস্জিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় মাদ্রাসায়
রাত্রি দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলে না এই খোশ গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

৫০

এক হাতে মোর তস্‌বী খোদার, আর হাতে মোর লাল গেলাস,
অর্ধেক মোর পুণ্য-স্নাত, অর্ধেক পাপে করল গ্রাস।
পুরোপুরি কাফের নহি, নহি খাঁটি মুসলিমও–
করুণ চোখে হেরে আমায় তাই ফিরোজ নীল আকাশ।

৫১

একমণী ঐ মদের জালা গিলব, যদি পাই তাকে,
যে জালাতে প্রাণের জ্বালা নেভাবার ওষুধ থাকে!
পুরানো ঐ যুক্তি-তর্কে দিয়ে আমি তিন তালাক,
নতুন ক'রে করব নিকাহ্ আঙুর-লতার কন্যাকে।

৫২

বিষাদের ঐ সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ভাই শিরোপরি,
আঙ্গুর-কন্যা সুরার সাথে প্রেম ক'রে যাও প্রাণ ভরি'।
নিষিদ্ধা ঐ কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী,
তাহার সতী মায়ের চেয়ে ঢের বেশী সে সুন্দরী।

৫৩

স্বর্গে পাব শারাব সুধা, এ যে কড়ার খোদ খোদার,
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয় এ কোন্ বিচার ?
হাম্‌জা সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব,–
তুচ্ছ কারণ–শারাব হারাম তাই হুকুমে মোস্তফার।

৫৪

রজব শাবান পবিত্র মাস বলে গোঁড়া মুসলমান,
সাবধান, এই দু'মাস ভাই কেউ করো না শারাব পান।
খোদা এবং তার রসুলের রজব শাবান এই দু'মাস
পান পিয়াসার তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ রমজান !

৫৫

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শারাব চলুক আজ দেদার।
এক পেয়ালি শারাব যদি পান করো ভাই অন্য দিন,
দু পেয়ালি পান করো আজ বারের বাদশা জুম্মা বার।

৫৬

মস্‌জিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-পায় ;
ওগো প্রভু, কোন্ মাটিতে করলে সৃজন এই আমায় ?
সংশয়াত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি চাহি এই ধরায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭

মুগ্ধ করো নিখিল হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে,
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসজিদ আর 'কাবা' ;
কি হবে তোর তীর্থে 'কাবা'র, শান্তি খোঁজ হৃদয়-তলে।

৫৮

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরত বিবেক জাগে এক নিমেষ।
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ ক'রে নাও প্রাণ ভরে,
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ।

৫৯

হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মস্‌জিদ মন্দির গির্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান–
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির উর্ধ্বে তারা মুক্ত-প্রাণ।

৬০

মদ পিও আর ফুর্তি করো–আমার সত্য আইন এই !
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না–স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, "দিব কি যৌতুক ?"
কইল বধূ, "খুশি থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই।"

৬১

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর,
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব না কো তখ্‌ত আমি শাহানশার!

৬২

হূরী ব'লে থাকলে কিছু–একটি হূরী মদ খানিক
ঘাস-বিছানো ঝর্ণাতীরে অল্প-বয়েস বৈতালিক–
এই যদি পাস্‌, স্বর্গ নামক পুরনো সেই নরকটায়
চাস্‌নে যেতে, স্বর্গ ইহাই, স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

৬৩

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অঢেল লাল শারাব
গেহুঁ'র রুটি, গরম কোর্মা, কালিয়া আর শিক-কাবাব,
আর লালা-রুখ, প্রিয়া আমার কুটীর-শয়ন-সঙ্গিণী,–
কোথায় লাগে শাহানশাহের দৌলৎ ঐ বে-হিসাব।

৬৪

দোষ দিওনা মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাও না মদ :
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হ'ত রদ্‌।
মদ না পিয়েও, হে নীতিবিদ্‌, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরাও শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ্‌!

Dhaka University Institutional Repository

৬৫

খুশী-মাখা পেয়ালাতে ঐ গোলাপ-রক্ত মদ-মধুর !
মধুরতর পাখীর গীতি, বেণুর ধ্বনি বীনার সুর।
কিন্তু ঐ যে ধর্মগোঁড়া–বুঝল না যে মদের স্বাদ,
মধুরতম–রয় সে যখন অন্ততঃ পাঁচ যোজন দূর!

৬৬

চৈতী-রাতে খুঁজে নিলাম তৃণাস্তৃত ঝর্ণা-তীর,
সুন্দরী এক হুরী নিলাম, পেয়ালা নিলাম লাল পানির।
আমার নামে বইল হাজার কুৎসা গ্লানির ঝড় তুফান,
ভুলেও মনে হ'ল না মোর স্বর্গ নরকের নজীর।

৬৭

সাকী-হীন ও শারাব-হীনের জীবনে, হায়, সুখ কী বল ?
নাই ইরাকী বেণুর ধ্বনির জমজমাটি সুর-উছল
সুখ নাই ভাই সেথায় থেকে ; এই জগতের তত্ত্ব শোন্,
আনন্দহীন জীবন-বাগে ফলে শুধু তিক্ত ফল।

৬৮

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ–
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পূণ্য এর।

৬৯

শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী, হেথায় এলাম ফের !
তৌবা ক'রেও পাইনে রেহাই হাত হতে ভাই এই পাপের।
'নূহ্' আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো না কো আর, সাকী,
তার চেয়ে মদ প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের !

৭০

নৃত্য-পাগল ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের 'পর–
হেলায় পায়ে দলো না কেউ–এই যে সবুজ তৃণের ভিড়
হয়ত কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।

৭১

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পা'য়
খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু-ঝঞ্জা প্রায়।
তারই মাঝে এই দু'দিনের খোঁজ রাখি না–ভাবনা নাই,
যে গত-কাল গত, আর যে আগামী-কাল আসতে চায়।

৭২

আর কতদিন সাগর-বেলায় খামকা বসে তুলব ই'ট !
গড় করি পায়, ধিক লেগেছে গ'ড়ে গ'ড়ে মূর্তি পীঠ।
ভেবো নাকো–খৈয়াম ঐ জাহান্নামের বাসিন্দা,
ভিতরে সে স্বর্গী-চারী, বাহিরে সে নরক-কীট।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩

মধুর, গোলাপ-বালার গালে দক্ষিণ হাওয়ার মদির শ্বাস,
মধুর, তোমার রূপের কুহক মাতায় যা এই পুষ্পাবাস।
যে গেছে কাল গেছে চলে, এলো না তার ম্লান স্মৃতি,
মধুর আজের কথা বল, ভোগ করে নাও এই বিলাস।

৭৪

শীত ঋতু ঐ হ'ল গত, বইছে বায় বসন্তেরি,
জীবন-পুঁথির পাতাগুলি গড়বে ঝ'রে, নাই দেরী।
ঠিক বলেছেন দরবেশ এক, "দূষিত বিষ এই জীবন,
দ্রাক্ষার রস বিনা ইহার প্রতিষেধক নাই, হেরি।"

৭৫

'সরো'র মতন সরল তনু টাট্‌কা-তোলা গোলাপ-তুল,
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ' মশগুল।
মৃত্যুর ঝড় উঠবে কখন, আয়ুর পিরাণ ছিঁড়বে তোর–
পড়ে আছে ধুলায় যেমন ঐ বিদীর্ণ-দল মুকুল !

৭৬

পল্লবিত তরুলতা কতই আছে কাননময়,
দেওদার আর থল্‌কমলে, জান কেন মুক্ত কয় ?
দেবদারু তরুর শত কর, তবু কিছু চায় না সে ;
থল্‌কমলীর দশ রসনা, তবু সদা নীরব রয়।

৭৭

আমার সাথী সাকী জানে মানুষ আমি কোন্ জাতের,
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের সুখ-দুখের।
যেমনি মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাস ভরে দেয় সে মদ,
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেব-লোকের।

৭৮

আরাম ক'রে ছিলাম শুয়ে নদীর তীরে কাল রাতে,
পার্শ্বে ছিল কুমারী এক, শারাব ছিল পিয়ালাতে ;
স্বচ্ছ তাহার দীপ্তি হেরি' শুক্তি-বুকে মুক্তা-প্রায়
উঠল হে'কে প্রাসাদ-রক্ষী, ' ভোর হ'ল কি আধ-রাতে ?

৭৯

মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ঐ গোলাপ গুল্
শরিয়তের আজ খেলাফ্ ক'রে বেদম আমি করব ভুল।
গুল্-লালা-রুখ্ কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে
উঠল রেঙে কানন-ভূমি লালা ফুলের কেয়ারী-তুল্।

৮০

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পু'থি যৌবনের!
ধুলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম!
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে দেরী ঢের।

Dhaka University Institutional Repository

৮১

আজ আছে তোর হাতের কাছে আগামীকাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াস্‌নে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন-করিস্‌নে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি-নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!

৮২

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার!
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন, রে অবোধ!
আখেরে রে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার!

৮৩

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত করে মোদের কর,
হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর;-
মৃত্যু-লোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আস্‌ল না,
যে সব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশ্‌ খবর।

৮৪

পান করে যাই মদিরা তাই, শুনছি প্রাণে বেণুর রব,
শুনছি আমার তনুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,
তিক্ত স্বাদের তরে সুরার করো না কেউ তিরস্কার,
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিক্তাসব।

৮৫

ব্যথার দরুণ, শারাব পিও, ইহাই জীবন চিরন্তন ;
জরায় স্বর্গ-অমৃত এ, যৌবনের এ সুখ স্বপন।
গোলাপ, শারাব, বন্ধু লাভের মরসুম এই আনন্দের-
য'দিন বাঁচ শারাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন।

৮৬

সুরা দ্রবীভূত চুণী, সোরাহি সে খনি তার,
এই পিয়ালা কায়া যেন, প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার।
বেলোয়ারির এই পিয়ালা-ভরা তরল হাসির রক্তিমা,
কিংবা ওর ব্যথায়-ক্ষত হিয়ার যেন রক্তাধার।

৮৭

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শারাব তার ভিতর ;
দেহ তাহার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশীর স্বর।
খৈয়াম! তুই জানিস্‌ কি এই মাটির মানুষ কোন্‌ জিনিস ?
খেয়াল-খুশীর ফানুস এ ভাই ভিতরে তার প্রদীপ-কর।

৮৮

ব্যর্থ মোদের জীবন ঘেরা কুগ্রহ সব মেঘলা প্রায়,
'জিহুন' সম স্রোত বয়ে যায় অশ্রু-সিক্ত চক্ষে, হায়!
বুকের কুন্ডে দুখের দাহ- তারেই আমি নরক কই,
মুহূর্তের যে মনের শান্তি-আমি বলি স্বর্গ তায়।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯
মদের নেশার গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির।
শারাব-ভরা কু'জোর টু'টি জাপটে সাকী হস্তে তার
পাত্রে ঢালে, নিঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির!

৯০
পেতে যে চায় সুন্দরীদের ফুল্ল-কপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুলল দাঁত
তাই সে ছু'য়ে ধন্য হ'ল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল।

৯১
শারাব নিয়ে বসো, ইহাই মহ্মুদেরই সুলতানৎ
'দাউদ' নবীর শিরীন-স্বর ঐ বেণু-বীণার মধুর গৎ।
লুট ক'রে নে আজের মধু, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।

৯২
ওগো সাকী! তত্ত্বকথা চার ও পাঁচের তর্ক থাক,
উত্তর ঐ সমস্যার গো এক হোক কি একশ' লাখ।
আমরা মাটির, সত্য ইহাই, বেণু আনো, শোনাও সুর!
আমরা হাওয়া, শারাব আনো! বাকী যা সব চুলোয় যাক।

৯৩
এক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া, রে ভাই, মদ চালাও!
কালকে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন দেখতে পাও।
খামখেয়ালীর সৃষ্টি এ ভাই, কালের হাতে লুঠের মাল,
তুমিও তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুঠিয়ে দাও!

৯৪
কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,
তূসের রাজ্য একছিটে এই মদেও কাছে সব যে ঝুট!
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তব
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-জনের শ্বাস অস্ফুট।

৯৫
এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের।

৯৬
ঘরে যদি বসিস্ গিয়ে 'জম্‌হুর' আর 'আরাস্তু'র,
কিংবা রুমের সিংহাসনে কায়সর হ'স্ শক্তি শূর—
জামশেদিয়া জামবাটি ঐ নে শুষে রে, সময় নাই,
বাহ্‌রামও তুই হ'স্ যদি, তোর শেষ ত গোর আঁধারপুর!

Dhaka University Institutional Repository

৯৭

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,
পরুক ওড়না রেশমী কিংবা পরুক জীর্ণ দীন বসন।
থাকুক শুয়ে ধুলায় সে কি থাকুক সোনার পালঙ্কে,
নরকে সে গেলেও প্রেমিক করবে সেথায় অন্বেষণ।

৯৮

খৈয়াম- যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুন্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সুত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটলো, হায়!
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

৯৯

সাত-ভাঁজ ঐ আকাশ এবং চার উপাদান-সৃষ্ট জীবন!
ঐ এগারোর মারপ্যাচে সব ধোঁওয়াস্, গলিস বদ-নসীব।
যে যায় সে যায় চিরতরে, ফেরত সে আর আসবে না,
পান ক'রে নে বলব কত, বলে' ক্লান্ত জিভ!

১০০

খাবার হওয়ার শারাব-খানায় ছুটছি আমি আবার আজ,
রোজ পাঁচবার আজান শুনি, পড়তে নাহি যাই নামাজ!
যেমনি দেখি উদ্‌গ্রীব ঐ মদেরও কু'জো, অমনি ভাই-
কু'জোর মতই উদ্‌গ্রীব হই, কণ্ঠ সটান হয় দরাজ।

১০১

এক কু'জো-যা আমার মত ভোগ করেছে প্রেম-দাহন,
সুন্দরীদের মাথায় থাকি পেলো খোঁপার পরশন।
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও
পেলো কতই তন্বঙ্গীর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন!।

১০২

দ্রাক্ষা সাথে ঢলাঢলির এই ত কাঁচা বয়স তোর,
বৎস, শারাব-পাত্র নিয়ে ঠাঁয় বসে দাও আড্ডা জোর।
একবার ত নূহের বন্যা ভাসিয়েছিল জগৎখান,
তুইও না হয় ভাসিয়ে দিলি মদের স্রোতে জীবন তোর!

১০৩

সাবধান! তুই বস্‌বি যখন শারাব পানের জলসাতে,
মদ খাস্‌নে বদ্-মেজাজী নীচ কুৎসিত লোক সাথে।
রাত্তির ভর করবে সে নীচ চীৎকার আর গন্ডগোল,
ইতর সম চেঁচিয়ে কারণ দর্শাবে ফের সে প্রাতে।

১০৪

যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই, যত পার মদ চালাও,
তিনটি কথা স্মরণ রেখে ঃ কাহার সাথে মদ্য খাও ?
মদ-পানের কি যোগ্য তুমি ? কি মদই বা করছ পান ?-
জ্ঞান পেকে না ঝুনো হ'লে মদ খেয়ো না এক ফোঁটাও!

Dhaka University Institutional Repository

১০৫

তোমরা–যারা পান কর মদ আর সব দিন, কিন্তু যা
পান কর না শুক্রবারে, ছোঁয়ো না শারাবের কুজা–
তাদের বলি-আমার মত সব বারকে সমান জান,
খোদার তোরা পূজারী হ', করিস্ না কো বার পূজা।

১০৬

করছে ওরা প্রচার-পাবি স্বর্গে গিয়ে হূরপরী,
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদা যা পা'স তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিস্‌নে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূণ্য হাওয়ায় সঞ্চরি।

১০৭

এই সে আঁধার প্রহেলিকা পারবিনে তুই পড়তে মন!
তুই কি সফল হবি যেথায় হার মেনেছে বিজ্ঞজন?
শারাব এবং পেয়ালা নিয়ে খুশীর স্বর্গ রচ হেথাই–
পাবি কি না পাবি বেহেশ্‌ত্, বলতে পারে কেউ কখন?

১০৮

দোহাই! ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শারাব-খোর গোঁয়ার,
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।
শারাব পিও, কারণ শারাব পান কর আন না-ই কর,
ভাগ্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।

১০৯

জীবন যখন কণ্ঠাগত-সমান বলখ্ নিশাপুর,
পেয়ালা যখন পূর্ণ হ'ল-তিক্ত হোক কি হোক মধুর।
ফুর্তি চালাও, নিভে যাবে হাজার তপন লক্ষ চাঁদ,
আমরা ফিরে আসব না আর এই ধরণীর পথ সুদূর!

১১০

আয় ব্যয় তোর পরীক্ষা কর্ ঠিক সে হিসাব করতে পেশ্,
আসার বেলায় আন্‌লি কি আর নিয়েই বা কি যাস সে দেশ।
"আনব না কো বিপদ ডেকে শারাব পিয়ে"–ক'স যে তুই,
মদ খাও আর না খাও তবু মরতে তোমায় হবেই শেষ।

১১১

হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুম্ভকার,
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা, ঘট তৈরীর মাল দেদার।
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এ-সব যেই দেখলাম, কইল মন,
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপ দাদার।

১১২

একি আজব করছ সৃষ্টি, কুম্ভকার হে, হাত থামাও!
চূর্ণ নরের মাটি নিয়ে করছ কি তা দেখতে পাও?
কায়খসরুর হৃদয় এবং ফরীদুনের অঙ্গুলি
বে-পরোয়া হয়ে তোমার নিঠুর চাকায় মিশিয়ে যাও!

Dhaka University Institutional Repository

১১৩

চূর্ণ করে তোমায় আমায় গড়বে কু'জো কুম্ভকার,
ওগো প্রিয়া! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-খিড়িক-দ্বার–
পাত্রে ব্যথার শান্তি ঢালো–এই সোরাহির লাল সুরা,
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর।

১১৪

এই যে রঙীন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে যে গড়ল সে
ফেলবে ভেঙে খেয়াল খুশীর লীলায় এদের বিন দোষে?
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ
প্রীতির ভরে সৃষ্টি ক'রে করবে ধ্বংস ক্রোধবশে!

১১৫

পেয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লালা ফুলের প্রায়
ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস্ লালা-রুখদিল্ প্রিয়ায়।
মউজ ক'রে শারাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়ত ভাই
উলটে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ আসা ঝঞ্ঝাবায়।

১১৬

মস্‌জিদ আর নামাজ রোজার থামাও থামাও গুণ গাওয়া,
যাও, গিয়ে খুব শারাব পিও, যেমন ক'রেই যাক পাওয়া!
খৈয়াম, তুই পান করে যা, তোর ধূলিতে কোন্ একদিন
তৈরী হবে পেয়ালা, কু'জো, গাগ্‌রী, গেলাস মদ-খাওয়া।

১১৭

মৃত্যু যেদিন নিঠুর পায়ে দল্‌বে আমার এই পরান,
আয়ুর পালক ছিন্ন করি' করবে হৃদয়-রক্ত পান,
আমায় মাটির ছাঁচে ঢেলে পেয়ালা ক'রে ঢালবে মদ,
হয়ত গন্ধে সেই শারাবের আবার হব আয়ুষ্মান!

১১৮

রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,
রং-বেরং-এর খিলান-করা এই যে আকাশ-অবাস্তব।
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,
একটি নিঃশ্বাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুসুমের এ টব।

১১৯

তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান-দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শারাব রাত্রিদিন!
তোমার কাছে তস্‌বী দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল্-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙীন!

১২০

মস্‌জিদের ঐ পথে ছুটি প্রায়ই আমি ব্যাকুল প্রাণ,
নামাজ পড়তে নয় তা বলে, খোদার কসম! সত্যি মান।
নামাজ পড়ার ভান ক'রে যাই করতে চুরি জায়নামাজ,
যেই ছিঁড়ে যায় সেখানা, যাই করতে চুরি আরেকখান।

Dhaka University Institutional Repository

১২১
নিত্য দিনে শপথ করি– করব তৌবা আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।
অমনি আঁখির আগে দাঁড়ায়ে গোলাপ ব্যাকুল বসন্ত
সকল শপথ ভুল হয়ে যায়, কুলোয় না আর তৌবাতে।

১২২
আগে যে সব যুখ ছিল, আজ শুনি তাদের নাম কেবল,
মদ ছাড়া সব গেছে ছেড়ে আগের ইয়ার বন্ধুদল।
কেমন ক'রে ছাড়ব– যে মদ আমায় কভু ছাড়ল না,
এক পেয়ালা আনন্দ, তাও ছাড়লে কিসে বাঁচব বল।

১২৩
আমরা শরাব পান করি ভাই শ্রীবুদ্ধি ঐ পানশালার,
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার।
আমরা যদি পাপ না করি ব্যর্থ হবে তাঁর দয়া,
পাপ করি তাই ক্ষমা ক'রে করুণাময় নাম খোদার।

১২৪
তোমার দয়ার পেয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মস্ত করো আমার 'আমি'র পাই সীমা,
দুঃখে যেন শির না দুখায় অতঃপর, হে দুঃখহর!

১২৫
আমায় সৃজন করার দিনে জানত খোদা বেশ ক'রেই
ভাবীকালের কর্ম আমার, বলতে পারত মুহূর্তেই।
আমি যে সব পাপ করি–তা ললাট লেখা, তাঁর নির্দেশ,
সেই সে পাপের শাস্তি নরক–কে বলবে ন্যায় বিচার এই!

১২৬
দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু, দুয়ার খোলো করুণার!
আমায় করো তোমার জ্যোতিঃ, অন্তর মোর অন্ধকার।
স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম ক'রে–
সে ত আমার পারিশ্রমিক, নয় সে দয়ার দান তোমার।

১২৭
দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমেও স্বর্গ হ'তে দিলেন কেন নির্বাসন?
পাপীর তরে করুণা যে–করুণা সে-ই সত্যিকার,
তারে আবার প্রসাদ কে কয় পুণ্য করে যা অর্জন!

১২৮
আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা-হৃদয় করি হেথায় শারাব পান।
আরাম-সুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না দুর্দশায়,
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের উর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২৯

দেখে দেখে ভণ্ডামি সব হৃদয় বড় ক্লান্ত, ভাই!
তুরন্ত শারাব আনো সাকী, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই!
শারাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কা'ল, আজ ত এখন মদ চালাই।

১৩০

স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ মোল্লা হয়ে সাজলে সং!
ছাড় কপট তপের এ ভান, সাধুর মুখোস এই তড়ং।
দেবেন 'আলী-মুর্তজা' যা সাকী হয়ে বেহেশ্‌তে
পান করো সে শারাব হেথাও হুরী নিয়ে রং-বেরং।

১৩১

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন–
"দুরাচার আর সুরার কর দাসীপণা সর্বক্ষণ!"
"আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি"–কয় বারনারী,
"কিন্তু শেখজী, তুমি কি ভাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?"

১৩২

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুরখান–
দেখতে পেলাম ভাঁটি-খানার পথ ধরে শেখ সাহেব যান!
কইনু দেখে, "ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব!"
কইলেন পীর, "ফক্কিকার এ-দুনিয়া, করো শারাব পান!"

১৩৩

কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাঁটি–খানার পাঁড় মাতাল,
পীর সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল-ভরা মাল।
কইনু, "হে পীর, শরম তোমার নেই কি?" হেসে কইল পীর,
"খোদার দয়ার ভান্ডার সে অফুরন্ত, রে বাচাল!"

১৩৪

হে শহরের মুফ্‌তি! তুমি বিপথ-গামী কম ত নও,
পানোন্মত্ত আমার চেয়ে তুমিই বেশী বেহুঁ'শ হও।
মানব-রক্ত শোষ তুমি, আমি শুষি আঙুর-খুন,
রক্ত-পিপাসু কে বেশী এই দু'জনের, তুমিই কও!

১৩৫

ভণ্ড যত ভড়ং ক'রে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়–লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোস প'রে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ!

১৩৬

ধূলি-ম্লান এ উপত্যকায় এলি, এসেই হলি গুম,
করল তোরো জরদ্‌গব এ সে যাওয়া আসার ধূম।
নখগুলো তোর পুরু হয়ে হয়েছে আজ ঘোড়ার খুর,
দাড়ির বোঝা জড়িয়ে গিয়ে হ'ল যেন গাধার দুম্‌।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭

সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ, শারাব পান,
ভন্ডদের ঐ বুজরুকি কি হয় কখনো তার সমান ?
প্রেমিক এবং পান-পিয়াসী এরাই যদি যায় নরক,
স্বর্গ হবে মোল্লা পাদরী আচার্যদের "দাড়ী-স্থান"!

১৩৮

এই মূঢ়দল-স্থূল তাহাদের অজ্ঞানতার ঘোর মায়ায়,
ভাবে-মানবজাতির নেতা তারাই জ্ঞান ও গরিমায়।
ফতোয়া দিয়ে কাফের করে তাদের তারা এক কথায়
শুভ্র-মুক্তবুদ্ধি যারা, নয় গর্দভ তাদের ন্যায়।

১৩৯

মার্কা-মারা রইস্ যত-ঈষৎ দুখের বোঝার ভার
বইতে যাঁরা পড়েন ভেঙে, বিস্ময়ের নাই অন্ত আর,
তাঁরাই যখন দীন দরিদ্রে দেখেন দ্বারে পাততে হাত
তাদের তখন চিনতে নারেন মানুষ ব'লে এই ধরার।

১৪০

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
প্রাণে কারুর না দাও ব্যথা, মন্দ কারুর নাহি চাও,
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে না-ই চললে তায় বা কি!
আমি তোমার স্বর্গ দিব, আপততঃ শারাব নাও!

১৪১

জ্ঞান যদি তোর থাকে কিছু-জ্ঞানহারা হ' সত্যিকার,
পান করে নে শাশ্বতী সে সাকীর পাত্রে সুরার সার!
সেয়ান-জ্ঞানী! তোর তরে নয় গভীর আত্মবিস্মৃতি,
সব বোকারা জ্ঞান লভে না সত্যিকারের জ্ঞানহারার।

১৪২

যার পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বুকের বন্ধু তোর
মার্জিত জ্ঞান-চক্ষু নিয়ে দেখ্ এই তোর শত্রু ঘোর।
বন্ধু বেছে নিস্‌নে রে তোর অ র্জতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তর-হীন রঙ্গতার এ দোর।

১৪৩

দাস হয়ো মাৎসর্যের, হয়ো না কো অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর করে না ঠুনকো যশোখ্যাতির সখ,
অগ্নি-সম প্রদীপ্ত হও, বন্যা-সম প্রাণোদ্বেল,
হয়ো না কো পথের ধূলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক!

১৪৪

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন,
নির্বোধের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি-করবে তাহা বিসর্জন!

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫

সেরেফ্ খেয়াল-খুশীর বশে আপন জনের বক্ষে তুই,
এই যে তীব্র যন্ত্রণারই ক্ষত এঁকে দিস্ নিতুই–
শোক কর, কাঁদ, অশান্ত তোর মনও মৃত বী'র তরে,
আপন হাতে বধ করেছিস, রে অবোধ, এ শক্তি দুই।

১৪৬

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ সুখের এই দাওয়াই
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হস্‌নে, দেখবি দুঃখ নাই!
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে এই সে ভাই।

১৪৭

আকাশ পানে হতাশ আঁখি চেয়ে থাকি নির্নিমিখ্
'লওহ' 'কলম' বেহেশ্‌ত্-দোজখ কোথায় থাকে কোন্ সেদিক ঃ
অন্ধকারে পেলাম আলো, দরবেশ এক কইল শেষ–
'লওহ' 'কলম' বেহেশ্‌ত্-দোজখ তোরি মাঝে–নয় অলীক!

১৪৮

দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ আর নয় গগন
করল স্রষ্টা সৃষ্টি রে ভাই, দেখছে যাহা জ্ঞান-নয়ন!
চার উপাদান, ইন্দ্রিয় পাঁচ, আত্মা তিন ও দুই জগৎ–
পারল না সে সৃষ্টি করতে আরেকটি লোক মোর মতন।

১৪৯

কি হই আর কি নই আমি–মোর চেয়ে তা কে জানে ?
ঊর্ধ্বে নিম্নে যাহা কিছু ভেদ আছে তার মোর প্রাণে।
একদিনে মোর এসব বিদ্যা করল জলে বিসর্জন,
শারাব পানের অধিক মহৎ–কেউ যদি তার খোঁজ আনে!

১৫০

শূন্য হাত্‌ড়ে শূন্য পেলাম– যে আঁধারকে সে আঁধার!
একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহঙ্কার
ভেবেছিলাম–গিঁঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার।
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে।

১৫১

আসিনি ত হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামত, খেলার পুতুল তাঁর হাতে।
ক্ষীন কাঁকালে জড়িয়ে আঁচল, ঢালো সাকী বিলাও মদ,
পিয়ালা ভর সেই পানিতে–ধরার কালি ধোয় যাতে!

১৫২

ঘেরা-টোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস–
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করুণ সেই কথাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩

আমার রোগের এলাজ্ কর পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা,
পাংশু মুখে ফুটবে আমার চুণীর লালী, বন্ধুরা!
মরব যেদিন–লাল পানিতে ধয়ো সেদিন লাশ আমার,
আঙুর-কাঠের 'তাবুত' ক'রো, করব দ্রাক্ষাদল-ঝুরা।

১৫৪

পেয়ালার প্রেম যাচ্ঞা কর, থেমো না এক মুহূর্তও,
থাকবে হৃদয় মগজ তাজা মদ দিয়ে তায় ভিজিয়ে থোও!
আদমেরে করতো প্রণাম শয়তান দু' হাজার বার–
হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রমাণ আঙুর-মউ।

১৫৫

অঙ্গে রক্ত মাংসের এই পোষাক আছে যতক্ষণ
তকদীরের ঐ সীমার বাইরে করিস্‌নে তুই পদার্পণ।
নোয়াস্‌নে শির, 'রুস্তম' 'জাল' শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত যদি হয় 'হাতেম-তাই' তাহারও দান নিস্‌নে শোন্।

১৫৬

কইল গোলাপ "মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি, রং সোনার,
গুলবাগিচার মিসর দেশে য়ুসোফ আমি রূপকুমার।"
কইনু, "প্রমাণ আর কিছু কি দিতে পার?" কইল সে,
'রক্ত-মাখা এই যে পিরাণ প'রে আছি, প্রমাণ তার!"

১৫৭

হৃদয় ছিল পূর্ণ প্রেমে, পেয়েছিলাম তায় একাও,
বক্ষে ছিল কথার সাগর, একটি কথা কইনি তাও।
দাঁড়িয়ে ভরা নদীর তীরে মরলাম আমি তৃষ্ণাতুর,
বিস্ময়কর এমন শহীদ দেখেছ আর কেউ কোথাও ?

১৫৮

'ইয়াছিন' আর 'বরাত' নিয়ে, সাকী রে, রাখ, তর্ক তোর!
আমার সুরার হাত-চিঠে দাও, সেই সে 'সুরা বরাত' মোর।
যে রাতে মোর শ্রান্তি ব্যথা ডুবিয়ে দেবে মদের স্রোত,–
সেই সে 'শবে-বরাত' আমার, সেই ত আমার বরাত জোর।

১৫৯

ভূলোক আর দ্যুলোকেরই মন্দ ভালোর ভাবনাতে,
বে-পরোয়া ঘুরে বেড়াই ভাটি-খানার আড্‌ডাতে।
গোলক হয়ে পড়ত যদি মোর ঘরে ঐ যুগল লোক,
মদের নেশায় বিকিয়ে দিতাম ওদের একটা আধলাতে।

১৬০

এই নেহারি-নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।
মহলা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয়-লীলার!

Dhaka University Institutional Repository

১৬১
আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাই রে এতে সন্দ নাই!
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু-বাক্সে তাই!

১৬২
আসমানি হাত হতে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর
পন্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর!
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর।

১৬৩
চাল ভুলিয়ে দেয় রানী মোর, খঞ্জন ঐ চোখ খর,
বোড়ে দিয়ে বন্দী ক'রে আমার ঘোড়া গজ হর!
তোমার সকল বল আগিয়ে কিস্তির পর কিস্তি দাও,
শেষে লালা-রুখ্ দেখিয়ে 'রুখ্' নিয়ে মোর, মাত কর!

১৬৪
আসমানে এক বলিবর্দ রয় 'পর্বিণ' নাম তাহার
আছে আরেক বৃষভ নিচে বইতে মোদের ধরার ভার।
কাজেই, এই যে মানবজাতি– জ্ঞানীর চক্ষে হয় মালুম–
ঐ সে ভীষণ ষাঁড় যুগলের মধ্যে যেন ঝাঁক গাধার।

১৬৫
শ্রেষ্ঠ শারাব পান ক'রে নেয় বদ্‌রসিকে, হায় স্ব হায়!
স্থুল-আত্মা মূর্খ ধনিক শ্রেষ্ঠ বিলাস বিভব পায়।
হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জিয়ার
শুকায় কিনা গুম্ফ-বিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায়!

১৬৬
রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্তি ইহার হয় না নাশ।
এই মদিরা–হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,
ভেবো না কেউ সুরার সাথে সুরার সা ও যায় উবে,
কভু এ হয় প্রাণী কভু তরু-লতা, ফুল-সুবা।

১৬৭
লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ও গাল করে মাত,
খেলতে গিয়ে চীন কুমারী হারে প্রিয়া তোমার সাথ।
খেলতে বাবিল্-রাজার সাথে হান্‌লে চাউনি একটিবার
মন্ত্রী ঘোড়া গজ নিলে তার হেনে ঐ এক নয়ন-পাত ?

১৬৮
তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর ব্যাকুল মন!
মীন-কুমারী হংসীরে কয়, "শুকাবে এই বিল যখন!"
মরালী কয়, "কাবাব যদি হই দু'জনাই তুই-আমি,
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায় লাভ তখন।"

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯

ঘূর্ণ্যমান ঐ কুগ্রহ-দল-সদাই যারা ভয় দেখায়-
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ঐ লণ্ঠনেরই ছায়ার প্রায়।
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথ্বী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায়।

১৭০

ফিরনু পথিক সাগর মরু ঘোর বনে পর্বত-শিরে
এই পৃথিবীর সকল দেশে গুহায় ঘরে মন্দিরে,
শুনলাম না-ফিরছে কেউ তীর্থ-পথিক এই পথের,
আজ এ পথে যাত্রা যাহার, আসল না সে কা'ল ফিরে!

১৭১

দুইজনাতেই সইছি সাকী নিয়তির ভ্রূভঙ্গি ঢের,
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ
সেই ত ধ্রুব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের!

১৭২

স্রষ্টা মোরে করল সৃজন জাহান্নামে জ্বলতে সে,
কিংবা স্বর্গে করবে চালান-তাই বা পারে বলতে কে !
করব না ত্যাগ সেই লোভে এই শারাব সাকী দিল্‌রুবা,
নগ্‌দার এ ব্যবসা খুইয়ে ধারে স্বর্গ কিন্‌বে কে ?

১৭৩

দুর্ভাগ্যের বিরক্তি পান করতে যেন না হয় আর,
পানই যদি করি, পানি পান করব পান-শালর।
এই সংসারে হত্যাকারী, রক্ত তাহার লাল শাবার,
আমাদের যে খুন করে, কি ? করব না পান খুন তাহার ?

১৭৪

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়ত নরকেই জ্বলি,
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়ত হবি অঞ্জলি।
খোদায় দয়া শিখাতে যাস্‌ সেই সে তুই, কি দুঃসাহস !
তুই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস্‌ কি বলি ?

১৭৫

কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস্‌, করেছি তোর ক্ষতি কোন্‌
সত্যি বলিস্‌, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ।
একটু মদের তরে এত উঞ্ছবৃত্তি তোষামোদ
এক টুকরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস্‌ অনুক্ষণ।

১৭৬

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!
স্বভাব-দোষে চিরটা কাল নিষ্ঠুরতার টান্‌ছে জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখ্‌তে যদি এই ধরা
খুঁজে পেত ঐ বুকে তার হারা-মণি-মানিক ঢের।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭
ভাগ্য দেবী! তোমার যত লীলা খেলায় সুপ্রকাশ
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও দুঃখ শোক,
বাহাত্তুরে ধরল শেষে ? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস ?

১৭৮
সইতে জুলুম খল নিয়তির চাও বা না চাও শির নোওয়াও!
বাঁচতে হলে হাত হতে তার প্রচুর ভাবে মদ্য খাও।
তোমার আদি অন্ত উভয় এই সে ধূলা মাটির কোল,
নিম্নে নয় আর এখন তুমি ধরার ধূলির উর্ধ্বে ধাও।

১৭৯
মোক্ষম বাঁধ বেঁধেছে যে মোদের স্বভাব-শৃঙ্খলে,
স্বভাব-জয়ী হতে আবার আমাদের সেই বলে !
দাঁড়িয়ে আছি বুদ্ধি-হত তাই এ দু'য়ের মাঝখানে–
উলটে ধরবে কু'জো কিন্তু জল যেন তার না টলে !

১৮০
মানুষ খেলার গোলক প্রায় ফিরছে ছুটে ডাইনে বাঁয়,
যেদিক পানে চলতে বলে ক্রূর নিয়তির হাতা তায়।
কোন হলি ভাগ্যদেবীর নিঠুর খেলার পুতুল তুই,
সেই জানে-এক সেই জানে রে, আমরা পুতুল অসহায়।

১৮১
খামকা ব্যথার বিষ খাস্‌নে, মুষড়ে যাস্‌নে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজির এই দু'নিয়ার তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়
আখেরে ত দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন–ভয় ভাবনা যাক চুলায় !

১৮২
সিন্ধু হতে বিচ্ছেদেরই দুঃখে কাঁদে বিন্দুজল,
'পূর্ণ আমি', কইল হেসে বিন্দুরে সিন্ধু অতল।
সত্য শুধু পূর্ণ, বাকী অন্য যা তা নাস্তি সব,
ঘূর্ণ্যমান ঐ এক সে বিন্দু বহুর রূপে করছে ছল।

১৮৩
আমার রানী (দীর্ঘায়ূ হন দম্ভে মারতে দাসকে তাঁর!)
হঠাৎ খেয়াল হ'ল, দিলেন সস্নেহ এক উপহার।
গেলেন চলে অনুগ্রহের চাউনি হেনে ! তার মানে–
'তার চেয়ে ঐ নালার জলে দাও ভাসিয়ে প্রেম তোমার।'

১৮৪
তোমার আদরিণী বধূ ছিল, প্রভু আত্মা মোর,
কাছ হ'তে তায় তাড়িয়ে দিলে কোন্ দোষে, হায় মনোচোর!
পূর্বে কভু ছিলে না ত এমন কঠোর, হে স্বামী !
বিরহিণী বাস করিব প্রবাসে কি জীবন ভর ?

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫

যেমনি পাবি মণ দুই মদ–যেখানে হোক যদিই পাস–
অমনি পানোন্মত্ত ওরে, সে মদ-স্রোতে যুবে যাস।
যেমনি খাওয়া অমনি হবি আমার মত মুক্ত-প্রাণ
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর ঋষির মত দাড়ির রাশ !

১৮৬

মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে মন্দ ভালোর দুই ধারা,
শুভাশুভ দুঃখ ও সুখ দান নিয়তির-কয় যারা,
তাদের বলি–অপরাধী করছে খামকা কুগ্রহে,
তোমার চেয়ে হাজার গুণ যে অসহায় সে বেচারা !

১৮৭

তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও !
এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশী করতে চাও
এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার
মুস্‌লিম খ্রীস্টান ইহুদী সবার যশো-গাথা গাও।

১৮৮

বলতে পার ! টক সে কেন আঙুর যখন কাঁচা রয় ?
পাকলে তার মিষ্টি রসে, তারই শারাব তিক্ত হয়।
কাঠকে কুঁদে কুঁদে যখন শিল্পী গড়ে রবাব বীণ
সেই কাঠে সেই শিল্পী বেণু গড়তে পারে ? নয় গো নয় !

১৮৯

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী বো'স যদি গোরস্থানে।
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও; সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়
জানতে চাস্‌নে কারেও আর তোরেও কেহ না জানে।

১৯০

খৈয়াম ! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা ?
দুঃখ ক'রে কেদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা ?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা।

১৯১

আবার যখন মিলবে হেথায় শারাব সাকীর আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল, একটি ফোটা অশ্রু ফেলো মোর নামে !
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকীর পাশ,
পেয়ালা একটি উল্টে দিয়ো স্মরণ ক'রে খৈয়ামে !

১৯২

বিশ্ব-দেখা জাম্‌শেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর
ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়।
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে–
জাম্‌শেদের সে জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর !

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩
আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,
প্রভু আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, " হে নিঠুর,
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয় ?"

১৯৪
হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,
খোদা কি, তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,
তুমি যখন রইবে না কাল জানবে কি আর শূন্য বই ?

১৯৫
খৈয়াম ! তোর দিন দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা–
আত্মা নামক শাহানশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে; কোথায় সে যায় অ-জানা।

১৯৬
পৌঁছে দিও হযরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম–
"বাদ্‌শা নবী! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর-পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?"

১৯৭
তত্ত্ব-গুরু-খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হাদিস !
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ!

গ্রন্থপঞ্জি :

১. নজরুল ইসলাম, কাজী: *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনায় : আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ব/এ-১৫২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের গত দু'শ বছরের ইতিহাসে তথা আধুনিক যুগের চারজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন, কবি মধুসূধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তাঁদের মধ্যে দু'জনের জন্ম বাংলাদেশে। মাইকেলের জন্মভূমি যশোর এবং জীবনানন্দের জন্মভূমি বরিশাল। জন্মসূত্রেই তঁদের লেখায় এসেছে বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য, মাটি ও মানুষের কথা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায় এবং নজরুলের জন্ম বর্ধমান হলেও তাঁদের লেখায় পর্যাপ্তভাবে বাংলাদেশের কথা এসেছে। তঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম এরূপ এক ব্যক্তিত্ব যাঁর উপর রয়েছে পারস্য সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমধর্মী চেতনা।

জীবনের প্রাথমিক স্তরে যে কবি বিদেশি ভাষায় কাব্য সৃষ্টিতে সক্ষম, প্রতিভা তাঁর অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ; তাঁর যাত্রাপথও অভিনবত্বে চিহ্নিত। বাংলাদেশে যে সময় এক প্রবল ভাববিপ্লব ঘটেছিল এবং বরীন্দ্র প্রভাবিত বড় বড় কবি-সাহিত্যিকের গ্রন্থ পাঠ করে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল– ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, স্নেহের দুলাল মধুসূদন যেরূপ সর্বসুখ ত্যাগ করে দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন, শান্তি অপেক্ষা অশান্তি, গৃহ অপেক্ষা মুক্তপ্রান্তর প্রিয় হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ঐশ্বর্যের সমুদ্রে ডুবে বিলাসিতাস্বরূপ সাহিত্য রচনা করেছিলেন; নজরুল ঠিক অভাবের সমুদ্রে হাবুডুবু অবস্থায় দারিদ্র্যের দুঃখ-কষ্ট বুকে ধারণ করে, নিজে ভস্ম হয়ে, নিজ প্রতিভার আলোকচ্ছটায় সাহিত্য প্রেমিকের হৃদয় মন্দির আনন্দে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তিনি নিজেকে এভাবে দগ্ধ না করলে ঐ আলো আমরা পেতাম না। যাঁরা মহাপ্রাণ; তাঁদের জীবন বহুর প্রয়োজনে এভাবেই উৎসর্গিত হয়ে থাকে– ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয়। এ গবেষণাকর্মের অধ্যায়গুলোতে নজরুলের ফারসি শিক্ষা এবং তাঁর সাহিত্যকর্মে ফারসি সাহিত্যের অনুপ্রবেশের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

নজরুল প্রতিভা মূলত সৃজনী প্রতিভা। কবি এক আশ্চর্য ক্ষমতায় ফারসি সাহিত্যের রূপক শব্দগুলো স্বীয় কাব্যে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন; স্বীয় জীবনের সমস্ত দুঃখ-চাঞ্চল্য-বিক্ষোভকে অন্তরালে রেখে তিনি এমন এক অনবদ্য সৃষ্টি মানুষের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন যার রহস্যময় সৌন্দর্য চিরকাল মানুষের সম্মুখে যেন অপূর্বই থেকে যায়। এটা এক ধরনের সেবা। সেবক আত্মগোপন করে তাঁর প্রকৃতি ও রূপ-রসের সেবা মানুষের দরবারে হাজির করেন, যার দৃষ্টান্ত– ব্যাসের *মহাভারত*, বাল্মীকির *রামায়ণ*, হোমারের *ইলিয়ড*, কালিদাসের *শকুন্তলা*, শেক্সপীয়রের *ম্যাকবেথ*, মাইকেলের *মেঘনাদবধ*, ফেরদৌসির *শাহনামা*, রুমীর *মসনবী*, সাদীর *গুলিস্তান-বোস্তান*, হাফিজের *দিওয়ান ও রুবাইয়াত* এবং খৈয়ামের *রুবাইয়াত* ইত্যাদি। বড় সৃষ্টির ভিতর যে পূর্ণ তপস্যা এবং সেবায় আত্মসমর্পনের ভাব রয়েছে, সমগ্রতার দিক দিয়ে লক্ষ করলে নজরুলকাব্যে তা পাওয়া যায়।

নজরুল অন্যের দুঃখ-কষ্টকে নিজের বলে মনে করতেন। আগুন যেমন ধাতুকে পুড়িয়ে খাঁটি করে তেমনি দুঃখ-কষ্টও আত্মাকে আয়নার মত পরিচ্ছন্ন রাখে। পৃথিবীতে এমন কোন ঘর নেই যে ঘরে দুঃখ নেই। নজরুল লিখেছিলেন, এক বিধবা তাঁর মরা সন্তান কোলে নিয়ে গৌতম বৌদ্ধকে বললেন তাঁর পুত্রকে বাঁচিয়ে দিতে। বুদ্ধদেব বললেন, 'দুঃখ নেই শোক নেই এমন কোন ঘর হতে কয়েকটি বিল্বপত্র যদি এনে দিতে পার, তাহলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব'। বিধবা বহু খোঁজ করেও দুঃখ শোকের ছোঁয়া নেই এমন কোন ঘর খুজে পেলেন না। তাই তিন দিন পর যখন জননী ফিরে এলেন তখন বিশ্বের দুঃখ কষ্টের মাঝে নিজ দুঃখের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন। (নজরুল রচিত 'জীবন-বিজ্ঞান' অবলম্বনে)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর সমালোচনামূলক ধর্মবিরোধী কবিতাগুলো ছিল খোদার সাথে অভিমান স্বরূপ। তিনি তাঁর 'চির বিদ্রোহী' কবিতায় অভিমানী হিসাবে বলেছেন :

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না!
তোমার সর্বশক্তি আমায়
বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায়!
হায়! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।

সম্পর্কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে পৌছেই অভিমান করা যায়। অভিমান করার জন্য যে পর্যায়ে পৌছার প্রয়োজন নজরুল সেখানে পৌছেছিলেন। বিদ্রোহমূলক উক্তির মাধ্যমে খোদা তথা ভগবানের উল্লেখ করে বিদ্রোহী নজরুল মহান আল্লাহর একক সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন।

নজরুলের ধর্ম সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোতে একদিকে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ঈশ্বর, দেবদেবী, অবতার, পয়গম্বরের প্রশংসায় মুখর; অন্যদিকে সমকালীন সমাজের ধর্মবোধ ও এর প্রয়োগরীতির ছিদ্রান্বেষী। কখনো তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জাগরণের দূত আবার তাদেরই সমালোচক। কোথাও তিনি খোদা-ভক্ত, আবার কোথাও বিদ্রোহী। কোথাও ঈশ্বর, ভগবান বা দেব-দেবীদেরকে সার্বিক শক্তি ও প্রেরণার উৎসরূপে দেখেন আবার কোথাও তাঁদেরকেই গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলে অভিহিত করেন। নজরুল আল্লাহকে স্বীকার করে ধর্মের আস্থাবাদী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এখানেই তাঁর ধর্মবোধ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ধর্মকে তিনি ভক্তির লক্ষ্য এবং শক্তির উৎসরূপেও দেখেছেন। প্রকৃত ধর্মবাদীর পক্ষে এই-ই স্বাভাবিক। গবেষণাকর্মে প্রমাণসহকারে নজরুলকে একজন ধার্মিক ও খোদাভীরু হিসাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

নজরুল 'ভৃগু' সম্পর্কিত উক্তিটিতে বলেছিলেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন'। যিনি ভগবানের বুকে লাথি মারেন; তাঁকে আবার আল্লার নামে জান কোরবানি করতে দেখা যায়। তাঁর অপরাধ তিনি ভগবানের বুকে লাথি মেরেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কি বুক আছে? যদি বুক থাকে তবে ভগবতীও আছে। তাতে অবশ্য হিন্দুদের ক্ষেপার কথা; কিন্তু মুসলমানরা ক্ষেপলেন কেন? অনেকের অভিযোগ; নজরুল কখনও কখনও জগদীশ্বর, ভগবান ও ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য। তাদের কাছে প্রশ্ন এ শব্দগুলো কি 'রব্বুল আলামিন' শব্দের প্রতিশব্দ ? কবির বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ– তাঁর লেখার মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ রয়েছে, তার উত্তরে যদি বলি, পারস্য সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'শাহনামা'য় মুসলমান কবি ফেরদৌসি অগ্নি-উপাসক ফারসি রাজাদের গুণগান গেয়েছেন, এজন্য কোনো মুসলমান সমালোচক নিন্দা করেছেন কি ? কোনো লেখককে বিচার করতে হলে তাঁর সমস্তটা নিয়েই বিচার করতে হবে। নজরুলের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর হাজার হাজার ইসলামি কবিতা বাদ দিয়ে 'বিদ্রোহী' আর 'ধুমকেতু' নিয়ে কেউ কেউ বিচার করেছেন। তাঁরা যেভাবে সে দু-তিনটি কবিতা নিয়ে বিচার করেছেন কবি কি সে হিসেবে 'বিদ্রোহী' ও 'ধুমকেতু' লিখেছেন? নাকি তাঁরা কবির এ দু-তিনটি কবিতার অমর্যাদা করেছেন? অবশ্য কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পড়ে বিচার করলে প্রকৃত বিষয় পরিষ্কার হবে।

পিএইচডি গবেষণার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি; কিন্তু *নজরুল চেতনায় ইরানি প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত ভাষা ও সাহিত্য* এর বিশাল সাগরের অবলোকন সমাপ্ত হয় নি। মনে হয় যেন এ সাগরের বেলাভূমিতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।